

যে এ সকল গুচ তৎক্ষত্রিয়েরই অধিকার, ব্রাহ্মণের অধিকার নাই।

এই পূর্বাঞ্চলীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে ইক্ষাকুবংশে ভগবান শাক্য সিংহের জন্ম হয়। তাহাব জন্ম গ্রহণের ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিদেহ দেশস্থ বৈশালী নগরে ভগবান্ নিগ্রহস্থনাথের জন্ম হয়। ইনি জৈন ধর্মের প্রবর্তক। প্রথম প্রথম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীগণ—ব্রাহ্মণ গণের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেন নাই, তাহাবা প্রচলিত আচার ব্যবহার মানিয়া চলিলেন, স্মরণ্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাহাদেব বিবোধ ঘটিত না। বুদ্ধ ও নিগ্রহস্থনাথের শিষ্যগণ সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতেন, যে ভিক্ষু হইল সে স্মৃতি আচার মানিত না। কিন্তু তাহাতেও ব্রাহ্মণগণের আপত্তি ছিলনা। স্মৃতি ও আচার সংসারীর জন্ত, বৈবাগীর জন্ত নহে। যে সকল সংসারী ব্যক্তি এই শাক্য ও জৈন ভিক্ষুদিগের আহাব যোগাইত ও তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি কবিত, তাহাবা স্মৃতিব আচার অনুসারে চলিলে, ব্রাহ্মণেবা তাহাদেব বিরুদ্ধাচরণ কবিতেন না।

আব এক কথা ব্রহ্মর্ষিদেহ হইতে এত দূর প্রদেশে ব্রাহ্মণগণের সংখ্যাও আধিপত্য অধিক ছিলনা। এইরূপে দুই শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধ ও জৈনগণ নিবাহভাবে মগধে বাস কবিতেন। পবে যখন অশোক রাজাব সমবে বৌদ্ধগণের প্রভাব বাড়িয়া উঠিল, রাজা নিজে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়া নানাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক পাঠাইয়া দিলেন তখন বৌদ্ধপ্রচারকগণ সর্ব

প্রথমে বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালায় তৎকালে ব্রাহ্মণ ছিল কি না সন্দেহ। মনু যে সকল প্রত্যন্তবাসী ক্রিয়া-হীন ব্রাহ্মণ দর্শনশূন্য অতএব বৃন্দল প্রাপ্ত জাতিব উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে পৌণ্ড ও কিবাত নামক দুই জাতি আছে। কিবাতগণ মিথিলাব উত্তর পূর্বে ও পৌণ্ডগণ ঠিক পূর্বাংশে বাস করিত, স্মরণ্য পৌণ্ড দেশেব পূর্ববর্তী অঙ্গ, বঙ্গ দেশে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণেব কিছুমান আধিপত্য ছিলনা। এই জন্য বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম বিলক্ষণ বঙ্গমূল হইয়া পড়িয়াছিল এবং সর্বাধিক অধিক কাল আপনাব প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল। ব্রাহ্মণেবা বঙ্গদেশেব উপব এত চটা ছিলেন যে তাহারা বলিতেন বঙ্গদেশে আদিব্রাহ্মণ প্রায়-শুদ্ধ করিতে হয়। মনুয সময় বঙ্গদেশেব উপর এ বাগ ছিলনা, বঙ্গদেশ আর্যবর্তের চতুঃসীমাব অন্তর্গত। তবে ব্রাহ্মণদেব এ বাগ হয় কেন? শুদ্ধ বাঙ্গালা বৌদ্ধদেহ বলিয়া। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, ও মগধ এই কয়েকটা দেশেব উপবই ব্রাহ্মণগণের বাগ, এবং এই কয়েকটা দেশই বৌদ্ধ অথবা জৈন প্রধান।

শঙ্কবাচার্য্য দুই ব্রাহ্মণগণের নমনের জন্ত বেদোদিত অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন এবং বিরোধিতাবলম্বিদিগের পবাজযার্থে সমস্ত ভাবতবর্ষ পবিক্রমণ কবেন। কিন্তু তিনি মগধ ও বঙ্গদেশে আগমন কবেন নাই। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্মণগণের বিশেষ অভাব ছিল। সেই জন্তই বোধ হয় তিনি বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন নাই। আমবা

আরও দেখিতে পাই কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার প্রামাণ্য সংস্থাপন কবিলে ভারতের অত্যন্ত দেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধদিগের প্রভাবও ক্রমেতে লাগিল। কিন্তু মগধ ও বঙ্গ একপ হয় নাই। মগধ ও বঙ্গ দেশবাসী যেরূপ বৌদ্ধ ছিলেন সেইরূপই বহিয়া গেলেন। শঙ্করাচার্য্যের কিছুকাল পরে চীনদেশের পরিত্রাজক হিযাহুসাঙ মগধ ও বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তখন এই উভয় দেশেই কান্তকুজাধীশ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের অধীন ছিল। তিনি বাঙ্গালায় যে সকল নগর পরিভ্রমণ কবিয়াছিলেন সে সকল দেশেই বৌদ্ধ মন্দির এবং অনেক বিধর্ম্মীগণের মন্দিরও ছিল। এই বিধর্ম্মী কাহারা, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। তৎকালে বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আবও একটি ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এই ধর্ম্মের যাজকগণ পণ্ডিত শব্দে অভিহিত হইতেন। আমবা ব্রতমালাবদান পুস্তকে দেখিতে পাই যে তৎকালে ভারতবর্ষে তিন প্রকাব ধর্ম্মযাজক ছিল, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও ভ্রমণ। এখনও বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেক পণ্ডিত যাজক দেখিতে পাওয়া যায়। হিযাহুসাঙ বোধ হয় এই পণ্ডিতদিগের অনেক মন্দির দেখিতে পাইয়া ছিলেন। কান্তকুজ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবাব কিছু দিন পরে বাঙ্গালা ও মগধে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের প্রাভুর্ভাব বৃদ্ধি হয়। পাল রাজাদিগের সময়ে আমবা দেখিতে পাই এক জন ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া

ছিলেন, এবং প্রধান মন্ত্রীর তিন চারি পুরুষ ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, বোধ হয় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ প্রাভুর্ভাবের এই সূত্রপাত। কিন্তু যেমন পালবাজগণের রাজত্ব কালে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ প্রাভুর্ভাবের সূত্রপাত হয়, সেইরূপ অপবদিকে পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধদিগের অনেকটা একাকাব হইয়া যায়। আমবা ধর্ম্ম মঙ্গলে গ্রন্থ দেখিতে পাই যে পাল বংশীয় ধর্ম্মপাল নামক রাজাব অধিকার সময়ে ধর্ম্মের পূজা প্রচাব হয়। বমাই বাইতী এই ধর্ম্মের যাজক ছিলেন। কালু ডোম এই ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে লাউসেনের বিশেষ সহায়তা করিয়া ছিলেন এবং পবিণামে ডোমেবাই ধর্ম্ম পূজার প্রধান পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। আমার বোধ হয় ধর্ম্ম পূজা বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। বৌদ্ধ রাজাব সময় উহার প্রাভুর্ভাব, বৌদ্ধদিগের বহুত্রয়ের মধ্যে ধর্ম্ম রহই উহার উপাস্য দেবতা এবং যে সে জাতি লোকই উহার যাজক হইতে পাবে। বিচক্ষণ পালবাজগণ নিম্নশ্রেণীর অনাধ্যাদিগকে এই রূপে আপনাদিগের ধর্ম্মাক্রান্ত কবিয়া আপনাদের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

ক্রমে পালবংশের প্রভাব ধ্বংস হইলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা স্বাধীন হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৌদ্ধ ছিলেন এবং কতকগুলি হিন্দুও ছিলেন। যাহারা হিন্দু ছিলেন, তাহারা সহজেই যজ্ঞাদি করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন, দেশে ব্রাহ্মণাদি থাকিলেও সে সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা বজ্রকার্য সম্পন্ন

হইয়া উঠিত না। তাই তাঁহাদিগকে বিদেশ হইতে অন্ততঃ পাঁচজন করিয়া ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবার দ্রষ্টা আনয়ন করিতে হইত। আমরা “গৌড়ে ব্রাহ্মণ” নামক পুস্তকে দেখিতে পাই যে আদিশূর ভিন্ন অষ্ট দুই তিন জন রাজাও যজ্ঞার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। আদিশূর রাজার ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা সকলেই অবগত আছেন, তিনি একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যে রাজার নিকট ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইয়া ছিলেন তিনিও একজন পরাক্রান্ত ভূপতি। এইজন্ত তাঁহাৰ্হাকর্ষক আনীত ব্রাহ্মণগণের প্রভাব সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন ভিন্ন আদিশূরসম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তাঁহার কয়েক পুরুষ পরে হিন্দু-ধর্মাবলম্বী বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন অতি পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের বহুদূর সংস্কার এই যে বল্লালসেন অত্যন্ত জাতিদিগকে ব্রাহ্মণ প্রদান করিয়া হিন্দু করিয়া লইয়া ছিলেন এবং বাঙ্গালার জাতি সম্বন্ধে একটা পাকা বন্দোবস্ত কবিয়া দিয়া যান। বল্লালসেনের বন্দোবস্ত আজিও চলিয়া আসিতেছে।

আমি এতক্ষণ বর্ণধর্মের উৎপত্তি ও বাঙ্গালার পূর্ব ইতিহাস লইয়া আপনাদিগের অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু বোধ হয় আপনারা আমার এই অপরাধ মার্জনা করিবেন। বঙ্গদেশের জাতিমালা প্রাধিকানপূর্বক বৃদ্ধিতে গেলে যে সকল কথা নিতান্তই প্রযোজন হয়, আমি শুদ্ধ তাহাই যতদূর পারি সংক্ষেপে বলিযাছি। বল্লালসেন জাতিসম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত

করিয়াছিলেন তাহার যত্নপি একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ থাকিত তাহা হইলে আপনাদিগকে অল্প এতক্ষণ সময় নষ্ট করিতে হইত না।

বল্লাল সেন কি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। বাঙ্গালার জাতি সম্বন্ধে আমবা শূলপাণি-প্রণীত প্রাথমিক-বিবেক গ্রন্থ হইতেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারি। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির মত বঙ্গদেশে আদবলীয়। তিনি আপনাকে সাহড়িয়ান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সাহড়ি শব্দে বাটার শ্রেণীয় ভরহাজগোত্রীয় একটি গাঁই বুঝায়। শূলপাণি যখন আপনাকে সাহড়িয়ান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই বাটারশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রিয় ছিলেন। বঙ্গদেশে স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার কথা অত্যন্ত প্রামাণিক। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র এই চারি জাতিতে স্বীকার কবিয়াছেনই, তাহার উপর নানাশ্রেণীর অন্ত্যজ জাতিরও অস্তিত্ব স্বীকার কবিয়া গিয়াছেন। তিনি অপস্ত্রের বচন উদ্ধৃত কবিয়া বলেন রজক, নট, বাগ্গকব, চর্ম্মকার ও কৈবর্ত্ত আদির অন্ন, জ্ঞানপূর্বক ভোজন কবিলে অর্দ্ধ চন্দ্রায়ণ কবিত্তে হয়। কাপালিকার অন্ন ভোজন করিলেও সেই ব্যবস্থা। কিন্তু চণ্ডাল স্বপচ ক্ষতা, সূত, বৈদেহিক, মাগধ প্রভৃতির অন্নভোজন করিলে পূর্ণ চন্দ্রায়ণ করিতে হয়। আমরা দেখিতেছি, শূত্রের অন্ন, আহাবের পক্ষে শূলপাণির নিয়ম অন্ত্যজ জাতির অন্ন আহাবের দ্বারা কঠিন নহে। তিনি বলেন আপৎকালে বিধি যদি শূত্র গৃহে শূত্র

অঙ্গ ভোজন কবে তাহা হইলে মনস্তাপের
 দ্বাৰা শুদ্ধ হইতে পাবে। প্রতিগ্রহ সম্বন্ধেও
 তিনি বলেন শূদ্রের নিকট প্রতিগ্রহ কবিলে
 অর্দ্ধ চাক্ষায়ণ, শৌণ্ডিক, ব্যাধ, নিষাদ, বক্র,
 ঋক্যাব প্রভৃতির নিকট প্রতিগ্রহ কবি-
 লেও অর্দ্ধ চাক্ষায়ণ, বিস্ত চণ্ডালাদির
 নিকট প্রতিগ্রহ কবিলে পূর্ণ চাক্ষায়ণ
 কবিত্তে হয়। স্পর্শ সম্বন্ধেও তিনি বলেন
 চণ্ডাল স্পর্শ কবিলে স্নান, ঘৃতপ্রাশন
 ও মহাব্যাহতি হোম কবিত্তে হয়, কিন্তু
 ঋক্যাব, বজ্রক, বেণ, ধীবব ও নটকে স্পর্শ
 কবিলে আচমন দ্বাৰা শুদ্ধ হইতে পাবে।
 তাহাৰা যে অঙ্গ স্পর্শ কবিবে সে অঙ্গ ধৌত
 কবিত্তে হইবে, মস্তক স্পর্শ কবিলে স্নান

কবিত্তে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধ ও বৃক্ষকরাস
 স্পর্শ কবিলে সবস্ত স্নান কবিত্তে হইবে ও
 দ্বাদশ বাব মৃত্তিকা লেপন কবিত্তে হইবে।
 চণ্ডালের কুপস্থ জল পান কবিলে ব্রাহ্মণকে
 ত্রিবাত্র উপবাস কবিত্তে হয়, কিন্তু শূদ্রের
 জল খাইলে পদ্মপাত্রেব জল অথবা কুশোদক
 পান কবিলে শুদ্ধ হইয়া যায়। কোন
 অস্ত্রাজ জাতি যদি কূপ খনন কবিবা দেখ,
 সেই কূপের জল পান কবিলে পঞ্চগব্য সেবা
 কবিত্তে হয়। এতদ্বাৰা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে
 শূলপাণি অস্ত্রাজ জাতিগণকে বজ্রকাদি ও
 চণ্ডালাদি এই দুই ভাগে বিভক্ত করিষাষ্টেন,
 এবং কৈবর্তদিগকে বজ্রকাদিব মধ্যে নিক্ষেপ
 কবিয়াছেন।

ক্রমশঃ

সিপাই যুদ্ধে ব্রিটিশনীতি।

১৮৫৭ অব্দেব যে ভয়ঙ্কর বিপ্লবে সমস্ত
 ভারতবর্ষ আন্দোলিত হয়; বাঙ্গালা উত্তর
 পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্যদেশ যাহাব
 অভিঘাতে বুহ্মুর্ছঃ তবঙ্গাখিত হইয়া সাধা-
 বণের সম্মুখে যুগপৎ আশা ও আশ্বাস,
 আতঙ্ক ও আকুলতাব বাজ্য বিস্তাব কবিত্তে
 থাকে, সুদূর দক্ষিণাপথে যাহার গতি প্রসা-
 রিত হইয়া সকলকে সমান সমস্ত ও
 সমান বিচলিত কবিয়া তুলে, তাহার মর্ম-
 তেদী ইতিহাস অনেকে অনেক রূপ লিখিয়া

গিয়াছেন। এই ইতিহাসে আমবা এক
 সময়ে যেমন করুণাব 'মোহিনীচ্ছবি ও
 ন্যাযেব জলন্ত প্রতাপ দেখিবা স্তম্ভিত হই,
 অন্য সময়ে তেমনই পাপেব প্রগাঢ় কালিমা,
 কঠোবতাব হৃদযবিদারক দৃষ্ট ও বিষাদের
 ঘোবতব অন্ধকার দেখিবা মর্দাহত হইয়া
 থাকি। কোন কোন ন্যাযপর ঐতিহাসিক
 সিপাইযুদ্ধের ইতিহাসের চিত্র যথাযথ
 অঙ্কিত কবিত্তে প্রয়াস পাইয়াছেন বটে,
 কিন্তু অনেক অদ্বন্দ্বী স্বজাতিপ্রিয় লেখ-

কের দোষে ঐ ইতিহাস অনেক স্থলে কলঙ্কিত এবং অনেক স্থলে বা অতিবঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ভারতের একখানি মুসলমান ইতিহাস প্রণীত ও প্রচারিত হয় নাই। বাঙ্গালীক ও বেঙ্গালিদের বীলাভূমি, খনা ও লীলাবতীর জন্মস্থান, বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভবক্ষেত্র, প্রতাপসিংহ ও শিবজীব কীর্ত্তিনিকেতন এখনও অনেকের নিকট অনেক বিষয়ে অন্ধকাবাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ষাঁহাবা ভাবতের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাবা প্রায় সকলেই বিদেশী। তাঁহাদের লেখনীগুণে অনেক বিষয় যথার্থ প্রতিফলিত হইলেও বহুদর্শিতা বা সমদর্শিতাব অভাবে অনেক বিষয় আবাব বিপর্য্য হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ অব্দেব সিপাহিযুদ্ধেব কাহিনীও গাইরুপ অসম্পষ্ট, অসংলগ্ন ও অতিবঞ্জিত। কোনও ভারতবর্ষীয় আজ পর্য্যন্ত এই বিপ্লবেব একখানি প্রণালীবদ্ধ ইতিহাস প্রচাব কবেন নাই। এস্থলেও বিদেশিগণই এই বিদেশীয় বিপ্লবেব কৃত্রিম জগত্বেব সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল বিদেশী এই বিপ্লবেব তবঙ্গবর্ত্তে পড়িয়া ইতস্ততঃ সূঁবিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাহাবা পুস্তকাকারে, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বা বক্তৃতােনের নিকট গোপনীয় লিপিতে উহাব বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মোহিনী কল্লনীয় উদ্ভাস্ত হওয়াতে ইহাবা প্রকৃত ইতিহাসের স্বথোচিত সম্মান বন্ধা করিতে পাবেন নাই। ইহারা যে বিপদে পড়িয়াছিলেন সেই বিপদই শতগুণে পল্লবিত কবিয়াছেন, যে যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন সেই

যুদ্ধই আপনাদের স্বজাতীয়গণেব আলো-কিক বীরত্ব ও অসাধারণ ক্রমতাব বিকাশ দেখিয়াছেন, যে অত্যাচার সহিয়াছেন সেই অত্যাচারই সমগ্র ভারতের অতুষ্টিত বলিয়া ঘৃণা ও বিবাগেব সহিত ভারতবাসীদিগকে মুক্তিমান মহাপাপ বলিয়া বর্ণনা কবিয়াছেন। ইহাদেব লিপি পটুতা, ইহাদেব অভিজ্ঞতা, ইহাদেব সমদর্শিতা - সমস্তই অমুচিত স্বজাতি-প্রিয়তাব তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া গিয়াছে। ইহাবা বর্ণনাশক্তিব পরিচয় দিয়াছেন, কষ্টসহিষ্ণুতাব প্রমাণ দেখাইয়াছেন, বৈষয়িক জ্ঞানেব আভাস দিয়াছেন, কিন্তু সমদর্শিতাব সহিত ইতিহাসেব গৌরব রক্ষা করিতে পাবেন নাই। সুতরাং ইহাদেব প্রচারিত গ্রন্থ ইহাদেব লিখিত লিপি বা ইহাদেব বর্ণিত ঘটনা সকল প্রকৃত ইতিহাসস্থানীয় না হইয়া কল্পনাময়ী আখ্যানিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে সকলেই স্বীকৃত অন্ধ বিশ্বাস বা এইরূপ অন্ধ স্বজাতিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন, অথবা সে কথা বলি না। অনেক ইংরেজ সমদর্শিতাব পরিচয় দিয়া প্রকৃত ইতিহাসেব সম্মান বাখিয়াছেন; কিন্তু ইহাদেব সংখ্যা অতি অল্প এবং ইহাদের বর্ণনাও অনেক স্থলে অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ বর্ণনা হইতেও আমরা অনেক সময়ে নিগূঢ় সত্যের আভাস পাইয়া থাকি। ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনাব সময় ইহাতে আমাদের অনেক উপকার হইয়া থাকে। আমরা উপস্থিত প্রবন্ধে এই সকল লেখকের সাহায্যে সিপাহিযুদ্ধের সম্বন্ধে একটি গুরুতব বিষয় প্রতিপন্ন কবিতো চেষ্টা করিব

অনেক ইঙ্গবেজ লেখক সিপাহিবিপ্লবের ঘটনা বর্ণনা কবিত্তে গিয়া উত্তেজিত সিপাহিদিগের ঐশাচিক ব্যবহার ও গুরুতব নিষ্ঠূবতার বর্ণনা কবিষাছেন। 'সিপাহিবাকিৰূপে ইউৰোপীয়দিগকে দলে দলে হত্যা কৰিয়াছিল, কোমলপ্রাণ বালক বালিকাদিগকে সন্ধিনের উপব কেলিয়া দিয়া কিলূপে ভীষণ শোণিত-তবন্ধিনীব তবন্ধোচ্চুস দেখাইষাছিল, অসহায় মহিলাদিগকে কিকূপে তববাবিব আঘাতে থণ্ড বিথণ্ড কবিষা কেলিষাছিল, তাহা ইহাবা নিদারূণ ক্রোধ ও নিদারূণ অনুশোচনাব সহিত বর্ণনা কবিষাছেন। এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহিগণ যে নিষ্ঠূবতার পরিচয় দিষাছিল, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকাব কবিবেন না। ইহাদেব অভিজ্ঞতা বা দূবদর্শিতা ছিল না। কিলূপ অবস্থায় পড়িলে কিকূপ কাৰ্য্যপদ্ধতির অনুসরণ কৰিতে হয়, তাহা ইহাবা জানিত না। গবর্ণমেন্টের রাজনীতিব মন্খোত্তেদে ইহাদেব সামর্থ্য ছিল না। গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন কবিলে পরিণামে যে কি হইবে তাহা ইহারা বুদ্ধিত না। বিবেক ও জ্ঞাপবতা ইহাদিগকে সুপথ দেখাইষা দেয নাই। কর্তব্যবুদ্ধি ইহাদেব অন্ধকারময় কাৰ্য্যক্ষেত্রে আলোকবস্তীব স্বরূপ হয় নাই। দয়া ও কোমলতা ইহাদিগকে সমবেদনা দেখাইতে প্রবর্তিত করে নাই। গুরুতব উত্তেজনাব সময়ে যখন "কোম্পানির যুলুক রসাতলে গেল" বলিষা জনরব উঠিতে লাগিল, এই জনরব যখন বাতাসের উপর ভর কৰিষা বিহাংবেগে বাজারে বাজারে প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন ইহাবা সক-

লেই কোম্পানির বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন কৰিষা কোম্পানির ধমে আপনাদিগকে সন্তুষ্ট কৰিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এই গভীর উত্তেজনাব আবেগে ইহাদেব বাস্তবজ্ঞা অল্প জ্ঞানের বিপত্তিপূর্ণ তরঙ্গাঘাতে নিমজ্জিত হইষা গেল। যে বিপ্লব যুহুর্ন্তে যুহুর্ন্তে আপনাব সংহাবিনী শক্তির পবিচয় দিষা সকলকে সন্তুষ্ট কৰিষা তুলে, তাহাব আঘাতে কেহই স্থিরতাব সীমা অনুম্ন বাধিতে পারে না। সিপাহিগণও এই সময়ে স্থস্থির থাকে নাই। তাহারা চারি দিকে অরাজকতা দেখিষা আপনারাই সেই অবাজকতাব সীমা অধিকতর বিস্তৃত কৰিতে উচ্ছত হইল। কোম্পানি লোকাচার বা দেশাচারের অনুবর্তী না হইষা পূৰ্বে যে সকল অকার্য্যেব অনুষ্ঠান কৰিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এখন উত্তেজিত জনগণের নৃষ্টিপথে জাগকক হইল। ইহারা পূৰ্ব হইতেই কোম্পানিকে বিদেশীয় ও বিজাতীয় দল বলিষা জানিত, যেহেতু ইহাদেব দেবতা কোম্পানিই দেবতা ছিল না; ইহাদেব চিত্তবৃত্তি কোম্পানিব চিত্তবৃত্তিব সহিত মিশিষা ষাইত না; ইহাদেব অনুশাসন, ইহাদেব আচার ব্যবহার ও ইহাদেব রীতি নীতি, কোম্পানির অনুশাসন, কোম্পানির আচার ব্যবহার ও কোম্পানির রীতিনীতির সহিত এক শ্রেণীতে সমাবেশিত হইত না। স্থতরাং ষোরতর বিপ্লবের সময় ইহারা কোম্পানির সহিত সমবেদনা দেখাইল না; ববং দুরাশায় বুক বাধিষা স্বদেশ হইতে সমস্ত বিদেশীয় চিহ্ন বিনষ্ট কৰিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইল। ইহাদেব অনেকে কাৰ্য্যে

অনলল, স্বল্পসাধনে তৎপর, সংগ্রামে নি-
পুণ, বৃত্তান্তে নির্ভীক এবং ধর্মোদ্গাদে
অবীর ছিল। সুভারার ইহার কিছুতেই
নিরস্ত হইল না। ইহার সন্মুখে বাহা
কিছু পাইল, তাহাই লুটিয়া লইতে লাগিল
এবং বিদেশী যুবক যুদ্ধ বালক বালিকা স্ত্রী
পুরুষ বাহাদিগকে দেখিল, তাহাদেরই
শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিয়া
ফেলিল। উগ্রত্বতা, নির্ভীকতা ও অনভি-
জ্ঞতার আবেগে ইহাদের সাধুবৃত্তি সকল
পর্য্যন্ত হইয়াগেল।

ভারতের উদ্ভেজিত সিপাহিগণ এক সময়ে
গভীর উদ্ভেজনায় আবেগে দ্বিধাদিক্
জ্ঞানশূন্য হইয়া এইরূপ লোমহর্ষণ কার্য্য
সাধন করিয়াছিল। ইতিহাসে এই সকল
কথা গোপনে বাধিতে আমাদের প্রবৃত্তি
নাই। অনভিজ্ঞ ও অনুরদর্শী লোকে সহসা
যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পরিণাম
তাহারা পূর্বে ভাবিয়া দেখে না; স্মৃতবাং
সিপাহিবিল্লবের পরিণাম না ভাবিয়াই
নিরস্ত্রের নিরক্ষর লোকে এক এক
সময় নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু
পূর্বেই বলিয়াছি যে এই সকল বিষয়ও
ইঙ্গরেজলেখকেরা অতিরঞ্জিত করিয়া তুলি-
য়াছেন। এই সময়ে ইঙ্গরেজ কুলনারীর
প্রতি ঘোরতর অত্যাচারের কথা প্রকাশ
করিয়া ইঙ্গরেজেরা সাধারণকে চমকিত
করিয়া তুলেন। সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস
দ্বিতীয় খণ্ডে এ সম্বন্ধে বাহা লিখিত হই-
য়াছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।—
“উদ্ভেজিত গণপ্রকৃতি লোকের পাশব
প্রবৃত্তিতে কোমলমতি কোমলাঙ্গী মহিলা, অবিবাহিতা

সবলতাময়ী যুবতীরা কিরূপ
নিগৃহীত হইয়াছিলেন! নিগ্রহ ও কঠোর
একশেষ ভোগ করিয়া নিষ্ঠুর লোকের
অত্যাচারে কিরূপে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত
হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এই সময়ের
অনেক সংবাদ পত্রে, অনেক পুস্তকে প্রকা-
শিত হইয়া সম্মদ্য পাঠকের মনে নিদারুণ
কোভ, বোধ ও স্থগার আবেগ তুলিয়া দেব।
কিন্তু এই সকল বর্ণনা যে প্রকৃত ঘটনামূলক
সে বিষয়ে কেহ কোনরূপ বিশদ প্রমাণ
দেখাইতে পারেন নাই। লেখকেরা, বোধ
হয়, অনেক স্থলে মোহিনী কল্পনার উদ্ভাস
হইয়াই আপনাদের এই রূপ বিভীষিকাময়ী
বর্ণনায় পাঠকদিগকে চমকিত কবিত্তে প্রয়াস
পাইয়াছিলেন। একজন সম্মদ্য ইঙ্গরেজ
ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“এই সকল
স্থগিত অত্যাচারের বর্ণনা কেবল বাজাব
গুজবের উপর স্থাপিত হইয়াছিল কিম্বা নিম্ন
শ্রেণীর নিরক্ষর লোকের কথা শুনিয়া ঐরূপ
বর্ণনা করা হইয়াছিল। এই সকল লোক
বেশ জানে যে, যে কথা ঘটাই অতিবজ্জিত ও
পল্লবিত করা যায়, সে কথা অপবেব মনো-
যোগ ততই আকর্ষণ করিয়া থাকে। বোধ
হয় সে সময়ের উচ্চশ্রেণীর লোকে এইরূপ
অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত কাহিনীতে অপরের
কৌতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করেন নাই।
অত্যাচারের যে রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে,
তাহা কেবল মানবের উচ্চতর কল্পনাতেই
শোভা পায়। ঘোরতর হুঁচকারের অবতারে-
রাই কেবল সেই সকল অমানুষিক ভয়ঙ্কর
কার্য্যের অস্তিত্ব করিতে পারে। ইঙ্গরেজ
মহিলাদের উপর যে অত্যাচারের উল্লেখ

কথা হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণ হউক বা ক্ষত্রিয় হউক, বিজ্ঞাতীয় হিন্দুগণকর্তৃক অল্পাধিক হইলেই, তাহাতে জাতি নষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাদেব চরিত্র ও আচারও এইরূপ পাপকার্য্যের একান্ত বিবোধী। যে সকল ঋজব সর্কদা পরদাপহরণ কবিয়া বেড়াই, তাহাবাও এইরূপ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা লুঠ পাঠ ব্যতীত আর কিছুতেই মনোযোগ দেয় না। সম্পত্তি হরণের অনুবাগে বিবাহিতা মহিলাব পবন আদবেব ধন, বিবাহের অঙ্গুরী টানিয়া লইতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে। ইহাতে যে মহিলার পবিত্র বন্ধনের পবিত্রতা নষ্ট হইবে, তাহা তাহাবা বুঝে না। বস্তুতঃ এই পবিত্রতা নষ্ট কবিবার জন্যই তাহাবা উক্ত অঙ্গুরী অপহরণ করে না। মুসলমানের কথা সত্যজ্ঞ। কোবাণেব উপদেশেব সম্বন্ধে আমবা যাহাই মনে কবি না কেন, নাম মাত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিজেতাবা ইউরোপেব যুদ্ধে নগব সমূহ যে রূপে উৎসন্ন কবিয়াছিলেন, তাহাব যে পোমহর্ষণ চিত্র ইতিহাসে বহিয়াছে, তাহাব তুলনায় উপস্থিত সময়েব দৌবাগ্ন্য ও নিষ্ঠুরতা ববিরণ যে অধিকতর ভয়ঙ্কর সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।”

একজন সমদর্শী ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিক এইরূপ উদারভাবে ভাবতবর্ষেব পক্ষ সমর্থন কবিয়াছেন। উদ্ভোজিত সিপাহিবা যেকপ প্রকৃতির লোক ছিল, যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, যেরূপ সময়ে ইচ্ছিকার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল এবং গবর্ণমেন্টেব রাজনীতির দোষে লোকের কুমন্ত্রণায় যেকপ বিচলিত হইয়া

উঠিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের অত্যাচার ক্রিয়মাংশে মার্জনীয় হইতে পাবে। কিন্তু ইঙ্গরেজ বাজপুরুষ সুশিক্ষিত ও দূরদর্শী হইয়া উপস্থিত সময়ে যেরূপ অত্যাচারেব পবিচয় দিবাছেন, নিবাহী লোকের শোণিতে আপনাদেব হস্ত কলঙ্কিত কয়িয়া যেকপ নির্দয়তা ববাকাঠা দেখাইয়াছেন, সন্দেহ ঐতিহাসিকের নিকট তাহা কখনও মার্জনীয় হইতে পাবিবে না। এই সময়ে অধিকাংশ বাজপুরুষের বুদ্ধির স্থবিতা ছিল না, কর্তব্যকক্ষে অভিনিবেশ ছিল না, স্থায়্যপতা বগোব বক্ষা করিতে প্রবৃত্তি ছিল না। তাবতেব নিবক্ষণ জনসাধারণ ষাধা করিতে সক্ষম হইত, তাহাবা অবলীলায় তাহা করিয়াছেন। ইতিহাসে এ বিষয় ভাল আলোচনা কবা হয় নাই, অধিকাংশ ইঙ্গবেজ লেখক রিদে-শ্বেব অত্যাচারেব কথাই পল্লবিত কবিয়া গিয়াছেন—স্বদেশেব অপকর্মেব দিকে কিছুই দৃকপাত কবেন নাই। কিন্তু উদার ও সমদর্শী ঐতিহাসিকগণ অবশ্য স্বীকাব কবিবেন যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ কেবল ইউরোপেই আপনাদের অত্যাচারেব পবিচয় দেন নাই, ইহাদেব আক্রমণে কেবল ইউরোপেব স্রৃষ্ট লোকালবই বিলম্ব হইয়া যায় নাই, ইউরোপেব ইতিহাসই কেবল ইহাদেব এই ভয়ঙ্কর কার্য্যের চিত্র দেখাইয়া অপরকে চমকিত কবিয়া তুলে নাই। ভারতেব এই সিপাহি-বিপ্লবেব ইতিহাসেও ইহাদেব প্রবল উত্তেজনা, প্রবল প্রতিহিংসা এবং তৎপ্রযুক্ত ভয়াবহ কার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। দিল্লী সিপাহি-

দিগের হস্তগত হইলে, ইঙ্গবেজেরা যখন চারিদিকে পলাইতে থাকেন, তখন কতিপয় ইঙ্গরেজ পলায়ন সময়ে পশ্চিমদে ৭ জন লম্বদাবের (ইজ্রাবাদার) কাসি দেন এবং ৪ খানি গ্রাম জালাইয়া ফোলন। যেহেতু পলায়িতদিগের সন্ধেহ জন্মিয়াছিল যে লম্বদাবেরা ইঙ্গবেজ মহিলাদিগকে হত্যা করিয়াছিল। আব এক জন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সৈনিক পুরুষ (সেনাপতি নীল) এলাহাবাদ হইতে যাত্রাকালে এত লোক বিনষ্ট কবেন যে, শেষে তাঁহার সৈন্তদলের এক জন আকিসব-আব, লোক পাওয়া যাইবে না বলিয়া, তাঁহাকে সেই সর্বদ্বন্দ্ব হইতে নিবস্ত রাখিতে অনুবোধ কবেন। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী সৈনিক পুরুষ নিবস্ত লোকদিগকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছেন, হিন্দু পবিত্র দেব-মন্দির বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, অধিক কি শরণাগত নিবপবধ বালকেরও প্রাণনাশ করিয়া আপনাব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেনাপতি হড্‌সনের পৈশাচিক ব্যবহারের কথা মনে হইলে আজ পর্য্যন্ত হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। সিপাহি-বিপ্লব যখন প্রায় শেষ হয়, তখন হড্‌সন দিল্লির তিন জন রাজকুমারকে যেকপ নির্দয়রূপে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে শোণিতাক্ষরে লিখিত বহিষাছে। হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরে এই রাজকুমারগণ আব্রবক্ষা করিতেছিলেন। আপনাদের জীবন রক্ষা পাইবে এই আশায় ইঁহারা সমাধিমন্দির হইতে আপনাদের ইচ্ছায় বাহিবে আসিয়া ইঙ্গবেজ-সেনানী হড্‌সনের নিকট আত্ম সমর্পণ কবেন। ইঁহাদের মুখমণ্ডলে ভয়ের চিহ্ন ছিল না।

আশঙ্কার কালিয়া ছিল না, নিরাশার বিষমতা ছিল না। ইঁহারা উপস্থিত হইয়া বিনয় ও নম্রতার সহিত হড্‌সনকে অভিবাদন করিলেন। হড্‌সনও প্রত্যভিবাদন করিলেন। অবশেষে হড্‌সন ইঁহাদিগকে সমাধি-মন্দির হইতে পাঁচ মাইল দূরে লইয়া গেলেন। এই স্থানে তিনি আপনাব সৈন্তদ্বারা ইঁহাদের আবোহিত করুব গাড়ী ঘেরিলেন এবং ইঁহাদের গাত্রবস্ত্র খুলিয়া সহস্রে ইঁহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করিলেন। কেবল এই হত্যাতেই ব্রিটিশ বীরপুরুষের কোথ শাস্ত হইল না। হড্‌সন, নিহত দম্ভাট্-পুত্রগণের অস্ত্র, অলঙ্কার, পরিচ্ছদ সংগ্রহ পূর্বক দিল্লি নগরে যাইয়া মৃত দেহ গুলি বাহিবে অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া রাখিলেন। মুসভা ব্রিটিশ রাজত্বে ব্রিটিশ বীরের নিকটে এই কপে আশ্রয়প্রার্থীর আত্মসমর্পণের গোবব রক্ষা পাইল। ব্রিটিশ বীরপুরুষ এই কপে যুদ্ধবিবত শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবকে হত্যা করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাব অপূর্ব বীরত্ব কীর্তির পরিচয় দিলেন। এই বীরপুরুষের মহা-কীর্তির গোবব তাঁহাব সজাতীয়গণের অনেক উচ্চ কণ্ঠে গান করিয়া থাকেন।

যে সকল ব্রিটিশ বীরপুরুষ যুদ্ধ-স্থলে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, আপনাদের করগ্রত তববাবির উপব নির্ভব করিয়া বিজয়-গোবব লাভের আশায় দম্ভকালে সাহসের একশেষ দেখাইয়াছেন, তাঁহারাও এইরূপ বীরত্বের অবমাননাও বীরপুরুষোচিত গুণের এইরূপ গোবব মর্ষ্ট করিতে ক্রটি কবেন নাই। ঈহারা অজ্ঞ-চালনায

দীক্ষিত ছিলেন না, সংগ্রামে সমরলক্ষীর প্রসাদ লাভের আশাও অস্বাভাবিক-নিপাতে প্রবৃত্ত হইতেন না, শাস্ত্রভাবে বিচারাসনে বসিয়া রাজ্যের শান্তি রক্ষা করাই ঠাহাদের কার্য ছিল, তাঁহারাও বর্ণিত সময়ে সংহারিণী-মূর্ত্তির করাল ছায়া বিকাশ করিতে কাতর হন নাই। গবর্ণমেন্ট যে আইন প্রস্তত করিয়াছিলেন, সে আইনই জীব-হত্যা ঠাহাদের অমোঘ অস্ত্ররূপ ছিল। কামানের গোলা ব্যর্থ হইতে পারে, সজিনের সন্ধান বিকল হইয়া ঘাইতে পাবে, তববারির আঘাত লক্ষ্যে পতিত হইতে না পারে কিন্তু ইহাদের অস্ত্রের সন্ধান কোথাও প্রতিহিত, কোথাও ব্যর্থ বা কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ইহারা জীববিনাশে প্রতি মুহূর্ত্তে যেরূপ তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন, বুদ্ধদেব স্ত্রীপুণ বীরপুরুষের পরিচালিত অস্ত্র সেই রূপ তৎপরতা দেখাইতে পাবে নাই। একটি বিভাগে উপস্থিত সময়ে গবর্ণমেন্টের আইনের

হুমায় এই রূপে শত শত নির্দোষ প্রাণীর হত্যা হয়। আরতানে পরিমাণে ও সমুদ্বিতে এই বিভাগ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সর্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। ভারতের দুইটি প্রধান নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া এই স্থানে সঞ্চিত হইয়াছে। ইহা হিন্দুদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। দূরাগত যাত্রি-সমাগমে এই তীর্থস্থান এক এক সময়ে লোকারণ্যের অপূর্ণ হৃদয় বিকাশ করিয়া দেয়। মোগল সম্রাটগণের সময়ও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে উত্তর নদীর সঙ্গমস্থানে একটি সুদৃষ্ট দুর্গ নির্মিত হয়। ইংবাজেরা অতঃপর ঐ দুর্গই সংকত করিয়া আত্মরক্ষার উপায় বিধান করেন। এই বিভাগে অনেকগুলি সুদৃষ্ট পল্লী ও শ্রমোদ্ভব নগর আছে। উপস্থিত সময়ে ইহাতে প্রায় দশ লক্ষ লোকের বাস ছিল এবং কেবল দুই মাইল হইতে গবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর কুড়ি লক্ষ টাকা পাইতেন।

ক্রমশঃ।

কুশীনগর।

কুশীনগর কোথা? যে স্থানে ভগবান শাক্যসিংহ নির্ব্বাণনগরীতে অধিষ্ঠান করেন, যে স্থানে অশীতিপর বৃদ্ধ শাক্যসিংহ প্রাণ-ত্যাগ করিলে, প্রকাণ্ড শালতরুদ্বয়ের মধ্যে

শরণ তদীয় মৃত দেহের চতুর্দিশে দিক দিয়া হইয়া, তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যমণ্ডলী অবি-রত অঙ্গজল বিসর্জন করতঃ জগৎ অন্ধকার-ময় বোধ করিয়াছিল, সে কুশীনগর কোথা?।

যেখানে অশোকবাজ ও গুরুদেবের নির্মাণ-প্রাপ্তিস্বার্থ প্রকাণ্ড নির্মাণ স্থাপন নির্মাণ কথিয়া দিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে শাক্য-সিংহের নির্মাণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সহস্রবৎসর ধরিয়া অগণিত সংখ্যক তীর্থ-যাত্রা-ভিলাষী ভক্ত বৃন্দকে আকর্ষণ কবিত সে কুশীনগরকোথায় ?

ভগবান শাক্যসিংহ আপনার নির্মাণ প্রাপ্তির সময় সন্নিহিত জামিয়া বৈশালী নগর হইতে উত্তর পশ্চিমে কপিলবাস্ত অভিমুখে যাত্রা কবিলেন, কিয়ৎদূর গমন কবিয়া একবার পশ্চাৎ ফিবিয়া গেমবাবের ক্ষত বৈশালীনগর দর্শন কবিলেন। তখন এ ভক্ত-ভবন আর দেখিতে পাইল না ভবিয়া তাহার দীর্ঘ নিখাস পাড়িল, অশ্রুজল গণ্ডদেশ বহিয়া পতিত হইতে লাগিল। যে স্থানে এই ঘটনা হইয়াছিল পববন্তী ভক্তগণ তথায় স্থাপন নির্মাণ কাব্যাদিয়াছিল কিন্তু সে ইনিই বা কোথায়? তথা হইতে অর্ধৎ বোধিসত্ত্ব প্রত্যেক বৃদ্ধ ও ভিক্ষুগণে পবিরত হইয়া তাহাদিগকে নানা সত্বপদেশ প্রদান কবিত কবিত হঠাৎ তাহার বোগ-যাতনাবুদ্ধি হইয়া উঠিল, তিনি কুশীনগর সন্নিহিত প্রকাণ্ড শালতরুদ্বয়ের মধ্য স্থলে শয়ন কবিলেন ক্রমে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল তিনি নির্মাণ নগরীতে অধিষ্ঠান কবিলেন। কিন্তু সে কুশীনগর কোথায় ?

এখন সে পুণ্যভূমি নিবিড় অরণ্যে পবিশত হইয়াছে। সমস্ত ভাবত পবিদর্শনকর কেহই জানে না কোথায় ভারতের গোবব-ববিব শেষ সমাধিস্থান অবস্থিত ছিল। সিংহল পূর্ব উপদ্বীপ তাহার চীন

প্রভৃতি দেশদেশান্তরস্থ সৌগতগণ কোথায় আসিয়া তাহাদের ইষ্টদেবের চবম মন্দির সন্দর্শনে আপনাদিগকে পূত মনে করিত এখন সেই স্থান জগতের কেহই জানে না। তাহার স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। যে স্থাপ এককালে ১৭৭ ফুট উচ্চ ছিল এখন তাহার কিছুমাত্র দেখা যায় না। কতক ভগ্ন হইয়া গিয়াছে কতক মাটিতে প্রোত হইয়াছে, কতক বন ও জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া বহিয়াছে। ভয়াল ভঙ্গুক বাজাদি স্থাপদ সকল তাহার চতুর্দিকে বিচরণ কবিতেছে।

কিন্তু তাহাই বা কোথায়? কেহইত জানেনা, সংস্কৃত সাহিত্য এত প্রকাণ্ড তাহাতে ত কুশীনগরের কোন ঠিকানাই পাওয়া যায় না। পালি সাহিত্য এত বিস্তৃত কিন্তু সিংহল পূর্ব উপদ্বীপ তিরতের পালিগ্রন্থেও তাহার ঠিকানা মিলিল না। ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্মৃত্তস্মারক মনীষীগণ ইতালি স্মৃতি পড়িলেন। কালের অনন্ত স্রোতে বৃষ্টি নির্মাণ নগরীর স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত কবিয়াছে, আর সে স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত কবিবাব উপায় নাই।

এমন সময়ে স্ত্র প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত স্তানিস্লা জুলিএন চীনদেশে হিষাঙ্গু নামক ভাবত-পবিদর্শনকারী একজন অতি প্রাচীন বৌদ্ধভিক্ষুর নাম শুনিতে পাইলেন। আরও শুনিলেন যে হিষাঙ্গু সাঙ তাহার ভাবত পবিভ্রমণ বিষয়ে এক প্রকাণ্ড পুস্তক বচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বাব ভারতবর্ষে প্রাচীন ইতিহাসও ভূগোলের কতক উদ্ধার সাধন হইতে পাবে

ভরসায় উক্তমশীল করাসী পণ্ডিত চীন ভাষা অধ্যয়ন করিতে আৰম্ভ করিলেন। যে ভাষার ৪০০ এবং অধিক অসংখ্য অক্ষর, যাহার প্রত্যেক অক্ষর এক একটা কথাব সম্বন্ধ সমান, যাহার বর্ণপরিচয় দৃষ্টেই শিক্ষার্থীগণের লক্ষ্য উপস্থিত হয় স্থানি-সুজুলিএন সেই ভাষা অল্পদিনের মধ্যেই একেবারে অভ্যস্ত কবিয়া তুলিলেন। এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার অভিনা-ষিত হিযাহুসাঙের ভাবত ভ্রমণ-বিবরণ করাসী ভাষায় অল্পবাদ কবিয়া ফেলিলেন।

যেমন তিমিবাচ্ছন্ন গিবিঙহাগুটে সৌব-কর প্রবেশ কবিয়া তাহাকে আলোকিত করে এই নুতন গ্রন্থের আলোকে সেই-রূপ নিবিড় অন্ধতমসচ্ছন্ন ভাবতবর্ষীয় ইতিহাস-গুহা আলোকিত হইয়া উঠিল। সহসা ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশ বিদীর্ণ হইয়া গেল যেমন ভূতত্ত্বিৎ পণ্ডিতগণের অল্প-মানগম্য ভূত্বিকাস্তব সকল মানব মননের পরীক্ষাপযোগী হয় সেইরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশে ভাবত ইতিহাসের অনেক দুর্লভ মুদ্রের অল্পমানেব ও অগম্য বিষয় সকল প্রকাশ হইয়া পড়িল। পণ্ডিতগণ, ঐতি-হাসিকগণ, প্রত্নতত্ত্ববিগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

হিযাহুসাঙ একজন অধিতীয় মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার সময়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতা-ব্দীতে চীন হইতে ভাবতবর্ষে আসিবার পথ ছিলনা। আসিতে হইলে তাঁহার ও আকগানিস্থান বেটন করিয়া আসিতে হইত। বৌদ্ধভিক্ষু গুরুদেবের লীলা ভূমি পরিদর্শনার্থ ভারতীয় মনীষীগণের

নিকট স্তম্ভ, বিনয়, অভিধর্ম, প্রভৃতি মহা-বৈপুল্য যুক্ত মহাবান গ্রন্থ অধ্যয়নার্থ মহৌৎ-স্বকাম্য অন্তঃকরণে ঘোষবিপদসঙ্কুল, অজ্ঞাত, দুর্গম, অসভ্য অন্ধতা ও বর্কর জাতিগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত, ভীষণ পথের পথিক হইলেন। কতশত নদ নদী পার্শ্বত কন্দব লঙ্ঘন কবিয়া কতকত রাজ্য মহা-রাজ্য সাম্রাজ্য অতিক্রম কবিয়া স্বীয় লক্ষ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় বহু বৎসব অবস্থান কবিয়া হৃদয় ভরিয়া আপনাব অভিনাষ পূরণ করত আবার স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ভাবতবর্ষ তাঁহার পক্ষে পূণ্য ভূমি, তাঁহার পক্ষে উহা স্বর্গ বা স্বর্গ হইতেও মনোবম। তিনি উহাকে ভাল বাসিতেন ভক্তি কবিতেন এবং উহার ঘটনাবলী ও মানচিত্র হৃদয়াকাশে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন। এই জন্য তিনি যাহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন তাহা ভক্তি ভাবে সুস্মারস্মার রূপে লিখিয়া গিয়াছেন। যেখানে যে কয়দিন ছিলেন, যাহার যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নিকটে যে সকল তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন, নিকটে যে সকল স্থানে বড় বড় মনীষীগণ গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, এ সমস্তই তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতস্ত্রিম একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময়ে যে পথে গিয়াছিলেন যত পথ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, যাহা যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া ছিলেন, তাহাও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এই অদ্ভুত গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে প্রচার হইবামাত্র ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভাবতবর্ষের

মানচিত্র খুলিয়া বসিলেন। স্থিৰ-যৌবনা ভাবত ললাম ভূতা বাবাণনৌ গয়া ও মধুবা খুজিয়া লইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। কিন্তু অল্প অল্প যে সকল স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষু গমন কবিয়াছিলেন তাহার ঠিকানা হইল না। পবিত্রাজকের মাপ চৈনিক মাপ, তাহাকে ভাবতীৰ্ণ সর্কেবিভাগেব মাইলে পবিণত কবিত্তে হইল, কত “লি”তে মাইল হইবে তাহা লইয়া কত গোলমাল হইল, শেষ স্থিৰ হইল যে ৬ লিতে এক মাইল হয়।

কিন্তু তথাপি পবিত্রাজকের দূরতাব সহিত মানচিত্রের দূরতা কিছুতেই মিল হয় না। পবিত্রাজক যে স্থান গয়া হইতে ৫০ মাইল উত্তর পূর্বে লিখিয়াছেন সে স্থানে নগরী না হইয়া ব্রহ্ম হইল, যেখানে পর্বত গুহা পাইবার কথা সে স্থানে নদীগর্ভ লক্ষিত হইল, যে স্থানে বাজপ্রসাদের ভগ্না বশেষ পাইবার কথা সে স্থানে শ্যামল শস্য পূর্ণ ধান্যক্ষেত্র লক্ষিত হইল। তখন পণ্ডিত গণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন তখন তাঁহার পবীক্ষার্থ স্থানে স্থানে দল বাধিয়া পরিত্রাজক প্রদর্শিত এক স্থান হইতে অন্ত-স্থানে যাইতে লাগিলেন। গিয়া দেখিলেন যে মানচিত্রের দূরতাব সহিত পবিত্রাজকের দূরতা অনেক বিভিন্ন হইবে। মানচিত্রের দূরতা সবল বেধায় মাপিতে হয়। কিন্তু পর্যটন করিতে গেলে-ত পথ ধরিয়া যাইতে হইবে; পথ ত প্রায় ঠিক সকল বৈধিক আকারে নির্মিত হয় না। স্মৃতবাঃ মানচিত্রের মাপেও পর্যটনের মাপে অনেকটা বিভিন্নতা আপনা হইতেই হইয়া উঠিবে। তাহার পর পথ পবিবর্তন হইয়া গিয়াছে

যে পথে পবিত্রাজক পর্যটন করিয়া গিয়াছিলেন, সে পথ পবিবর্তন হইয়াছে। স্মৃতবাঃ তাঁহার পুস্তক হইতে আবিষ্কারের পথ হইল বটে, কিন্তু যত সহজে আবিষ্কারের কথা ছিল তাহা হইল না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পর্যটনার্থ বহুপরিকর হইলেন। এই পর্যটক প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে আলেক-জাণ্ডার কনিঙহাম সাহেব প্রধান। তিনি নানা স্থানে পর্যটন কবিয়া ভাবতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে হিয়াহুসাঙ প্রদর্শিত প্রদেশ সমূহেব পুনরাবিষ্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কনিঙহাম যে সকল স্থান আবিষ্কার কবিলেন, তাহা যে ঠিক হইল একথা তিনিও বলিতে পারিলেন না। স্মৃতবাঃ স্মৃতিকাল খনন কবত পবীক্ষা কবা আবশ্যক হইল। তখন ভাবতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট অত্যন্ত উদ্যম সহকায়ে কনিঙহাম সাহেবের সহায়তায় প্রেরিত হইলেন এবং আর্কিওলজিকাল সর্কেনামক বিভাগেব সৃষ্টি কবিলেন। প্রাচীন স্থান সমূহেব অনুসন্ধান প্রাচীন কীর্তিগুলি পুনরুদ্ধার, ভগ্নপ্রাচীর প্রাচীন অট্টালিকাদি পুনঃ সংস্কার ঐ বিভাগের কর্তব্য কার্য বলিয়া স্থিৰীকৃত হইল। এবং আলেকজাণ্ডার কনিঙহাম সাহেব উহার ডাইবেকটর হইলেন। তখন দস্তুরমত অধেষণ আবস্ত হইল। কনিঙহাম সাহেব নিজে যেমন এবিষয়ে উদ্যমশীল তাঁহার সহকাবীরাও সেইরূপ উদ্যমশীল। তিনি উৎসাহদান প্রশংসা ও পরিতোষিক প্রদত্তিবা আপনার তেজেও উত্তম সহকারী বর্গকে তেজস্বীও উদ্যমাক্রান্ত কবিয়া তুলি-

লেন। এই সকল উগমশীল পবিত্রাজক পণ্ডিতগণের যত্নে পবিত্রমে ও অধ্যবসায়-বলে অনেকস্থলে ভাবভেব লুপ্তকীর্তি সকল পুনরুদ্ধার হইতেছে হইয়াছে এবং হইবে। যতগুলি গুপ্তস্থান আবিস্কৃত ও যতগুলি কীর্তি স্তম্ভ পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে তাহাদেব মধ্যে কুশীনগর একটি প্রধান স্থান এবং তথাকার নির্মাণ-স্থপও নির্মাণ-প্রতিমা প্রধান কীর্তি।

কুশীনগর কুশীনগর নাম শুনা যাইত কিন্তু কোথায় কেহ জানিত না। হিয়াস্থ-গেব পুস্তকে তিনি কোথায় হইতে কোথায় গিয়াছিলেন তাহা লিখিত আছে। তিনি পিপ্পল বন নামক একটি স্থান হইতে কুশীনগরে গমন কবিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে কুশীনগরও যেমন অজ্ঞাত পিপ্পল-বন ও তেমনি অজ্ঞাত স্থান। পিপ্পল বনেঘাইবার পূর্বে তাহাকে অনোমানদী— বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান তীর্থ স্থান—পার হইতে হইয়াছিল। কিন্তু উত্তরকোশলের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্বিৎ প্রবাহের মধ্যে কোনটি অনোমা তাহা কেহই জানেনা। কাল-ক্রমে নদী নাম ও পরিবর্তিত হইয়াগিয়াছে। অনোমা নদী পার হইবার পূর্বে হিয়াস্থ সাঙ বামগ্রাম নামক পুণ্য তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন; বামগ্রামের ও সন্ধান পাওয়া যায় না। বামগ্রামে আসিবার পূর্বে তিনি বুদ্ধদেবের জন্ম ভূমি কপিল বাস্তু নগর দর্শন কবিয়াছিলেন। কিন্তু কই সে স্থানেবই বা নাম কে জানে? কপিলবাস্তু যাইবার সময় চীন দেশীয় পবিত্রাজক শ্রাবস্তীতে কিছুদিন অবস্থিতি করেন।

এই শ্রাবস্তী ভগবানের প্রিয়স্থান। এই স্থানেই অনাথপিণ্ডনামক তৎকাল প্রসিদ্ধ একজন ধনী ব্যক্তি বৌদ্ধদেবের বাসার্থ জেতবন নামক উদ্যান ক্রয় করিয়া দেন। উদ্যানটী তখন শ্রাবস্তীর কোন বাজকুমারের সম্পত্তি ছিল। বাজকুমার বলিলেন আমার উদ্যান আবরণ কবিত হইলে যত স্বর্ণ মুদ্রা আবণ্ডক যদি তত স্বর্ণ মুদ্রা দিতে পার তবে তোমার আমি আমার বাগান ছাড়িয়া দিতে পারি। অনাথপিণ্ড ঠিক তাহাই কবিলেন। একটি একটি কবিয়া স্বর্ণ মুদ্রা বিছাইয়া উদ্যানটী মুড়িয়া দিলেন। বাজকুমার মুদ্রাগুলি লইয়া উদ্যানটী ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু হায সেই শ্রাবস্তীই কোথায় কে জানে। তাহার ও নাম লোপ হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষ বাসীগণ অনাথপিণ্ডদেব নামও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। এইত শ্রাবস্তী হইতে কুশীনগর পর্যন্ত ৮।১০টি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধক্ষেত্রের নামহইল ইহার একটিও লোকে জানে না।

কিন্তু এইবার আমরা বোধ হয় এই ঘোব অন্ধকাবে একটু আলোক পাইব। এই অগাধ সমুদ্রের কূল কিনারা পাইব হিয়াস্থসাঙ শ্রাবস্তী যাইবার পূর্বে বহুসংখ্যক বিধম্পীপবিত্ত সর্বস্ব তীরবন্দী অযোধ্যানামক নগরে বাস করিয়া ছিলেন। অযোধ্যার নাম ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই, পাবিবেও না। কবিগুরু, বাঙ্গালীকবি প্রতিভাধরে ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট অযোধ্যা আপনাব জন্মভূমি অপেক্ষা আদ-বের স্থান। এই স্থানে তাহাদেব জীবনের আদর্শস্বরূপ লক্ষ্যবিজয়ী রক্ষ: কুলবিমর্দী

বামচন্দ্র অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিষাঙ্ক-
সাত্ত্ব এবং অযোধ্যা এই অযোধ্যা এবং তাঁহার
বিধর্ষীগণ আমবা অর্থাৎ হিন্দুগণ।

এখন আমাদিগকে এই অযোধ্যা
হইতে আবাব ফিবিয়া শ্রাবস্তী কপিলবাস্ত,
বামগ্রাম, অনোমা পিল্লবন হইয়া কুশীনগবে
উপস্থিত হইতে হইবে। এইবার আমবা
দেখিতে পাইব আলেকজান্ডার কনিঙ্ঘাম
সাহেব ও তাঁহার বীরজয় সহকাবীগণ
কেমন আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও কৌশলবলে
এই সমস্ত স্থান নবাবিকৃত করিয়া কুশী-
নগবে উপস্থিত হইয়াছেন।

অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তী ৫০০ লি
উত্তর। ৫০০ লিতে ইংরাজী ৮৩ মাইল।
উত্তর বলিতে গেলে ত আব ঠিক উত্তর
বুঝায় না। ঠিক উত্তরেব একটু এ দিক ও
হইতে পারে একটু ওদিক ও হইতে পাবে।
সুতরাং ৮৩ মাইল উত্তরে আসিয়া
অন্নসন্ধান আবস্ত কবিত্তে হইল। অন্ন-
সন্ধান প্রকাশ পাইল যে সাহেত মাহেত
নামক স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকাব
ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন
সাহেত মাহেতই শ্রাবস্তী বলিয়া অনুমান
হইল। কিছুদিন পবে ঐ সাহেত মাহেতেরই
এক স্থানে খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা বুদ্ধ
প্রতিমা দৃষ্টিগোচর হইল তাহার সিংহাসনে
শ্রাবস্তী নগরের নাম খোদিত আছে সুতরাং
সাহেত মাহেতই যে শ্রাবস্তী সে বিষয়ে
আর বিশেষ সন্দেহ রহিল না।

শ্রাবস্তী হইতে ৫০০ লি দক্ষিণ পূর্বে
কপিল বাস্ত। কপিল বাস্ত কোথায় ইহা
লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছিল। শেষ

কপিল বাস্ত নগরও পাওয়া গিয়াছে।
ভুইলাতাল নামক পুষ্করিণী চতুঃ পার্শ্বে যে
সকল ভগ্নাবশেষ পতিত বহিয়াছে তাহাই
কপিল বাস্তর ভগ্নাংশ কনিঙ্ঘাম সাহেবের
সহকাবী কাবলীল সাহেব এই স্থানে মায়া-
দেবীর মন্দির প্রভৃতি প্রাচীন স্থান সকল
আবিষ্কার ও নির্ণয় করিয়াছেন। কপিল-
বাস্তর কথা লইয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হওয়া উচিত
এজ্ঞ তাহার সবিস্তার বর্ণনা এখানে করা
গেল না।

কপিলবাস্ত বা ভুইলাতাল হইতে ২০০ লি
অর্থাৎ ৩০ মাইল পূর্বে বামগ্রাম। বামগ্রামে
হিষাঙ্কসাত্ত্ব বৌদ্ধ ধাতু কর্তৃক অধিষ্ঠিত
একটা প্রকাণ্ড স্তূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন।
সংস্কৃতে স্তূপ শব্দের অর্থ টিপি। পূর্বে কালে
নানা কাবণে লোকে স্তূপ নির্মাণ করিত।
বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের শবীর ধাতুর কোন স্থান
লইয়া অর্থাৎ নথ কেশাদি লইয়া একটা
নির্দিষ্ট স্থানে রাখিত, পবে তাহার উপর
প্রকাণ্ড স্তূপ নির্মাণ করিত, স্তূপ গুলি
পরিমাণের কিছুই স্থবর্তা ছিলনা। ৫০।
৬০। ৭০। ৮০ ফুট এমন ২০০। ৩০০ ফুট
উচ্চ স্তূপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।
কোন কোন স্তূপের ব্যাস ৮৫। ৮৬ ফুট ও
শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। স্তূপ গুলি গোল
ধামের মত এবং নিরেট ইটের গাঁথনি। রাম
গ্রামে এই রূপ একটা স্তূপ ছিল। এক্ষণে
ভুইলাতাল হইতে পূর্বে প্রায় ৩০ মাইল
অন্তরে বামপুর দেওড়িয়া নামক একটা গ্রাম
আছে তথ্যচ একটি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ
দৃষ্ট হয় আর এই ভগ্নাবশেষ হইতে ৫০০ ফুট
অন্তরে একটা স্তূপের ভগ্ন অংশ দৃষ্ট হয়।

রামগ্রামে যে স্থান আছে এখন তাটা উড়ে
২০ ফুট এবং উহার ব্যাস ৮৫ ফুট।

কপিল বাস্ত হইতে ২৬০ লি অর্থাৎ
৪৩ মাইল অন্তরে অনোমানদী। অনোমা
নদী বৌদ্ধদিগের একটি তীর্থ ক্ষেত্র। বুদ্ধ
দেব গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় অশ্বা-
বোহণে গমন করিয়াছিলেন। অনোমা নদীই
তাহার পথের প্রথম নদী তিনি অশ্বাবোহণে
এই নদী লক্ষ্যত্যাগে উদ্ভীর্ণ হইয়া ছিলেন।
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কপিলবাস্ত হইতে
রামগ্রাম ৩০ মাইল রামগ্রাম হইতে সোজা
রাস্তা পাওয়া যায় না অনেক নদী নালা
ঘুরিয়া তামেশ্বরনাথ নামক শিব মন্দিরের
নিকটে একটি নালা আছে। সেটি প্রায়
১৩ মাইল হইবে। নালাব নিকটে কতকগুলি
বৌদ্ধ মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে।
নদীর নাম এখন অনোমা নাই, উহা নাম
হইয়াছে “কডোবা” যাহার উপর কেহ লক্ষ-
দিয়া পার হইয়াছিলেন। উহা অন্ত সময়ে
অতি সামান্য নদী থাকে, বর্ষায় অত্যন্ত প্রবল
হয়। কাবলীল সাহেব এই নদীকেই
অনোমা নদী বলিয়া স্থির কবিয়াছেন।
উহার দূরত্ব কপিল বাস্ত হইতে ঠিক ৪৩
মাইল। ললিত বিস্তবে বলে যে কপিল-
বাস্ত হইতে অনোমা ৬ যোজন ৭ মাইলে
যোজন ধরিলে ৪২ মাইল।

এই অনোমা নদী পার হইয়াই ভগবান
সংসারীর চিত্তব্রূপ রাজবশ পরিহার পূর্বক
ভিক্ষারীর বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং
মস্তক মুণ্ডন করিয়া ছিলেন এবং ছন্দকনামে
তাহার যে ভৃত্য এতদূর সঙ্গে আসিয়াছিল
তাহাকে বিদায় কবিয়া দিয়াছিলেন।

যেখানে এই তিনটি কার্য হয়; বৌদ্ধগণ সে
তিনটি স্থানকেই পবিত্র পুণ্য তীর্থ বলিয়া
মনে করিত এবং এই তিন স্থানেই বহুসংখ্যক
স্থূপ বিহাবাদি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল।
এবং এই তিনটি স্থানেবই ভগ্নাবশেষ
কডোবা নদী পার হইয়া ২ ক্রোশের মধ্যে
অদ্যাপি লক্ষিত হয়। কাবলীল সাহেব
অনুমান করেন যে যে স্থানে ভগবান মস্তক
মুণ্ডন করেন সেই স্থানে একটি প্রাচীন
নগরের ভগ্নাবশেষের উপর” শিরসাবাও
নামক একটি গ্রাম আছে। শিবসারাবাও
শব্দেব অর্থ মস্তক মুণ্ডন করা। যেখানে
তিনি আপন বেশ প্রদান পূর্বক একজন
ব্যাকের নিকট তাহার বেশ ভিক্ষা করিয়া
ধারণ করেন সেখানে নিবেট ইটের
একটি প্রকাণ্ড স্থূপেব ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি
দেখিতে পাওয়া যায় আব যেখানে ভগবান
ছন্দককে বিদায় দেন সে স্থানেব নাম
অদ্যাপি মহাস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এই
মহাস্থানে পবন সৌগত মহারাজা অশোক
একটি প্রকাণ্ড স্থূপ নির্মাণ করিয়া দিয়া-
ছিলেন। প্রাচীন কালের ইট খুব বড় বড়।
এখন মহাস্থানে খুব বড় বড় ইট অনেক
দেখিতে পাওয়া যায়।

এই তিনটি স্থূপের সান্নিধ্য হইতে ভগ-
বান্ হিযাহ্‌সাত পূর্ব দক্ষিণাভিমুখে ১৮০ লি
অর্থাৎ ৩০ মাইল পথ, পর্য্যটন করিয়া
নিবিড় জঙ্গোদবন মধ্যে মৌঘ্যরাজগণের
বাজধানীতে উপস্থিত হন। বুদ্ধদেব নির্মাণ
প্রাপ্ত হইলে তাঁহার শরীরেব দাহ
করা হয়। দাহাবশিষ্ট অস্থি সকল আট-
ভাগে বিভক্ত, যে আটজন বাজা দাহস্থলে

উপস্থিত ছিলেন তাঁহাবাই সেই অস্থি সমূহ আটভাগে বিভক্ত করিয়া লন। এবং নিজ নিজ রাজধানীতে স্থাপন করিয়া তাহাব উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ নির্মাণ করিয়াদেন। ভাগ শেষ হইয়া গেলে মৌর্যগণ তথায় উপস্থিত হন এবং ভগবানের ধাতু প্রাপ্ত হইতে না পাবায় একান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে তাঁহার চুল্লীর অঙ্গারগুলি সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করেন এবং নিজ রাজধানীতে তাহাব উপর স্তূপ নির্মাণ করিয়াদেন। হিয়াহুসাও এই স্থানে ঐ অঙ্গারস্তূপ দেখিতে পান।

গোরকপুর জিলাব মধ্যে গড়ানদীর তীরে রাজধানী উপদোলিয়া নামক স্থানে বহুসংখ্যক প্রাচীন অট্টালিকাব ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইস্থান পূর্বেজ মহাস্থান হইতে ২৯ মাইল এবং কড়োয়া হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এবং উহাব নিকট অঙ্গার পি বহু সংখ্যক স্তূপোদ্ধারস্থ পবিলক্ষিত হয়। এইঅঙ্গার কাবলীল সাহেব এইস্থানকেই উক্ত মৌর্যবাজগণের রাজধানী বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং এই স্থানের একটি স্তূপকে অঙ্গার-স্তূপ বলিয়া মনে করেন।

কাহিয়ান নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক এবং হিয়াহুসাও ঠিক এইস্থান হইতেই কুশীনগরে গমন করেন। কুশীনগর এই স্থান হইতে পূর্বউত্তর পূর্ব। কেবল বনের মধ্যদিয়া পথ। কিন্তু হুংথের মধ্যে কুশীনগরে গিয়া বুদ্ধদেবের নির্বাণ প্রতিমা লক্ষণ করিব এই আনন্দে ভোর হইয়া হিয়াহুসাও রাজধানী হইতে কুশীনগরের দূরত্ব লিখিয়া যাঁতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এবং কাহিয়ান যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে ও ভুল আছে। কাহিয়ান বলেন যে রাজধানী হইতে কুশীনগর ১২ যোজন, ৮৪ মাইল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পরিণামে দৃষ্ট হইবে যে, উহা বাব যোজন নহে বাব ক্রোশ মাত্র ২৭। ২৮ মাইল। যদিও রাজধানী হইতে কুশীনগরের দূরত্ব স্থিরীকৃত হইল না। কিন্তু হিয়াহুসাও বলিয়া গিয়াছেন যে কুশীনগর হইতে বারাগসী ৭০০ লি অর্থাৎ ১১৭ মাইল এবং কাহিয়ান বলিয়াছেন যে বৈশালী হইতে কুশীনগর ২৫ যোজন বা ১৭৫ মাইল। এক্ষণে এই সমস্ত দূরত্ব লইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে গোরকপুর নামক স্থান হইতে ৩০ মাইল পূর্বে কোন স্থানেই কুশীনগর নামক প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থটি অবস্থিত ছিল। গোরকপুর হইতে প্রায় ৩০ মাইল অন্তরে কসিয়া নামক একটা স্থানে একটা প্রাচীন নগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। দেখিলে বোধ হইত একটা মাটির চিপিমাত্র, কিন্তু খুঁড়িলে প্রচুর ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কনিঙহাম সাহেব ও তাহার পূর্ববর্তীগণ এই কসিয়াই কুশীনগরের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং উক্ত মাহাস্থা সাহেব কসিয়ার কয়েকটি স্থান খুঁড়িয়াও দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মনে কবিতেন যে কসিয়া কুশিয়ার অপভ্রংশ আর কুশিয়া কুশীনগরের অপভ্রংশ। সুতরাং এই কসিয়াই সম্ভবতঃ কুশীনগর হইবে। উহার নিকটে কতকগুলি বৌদ্ধ প্রতিমূর্তি প্রাপ্ত হওয়ার

এই অল্পমান অনেক পৰিমাণে সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। এইভাবে কিছুদিন যায় পবে ১৮৭৬ সালে কনিংহাম সাহেব আপ-
নার সহকারী কাবলীল সাহেবকে কসিয়ার
স্থানে স্থানে খুঁড়িয়া উহা কুশীনগব কি না
সপ্রমাণ করিবার আদেশ দেন, তদনুসারে
উক্ত কাবলীল সাহেব কসিয়া যাত্রা
করিয়া ভগ্নাবশেষ মধ্যে বুদ্ধভিক্ষুব যে
প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহাব সন্নিধো শিবিব
সন্নিবেশ কবেন।

কুশীনগবে বুদ্ধদেবের নির্মাণ স্থূপ ছিল,
নির্মাণ প্রতিমা ছিল, একটী প্রকাণ্ড বিহাব
ছিল এবং নির্মাণ প্রতিমাব জন্ত একটী
মন্দির ছিল। কাবলীল সাহেব নিবতিশয
অধ্যবসায় বলে এই সকল গুলিই আবি-
ষ্কার কবিতো সক্ষম হইয়াছেন।

তিনি যেস্থানে শিবিব সন্নিবেশ কবিয়া-
ছিলেন তাহাব অবিদূবে মূর্ত্তিকাবাশি
অতি উচ্চ এবং তাহাব মধ্যে সর্বোচ্চ
স্থানে একটা স্তম্ভের মত পদার্থ দৃষ্টি
গোচর হইতে লাগিল। এই উচ্চ ভূভাগ
এবং ঐ স্তম্ভপ্রায় পদার্থ নিবিড় জঙ্গলে
আবৃত, এতই জঙ্গল যে নিকটে যাওয়া
যায় না। ইহাতে যাইতে হইলে জঙ্গল পবি-
ষ্কার কবিতো হয়। দুব হইতে এই উন্নত
ভূভাগ ও উহাব উপবিস্থিত, স্তম্ভ, শিখবা-
ধুষিত উচ্চ পর্বতমালাব স্রায় লঙ্কিত
হইতে লাগিল। কাবলীল সাহেব মনে
কবিলেন এই স্থানে নিশ্চয়ই নির্মাণ
স্থূপের ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইবেন এবং
বহুসংখ্যক লোক আনাইয়া ঐ উন্নত ভূভাগের
জঙ্গল পবিষ্কার কবিলেন। তখন দৃষ্ট

হইল যে যেস্থানটি সর্বোচ্চ তাহাব মস্তকে
একটি নিবেট ইটের খাম প্রায় ২০ ফুট
উচ্চ, তাহাব পার্শ্বস্থ ভূমি অনেকটা নিম্ন
এবং এই নিম্ন ভূমিব পাশ্বেই আব একটি
উচ্চ মূর্ত্তিকা বাশি। ইষ্টক স্তম্ভের ব্যাস
প্রায় ২০ ফুট হইবে এবং পাশ্চবর্তী সম-
তল ভূভাগ হইতে উহাব উচ্চতা ৫৭ ফুট।
এই ৫৭ ফুট উচ্চ মূর্ত্তিকাবাশিব পশ্চিম
নিম্নভূমি তাহাব পার্শ্বে আবাব উচ্চভূমি
দেখিয়া শুনিয়া কাবলীল সাহেব অল্পমান
কবিলেন যে এই ৫৭ ফুট উচ্চ ইষ্টক
বাশি নির্মাণ স্থূপের ভগ্নাবশেষ। তাহাব
নিকটস্থ উচ্চ ভূভাগ নির্মাণ মন্দিরের
ভগ্নাবশেষ। আব চতুর্দিকস্থ বিস্তৃত উচ্চ-
ভূমি নির্মাণ বিহাবের শেষ অবস্থা মাত্র।

এই মনে কবিয়া তিনি সর্ব প্রথমে
নির্মাণ মন্দিরের শিবোভাগ হইতে মূর্ত্তিকা
খনন কবিতো আবস্ত কবিলেন। তাহাব
মনে হইল নির্মাণ প্রতিমা ইহাবই মধ্যে
অবস্থিত হইবে। সে প্রতিমা ত ছোট
খাট নহে, ২০ ফুট দীর্ঘ এবং শযান
অবস্থায় অবস্থাপিত মূর্ত্তিকাবাশিব ঠিক
শিবোভাগ হইতে যদি কূপের স্রায়
খনন করা যায়, নির্মাণ প্রতিমা
থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার কোন না কোন
অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই
আশায় খনন কার্য আবস্ত হইল। আশা
অচিবাৎ ফলবতী হইল। ১০ ফুট খুঁড়িতে
না খুঁড়িতেই কোদালিতে পাথর ঠেকিল।
কাবলীল সাহেব আশায় উল্লসিত হইয়া
উঠিলেন চারিদিক খুঁড়িতে লাগিলেন কোন
অংশ না ভাঙ্গিয়া যায় তজ্জন্ত অত্যন্ত

সতর্ক হইলেন ক্রমে তাঁহাব মনের আশা পূর্ণ হইল। তাঁহাব অধ্যবসায়ের ফল ফলিল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনুমান সফল হইল। বুদ্ধদেবের প্রস্তবপ্রতিমা উদ্ধার হইল। ভগবান্ যেমন মৃত্যু সময় দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন তেমনি শয়ন করিয়া আছেন। পশ্চিমাঙ্গে ভগবান্—নির্কীর্ণ লাভ কবেন ভগবানের প্রতিমাও পশ্চিমাঙ্গে। অনুমান হইল হিয়াবুসাড প্রায় ১২০০ বৎসব পূর্বে যে বক্তাবর্ণ বাথুকাপ্রস্তব প্রতিমা দেখিয়াছিলেন এও সেই প্রতিমা। কিন্তু হায় প্রতিমাব পদদ্বয় নাই বামজাত্ব নিম্নভাগ নাই। বাম হস্ত নাই কোমবেব কিবদংশ নাই। মস্তক ও মুখেব কিবদংশ নাই। কাব-

লীল সাহেব এই সকল ভগ্নাংশের জ্ঞান অন্বেষণ আবস্ত করিলেন এবং স্থখের বিষয় এই যে তাহাব অনেক গুলি প্রাপ্তও হইলেন। অনেক অংশ সিংহাসনের মধ্যে গাঁথা হইয়া গিয়াছিল। স্মৃতবাং ২০ ফুট দীর্ঘ সেই প্রতিমা উত্তোলন করতঃ তাহা নিম্নস্থ সিংহাসন ভগ্ন করতঃ প্রতিমাব যে সকল অংশ তাহাব মধ্যে গাঁথা ছিল তাহা সংগ্রহ করিতে হইল। সিংহাসনটির দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট ৬ প্রস্থ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। যতদূর সম্ভব প্রতিমাব ভগ্নাংশসমূহ সংগৃহীত হইলে কাবলীল সাহেব সিংহাসন ও প্রতিমাব সংস্কার কার্যা ব্রতী হইলেন।

কমশঃ

জৈনধর্ম ।

জৈনধর্মাবলম্বিদিগের মধ্যে বংশাঙ্কক্রেম বদ্ধমূল এইরূপ সংস্কার আছে যে তাহাদেব ধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে উৎপন্ন নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন। তাহাদেব গুরুদেব ভগবান্ নিগ্রহ্ন নাথ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তাঁহাব বর্দ্ধমান, মহাবীর প্রভৃতি অসংখ্য অনেক গুলি নাম আছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহাদেব কথা বিশ্বাস করেন না। তাহাবা বলেন আচাৰ্য্য-সমূহ, কলসমূহ প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ জৈনধর্মের স্মৃতিস্তোত্র ও প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেছে, সেগুলি অবিশ্বাস্য। তাহাদেব মধ্যে দুই একজনের বিশ্বাস যে খৃষ্টের দশম শতাব্দীর আরম্ভে যখন বৌদ্ধধর্ম অন্তর্মিত-প্রায়, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম হইতেই জৈন-সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে, স্মৃতবাং জৈন-সম্প্রদায় বৌদ্ধগণের বহুকালপর্ববর্তী

জৈনধর্ম শাক্যমুনি সংস্থাপিত ধর্মের অবাস্তব-
ভেদ মাত্র। ভাবতবর্ষের ইতিহাসলেখক
লেখব্রজসাহেব উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের
একজন প্রধান ছাত্র। তিনি অপ্রণীত
ইংরাজী ভাবতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থে শ্রুতমাব-
মতি বালকবৃন্দকে ভ্রান্তমতেব অল্পসবণ
করাইবার জন্য অল্পানবদনে লিখিয়া গিয়াছেন
যে বৌদ্ধধর্মের অবনতিসময়ে বৌদ্ধধর্ম
ইন্দ্রধর্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া জৈনধর্ম-
রূপে পরিণত হইয়াছে। লেখব্রজ সাহেবের
অাখ আমাদেব দেশেব ও অনেক শিক্ষিত-
লোক উক্ত মতেব পোষকতা কবিয়া আসি-
তেছেন। তাঁহাদেব জন্তই এই প্রবন্ধেব
অবতারণা।

ডাক্তার হোবন্‌লি, জাকোবি, বুলব
প্রভৃতি শ্রুতসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উক্ত
মতেব সম্পূর্ণ বিবোধী। তাঁহাব প্রাচীন
জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত জৈন উপাসক-
গণেব ইতিহাস বিশ্বাস কবেন। ঐ সকল
ইতিহাস কিজ্ঞা যে বিশ্বাস কবেন সে বিষয়ে
তাঁহাবা অখণ্ডনীয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন
কবিয়াছেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে জৈন পুস্তকে
লিখিত ভগবান্‌ নিগ্রহ্ননাথের জীবনী
সহিত বুদ্ধদেবের জীবনী তুলনা কবিলে
স্পষ্টই বুঝিতে পাওয়া যায়, যে জৈনসম্প্রদায়
বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে কল্পনা কবিয়া লওয়া
হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক জৈন গুরু নিগ্রহ্ন-
নাথ মহাবীরেব জীবনী সহিত শাক্যমুনি
যে সাধারণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়
তাঁহাব কারণ এই, তাঁহাবা উভয়েই সন্ন্যাস-
ধর্ম ব্রতী হইয়া ছিলেন এবং তাঁহাবা উভয়েই

সমসাময়িক, স্বজাতি ও ধর্মোপদেশক ছিলেন।
মহাবীরের কুটুম্ব গণের সহিত বৌদ্ধদেবের
কতক গুলি জাতিব নামেব ও মিল আছে
বটে। মহাবীরেব জীব নাম যশোদা,
বৌদ্ধদেবের জীব নাম যশোধবা; মহাবীরেব
জ্যেষ্ঠভ্রাতাব নাম নন্দিবর্দ্ধন, বৌদ্ধদেবের
বৈমাত্রেয় ভ্রাতাব নাম নন্দ, বুদ্ধদেব সিদ্ধার্থ
নামে অভিহিত হইতেন, মহাবীরেব পিতাব
নাম ও সিদ্ধার্থ ছিল। কিন্তু এই কয়েকটি
নাম উভয়েবই বংশমধ্যে আছে বলিয়া কি জৈন
সম্প্রদায় বৌদ্ধ হইতে উৎপন্ন বলিতে পাওয়া
যায়? ফলতঃ ইহাব দ্বাবা কেবল এই প্রমাণ
হয়, যে তৎকালে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে
ঐ সকল নামেব ব্যবহাব অধিক ছিল।

সিদ্ধার্থের জীবনেব ঘটনাবলি সহিত
জিনদেবের জীবনী তুলনা কবিলে
অনেক গুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে পার্থক্য
দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব কপিলবাস্ত
নগরে জন্ম গ্রহণ কবেন, বৈশালীেব নিকটবর্তী
একটি পল্লীতে ভগবান্‌ মহাবীরেব আবির্ভাব
হয়। বুদ্ধদেবের জননী তাঁহাকে প্রসব
কবিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন, মহাবীরেব
জনক জননী তাঁহাব যৌবন অবস্থা পর্য্যন্ত
জীবিত ছিলেন। বুদ্ধদেব স্বীয় পিতা
শুদ্ধোদনেব অজস্র অল্পনয় বিনয় অগ্রাহ
কবিয়া, তাঁহাব জীবিতাবস্থাতেই সন্ন্যাস-
ধর্মে ব্রতী হন; ভগবান্‌ নিগ্রহ্ননাথ স্বীয়
পিতৃবিয়োগ হইলে আত্মীয় স্বজনেব অল্পমতি
গ্রহণ কবিয়া সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষিত হন।
বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কাল সন্ন্যাস আশ্রমে
অতিবাহিত কবিয়াছিলেন, জিনদেব বর্দ্ধমান
ধাদশ বর্ষ ক্রেশ-বহুল তপসধর্মে অবস্থান

কবেন। বুদ্ধদেব ভাবিয়াছিলেন তাঁহাব ঐ ছয় বৎসর কাল রথা নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাব উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে তপঃক্লেশ কিছুই সহায়তা কবিতে পাবেনাই। মহাবীর সম্পূর্ণ রূপে বৃষ্টিতে পাবিয়াছিলেন নির্ঝাণ লাভের পক্ষে তপস্শ্রমই প্রধান উপায়। দ্বাদশবর্ষ তপস্শ্রমক্লেশ ব্যতিবেকে কোন সন্ন্যাসীই নির্ঝাণ লাভ কবিতে পাবেন না। গোশাল-মাঙ্গলিপুত্র জৈনগুরু মহাবীরের বিবোধিগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন, কিন্তু তিনি জৈনদিগের যাদৃশ বিবোধী ছিলেন বৌদ্ধদিগের তাদৃশ বিবোধী ছিলেন না। জামলিব সম্বৎ প্রথমে জৈনদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদ প্রবর্তিত হয়; কিন্তু বুদ্ধদেবের ইতিহাসমধ্যে তাঁহাব নাম পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব কুশীনগরে নির্ঝাণ লাভ করেন, কিন্তু নিগ্রহ-নাথ তাঁহাব মৃত্যুর অনেক পূর্বে পাপা-নগরীতে স্বীয় কলেবর ত্যাগ কবিয়াছিলেন।

অনেকে জৈনগণের সহিত বৌদ্ধগণের কতকগুলি ধর্মগতসামঞ্জস্য দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, যে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে জৈনধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা কবিব।

উভয় সম্প্রদায়ই তাহাদের গুরুগণের জিন, অর্হৎ, মহাবীর, সুগত, তথাগত, সিক, বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ, পরিনিবৃত্ত, মুক্ত প্রভৃতি উপাধি প্রদান কবিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল উপাধি সম্বন্ধেও সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ, তথাগত, সুগত এবং সম্বুদ্ধ এই কয়েকটি উপাধিতে শাক্যমুনিকেই ভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবীরের এ কণ্ঠী উপাধি অতি বিবল

প্রচাব। জিনগুরু বর্জমানের বীর ও মহাবীর এই দুই উপাধি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। জৈন গুরুগণ তীর্থঙ্কর এই উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন, কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে তীর্থঙ্কর এই অর্থে বিধর্মীগণের উপাধি বুঝায়। এই সকল দেখিয়া স্পষ্ট অল্পমনি হয়, যে জৈনগণ বৌদ্ধগণের নিকট হইতে এ সকল উপাধি গ্রহণ করেন নাই। যখন বৌদ্ধগণ এই সকল উপাধি গ্রহণ কবিয়াছিল তখন নিশ্চয়ই তাহারা জৈনগণের বিবোধী ছিল। স্মৃতবার ইহাতে বরং জৈনসম্প্রদায়ের প্রাচীনতাই প্রমাণ হইতেছে। আর যখন বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈনধর্ম প্রায় এক সময়েবই, তখন যে উভয় সম্প্রদায় মধ্যে সম্মান সূচক কতকগুলি একরূপ উপাধি প্রবর্তিত হইতে পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ কল্পিবাব বিশেষ কাবণ দেখা যায় না। সমস্ত উপাধিগুলি যজ্ঞপি উভয় ধর্মেই এক অর্থে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে বরং সন্দেহেব কাবণ থাকিত। কিন্তু জৈনধর্মে যে শব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বৌদ্ধধর্মে সেই শব্দ অন্য কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে একরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বুদ্ধ শব্দ জৈন-শাস্ত্রে সাধারণ ধাত্বর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু বৌদ্ধধর্মে উহা শাক্যমুনির প্রধান উপাধি।

কেহ কেহ বুদ্ধভিক্ষুগণের দশ শীলের সহিত জৈনগণের পঞ্চ মহাব্রতের তুলনা কবিয়া জৈনধর্ম-বৌদ্ধধর্ম হইতে উৎপন্ন প্রমাণ কবিতে চেষ্টা করেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দশশীল —

- ১—প্রাণাতিপাত করিব না ।
- ২—অদত্তপদার্থ গ্রহণ করিব না ।
- ৩—কামকায়ে মিথ্যাচার ইত্যাদি বিবর্ত থাকিব ।
- ৪—মিথ্যা বলিব না ।
- ৫—মদ্যপান করিব না ।
- ৬—দিকাল ভোজন করিব না ।
- ৭—নৃত্য, গীত, বাজ ও অভিনয় ইত্যাদি বিবর্ত থাকিব ।
- ৮—মালা, চন্দন ও অলঙ্কার ব্যবহার করিব না ।
- ৯—উচ্চ অথবা প্রশস্ত শয্যা শয়ন করিব না ।
- ১০—স্বর্ণ ও বোপা গ্রহণ করিব না ।
- ১১—সকল বৌদ্ধবা ভিক্ষু নহেন তাহা দেব জন্য নিম্নলিখিত অষ্টাঙ্গ শীলের বিধান আছে । তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি সকলকেই পালন করিতে হইবে । আর শেষ তিনটি ধর্মভীরু ব্যক্তিগণ পালন করিবেন—
- ১—প্রাণাতিপাত কবা উচিত নহে ।
- ২—অদত্ত বস্তু গ্রহণ কবা উচিত নহে ।
- ৩—মিথ্যা বলা উচিত নহে ।
- ৪—মদ্যপান কবা উচিত নহে ।
- ৫—ব্যভিচার কবা উচিত নহে ।
- ৬—বাহ্মিতে গুরুপাক বস্ত্র ভোজন কবা উচিত নহে ।
- ৭—গন্ধ দ্রব্য বা মালা ব্যবহার কবা উচিত নহে ।

৮—ভূমিতে মাছুব পাড়িয়া নিদ্রা যাওয়া উচিত ।

জৈন ভিক্ষুগণের পঞ্চ মহাব্রত ।

১—অহিংসা ।

২—স্বনৃত ।

৩—অস্তেয় ।

৪—ব্রহ্মচর্য্য ।

৫—অপবিগ্রহ ।

বৌদ্ধগণের উপবোক্ত প্রথম পাঁচটি শীলের সহিত জৈনভিক্ষুগণের পঞ্চ মহাব্রতের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এগুলি প্রায় সমান । প্রথম নিয়ম চারিটি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একরূপ ক্রম অনুসারে নাই বটে, কিন্তু ক্রমভঙ্গ করিয়া মিলাইয়া লইলেই ঠিক মিলিয়া যায় । আর জৈনগণের পঞ্চম মহাব্রত “অপবিগ্রহ” বুদ্ধগণের পঞ্চম শীলের অপেক্ষা সাধারণ অর্থপ্রকাশকে মাত্র বৌদ্ধগণের মে নিয়মটি উহার অন্তর্ভুক্ত । এই সকল সামঞ্জস্য দেখিয়া একপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব যে সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে একটি নিশ্চয়ই অন্যতরের নিকট হইতে নিয়মগুলি গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । কারণ উহা তাহাদের কাহাবও নিজের সম্পত্তি নয় । আমবা দেখাইব উভয়েই ব্রাহ্মণসন্ন্যাসীগণের নিকট এগুলি গ্রহণ করিয়াছে ।

সনাতন ধর্ম ।

প্রয়োজন, অভিধেয় ও সহস্র ।

আর্য্য জাতির মধ্যে একটা জনশ্রুতি আছে যে, যৎকালে বান্ধসবাজ দশানন জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে ত্রেতাযুগের অধিকার বিস্তার হইয়াছিল, সত্যযুগের নির্দিষ্ট সময় সম্পূর্ণ ভোগ হইল না। সত্যযুগ ব্রহ্মাব নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মন! আপনকার বরপ্রভাবে দুর্দান্ত বান্ধসবাজ দশাননের দৌর্ব্বাধ্য আমি অসময়ে অধিকারচ্যুত হইয়াছি, আমার উপায় কি হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন, যদিও ভূমি এক্ষণে অসময়ে অধিকারচ্যুত হইয়াছ, তথাপি প্রত্যেক যুগের মধ্যে কিছু কাল কবিয়া তোমার অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া দিলাম। ত্রেতা যুগের শেষে যখন বামচন্দ্র বাবণ বধ করিবেন, সেই সময় তোমার পঞ্চদশ সহস্র বৎসব এবং দ্বাপর-যুগে তোমার দশ সহস্র বৎসব ও কলি-যুগে তোমার পঞ্চ সহস্র বৎসব অধিকার ভোগ হইবে। ব্রহ্মাব আদেশ ক্রমে কলি-যুগের পঞ্চ সহস্র বৎসব নিজ অধিকার ভোগের পর সত্য যুগের পঞ্চ সহস্র বৎসব অধিকার ভোগের সম্ভাবনা। এক্ষণে কলির নিজ অধিকারভোগ—৪৯৮৮ বৎসর হইয়াছে। জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আর ১২ বৎসব পবে সত্য যুগের অধিকার বিস্তার হইবে। পবস্তু ইহাও

সহজে অনুমিত হইতেছে যে, সত্যযুগের এই ভোগকাল পঞ্চ সহস্র বৎসবের মধ্যে বালা যৌবন ও বার্দ্ধক্য অথবা প্রাঃসন্ধ্যা মধ্যাহ্ন ও শেষ সন্ধ্যা আছে।

ইতি পূর্বে কলিযুগের প্রভাবে সনাতন ধর্ম তিবোহিতপ্রায় হইয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যযুগের আগমনের সময় উপস্থিত দেখিয়া তিনি পুনর্বার আর্ধ্যভূমিতে অবতীর্ণ হইতেছেন। অধুনা সর্কজীবের সমষ্টিরূপ বিবাত পুরুষের ইচ্ছা হইয়াছে যে, সনাতন ধর্ম পুনর্বার সকলের নিকট পবিচিত ও সমাদৃত হযেন। এক্ষণে বিবাত পুরুষের ইচ্ছানুসারে অনেকেই পবিচালিত হইয়া সনাতন ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশে ও জন্মোৎসর্গায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদেগের ইচ্ছা যখন বিবাত পুরুষের ইচ্ছার একাংশ, তখন আমবাও তদ্বাচা পবিচালিত হইয়া সনাতন ধর্মের স্বরূপ নিকপণে ও মাহাত্ম্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাই এতৎপ্রকাশের প্রয়োজন।

এক্ষণে এই গ্রন্থে যাহা যাহা অভিধেয়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। যথা প্রমাণ-নিকপণ। ধর্মের স্বরূপ নিকপণ। প্রণবের স্বরূপ। প্রণব হইতে জগতের সৃষ্টি। শব্দ সৃষ্টি ও অর্থ সৃষ্টি। হিবণ্যগর্ভ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিবাত মুক্তি। শব্দব্রহ্ম ও পবমব্রহ্ম নিকপণ। জায সন্ধ্যা বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন কাবদিগের স্ব স্ব মতের

সত্যতা ও পরস্পর বিবোধভঞ্জন। সকলের উপাস্ত দেবতা নিরূপণ। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাসকদিগের স্ব স্ব মতের সত্যতা ও পরস্পর বিবোধ ভঞ্জন। তন্ত্রশাস্ত্র, সৰ্বব্যাপী সৰ্বশাস্ত্রের ও সকল সম্প্রদায়ের উপজীব্য। তন্ত্রশাস্ত্রের নিত্যতা। তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত গ্রন্থবিশেষের বিলম্ব ও গ্রন্থবিশেষের নূতন আবির্ভাব। তন্ত্রশাস্ত্রের কোন্ অংশ হইতে কোন্ দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব। ব্রহ্মা হইতে শিবের উৎপত্তি। বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং শিব হইতে বিষ্ণুর উৎপত্তি এতৎসমুদায় মতের সত্যতা ও বিবোধ ভঞ্জন। সৃষ্টি পদার্থমাত্রাই উপাদান কাবণ প্রণবের সপ্ত অঙ্কের চিহ্ন। প্রণবের সপ্ত অঙ্ক হইতে সপ্ত আত্মার আবির্ভাব। সপ্ত আত্মা হইতে সপ্তমঠ। পূর্ব আত্মার দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচা-বাদি নিকপণ। দক্ষিণ আত্মার দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচা-বাদি নিকপণ। পশ্চিম আত্মার দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচা-বাদি নিকপণ। উত্তরাত্মার দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচা-বাদি নিকপণ। উর্দ্ধাত্মার দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচা-বাদি নিকপণ। অধ আত্মার দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচা-বাদি নিকপণ। সপ্ত-মাত্মার গুণতা। পূর্বাশ্রমে কথিত হঠযোগ ও তৎসাধন প্রণালী। দক্ষিণাশ্রমেকথিত লঘুযোগ ও তৎসাধন-প্রণালী। পশ্চি-মাশ্রমে কথিত লক্ষ্য যোগ ও তৎসাধন-প্রণালী। উত্তরাশ্রমে কথিত বাজযোগ ও তৎসাধন-প্রণালী। উর্দ্ধাশ্রমে কথিত

সন্ন্যাস উন্নয়নীযোগ ও তৎসাধন প্রণালী। অধ আত্মাষে কথিত গুরুত্ব অমনস্ক যোগ ও সহজযোগ। সপ্তমাত্মাষে কথিত বিদেহমুক্তি।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যুগভেদে ধর্মভেদের কাবণ। মহর্ষিদিগের বিভ্রুতি। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। সাকার উপাসনা ও স্থূল ধ্যান। নিবাকার উপাসনা ও সূক্ষ্ম ধ্যান। অধিকারিভেদে উপাসনার আবশ্য-কতা। অধিকারিভেদে উপাসনার অনাবশ্য-কতা। জীবমুক্তির লক্ষণ। সিদ্ধির লক্ষণ। উত্তম মধ্যম ও সামান্য সাধকের লক্ষণ। গুরুব লক্ষণ। শিষ্যের লক্ষণ। গুরু বাক্যে দৃঢ়তা ও গুরুভক্তির ফল। কোন্ আত্ম-যের কোন্ অংশ হইতে বৌদ্ধধর্ম খৃষ্টানধর্ম বা মুসলমান ধর্ম সৃষ্ট হইয়াছে। ভার্য্য ধর্ম ভিন্ন অস্ত্র ধর্মের অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদন। গুরু বিষয় প্রকাশ নিবন্ধন ভগবতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা। এই সমুদায় বিষয় এবং ইহাব আনুযায়িক অস্ত্র যাহা আবশ্যক হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইবে, পবস্ত্র সাধাবণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবাব অনুবোধে যাহাব পর যে বিষয় আবশ্যক বোধ হইবে, তাহাই লিখিত হইবে।

এক্ষণে প্রণোজন ও অভিধেয় বলা হইল, পবস্ত্র ধর্মের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ কি, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ধর্মই সমাজ বক্ষা করিতেছেন ও জগৎ বক্ষা করিতেছেন, ধর্ম আমাদের নিত্য সহচর বস্তু। আত্মা পবলোক গমন করিলেও ধর্ম সহগামী হইয়া থাকেন। মনুষ্যের পক্ষে ধর্মের স্রাব অমূল্য ধন আব কিছুই নাই।

ধর্মই মনুষ্যকে ক্রমশ উন্নত সোপানে উত্থাপিত করেন। ধর্ম বলে মানব, মানব-দেহ-ধারী হইয়াও দেবতাব জায়বিভূতি প্রাপ্ত হইবেন। অতএব ঈদৃশ অসাধারণ বদ্ধ ধর্মের সমগ্র অবশ্য পবিজ্ঞাত হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য।

প্রমাণ নিরূপণ।

সনাতন ধর্ম নিরূপণ করিতে হইলে কোন্ প্রমাণ অবলম্বন করিব তাহা অগ্রে ব্যক্ত করা কর্তব্য। কথিত আছে;—

“প্রত্যক্ষমেকক্ষার্বাকাঃ কণাদস্মৃগতো পুনঃ।
অনুমানঞ্চতচ্চাপি সাক্ষ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি ॥
স্তাযৈকদেশিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্য সহিতানি চত্বাধাঃ প্রোভাব্য ॥
অভাবযষ্ঠান্তেতানি ভট্টাবেদান্তি নন্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জ্ঞাঃ”।

চার্বাক্যেবা, একমাত্র প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণই স্বীকার করেন না। কণাদ ও মৌগতগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি মাত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সাক্ষ্য মতাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটি মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন। কোন কোন নৈষায়িক সাক্ষ্য মতেই মত দেন। কোন কোন নৈষায়িক প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ স্বীকার

করেন। প্রভাকর-মতাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ ও অর্থাপত্তি এই পাঁচটি প্রমাণ মান্য করিয়া থাকেন। ভট্টমতাবলম্বী ও বেদান্তমতাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ অর্থাপত্তি ও অভাব, এই ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন। পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ অর্থাপত্তি সম্ভব ও ঐতিহ্য, এই আটটি প্রমাণ স্বীকার করেন। আমরা তত্ত্ব অনুসারে এই আটপ্রকার প্রমাণই স্বীকার করিয়া থাকি, পবিত্র যিনি যে প্রমাণ স্বীকার করেন, তাঁহাকে সেই প্রমাণ দ্বাৰাই ধর্মের ভাব দৃঢ়তর করিয়া দিতে আমরা বিশেষ যত্নবান হইব। যাহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছুই মানেন না, তাঁহাদের নিকট সনাতন ধর্ম উজ্জল মূর্তিতে আবির্ভূত হইবে না।

শম্ভু বলিয়াছেন, “কেবল শাস্ত্র-মাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্গমঃ। যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥” কেবল শাস্ত্র অবলম্বন পূর্বক ধর্ম নিরূপণ করা কর্তব্য নহে, কাৰণ যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্মহানি হইয়া থাকে। অতএব আমরা শাস্ত্র অবলম্বন পূর্বক ধর্ম নির্ণয় করিব, পরন্তু যুক্তিকে সমাদরের সহিত সর্বদাই সম্মুখে রাখিব। কোন ক্রমেই যুক্তির অবমাননা করিব না।

ক্রমশঃ—

শৃঙ্খলা।

“শৃঙ্খলা” শব্দের অর্থ কি—একথা স্পষ্ট করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না,

একান্ত স্বতন্ত্র সংজ্ঞার অবতারণা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে এই পর্য্যন্ত

বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যিনি কখনও কোন কার্য্য করিয়াছেন অথবা যিনি কখনও কোন দ্রব্য সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনিই এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন। কার্য্য-ঘটিত অভিজ্ঞতা সকলেরই না থাকিতে পারে (যদিও ইহা নিতান্ত অসম্ভব) কিন্তু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কখনও কোন দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই, অন্ধ ব্যতীত এ কথা আর কেহই বলিতে পারেন না, সুতরাং এত অভাবসিদ্ধ বিষয় বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র বরং এবিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দেওয়াই প্রশস্ত। মনে করুন আমাকে ১০০/০ চাউল পল্লিগ্রাম হইতে কলিকাতায় আনয়ন করিতে হইবেক। এখন কে কোন দিন কত চাউল সবববাহ করিতে পারিবে, তাহাঁই স্থিরকরা প্রথমতঃ আমার কর্তব্য। পরে সমস্ত চাউল সংগৃহীত হইলে উপযুক্ত লোক এবং গাড়ি বা লোকেব দ্বারা চালান দেওয়া বিধেয়।

এই সমস্ত কার্য্য উপযুক্ত রূপে উপযুক্ত সময়েও উপযুক্ত উপায়ে নিষ্পন্ন করাব নামই শৃঙ্খলা। ইহার কোন একটির কোন রূপ ব্যত্যয় হওয়াব নামই বিশৃঙ্খলা। যেমন চাউল সংগ্রাহক দিন দেখিয়া লইবার লোক না রাখা কিম্বা পৌছাইয়া দিবার স্থান নিকপণ না করিয়া দেওয়া ইত্যাদি বিশৃঙ্খল কার্য্য। কার্য্য সম্বন্ধেই যে কেবল শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা এই দুই শব্দ ব্যবহার করা যায় একপন্থে, দ্রব্যাদিও বিশৃঙ্খল হইতে পারে। যেমন, যে বাড়ীর বায়ুসঞ্চালনের পথ অতি সঙ্কীর্ণ সেটিকে বিশৃঙ্খল বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে চাষিদিকেই বিশৃঙ্খলা; ইহার এক একটি কবিয়া দেখাইয়া দেওয়া এবং যথাসাধ্য নিবারণের উপায় স্থির করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যবসাকার্য্যে কলিকাতার প্রধান বিশৃঙ্খল গরুর গাড়ী। যিনি ঠেকিয়াছেন তিনিই জানেন যে ইহা অপেক্ষা গোলোযোগের কারণ আর আছে কি না। কোন গুদামে মাল লইবার জন্ত ২০। ৩০ খানি গাড়ী একত্র হয়। গাড়োয়ানেরা অত্যন্ত বোগাচ কবিয়া গাড়ী বাথে এবং সকলেই একেবারে বোঝাই করিতে আরম্ভ করে। পশ্চাতেব গাড়ী মালের অধিক নিকট বলিয়া অগ্রে বোঝাই হয় কিন্তু বাহির হইতে না পারিয়া মহা গোলোযোগ করে। শৃঙ্খলানিপুণ ব্যক্তি মাত্রেরই এই বিষয়টি দেখিলেই বলিতে পারিবেন যে, সময় ও পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্ত প্রথমতঃ গাড়িগুলি স্থান অনুসারে দুই তিন কিংবা চারি সারিতে রাখা উচিত। গরুগুলিও এমন ভাবে সাজান উচিত যে কোন গাড়ীর কোন গরু, তাহা শীঘ্র অঙ্কলোকেব দ্বারাও বাঁচিয়া লওয়া যায়। পরে ৪। ৫ জন গাড়োয়ান গরুর তত্ত্বাবধারণ করিবে, ১০ জন একত্র হইয়া প্রথম ২। ৩ বা ৪ খানি গাড়ী বোঝাই করিবে ও ৪। ৫ জন বোঝাই হইয়া মাত্র গরু জুতিতে থাকিবে। প্রথম গাড়ীগুলি বোঝাই হইলেই তাহারা চলিয়া যাইবে। এবং অবশিষ্ট লোক পুনঃ বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিবে। গরুর গাড়ী সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা আছে। এই গাড়ী সকল সাব বন্দী হইয়া যাইবার সময় প্রত্যেক দুই খানি পব এক খানি পাড়ী

সচ্ছন্দে যাইবার কাক থাকে অত্যন্ত আবশ্যক কিন্তু তাহা না করিয়া ইহাৰ এক সাবে ১০ । ১২ । ১৫ পান থাকিয়া মহা বিশৃঙ্খল উপস্থিত করে । এই গেল চালানসম্বন্ধে । নিশ্চয়-সম্বন্ধে এই কতব্য যে চক্রের মধ্য ঘর্ষণ স্থান লৌহ দ্বারা বাঁধান উচিত তাহা হইলে গাড়ী গুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী ও ক্ষিপ্ৰ-গামী হইবে । ফলতঃ লৌহ দ্বারা বাঁধাইতে যে খবচ পড়িবে অস্তুতঃ তাহাব দ্বিগুণ উপ-কাব দর্শিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।

আমবা প্রথমে গরুব গাড়ি লইলাম তাহাব কাবণ এই বিষয়টি সহজে সকলেবই জ্ঞয়জন্ম হইবে । সহজ হইতে আবস্ত কবিয়া অতি সাবধানে ক্রমে ক্রমে কঠিন বিষয় লইয়া সাধাবণেব বোধগম্য কবা তাদৃশ কঠিন নহে । এক্ষণে ট্রামগাড়ি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক । ট্রাম আমা-দেব কয়েকটি অনিষ্ট কবিয়াছে এবং তন্মধ্যে ২ । ১ টি কেবল শৃঙ্খলাব অভাবেই জন্মিয়াছে ।

প্রথমতঃ এই গাড়ী গুলিব মুহুগতি আমাদিগকে অভ্যস্ত কবিয়া ফেলিয়াছে । আমবা আব ইহাব মুহু গতিতে বিবস্ত হই না । দ্বিতীয়তঃ দুইখানি গাড়ীৰ মধ্যে কাল ব্যবধান অতি বিস্তৰ । ইহাতে ও পূৰ্বোক্ত কারণে আমরা সময়েব মূল্য একেবাবে জুলিয়া গিয়াছি । একজন লোক ২৫ মিনিট অপেক্ষা কবিয়া ৩০ মিনিটে হাঁটীৰাব পথ হাইবেন তথাচ চলিতে পাবিবেন না । আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে কেহ কেহ গবাণহাটা হইতে হেন্দো যাইবাব জন্য ট্রামে উঠিয়া অস্তন দেড় ঘণ্টা কাল ব্যাধ কবেন । ট্রামেব

১ম দুই কর্তব্য শীঘ্র শীঘ্র গাড়ী ছাড়ি ও দ্রুত গতি চালান । ট্রামকোম্পানী মনে করিতে পাবেন যে তাডাতাড়ি গাড়ী ছাড়িলে তাহা-দেব লাভ বমিয়া যাইবে । কিন্তু এটি নিতান্ত ভুল । জনসাধাবণেব আবশ্যক বুঝিয়া তদ্রূপ কাৰ্য্য কবিলে ব্যবসায়ীৰ কস্মিন কালে লোকসান হয় না । প্রত্যুত এই প্রধান নিয়ম বুঝিতে না পাবাই বাণিজ্য নাশেব অনেক সময় প্রধান কাবণ । ব্যব-সাধী মাত্রেবই কেবল দেখা চাই যে লোকে কি চায় । লোকেব অভাব কিসে দূৰ হয় । এই বিষয়টি সৰ্বদা সম্মুখে রাখিয়া, সাবধান হইয়া চলিলে সকল ব্যবসাই সূচাৰূপে চলে । ট্রামকোম্পানী যে জনসাধাবণেব অভাব সময়ে সময়ে দেখেন না এবং তজ্জন্ম যে তাঁহাদেবই ক্ষতি হয় তাহাব একটি উদা-হৰণ এই । ষ্ট্রাওরোডেব গাড়ীগুলি চিতপুৰ হইতে হাটখোলায় বেলা ৮ । ৯ টা পর্য্যন্ত ক্রমাগতই যাইতেথাকে ও বৈকালে ৩ । ৪ টা হইতে ফিবিয়া আগিনে আবস্ত কবে । কিন্তু এই সকল গাড়ীতে লোক লওয়া হয় না । কেহ তাহাতে উঠিলে তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়া হয় । এক্ষণে বাক্যব্য খালি গাড়ী যাওয়া এবং লোকপূর্ণ গাড়ী যাওয়াৰ খবচ একই । কিন্তু লোকপূর্ণ গাড়ীৰ আয় আছে, খালি গাড়ীৰ নাই । লোক পাইবাব বিষয় কোন সন্দেহ হইতে পাবে না । যে ছেতু অনেক লোক কেবল চিতপুৰ হইতে গবাণ-হাটা যান এবং নিমতলা ও হাবড়া বেলও-য়ের ব্যক্তিগণ ট্রামেব অভাবে বিশেষ কষ্ট বোধ করেন । আমাদেব দৃঢ় বিশ্বাস যে কালে শিল্প ব্যব্যর উন্নতি হয় কিন্তু দুৰ্ভাগ্য

বশতঃ আমবা ট্রাম-নিষ্কাশের উত্তরোত্তর অবনতি দেখিতেছি। নূতন গাড়ীগুলি পুৰাতন অপেক্ষা বিস্তর ভাবী। তাহাদের বায়ু-সঞ্চালন-পথ অপেক্ষাকৃত সঙ্গীর্ণ ও বৃষ্টিব-সময় আরোহীদিগের অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে।

প্রায় ২৫ বৎসর হইল ভাবতে কলেব গাড়ী চলিতেছে। এখনও এক একটি এমন

বিশৃঙ্খল আছে যে তাহা বলিবার নয়। প্রথমতঃ দেশীয় লক্ষণজাত নাবীগণের বিশ্রামের কোন স্থান নাই। আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। এখানে ৫০ পঞ্চাশ টাকা আয় হইলেই একজন লোক মধ্যবিত্ত হইবেন। সুতরাং অসাধ্য ব্যয় স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবার লইয়া যাওয়া অনেকের অদৃষ্টে ঘটে না।

ক্রমশঃ—

শৈলজা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বউ বউ ।

সুখী, নীবীকে বলিল “আয় তাই আজ বউ বউ খেলি”, নীবী বলিল, “সকাল বেলা বউ বউ খেলিব না—পুতুল খেলিবে ত এস দুই জনে খেলি”। সুখীব মনে ধবিল না নীবী বুঝিতে পারিল;—নীরী আপন মনে খেলাঘরের হাড়ি কুড়ি সাজাইতে লাগিল। সুখী বলিল তবে আমি বাড়ী যাই। নীরী খেলনা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুখীব হাত ধরিয়া বলিল “বব হইবে কে তাই?—কনে হইবে কে তাই”? এইবার সুখী প্যাঁচে পড়িয়া গেল ভাবিতে লাগিল যোগেশকে ও ভবেনকে তাহাদি-

গের বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিবে কি না। এমন সময় যোগেশ ও ভবেন তাহাদিগের বাড়ীর আপন আপন শিব সহিত আসিয়া নীববালাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল—সুখী আক্লান্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, নীবী তাহা কবিল না। নীবী সুখীকে বলিল “কনে হইবে কে?” সুখী ভাবিল নীবী পোড়ার মুখী বড় ছুটে, খেলিবাব ইচ্ছা নাই বলিয়া কতই অছিলা কবিতোছে। শেষ বলিল “আমি বোসেদের শৈলী পোড়ার মুখীকে আনিগে। তুই যাবি ত আমার সঙ্গে আয়।” নীবী, যোগেশ ও ভবেনকে “আমরা এখনি আসিতেছি—আসিয়া বউ বউ খেলিব, তোমরা বস বাড়ী চলিয়া যাইও না” বলিয়া সুখীব সহিত ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। সুখী হন্ হন্ করিয়া বোসেদের

ঘরে বৈশাখ শৈলজার মা, শৈলজাকে খাবার দিতেছিলেন, সেই স্থানে একেবারে উপস্থিত হইয়া শৈলজাকে বলিল। “শৈলি! এখনো তোব খাওয়া হয় নি? বব যে আসিয়া নীবীদেব বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া বহি-
ব্রাহ্মে—শীগির আয় শীগির আয়।”

শৈলজা আব খাবার খাইল না। মাব নিকট পবিবার কাপড় চাহিল। নীর-
বালা, সুরবালাকে বলিল—“ও কি ভাই। দেখ দেখি শৈলজা তোমার জন্তু পাবার খাইল না।” সুরবালা বলিল—“তা আমি কি ওকে খাবার খাইতে বাবণ কবিয়াছি? “তুই যেমন স্নান মেখে—না শৈলী তুই খাবার খাইয়া নে, আমবা দাঁড়াইয়া আছি।” শৈলজা বলিল “আমি খাবার খাব না, বল্ চলে যাবে, মা আমাৰ আপল দাও না?—আমি খাবার খাব না”। শৈলজাব মা এক খানি পাঁচ হাত কাপড় শৈলজাকে পবাইয়া দিয়া বলিলেন, খাবার না খাইলে বব বে কবিলে না। তখন শৈলজা দুই এক গাল তাড়াতাড়ি জলপান খাইয়া আমাৰ খাওয়া হইয়াছে বলিয়া সুরবালা ও নীরবালার হাত ধরিল। তাহাৰা, তাহাকে লইয়া চলিবা আসিল।

শৈলজা নীরবালাদেব বাড়ীতে যাইবা-
মাত্র যোগেশ ও ভবেন দুই জনেই আঙ্কাদে তাহার নিকট আসিল। শৈলজা, নীরবালা ও সুরবালার হাত ছাড়িয়া দিয়া যোগেশ ও ভবেন হাত ধরিল। সুর-
বালা ছয় বৎসরের বালক দুটিকে ও তিন বৎসরের বালিকাটিকে এক মনে
দেখিতে ছিল।—তিনটিতে মিলিয়া আদ্য

কেমন হইয়াছে, তাহাই ভাবিতে ছিল; খেলিবার কথা আব তাহাৰ মনে ছিল না, নীরবালা মনে কবিয়া দিল। নীরবালা বলিল “সুবি। বব কে হবে? সুরবালা সে কথাৰ কোন উত্তব না দিয়া শৈলজাকে জিজ্ঞাসা কবিল—“শৈলি! তুই কাকে বে করি—যোগেশকে না ভবেনকে।” শৈলজা বলিল “যোগেশকে।” যোগেশের মুখে হাসি আসিল, ভবেনেব মুখ শুখাইয়া গেল; -
শৈলজা যোগেশের হাত ছাড়িয়া দিয়া ভবেনেব দুইটি হাত ধবিল। ভবেনের মুখে আবার হাসি আসিল। সুরবালা, শৈল-
জাকে হাসিয়া বলিল—“দূর হতোপ, ছাড়ি। অমন সন্দেহ টুকটুকে ববকে বে না করিয়া কাল ববকে পছন্দ হলো।” এই বলিয়া নীরবালার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল—
নীৰবালাও একটু মুচকিয়া হাসিল। সে হাসিৰ অর্থ তাহাবাই বুঝিল, আব কেহ বুঝিতে পারিল না।

তাবপব সুরবালা নীরবালার কাণে কাণে
কি বলিল—নীৰবালা তাহাতে রাজি হইল না,—দেবলিল “মা বকিবে তুমি যাও তাই।”
সুরবালা আবার হনু হনু কবিয়া নীরবালার
মাৰ নিকট যাইয়া আঁসি ও চিকুণী চাহিল।
নীৰবালার মা জিজ্ঞাসা কবিল—“আঁসি
চিকুণী কি হইবে?”

সুর।—“শৈলজাব মাথাৰ চুল বাঁধিয়া
দিতে হইবে। আজ শৈলজাব বে”।

“নী-মা। কার সঙ্গে?”

সুর। “এই আমার ছেলে যোগেশের
সঙ্গে। “শৈলজা—নীরীর মেখে”।

নী-মা। “তা বেশ হয়েছে। আব

ভাবেন কান ছেলে হইল? সে কি আসেনি?"

সুবী। "সে আসিয়াছে—সে ও আমার ছেলে, 'সে নিতব্ব হইবে'।"

নীমা। "বেতে পেল কি?"

সুবী। "সে সব কথা এখন কিছু হই নি, পাওনা খোঁড়না কথা কহিতে আমি জুলিয়া গিয়াছি।"

নীমা। "ছেলের বেতে আমার ত খতে পাবে?"

সুবী। "তা আর পাবে না?—পাবে বৈকি"।

এই বলিয়া সুবাবা একদোড়ে আসি চিকণি লইয়া নীবাবার নিকট উপস্থিত হইল ও চোখ মুখ ঘূরাইয়া বলিল—“হ্যাঁলা নীবি। তুই আমাকে ফাঁকি দিতে বসে ছিস্। তোব মেয়ে—আমাব ছেলে—আমি ছেলেব মা, আমি যা' চাইব, তাই তোকে দিতে হবে,—তা'হা না হইলে আমার ছেলেবসহিত তোব মেয়েব বিবাহ দিব না”। শৈলজাব চক্ষু ছল্ ছল্ কবিত লাগিল,—শৈলজা মনে ভাবিল—তাহার বুঝি আব বিবাহ হইল না। যোগেশ ও ভবেনেব মুখ শুকাইয়া গেল, সুবাবা তাহা দেখিল। শৈলজাব কাঁদো কাঁদো মুখ থানি দেখিয়া নীবাবা, সুবাবাব উপর বড়ই চটিয়া গেল, ইহাব উত্তর না দিয়া থাকিতে পাবিল না, সুবাবাকে বলিল—“জুঁমি ছেলেব মা সত্য কিন্তু তোমাব ছেলে পাস্ করা নয়; পাস্ কবা হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই চাহিতে পারিতে।” সুবাবা বড় ফাঁপবে পড়িল—একদিকে শৈলজার চক্ষু ছল্ ছল্ কবিতেছে—অপব

দিকে তাহাব ছেলে পাস্ করা নয়। সে আব বেশী কিছু না কহিয়া এই মাত্র বলিল—“নীবি। তোব যা ইচ্ছা, তুই তাই দিস্।”

নীবাবা প্রথমে চন্দন ঘসিল। তার পর বব ও নিতব্বকে সাজাইতে আবস্ত কবিল। সুবাবা শৈলজাব মাথাব চুল বাঁধিতে বসিল। প্রথমে চুলগুলি বেশ কবিয়া আঁচড়াইতে লাগিল চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে গান ধবিল—

“সোনামুখী শৈলীবুড়ি লক্ষ্মী আমার মেয়ে।
নাহি নড়ে নাহি চড়ে চুলবাঁধতে গেলে ॥

চুপটি কবে বসে থাকে, যা' বলি তাই শুনে।
'বা' নাইকো মুখে তার, ঘাট নাইকো গুণে ॥”

সুবাবাবা চুল আঁচড়ান থামিয়া গেল। গানও থামিল। তাহার কি মনে পড়িয়াছে—সে আবার বাড়িব ভিতর গেল,—বাড়ীব ভিতর হইতে এবাব গোচ্চাব পরচুল্য আনিল। নীবাবা জিজ্ঞাসা কবিল “চুল গুল্য লইয়া কি হইবে?” সুবাবা উত্তর কবিল “কলি কাটিয়া চুল বাঁধিয়া দিতে হইবে。” নীবাবা কেবল একটু হাসিল, আব বড় কিছু বলিলনা। সুবাবা আবার চুল আঁচড়াইতে আরম্ভ কবিল, এবাব চুলেব গুছি গুলি দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, আবার গান ধবিল।—

“সোনামুখী শৈলীবুড়ি, লক্ষ্মী আমার মেয়ে।
নাহি নড়ে নাহি চড়ে, চুল বাঁধতে গেলে।
চুপটি কবে বসে থাকে যা' বলি তাই শুনে।
'রা' নাইকো মুখে তার ঘাট নাইকো গুণে।
এমন মেবে পাৰি কোথার দেখবি যদি আব।
চুলটি বাঁধা হ'য়ে গেলে খেলতে চলে যাব।”

শৈলজাব চুলগুলি তাদৃশ বড় নয় ও চুলে
চুলের ওছি ঝাইল না। সুরবালা কিছু
বিরক্ত হইয়া বলিল “দূর পোড়ারমুখি, চুল-
গুলি একটু বড় কবিত্তে পাবিস্ নাই।”
সুরবালার আব কলি কাটিয়া চুল বাঁধা
হইল না। শৈলজা সুরবালার দিকে বিমর্ষ-
ভাবে একবার ফিবিয়া চাহিল। সুরবালা
তাহার মুখচুশন করিল। শৈলজাব মুখ খানি
আবাব হাসি হাসি হইল।

এবার সুরবালা খুঁটি বাঁধিয়া শৈলজাব
মাথার চুল বাঁধিয়া দিবে মনে কবিল।
আঁচলে সে কি বাঁধিয়া আনিয়া ছিল অঙ্ক-
লেব বন্ধনটি খুলিল, খুলিয়া “পট ডুরি” ও
জগন্নাথের “দোনামালা” বাহির করিল।
নীরবালা তাহা দেখিল; কৌতুহলে জিজ্ঞাসা
করিল “ও আবার কি?” সুরবালা বলিল
আহ। যেন কিছুই জানেন না,—তোর যে
সেদিন বে হইল, এব মধ্যে সব ভুলে
গেছিস্?”

নীৰ। “তা যেন হলো, ওনিযেকি হবে?”

সুর। “মাথার চুল বাঁধিয়া দিতে হইবে।
আজ ত অল্প দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিতে নাই।
তুই কি সব ভুলে গেছিস্?”

নীৰবালা আর কিছু বলিল না, কেবল
সুরবালা কি করে তাহাই দেখিতে লাগিল।
নীৰবালার বর ও নিব্বর সাজান হইয়া
গিয়াছে। সুরবালা কোটনে রাঙা সূতা
জড়াইতে লাগিল ও বিড়্ বিড়্ করিয়া কি
বলিতে লাগিল।

নীৰ। “বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতেছ?”

সুর। “পটডুরি জড়াইবাব মত্ৰ।”

নীৰ। “কোথা হইতে শিখিলে?”

সুর। “ঠাকুরমার কাছ থেকে”।

নীৰ। “একটু চেষ্টা বল না ভাই—
আমিও শিখি”।

সুর। “এখানে আব কেউ ত নাই?”
এই বলিয়া সুরবালা একটু চেষ্টা বলিতে
লাগিল।

“বাঙা সুরতোয় সাদামনে বেঁধে দিছ চুল।
সোয়ামি পদে মনটা বেথো হয়না যেন ভুল॥
অমন বতন সোয়ামিব মতন হয় যাব মাথার
মণি।

মানুষ ত ছার প্রাণী বল, কি কবে তাব
শনি॥”

সুরবালার বাঙা সুরতা জড়ান হইয়া ঝাইলে
পব শৈলজাব গালে একটী চুমো ঝাইল।
নীৰবালা শৈলজাকে বলিল—‘শৈলজা!
সুবীকে নমস্কার কব।’ শৈলজা তাহাই
করিল। সুরবালা আবাব শৈলজাব মুখ
চুশন কবিল। শৈলজা আবাব স্থির হইয়া
বসিল। সুরবালা এবার দোনা মালা
কনেব মাথায জড়াইতে লাগিল। জড়াইতে
জড়াইতে এবার জগন্নাথের স্তব ধরিল।
নীৰবালা এক মনে শুনিতে লাগিল—

“জয় জগন্নাথ পায়ে পড়ি, থাকে যেন শৈল
বুড়ি॥

এথো হয়ে সোয়ামির কোলে বেঁচে যেন
‘শ’ কুড়ি।

ধনে পুতে লক্ষী নিয়ে, করে যেন ঘর।

জয় জগন্নাথ পড়ি পায়ে, দেহ এই বর॥

শৈলী বুড়ী সাধের ছুড়ি (যেন) রেখে তারে
পায়।

‘সতী সাবিত্রী’ বলে যেন পরম শক্ত তার।

নামটি যেন থাকে তাব সতী সীতের পাশ।

জয় জগন্নাথ পড়ি পায়, এই দাসীর আশ ॥”
নীরবালাও বলিল—

“নামটি যেন থাকে তাব সতী সীতের পাশ।

জয় জগন্নাথ পড়ি পায় এই দাসীর আশ ॥”

সুরবালার স্তব শেষ হইল, চুল বাঁধাও শেষ
হইল শেষ নীরবালাকে বলিল—“নীবি।

তুই ভতরুণ কনে সাজা, আমি গোটাকতক
ফুল তুলিয়া লইয়া আসি—এখনো ঢেব কাজ
বাকি বহিয়াছে;—ফুলের মালা গাঁথিতে
হইবে, গহনা গাঁথিতে হইবে, আবও কত
কি করিতে হইবে। আব এত কষ্ট করিয়া
তোতে আমাতে বব কনে সাজাইতেছি—
কেহ দেখিবে না”? এই বলিয়া সুরবালা
ফুল তুলিতে চলিয়া গেল। নীরবালা তত-
ক্ষণ কনে সাজাইতে লাগিল।

‘সুরবালা একটু পবেই আঁচল ভরিয়া
কাঠমল্লিকা ফুল লইয়া উপস্থিত হইল।
বনে অজস্র মল্লিকা ফুটে—সুরবালা ও
মনেব সাধে আঁচল ভরিয়া তুলিয়া আনি-
য়াছে। একটি একটি ফুল লইয়া আপনি
শৈলজাব চূলে ওঁজিয়া দিতে লাগিল ও
আজ্ঞাদে গান গাহিতে লাগিল—

‘নীল আকাশে সাদা তারা ফুটলে
যেমন হয়।

শৈলীর কালো চূলে সাদা ফুল তেমনি শোভা-
ময় ॥

পেকো জলে কমল ফুটে আলোকরে সর।
আমার—হুলপদ্ম শৈলীবুড়ি আলো করে

সর ॥

চাঁপাফুলে চরন ছিটে দেখতে যেমন রুহ।

শৈলীর কপালে কনে-চরন তেমনি শোভা-
ময় ॥

শেষ ফুলে মাথা ভবিয়া গেল। নীরবালা
ফুলের হাব ও গহনা গাঁথিতে ছিল তাহাও
তাহাব শেষ হইল—সে প্রথমই শৈলজাকে
ও তৎপরে নিৎববকে সাজাইল। সুরবা-
লাব আজ্ঞাদেব আর সীমা বহিল না;
সে আজ্ঞাদে করতালি দিয়া নাচিতে
ও গাহিতে লাগিল।—

“কলিযুগে রাম সীতে দেখতে যদি চান।
প্রাণ ভবে দেখে গিষে মেটা মনেব আশ ॥
ধবাতলে অবাক ছিটি অবাক হয়ে ববি।
পাপ তাপ সব দূবে গিষে চিবসুখী হবি।”

সুরবালা শুধু ফুল তুলিতে দায় নাই।
ফুলতুলিয়া ফিবিয়া আসিবাব সময় পাড়াব,
সকলকে বর কনে দেখিবাব নিয়ন্ত্রণ
করিয়া আসিয়াছিল। পাড়াব সকলে সুর-
বালাকে ‘সুখী পাগলী’ বলিত, তাহারা
সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। প্রায়
অনেকে আসিয়া তাহাকে গান গাহিতে
দেখিয়াছিল। সুরবালার হৃৎ ছিলনা,
সে আপন মনে গাহিতেই ছিল, শেষ এক
জন প্রতিবাসী সুরবালাকে সম্বোধন করিয়া
বলিল—“ও সুরী পাগলি! তোর রাম
সীতা ত দেখিলাম এখন লক্ষণ কোথায়?
একবার একাসনে তোর রাম সীতাকে
বসা না?—দেখি।” সুরীপাগলী অমনি
বাড়ীর ভিতর হইতে একখানি চৌকি
আনিয়া দুই জনকে একাসনে বসাইল।
যোগেশের দক্ষিণপার্শ্বে ভবেনকে বসাইল।
সকলেই বব কনে ও নিৎবব সাজান দেখিয়া
আশ্চর্য হইল। সকলের মনে রাম সীতা
ও লক্ষণের প্রকৃত ছবি—জদয়ে অঙ্কিত
হইল; সকলেই আশ্চর্য হইয়া একমনে

দেখিতে লাগিল। ক্রমে শ্রুবাবলাব ঠাকুরমা আসিল। ঠাকুরমা আসিয়া চৌকির কাছে গিয়া নমস্কার কবিল। সকলি একস্বরে বলিয়া উঠিল “ওমা। ওকি গো! বুড়া মাহুষ হইয়া—ব্রাহ্মণের মেয়ে হইয়া—বরকনেকে নমস্কার করিলে,”—“শৈলী, যোগেশ। তোমবাও ওঁকে প্রণাম কব।” যোগেশ ভবেন ও শৈলজা তাহাই করিল। বুড়ি বলিল “ওমা। আজ তোমবা রাজার অপেক্ষা বড়,”—“দেব দেবী অপেক্ষা বড়”। রাজা আসিলে আজি ও সিংহাসন পাইবেন না, স্মরণ হইতে দেব দেবী নামিয়া আসিলেও তাঁহা-দেব ও সিংহাসনের নিচে বসিতে হইবে। ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই। ও আসনে আজ কাহারও অধিকার নাই ও আসন আজ সকলের পূজনীয়”। এই বলিয়া আবার নমস্কার করিল। শৈলজা, ভবেন, ও যোগেশ ও আবার প্রণাম কবিল। একজন প্রতিবাসী অপর অপর প্রতিবাসীদিগকে সন্মোদন করিয়া বলিল “শ্রুবী পাগলী, তাব ঠাকুরমাও পাগলী”। সকলে হাসিয়া উঠিল। বুড়িও হাসিল—হাসিয়া তাহাকে “চির এয়রুদী হইয়া বাঁচিয়া থাক” বলিয়া আশীর্বাদ করিল। সকলে অবাক হইয়া রহিল।

বেলা দশটা। বৈশাখ মাসের রৌদ্র। অজ্ঞবেলাতেই অধিক বেলা হইয়াছে বোধ হয়। নীরবালার পিতা রৌদ্রের উজ্জ্বল দেখিয়া অধিক বেলা হইয়াছে ঠিক করিয়া কার্য্য হইতে (সমস্ত কার্য্য সমাধা না করিয়াও) বাটী প্রত্যগমন করিলেন। বাটী প্রত্যগমন করিয়া দেখিলেন বাড়িতে ভরানক মেয়ের ভিড়। শ্রুবাবলা বাড়ি ঢুকিয়া

মাত্রই তাঁহাকে তাঁহার নাতিনী শৈলজার শ্রুবালার ছেলের সহিত বিবাহ জানাইল। নীরবালার মাটির দিকে চাহিয়া মুহু মুহু হাসিতে লাগিল। অজ্ঞাত প্রতিবাসীরা নীরবালার পিতাকে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইল। কেহ কেহমাতাব কাপড় একটু টানিয়া দিল; কেহ কেহ তাহাও করিল না। পল্লী-গ্রামে সকলে প্রাণ সকলের সহিত একটা মিছামিছি সম্পর্ক বাঁধাইয়া বাস করিয়া থাকে।

নীরবালার বব কনের দিকে নিমেষ দৃষ্টিকবিয়া হাসিতে হাসিতে একেবারে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন ও নীরবালার মাতাকে ডাকিলেন। গিন্নি আসিয়া উপস্থিত হইলে বলিলেন “অনেক বেলা হইয়াছে আজ ওঁদের সকলকে এখানে থাইতে নিমন্ত্রণ কর, কাহাকেও বাড়ী ঘাইতে দিও না। আমি মাছের জন্ত বাহির হইলাম। এই বলিয়া গৃহ হইতে জাল বাহির করিয়া বাগানের দিকে যাইলেন। বাগান খিড়কিতে। অজ্ঞদিক দিয়াও খিড়কিতে আসা যায়। বাগানে জাল রাখিয়া খিড়কি দিয়া মাছ ধবিবার একটা লোক ডাকিতে গেলেন। হুই একজন পুরুষ প্রতিবাসী আসিয়া এই শুভকার্য্যে নীরবালার পিতার সহিত যোগ দিল। আজ সে পল্লীতে মহাধুম পড়িয়া গেল। ক্রমে ক্রমে হুই একজন পুরুষ নিমন্ত্রণ হইতে হইতে গ্রামের পুরুষ আর কেহ বাকি রহিল না। সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। নীরবালার মা বাহিরে আসিয়া প্রথমে বব কনে দেখিলেন। তারপর সকলকে সকলের হাতে ধরিয়া তাঁহার

বাড়িতে খাইবাব কথা বলিলেন। নিজে তাঁহাদিগের বাটতে গিয়াও বলিয়া আসিলেন। এ নিমন্ত্রণে কেহই আসিবার অপত্ত করিলনা। এ সুরীপাগলীর ছেলের বিবাহ—আব কাহারও ছেলের নহে। সুরবালার ঠাকুরমা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া সজাতির রঙ্গ ভঙ্গ দেখিতে ছিলেন। শেষ নীরবালার মাতাব নিমন্ত্রণ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন “এ বড় মন্দ নয়, ছেলেদেব খেলা হইতে হইতে বুড়াদেব খেলা আবস্ত হইল, তা বেশ। সুরী, তুই আয়—আমাব বাড়িতে যা আছে যোগাড় যোগাড় করিয়া আনবি আয়—এত আমারও কাজ।” সুরবালা হন্ হন্ করিয়া বুড়ী ঠাকুরমার সহিত বাড়ী যাইল। নীরবালাও সুরবালার সমিত যাইল। পরক্ষণেই একটা চাকবেব কাঁধে একভার আনাজ কোনাজ লইয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার প্রতিবাসিনীবা ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ গৃহ হইতে যে যাহা পারিল আনিয়া উপস্থিত করিল। কেহ শাক, কেহ আলু, কেহ বেগুন, কেহ মূলা, কেহ সুগন্ধি চাউল, কেহ বা দুধ প্রভৃতি যে যাহা পারিল আনিয়া উপস্থিত করিল। আনাজের আঁগুল হইয়া গেল। গোলা ভবা ধান চাউলেরও অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে কেহ বাটনা বাটিতে কেহ আনাজ কুটিতে, কেহ সুপারি কাটিতে, কেহ পান সাজিতে, কেহ রন্ধনে নীরবালার যাতার সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিল। আমোদের সীমা রহিল না। পরক্ষণেই নীরবালার পিতা পুত্রে কই মৎস্ত, আম ও কাঁচা পেঁপে লইয়া আসিলেন। কিঞ্চৎ

ক্ষণ মধ্যে বহু ব্যঞ্জন ও অন্ন প্রস্তুত হইয়া যাইল।

প্রথমে পুরুষেরা আহাৰ করিল। পুরুষেব মধ্যে শৈলজার পিতা কেবল আসেন নাই। তাহাতে কেহই তুঃখিত হইলেন না। আসিলে সকলেই অতিশয় স্তুতী হইতেন সন্দেহ নাই। তৎপরে মেয়েবা আহাৰ করিল। মেয়েদেব মধ্যে প্রাচ্য সকলেই আসিয়াছিল। কেবল শৈলজার মাতাঠাকুরাবাণী ও যোগেশেব জ্যেষ্ঠ ভগিনী কাদশ্বিনী আসেন নাই। শৈলজাব মা আসিবেন না সকলেই জানিত। কিন্তু ‘যোগেশেব ভগিনী কেন আসেন নাই কেহ কেহ, যোগেশের মাতা ঠাকুরাবাণীকে জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল। যোগেশেব মা উত্তর করিল “জামাই বাড়ি বহিয়াছে বলিয়া আসিতে পাবিল না।” আর একজন বলিল “জামাই তোমাব বাব মাসই বাড়িতে থাকেন ও থাকিবেন, তা বলিয়াকি সে কোথাও নিমন্ত্রণ যায় না?—না যাইবে না” ? আর একজন বলিল “যেসময় টুকু সে এখানে আসিবে সে সময় টুকু তাব গহনা পবিকার কবিলে ও খোল ব্যাসন দিবা গা মাজিলে কাজ দেখিবে”।

খেলা ঘরের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের আমোদ আনন্দ ও একদিনে ফুবাইয়া গেল। পত্নীগ্রামে তখন এইরূপ (আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি) প্রাচ্য সামান্ত বিষয়েই বৃহৎ বৃহৎ কর্ম কাণ্ড হইত। যথেষ্ট খাওয়া দাওয়া হইত, এইরূপ আমোদ আনন্দ করিত। এখন সে সব ফুরাইয়া গিয়াছে।

ক্রমঃ—

মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। কাণ্ডেন সাহেব বিস্মিত হইয়া আবাব্য উপস্থাসের মনোরম ইঙ্গিতাদি যেন স্বচক্ষে প্রতীত করিতেছিলেন। শান্তি কাণ্ডেনকে মুগ্ধ কবিয়া স্বপ্নের মত বনমধ্যে অদৃষ্টা হইলেন।

বাস্তবিক, মানবজীবন যখন উপস্থাস হয়, তখন সেই ঘটনাপূর্ণ জীবনের যে রমণীয় ভাব সে ভাব জীবনে আব কখন প্রতীত হয় না। ওথেলোর এইরূপ ঘটনাপূর্ণ হুঃসাহসিক জীবন-বৃত্তান্তে ডেন্‌ভিমোনার মন এই জন্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। ওথেলো আপন জীবন-উপস্থাস বর্ণন কবিতেন, আর ডেন্‌ভিমোনা আকর্ষণ পুরিয়া একমনে শুনিতেন। কবি এই ঔপস্থাসিক জীবনের রহস্য দুই ছত্রে কেমন সুন্দর বলিয়া দিয়াছেন—

"She loved me for the dangers

I had passed ;

And I loved her, that she did pity
them.

This only is the witchcraft I had
used."

বান্ধালীর জীবনে এইরূপ ঔপস্থাসিক ভাব প্রাপ্ত হওয়া বড় দুর্লভ। এজন্য বান্ধালীর কল্পনার এরূপ হুঃসাহসিক জীবন অধিকতর রমণীয়। যে দেশে নদী-তরঙ্গ কেবল মুগ্ধ হিলোলে বহিতে থাকে, কেবল বিপুল বনু স্ফীত করিয়া একটানা স্রোতে প্রস্তবেগে ছুটিতে থাকে, সে দেশের লোক এই পার্বত্য নদের ভীষণ জলকীড়া, গহ্বর জোঁড়ের হুঃসাহসিক উল্লঙ্ঘন, স্রাবু দেশীয় প্রবাহের-দুর্নিবার বেগ, জল-প্রপাতের বজ্র-সিনাক্ত এবং নির্বব-অঙ্কে ইন্দ্রধনুর শোভা

চমৎকৃত হইয়া দেখিবে, এ বড় বিচিত্র নহে। বান্ধালী এইরূপ ঔপস্থাসিক জীবনের হুঃসাহসিক ক্রিয়া কলাপ চমৎকৃত হইয়া শ্রবণ করেন, তাঁহার কল্পনায় এ চঞ্জের শোভা অতি রমণীয় বোধ হয়। বান্ধালীর চক্ষে আনন্দ মঠ এইরূপ চন্দ্র। সে চঞ্জের শোভায় বান্ধালী কেন না মোহিত হইবে? কবি বান্ধালীর জীবনে বীরত্ব দিলেন। বীরত্বমে বীরগণের শরীরে সে বীরত্ব বিলক্ষণ লাভিয়া গেল। শুদ্ধ বীরত্ব নহে, বীরত্ব স্বদেশাভিরাগে উচ্ছৃঙ্খলিত হইতেছে। স্বদেশাভিরাগে উৎসাহিত হইয়া হাজার হাজার লোক দেশেব মঙ্গলের জন্ত প্রাণ বিসর্জন করিতে উত্তত হইয়াছে। দলপতিগণ সেই ব্রতে ব্রতী হইয়া এক মনে এক ধ্যানে দেশের মঙ্গলের জন্ত উন্নতপ্রায় জীবনকে

ত্যাগী ও সন্ন্যাসাবলম্বী করিয়াছে।

তারা যে অসি ধারণ করিয়াছে, তাহা

স্বদেশের জন্ত নহে, কিন্তু স্বদেশের

হিতসাধনের জন্ত। তাহাদের নিকট মাতৃ-

ভূমিই একমাত্র দেবতা—মাতৃভূমিই এক-

মাত্র উপাস্ত জননী। শুদ্ধ যুধে নয়, কার্যে

সর্বত্যাগী হইয়া তাহাও সেই জননীর সেবায়

প্রাণপাত করিতেছে। ক্ষত্রিয়ের বীরত্বে

জীবনকে উৎসাহিত করিয়াছে—বান্ধালীর

সরস ক্ষেত্রে অগ্নিকুণ্ড জ্বলাইয়াছে। জ্বালা-

ইয়া জীবনকে বেরূপ ঔপস্থাসিক ভাবে

ঘটনাপূর্ণ করিয়াছে, তাহাতে নিরীহ বান্ধা-

লীর কল্পনা কেন না মোহিত হইবে।

বান্ধালী যেন কল্পনার একবার পৌরবে

উৎসাহিত হইতেছে। একবার স্বকীয়

ধর্ম্মকে বীরত্বের লক্ষণ দেখিতেছে, একবার

ক্ষত্রিয় ভেজে তেজীয়ান হইতেছে, তাহার বাহুতে বলসঞ্চার হইতেছে, তাহার শিরে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। এই ঘোর দাসত্বকালে যে কল্পনা বাঙ্গালীর মনে এরূপ বীরত্বের স্বপ্ন উদ্ভূত করিয়া দেয়, সে কল্পনা-কুহকে যে বাঙ্গালী মোহিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। বঙ্গবাসীর হৃদয়-গগনে এক্ষণে এই চন্দ্রই হাসিতেছে। কবি সেই হৃদয়ভাব বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া সেই রূপ ছবি চিত্রিত করিলেন। বাঙ্গালী জাতির জীবনকে একদা ঔপন্যাসিক ভাবে পূর্ণ করিলেন। এরূপ ঔপন্যাসিক কল্পনার ঘাছা শিরোভূষণ, তাহা না দিলে এ উপন্যাস সর্বস্ব স্বন্দর হইতে পাবে না। এরূপ কল্পনার শিরোভূষণ বীর রমণী। সেই বীর রমণী শান্তি। শান্তি বীরত্বের উপন্যাস, উপন্যাসেব শিরোভূষণ, কল্পনাব পরিপূর্ণ এবং তারাত্তিত অনন্ত আকাশেব পূর্ণ। তাঁহার জ্যোৎস্নায় আনন্দমঠের সমুদায় আলোকিত হইয়াছে।

আনন্দমঠের কল্পনা-সৌন্দর্য্য এই খানেই শেষ হয় নাই। বঙ্গদেশের রমণীয়তা তাহার সমৃদ্ধ বনরাজি। অপর দেশীয় বন অপেক্ষা স্তম্ভ-শোভাসুশোভিত, প্রচুরতাসম্পন্ন, লতাপল্লবাকীর্ণ, কুসুমরঞ্জিত বঙ্গীয় বনরাজি অধিকতর ঔপন্যাসিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। সেই স্বন্দর বনদেশে এক বীর সন্ন্যাসিদল—সন্ন্যাসিদলের বীরত্ব যেমন অসাধারণ তেমনি ঔপন্যাসিক। সেই সন্ন্যাসিদল আবার ঈর্ষাকায় স্ত্রী বাঙ্গালী—বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর বীরত্ব যথার্থ ঔপন্যাসিক ভাবে বিস্তারিত আছে। বীর বাঙ্গালীর মধ্যে

আবার বীর রমণী—কে বলিবে বীর রমণী ঔপন্যাসিক চিত্র নয়? সেই বীর রমণী আবার পুরুষ-বেশিনী—পুরুষ-বেশে বীর রমণী চিত্র কেমন মনোহর ও ঔপন্যাসিক। অরণ্যের মধ্যে তাপসের নিকুঞ্জকানন,—নিকুঞ্জকানন মধ্যে কুসুমভীরে সরসী—সরসীর মধ্যে কমল বন—কমলবনে পদ্মিনী ঢল ঢল করিতেছে। অথবা দণ্ডকারণ্যে গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী—পঞ্চবটী বনে নিকুঞ্জ-শোভিত রামাশ্রম—সেই রামাশ্রমে সীতাসুন্দরী কর্ণিকার পুষ্পবনবেষ্টিত—সেই কর্ণিকাবনে সোণার মায়ামুগ নৃত্য করিতেছে। এই শোভা আনন্দমঠে—আনন্দমঠে বীরভূমের অবগ্য—অরণ্য মাঝে রমণীর কুঞ্জকাননে সন্ন্যাসিগণের আশ্রম—আশ্রমে বাঙ্গালী বীরগণের কমল বন—কমল বনে বীর রমণী শান্তিরূপিনী পদ্মিনী হাসিতেছে। শান্তি আনন্দ-কাননে পুরুষ বেশে মায়ামণি—এই মায়ামণি যেন এক একবার সোণার রূপে উদয় হইতেছে, আবার নৃত্য করিতে করিতে কোথায় অদৃষ্ট হইয়া যাইতেছে।

আনন্দারণ্যে সন্ন্যাসিদলকে যখন আমরা প্রথম দেখিলাম, তখন আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমাদের অজ্ঞত হইয়াছিল সন্তানদলের অধিনায়ক সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী এক মহাশক্তি। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে সন্তানগণ এক মহৎ উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়া কেমন দৃঢ়ভাবে সঙ্ঘ রহিয়াছে। তাঁহার মন্ত্রণা সকল গোপনে গোপনে অনায়াসে সম্পাদিত হইতেছে। সন্তানগণের সংউৎসাহ ও অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপে পাঠক বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। এই ক্রিয়াকলাপে

পাত্র সন্তানক ব্রহ্মচারী। এই সন্তানগণের ক্রিয়াকলাপ গ্রহের অনেক দূর পর্যন্ত রশ সঞ্চার করিয়াছিল। অনেক দূর পর্যন্ত পাঠকের মন সেই ক্রিয়া কলাপে বিশ্বয়ের পর বিশ্বয়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সকল বিষয়েই সীমা আছে, বিশেষতঃ বিশ্বয়। বিশ্বয় অধিক কাল স্থায়ী হয় না। সন্তানগণের সহিত ক্রমশঃই আমাদের যত ঘনিষ্ঠতা হইল, ততই আমাদের বিশ্বয় কমিতে লাগিল। তাহাদের ক্রিয়া কলাপ সামান্য দৃষ্টান্তেই লুপ্ত ব্যাপার বলিয়া যখন প্রতীত হইতেছিল, যখন সন্তানগণ আর আমাদের তত চিন্তাকর্ষণ করিতে পারেন না, এমন সময় শান্তি দেবী উদয় হইলেন। উদয় হইয়া গ্রহে এক নূতন বসের সঞ্চাব করিয়া দিলেন। গ্রহের পুনর্জীবন হইল। শান্তি যেন উষাদেবীর স্তায় সহসা উদ্ভিত হইয়া সমুদ্রের দেশ আলোকিত করিয়া দিলেন। রজনীর অন্ধকার অপসারিত হইল। বিশ্বয় আবার নবীভূত হইল। আমরা এই নব বিশ্বয়ে শান্তির চিত্র দেখিয়া উত্তরোত্তর পুলকিত হইতে লাগিলাম। বৃক্ষব্যাপারের ঘোর সূচ্যকাণ্ড মাঝে শান্তির চিত্র যথার্থ শান্তি দান করিতে লাগিল। তাহার অন্তত সাহস ও বুদ্ধি রহস্যপ্রসারতার সহিত মিশিয়া এক অপূর্ণ রমণীর রূপে সৃষ্টি করিল। কল্পনা সেই অপূর্ণ রমণীর সুন্দর চিত্রে বিরূপ হইল।

বাস্তবিক, শান্তিদেবী এক অপূর্ণ কল্পনা। শান্তির কল্পনার অনেক রমণীর ভাব আছে। শান্তি শুদ্ধ বীর রমণী নহেন, তিনি পুরুষবেশে বীর রমণী। যে বেশে

শান্তিদেবী ঙ্গাবলি অধিক খেলিতে পাবে, কবি তাহাকে সেই পুরুষ বেশ প্রদান করিয়াছেন। শান্তি দেবী যে সমস্ত ভাবে আধার, বোধ হয়, পুরুষ বেশ না পাইলে সেই ঙ্গাবলি তত সুন্দর ভাবে বিকাশ হইত না। তাহাব রসিকতা পুরুষ বেশের রঙ্গরঙ্গে অধিকতর প্রফুল্লিত হইয়াছে। তাহার সাহস পুরুষ বেশে অধিকতর উপযোগী হইয়াছে। তাহার বুদ্ধি পুরুষ বেশে অধিকতর খেলিতে পাইয়াছে। আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না, এইরূপ এক অপূর্ণ রমণীর সমাবেশের জন্ত কি আনন্দমঠেব কল্পনাব সৃষ্টি, না আনন্দমঠের উপজ্ঞান কল্পনার উপযোগিনী করিয়া শান্তি দেবীর সৃষ্টি। যে রূপেই হউক, শান্তি দেবীর সৃষ্টি আনন্দমঠের কল্পনাব এক পূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে।

শান্তিদেবী সাহসিনী। তাহার সাহস তাঁহাকে গৃহপিণ্ডের আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেনা। তিনি সেই অদ্ভুত সাহসে ভর করিয়া সেখানে সেখানে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেন। এই সাহস তাঁহাকে এক অদ্ভুত তেজস্বিতায় ভূষিতা করিয়াছিল। তিনি সেই তেজে যেন ফুলিয়া বেড়াইতেন। যেন পুরুষের পুরুষকারকেও ভুজ করিতেন। তিনি এতদূর সাহসিনী ও তেজস্বিনী ছিলেন, যেন রমণী-অঙ্গে তত তেজ ও তরু সাহস ভাল সাজে না বলিয়াই পুরুষ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি রমণীর সীমা অতিক্রম করিয়া পুরুষের সীমার আশ্রয় পড়িয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার পুরুষবেশ সুন্দর সাজিয়াছিল। অন্তরের প্রচুর সাহস

ও তেজ তিনি এক এক সময়ে যেন দমন করিয়া রাখিতে পারিতেন না। সে তেজ তাঁহাকে এক এক সময়ে পুরুষোচিত বীরকে মাতাইয়া তুলিত। তখন তাঁহাকে আর রমণী বলিয়া জ্ঞান হইত না। যে সাহস জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে, প্রাণ দিতে সঙ্কুচিত হয় না, সেই অদম্য বীরোচিত সাহসে শাস্তি একদা কাণ্ডেন টমাস সাহসকে পরাস্ত ও স্তম্ভীভূত করিয়াছিলেন। এই বীরোচিত সাহসে উত্তেজিত হইয়া শাস্তি রমণীবেশে একাকিনী ইংরাজ শিবিরে অনায়াসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সাহসে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাসিনী মিশিয়া অনায়াসে যুদ্ধ মাঝেও বিচরণ করিয়াছিলেন। যেখানে নির্ভীকতাব প্রয়োজন, শাস্তি সেখানে অগ্রসারিণী। ইংরাজ শিবির সমাবেশ দেখিতে মজ্ঞামাত্র হইতে শাস্তি অমনি আগে ভাগে বুকশিবে উদ্ভাসিত পূর্ণাবলোকণ করিলেন। 'যে অ' রে এত অদম্য সাহস, সে আশাব 'কি যুদ্ধে বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পাবে? যে সাহসেব এত তেজ ও অদমনীয়তা, উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে, তাহার কি ক্ষুণ্ণ ও প্রসার হয়? সেই ক্ষেত্র সন্তানগণের বৃহৎ ব্যাপার। এই ব্যাপার আয়োজিত না হইলে শাস্তির মত বীররমণী শোভা পাইত না। শাস্তি সাহস ও তেজ সন্তান দলপতিগণের সাহস ও তেজের তুলনায় কিছু ন্যূন ছিল না। এক এক সময়ে শাস্তির হৃদয়-তেজ যেন উছলিয়া পড়িত। এক এক সময়ে তাঁহার বীর স্বামীর মুক্তমান হৃদয়কেও তিনি উত্তেজিত করিয়া দিতেন।

তাঁহার তেজস্বিতা দেখিয়া জীবনব্যপারমানন্দে বিভূর্ণ বলে বলীয়ান হইয়া উঠিত। যাহার এত সাহস, এত তেজ সেও কি আবাব বমণী! এত তেজে তেজস্বিনী হইয়াও কিন্তু শাস্তি জানিত, আমি রমণী ভিন্ন আর কিছুই নহি। তাঁহার সাহস রমণীর সীমা অতিক্রম করিতে চাহিত, তিনি সে সীমা অতিক্রম করিতে দিতেন না। এই স্থলে শাস্তি-প্রকৃতির বমণীয়তা। তাঁহার সাহস ও তেজ রমণী-জীবনের উপজ্ঞাস, কিন্তু সে উপজ্ঞাসের এক চমৎকার সৌন্দর্য্য আছে। সেই সাহস ও তেজ অদম্য হইলেও শাস্তি তাহাকে আশ্চর্য্যভাবে দমন করিয়া রাখিতে জানিতেন। শাস্তির সাক্ষ্য সেব সীমা ছিল। রমণী পুরুষ সাজিলে সেই সাহস ও তেজ যতদূর খাটিতে পারে, তিনি সেই সীমা পর্যন্ত যাইতেন। তিনি যত তেজস্বিনী ছিলেন, তাঁহার আত্মসংযমের রশ্মি ততই সবল ছিল। তাঁহার সাহস ও তেজ পুরুষবেশে যত দূর যাইতে দিতে হয়, তিনি ততদূর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন, তাহারা স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিত; কিন্তু যেইমাত্র সেই সাহস ও তেজ শাস্তিকে অপদস্থ করিবে, অথবা শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাত করিবে এমত বোধ হইত, শাস্তি অমনি আশ্চর্য্য আত্মসংযম গুণে সে সাহস ও তেজকে শাসন করিয়া লইতেন। শাস্তি নবীআন্দরূপে একবার সন্তান সেনাদলকে যুদ্ধে উত্তেজিত ও পরিচালিত করিয়া দিয়া শেষে আপনি স্বীলোকের কর্তব্য এ ধর্ম্ম ভাবিয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। কাণ্ডেন টমাস যখন তাঁহাকে তুলি

কি না ভাবিতেছেন, এমত সময়ে বিজ্ঞুৎবেগে তিনি টমাসের উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হঠাতে বন্দুক ফাট্টিয়া লইয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেন। টমাস এক অপূৰ্ণ স্থল্লরী স্ত্রীমূৰ্ত্তি দেখিয়া ভূভিত হইয়া গেলেন। স্থল্লরী হাসিতে লাগিলেন। সাহসিনী শান্তি বায়ুব মত স্বাধীন ভাবে যথা তথা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু বায়ু যেমন সর্বদা দৈব শক্তির অধীন, শান্তি ও তজ্জপ একমাত্র আত্ম-শাসনের অধীন ছিলেন। সেই শাসনশক্তি তাঁহার হৃদয়ে যেন দৈব শক্তি রূপে যথা সময়ে প্রকাশিত হইত।

শান্তির হৃদয়বল যে কত প্রভূত, তাহা তাঁহার সাহস ও আত্ম-শাসনে প্রকাশিত হইত। কিন্তু শান্তির এই একমাত্র বল নহে। শান্তির বুদ্ধিবল বৃদ্ধি হৃদয়বল অপেক্ষাও প্রচুর। শান্তি যেমন সাহসিনী, তেমনি বুদ্ধিমতী। শান্তির যে সাহস সর্বব্যাপী ছিল, সেই সাহস কেবল বুদ্ধিব গভীরে বাঁধা ছিল। বুদ্ধি নির্দেশ করিয়া দিত। বুদ্ধিও যে ক্ষেত্রে বিস্তার করিয়া ছিল,। ই ক্ষেত্রে মধ্যে সাহসে বিচরণ। গগন-প্রসারে যেমন পক্ষী, জলাশয়-জীবন-বিস্তারে যেমন। বিচরণ করে, তেমনি স্বাধীন ভাবে তিনি ক্ষেত্রে বুদ্ধিবলে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে কোথায় কতদূর হাওয়া উচিত, কোথায়। রূপে কার্য করা উচিত, শান্তির বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা দেখাইয়া দিত। যে আত্ম-শাসন শান্তির স্বাধীনতার বল, সেই আত্ম-শাসনের বল বুদ্ধি। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি এক আশ্চর্য্য ভাব ছিল—যে ভাব অত

তাঁহার অদম্য স্বাধীনতা ও সাহস সর্ব শোভা পাইয়াছিল। অন্তর্নেত্রের জ্বলন্ত তাহার বুদ্ধি যে সর্বদাই আগ্রহক থাকি এমত নহে, সেই বর্ণী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সহকারে স্থিত-উপা-সহ-শান্তি কখন অপ্রতিভ ও অপদস্থ হইতেন না। কল্পনা বুদ্ধির সহায় হইয়া সর্বদাই শান্তিকে উপস্থিত উপায় দেখাইয়া দিত। এই উপস্থিত বুদ্ধি বলে, শান্তির সাহায্য হইয়া স্বাধীন ভাবে সর্ব করিত। শান্তি জানিতে—তেজস্বিতার আ-বোধ নাই; আত্ম-বাধা দেখ কে? এ যেন ফুলিয়া বেড়াইতেন। এ গরব তাহার বাস্তবিক শোভা পাইয়াছিল। শান্তির বুদ্ধি কখন নিফল হয় নাই। তাঁহার বুদ্ধি যেমন সাহসকে উল্লাসী করিয়াছিল, বিজয় তেমনি তাঁহার বুদ্ধিকে উল্লাসিনী করিয়াছিল। তাঁহার বিজয়-কিবীটিনী-উল্লাসে খেলিয়া বেড়াইত। তিনি এই বুদ্ধি বলে কোথায় না অয়লাভ করিয়াছেন? কবি অনেক ঘটনার রচনা করিয়া শান্তির বুদ্ধিবল দেখাইয়াছেন। যে সত্যানন্দ ঠাকুর প্রচুর বুদ্ধিবলে হাজার হাজার সত্যানন্দকে বাঁধিয়া রাখিয়া ছিলেন, বাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভাবে চারিদিকের কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না, কবি সেই সত্যানন্দ-সেনা-নাগক সত্যানন্দের সমক্ষে শান্তিকে আনিয়া দিলেন। আনিয়া দিয়া তাঁহাদিগের বুদ্ধির খেলা দেখাইতে লাগিলেন। এ

দেবে খেলায় কে বিজয়ী? যে বুদ্ধি সহস্র
মানবগণকে পরাভূত করিয়া নিজ বশে
থিয়াছিল, আজ সেই বুদ্ধি একজন রমণীব
‘জি হারিবার পাত্রী
‘তার সহায়তায়
‘নী হইয়া

ন,

আমি সকলকে পারিব কিন্তু এই নবীনানন্দ
গোস্থামীকে পারিব না। সত্যানন্দের এমত
‘ছিল না, যে তর্ক নবীনানন্দ কাটায় নাই।

‘শাস্তি যখন দেখিল, সত্যানন্দের
‘দশ আসিয়া আপনাকে বাধা

‘দেখিল বলে, সত্যানন্দের
‘স্বদয়-বেদনা

‘জানিতেন সেই
‘বেদনার সহায়। এই উপা

বিজয় লাভ করিলেন। শাস্তি সন্তান
‘প্রবেশাধিকার পাইলেন। সত্যানন্দ তাঁহার
‘গতিরোধ করিতে পারিলেন না। ইংরাজ-
‘জাতি যে এত কৌশলী, কিন্তু শাস্তির বুদ্ধি
‘কৌশলে সেই ইংরাজও পরাভূত। কাপ্তেন
‘টমাস শাস্তির উপস্থিত
‘ও হতবুদ্ধি হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ‘কবি
‘আর একস্থলে শাস্তির উপস্থিত বুদ্ধির অতি
‘সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। ‘কৌশলী ইংরাজ-
‘গণের শিবিরে কবি শাস্তিকে একাকিনী
‘পাঠাইলেন। শাস্তি বৈষ্ণবী সাজিয়া, মধুর
‘হাসি হাসিয়া মেজর উভের কাছে উপস্থিত
‘হইলেন। ইংরাজগণের মন্ত্রণা-জাল ভেদ
‘করিবার জন্য শাস্তি একাকিনী রমণী-বেশে
‘ইংরাজ শিবিরে দণ্ডায়মান। ‘কথার কৌশল-
‘চক্রে শত্রুগণের গুহ পবামর্শ ও অভিসন্ধি

বুঝিয়া লইলেন। শেষে বড় বিপদ। ইংরাজ
‘শত্রুর সঙ্গে একাকিনী ঘোড়ায় চড়িয়া
‘আসিতে হইবে। শাস্তি হটিবার পাত্রী
‘নহেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি অমনি
‘কৌশল স্থির করিল। শাস্তি এক অদ্ভুত রহস্য
‘করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পলাইয়া আসিলেন।

শাস্তি বুদ্ধি পুরুষ বেশে আব এক
‘অপূর্ব ভাবে বিকাশিত হইয়াছে। শাস্তিকে
‘অগত্যা পুরুষ বেশ ধারণ করিতে হইয়াছিল,
‘না করিলে তিনি সন্তানদলে মিশিয়া নিজ
‘উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিতেন না। পুরুষ
‘বেশে বমণী, পুরুষের সঙ্গে যত মজা করিতে
‘পাবে, শাস্তি সেমজাতে কেন বঞ্চিত হইবে।

যখন অবসর পাইয়াছেন, শাস্তি কৌতুক
‘করিয়াছেন। এই সমস্ত কৌতুক-বিলাসে
‘শাস্তির বুদ্ধি অতি রমণীয় ভাবে প্রকাশিত
‘হইয়াছিল। ‘কৌতুক যেমন শাস্তির বুদ্ধির
‘পরিচয় দিয়াছিল, বুদ্ধিও তেমনি শাস্তির
‘বহু-প্রিয়তাকে অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শন
‘করিয়াছিল। উল্লাসিনী
‘করিতে করিতে এমনি
‘উপনীত হন, যখন, তাঁ
‘প্রকাশিত হইয়া এক অপূর্ব
‘সংঘটিত করে। পাঠকের
‘কিন্তু এইখানে শেষ হয়। ‘কি
‘অনেক মজা দেখিয়া আসিয়াছে
‘কিনী শাস্তি তাঁহাকে অনেক
‘হাসাইয়া আসিয়াছে। আর বধ
‘চলে না, তখন শাস্তি নিজ রমণীমূ
‘সমুদায় রহস্য ভাঙ্গিয়া দেন।

আর মহাখেতা! তোমার কৌশল
‘নের মধুর ধ্বনি কানন পরিপূর্ণ করিয়া

যখন নূব অচ্ছেদ সর্বোববে আসিতেছিল তখন, যুববাজ চম্পাপীড় তাহাতে মোহিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তুমি গন্ধর্ব্ব কন্যা হইয়াও কি শান্তির মত অবধ্যমাঝে সাবঙ্গে বন্ধাব দিতে পারিতে? শান্তি আনন্দ কাননকে সুধাব সঙ্গীতে পূর্ণ কবিয়া ছিলেন। শান্তি দেবীর কণ্ঠনিঃসৃত, বাগ-তান-লয-সম্পূর্ণ সঙ্গীতসুধা যখন বনকে মাতাইয়া ফুলিত, যখন জয়দেবের লহরীলীলা, কাননা-নিলেব তবঙ্গে মিশিয়া এক মধুর শ্রোতে বনকে উচ্ছ্বসিত করিত, তখন কি সন্ন্যাসি-দলেব হৃদয়-তবঙ্গ একেবাবে মাতিয়া উঠিত না? বৃদ্ধ সত্যানন্দ ঠাকুরও উন্মত্ত হইয়া সে সুরে যেমন যোগ দিতে যাইতেন, অমনি গর্জিতা শান্তি আব একটু উচ্চে তুলিয়া কণ্ঠ-বব ছাড়িয়া দিতেন, সেই সুধাশ্রোতে কানন ভাসিয়া যাইত। যখন সন্ন্যাসিদলেব “বন্দে মাতরং” ক্রমে পুৰাতন হইয়া আসিতো ল’গিল, শান্তি তাহাতে কামিনী-কণ্ঠের মধুর সুব-লহরী দিয়া নবীভূত করিলেন এবং সেই সুবও যখন পুৰাতন হইল, অমনি জয়দেবের সুধা-লহরীতে কাননকে প্রতিলবনিত করিলেন। বনদেবী যেন প্রচ্ছন্ন বেশে সহসা নবীনানন্দরূপে বনে উদয় হইয়া চাবিনিকে অমৃত বর্ষণ করিতে ছিলেন।

শান্তির মধুবতা শুদ্ধ তাঁহার কণ্ঠে নহে, তাঁহার হৃদয়-কঙ্করে আরও কত সুধাবাশি সঞ্চিত ছিল। তাঁহার হৃদয়-কাব্য বিকসিত করিয়া দেখি, তাহা প্রেমের পবিপূর্ণ। এত সাহসিনীর সঙ্গে এত প্রেম। অথবা প্রেমেরই তিনি সাহসিনী।/ যদি শান্তিকে বধার্থ বুঝিতে চাও, তবে তাহার হৃদয় দেখ।

শান্তি-হৃদয়ের প্রেম, সামান্য কামিনীর প্রেম নহে। তাহা বীব বমণীব প্রেম। শান্তির প্রেম শুদ্ধ পতিব্রতা নাবীর প্রেম নহে, তাহাতে ততই প্রগাঢ়তা ছিল বটে, কিন্তু তাহা বীবেরে মিশ্রিত ছিল। বীরেরে মিশিয়া প্রেমের মহত্ব বাড়িয়াছিল। শান্তি জীবানন্দকে শুদ্ধ পতি বলিয়া ভাল বাসিতে চাহিতেন না, তিনি সেই পতিকে বীবধর্মে ভূষিত দেখিতে চাহিতেন। শান্তি নিজে যেকপ বীববমণী ছিলেন, পতিকে তেমনি উপযুক্ত পাত্ররূপে দেখিতে চাহিতেন। এঞ্জল পতির তেজ একটু কমিয়া আসিতে দেখিলে, অমনি বীরোচিত বাক্যে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি যে প্রেমের প্রগাঢ়তা একদা গৃহের বাহিবে আসিয়া ছিলেন, সেই প্রেমের উচ্চতায় উঠিয়া পতিকে বীবধর্মে উত্তোজিত করিতেন। সেই স্বামী যখন শান্তির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পদ্যিচ্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, শান্তি তখন বলিতেছেন :—

“ছি তুমি বীব। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম জীব জন্য বীরধর্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম কখন ত্যাগ করিও না।”

যে রমণীর মুখে এমন উচ্চদরের কথা, সে রমণী যে একজন নারীরত্ন তাহার কি আব সন্দেহ আছে?

পতি যতদিন ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ব্রতী ছিলেন, শান্তি ততদিন গৃহে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। কিন্তু শান্তি যখন দেখিলেন, সেই পতির ব্রত

ভঙ্গ হইয়াছে, এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণ জীবন-উৎসর্গ, তখন পতি-প্রাণা শাস্তি আবার গৃহে স্থির থাকিতে পাবিলেন না। তিনি সেই পতিকে বাঁচাইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সাহস তাঁহাকে উৎসাহিত করিল। বুদ্ধি তাঁহাকে সাহস দিয়া পুরুষবেশে সজ্জিত করিল। শাস্তি ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিলেন। স্বদেশেব হিতের জন্য সন্তানগণের ব্রহ্মচর্যা, নিজ পতির হিতের জন্য শাস্তির ব্রহ্মচর্যা। শাস্তি পতি-প্রেমে সন্ন্যাসিনী হইলেন। শুদ্ধ পতিকে চাহিতেন বলিয়া কি শাস্তি ব্রহ্মচারিণী? শুদ্ধ পতির জীবন রক্ষার জন্য কি শাস্তি ব্রহ্মচারিণী? তাঁহাকে কি বিয়া সন্ন্যাসিদলে মিশিতে না দিলেই ত পতির জীবন রক্ষা হইত। গৃহে ফিবিয়া আসিতেও ত পতির ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শাস্তি তত নীচতায় নামিয়া পতির জীবন রক্ষা করিতে চা হন নাই। পতির জীবন ও ধর্ম উভয়েরই শ্রদ্ধা শাস্তি চাহিয়াছিলেন। পতির জীবনে শাস্তির জীবন, পতির ধর্মেও শাস্তির জীবন। এই স্থলে আমবা শাস্তির প্রকৃত গোবব উপলব্ধি করি। শাস্তি সামান্য সতী ছিলেন না, পতির শুদ্ধ জীবন রক্ষা করিয়া তিনি স্বীয় পাতিত্রত্য রক্ষা করিতে চাছেন নাই। পতির ধর্ম রক্ষা করিতে হইবে তজ্জন্ত তাঁহার বিশেষ আকিঞ্চন। এই আকিঞ্চনের অনুবাহে শাস্তির পাতিত্রত্য অতি উচ্চ গোববে উত্তোলিত হইয়াছে। পতির জীবনের জন্য শাস্তি ব্রহ্মচারিণী নছেন; কাবণ, ব্রহ্মচারিণী না হইয়াও সে জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু পতির ধর্মের

জন্য শাস্তি ব্রহ্মচারিণী। সহধর্ম্মিনীর প্রকৃত অর্থে শাস্তি ব্রহ্মচারিণী। শাস্তিই যথার্থ হিন্দু সতী, শাস্তিই যথার্থ স্মৃদ্ধবী। শাস্তি আদর্শ সতী, শাস্তি আদর্শ স্মৃদ্ধবী।

শাস্তি যে পথ অবলম্বন করিলেন, তাহাতে পতির ধর্ম রক্ষা হইতে পাবে সত্য, কিন্তু তাহাতে ত পতির জীবনের আশঙ্কা আছে। পতির ধর্ম রক্ষা হইতে পাবে বটে, কিন্তু তাহার জীবন ত উৎসর্গিত হইবে। ধর্ম রক্ষা করিতে গিয়া শাস্তি ত পতিকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে দিলেন। কি জন্য তবে শাস্তি আবার পতিকে সন্তানদলে মিশিতে দিলেন? এই স্থলে সতীর ধর্মতাব প্রেমকে পরিচালন করিয়াছে। সতী পতি-অনু-বাগিনী বটে, কিন্তু তাহার ধর্মতাব বুদ্ধি প্রেম অপেক্ষাও প্রবলতর। শাস্তির প্রেম ধর্মকে নিয়মিত কবে নাই, কিন্তু ধর্ম প্রেমকে নিয়োজিত করিয়াছিল। হিন্দু সতীর এই শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। হিন্দু নারীর সতীত্ব এই স্থলে বিজয়ী। হিন্দু সতী এই স্থলে সর্বদেবী সতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই উচ্চ অঙ্গের সতীত্ব আমবা সাবিত্রীতে দেখিতে পাই। সাবিত্রী কি সাহসে সত্যবান্কে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন? সে সাহস সতীর ধর্ম-সাহস। তাঁহার ধর্মতাব এত প্রবল যে সে ধর্মতাব বিশ্বাস করিতে পাবে না যে, তাহার অঙ্গ হইতে পতিকে কেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। সতীর যদি ধর্ম-তেজ না থাকে, তবে তিনি সতী নহেন। এই ধর্ম-তেজে সতী এত তেজস্বিনী যে যমও তাঁহার নিকটে যাইতে শঙ্কিত করেন। সাবিত্রী ও সত্যবানের কল্পনার এই ধর্ম-

তেজের উজ্জল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই ধর্ম্মতেজে শান্তি সম্পন্না ছিলেন । শান্তির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহার পতিব প্রাণ হরণে কেহ সমর্থ হইতে পারিবে না । শান্তি সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ব্রহ্মচারিণী । তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কাবণ ধর্ম্ম, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের বল ধর্ম্ম । প্রেম সেই ধর্ম্মের সহায় মাত্র । শান্তি বড় কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া স্বামীব জীবন বক্ষা করা তাঁহার ব্রত । সেই ব্রত সাধনে যে একান্ত নিষ্ঠা চাই, সেই নিষ্ঠাষ নিরত হইয়া শান্তি আত্ম জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । সমুদায় সংসার ত্যাগ করিয়া এক মনে এক ধানে ব্রত উদ্যাপনার্থ ব্রহ্মচারিণী হইয়া ছিলেন । ভগবৎ প্রসাদরূপ সিদ্ধিলাভে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল । এই অটল বিশ্বাসের নাম ভক্তি । শান্তি সেই ভক্তিব প্রশস্ত মূর্ত্তি । এই ভক্তিতে শান্তি সাহসিনী । এই ভক্তিতে শান্তি সর্ব্বভাগিনী সন্ন্যাসিনী । ভক্তি-রূপিণী শান্তি সাধনার কৌশল-বাণবাণ নিজ ব্রত উদ্ভাপনে উজোগিনী হইয়া অসাধ্য-সাধনে ও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । সতীর অটল ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাকে অপূর্ব পতিব্রত-ধর্ম্মে ব্রতী করিয়াছে । শান্তিকে যিনি বুঝিতে চান, তিনি তাঁহাকে এই স্থানে দেখুন । যিনি শান্তিকে দেখিতে চান, তিনি দেখুন, শান্তি কেমন অটল ধর্ম্ম-বিশ্বাসে সতীর দুঃসাধ্য ব্রতচারিণী, কেমন কৌশলময়ী সাধনা-রূপিণী, কেমন ধর্ম্মবলে বীরের জ্ঞাষ সাহসিনী, কেমন সিদ্ধিলাভে ভক্তিমতী । যিনি সন্ন্যাস ও তপস্তার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে চান, তিনি শান্তির নিষ্ঠা দেখুন, তিনি শান্তির

জীবন-উৎসর্গময়—ব্রতচরণ দেখুন । এক বিষয়ে যিনি ব্রতধারিণী ও নিষ্ঠাবতী, তিনি আব সর্ব্ব বিষয়ে উদাসিনী । এইরূপ দৃঢ়-ব্রত আনন্দমঠে দুইজনে লক্ষিত হয় । এক জন সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, অন্য জন শান্তি দেবী । সত্যানন্দ যথার্থ তপস্বী, শান্তি যথার্থ তপস্বিনী । তাঁহারা তপস্যার প্রতি-মূর্ত্তিরূপে আনন্দমঠে উদয় হইয়াছেন । তপস্তার ফল উভয়েই লাভ করিয়াছেন । অসাধ্য-সাধনে উভয়েই কৃতকার্য হইয়াছেন । দৃঢ় তপস্তাবলে অসাধ্য সাধনে যে কৃতকার্যতা লাভ করা যায় তাহাই ভগবৎ-কৃপা । প্রকৃত সন্ন্যাস ও তপস্তা রূপ উপা-সনা কেমন সিদ্ধিমুখী ও ভগবৎ কৃপা পাত্র, তাহা উভয়েই প্রতীত করিয়াছেন । নিষ্ঠা-কিণী শান্তি সাহসিনী ও কৌশলময়ী, সাধনারূপিণী শান্তিই সিদ্ধিদায়িনী ভক্তি, এবং সিদ্ধিমতী ভক্তিই চিবসুখদায়িনী শান্তি । চিবসুখদায়িনী শান্তির স্নানাসঙ্গীতে সঙ্গ-মুখেব আনন্দ-কানন পবিপূর্ণ । সেই আনন্দ-কাননে দেহরূপ আনন্দমঠে শান্তি আশারূপিণী গৃহলক্ষ্যরূপে বিবাজিত । যে বনে শান্তিসুধার সঙ্গীত বর্ষণ করিতেছেন, সেই বন সন্ন্যাসিগণের আনন্দ-কানন । যে মন্দিরে শান্তি মাধাবিনী সুরবর্ণরূপে সন্ন্যাসপ্রমুখ সমুদায় মনোবৃত্তিকে মোহিত করিতেছেন, সেই মন্দির সত্য ও জীবাত্মার মন্দির । সত্যানন্দ ও জীবানন্দ সেই মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন । সে মন্দিরে ভবভোগী সংসার-লালসারূপ ভবা-নন্দকে জীবনপাত করিয়া প্রাবল্চিত্ত সাধন করিতে হইবে । সে মন্দিরে জীবানন্দের জীবা-

স্বাভাবিক সহধর্মিণী হইয়া শান্তি সত্যানন্দের (সত্য, পরমাত্মা) সেবা করিতেছেন। আনন্দমঠে এষ্ট ধর্মচিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। যিনি ধর্মজগতের নিগূঢ় বহুস্ত বুঝিয়াছেন, তিনি আনন্দমঠের এই চিত্র স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

বেন। তিনি দেখিতে পাঠবেন, ভক্ত জীবন রূপ জীবনানন্দের মনে শান্তিই অপূর্ণ সন্দেহী, শান্তিই চির সুখের নিত্যধাম।

পূর্ণচন্দ্র বসু—

জাতিভেদ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর।)

আর্য্যগণ প্রথম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিতে বিভক্ত ছিলেন। ক্রমে শূদ্র লইয়া তাঁহাদের চারুর্কণ্য হইল, তাহাব পর আবার অন্ত্যজ জাতি পঞ্চম বর্ণ হইল। শূলপাণি সেই অন্ত্যজদিগের আবার দক্ষিণ ভাগ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কি ধর্মভূক্ত সমস্ত জাতিব কথা বলা হইল? অস্ত্র দেশে কি হইয়াছে জানি না, বাঙ্গালায় তাহা নাই। বাঙ্গালায় বহুতর জাতি বহিরাছে, বাহাদেব কথা শূলপাণিও বলিলেন না, অথচ তাহার হিন্দু, ব্রাহ্মণ মানে, হিন্দুর ঠাকুর দেবতা পূজা করে, এবং শূদ্রের স্থায় সমস্ত সংস্কারও গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাব চতুর্কর্ণ ও পঞ্চমবর্ণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে। হিন্দু সমাজ মধ্যে এই সকল জাতিব অবস্থা কিরূপ এবং তাহাদের উচ্চতর জাতিব প্রতি কর্তব্য কি জানিতে হইলে মহাভারতীয় শান্তিপর্কের পঞ্চমটিতম অধ্যায়ে ইন্দ্র ও

মাকাতার সংবাদ পাঠ করা কর্তব্য। মাকাতা বহুসংখ্যক যবন ও অন্ত্যজ জাতির উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে ইন্দ্র। আমি এই সকল জাতি লইয়া কি করিব, এবং ইহাদের করণীয় কার্য্য কি? ইন্দ্র বলিলেন,—

“মাতাপিত্রোহি শুশ্রূষা কর্তব্য। সর্বদমু্যতিঃ।
“আচার্য্যাকুরশুশ্রূষা তথৈবাক্রমবাসিনাঃ।
“ভূমিপানাঞ্চ শুশ্রূষা কর্তব্য। সর্বদমু্যতিঃ।
“বেদধর্ম্মক্রিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্ম্মে বিধীয়তে।
“পিতৃযজ্ঞা স তথাকূপাঃ প্রপাশ্চ শয়নানিচ।
“দানানিচ বথাকালং বিজেভ্যঃ বিন্ধেৎ সদা।
“অহিংসা সত্যমক্রোধো বুদ্ধিদাযাহু পালনং।
“ভবণং পুত্রদাবাণাং শৌচমক্রোধ এব।
“দক্ষিণা সর্বযজ্ঞানাং দাতব্য। ভূতিমিচ্ছতা।
“পাকযজ্ঞা মহাহাশ্চ দাতব্য। সর্বদমু্যতিঃ।
“এতান্তেবং প্রকারাণি বিবিধানি পুণ্যবান্।
“সর্বলোকস্ত কৰ্ম্মাণি কর্তব্যানীহ পার্থিবান্।”

আমাদের দেশে ঠিক তাহাই ঘটনাছে ; আমরা অন্ত্যজ জাতি সমূহকে সংকল্প কবিত্তে উৎসাহ প্রদান কবি, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ দিয়াছি। এই ব্রাহ্মণ তাহাদের দান প্রতিগ্রহ কবে, তাহাদিগকে দশবিধ সংস্কার প্রদান কবে, দেবদেবী উপাসনা প্রবৃত্ত কবে, বামাযণ মহাভাবতের গল্প শুনায এবং সচ্চবিত্র ও সাধুশীল হইতে উপদেশ দেয, তাহাবা শ্রাদ্ধাদি কবে, নানাবিধ বাৎসরিক উৎসবে যোগ দেয এবং সাধাবণতঃ শূদ্রের বিহিত সমস্ত নিষমাবলীই পালন কবে। অন্ত্যজ জাতিব সহিত স্প্রব্রাহ্মণের সম্পর্ক কি? তাহা এক প্রকাব উক্ত হইয়াছে ; উহাদের সহিত চাতুর্কণ্য সমাজের সম্পর্ক কি রূপ একবার দেখা কর্তব্য। আমাদের এখন-কাব সমাজ চারিটা বিষয় লইযা একটু একটু গোল কবে। ধোপা, নাপিত, গুরু, পুৰোহিত।

ধোপা নিজে অন্ত্যজ জাতি, তাহার উপর সমস্ত অন্ত্যজ জাতির কাপড় কাচিবাব ভার আছে। কাহারও কাপড় সে কাচিব না বলিতে পাবে না। তবে ছই একটা নিতান্ত হীন-বৃত্তি জাতির কাপড় তাহাবা কাচে না। যথা মুদ্গকরাস, মেহতর ও হাড়ী।

নাপিত নিজে সম্ভ্রজাতি ; কৌরকর্ম তাহাব জিন্মা ; কিন্তু চণ্ডালদি বলিয়া যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট অন্ত্যজ আছে, নাপিতেরা তাহাদিগকে কামায় না। কামাইলে উহাদের জাতি যায়। পাটনীকে গ্রাম্য নাপিতে কামায় না। কিন্তু জাতি নাপিতেই উহাদের কামায়। যে নাপিত পাটনী কামায়, সে আপন সমাজে মুখ পায় না।

চণ্ডালের নাপিত স্বতন্ত্র, সে জাতিতে চণ্ডাল। পোদেব নাপিত গ্রাম্য নাপিত হইতে স্বতন্ত্র এবং জাতিতে নাপিত নহে। হাড়ীর নাপিত নাই, তাহাবা আপনারা ক্ষুব বাথে। এই জন্ত জাতিচ্যাত হইলে, তাহাকে বলে হাড়ীর ক্ষুবে তোমাব মাথা মুড়াইযা দিব। ডোমেবা কামায় না। কাওয়ারা গ্রাম্য নাপিতেব নিকট কামাইতে পায় না। মুচি-বাও প্রায় কামায় না। যদি কামায়, নিজে নিজে।

পুৰোহিত জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু অন্ত্যজ জাতির ক্রিয়া কবাইলে সে ব্রাহ্মণ পতিত হয় ও সমাজে চলন থাকে না। সামাজিক ব্রাহ্মণগণের মতে অন্ত্যজ বর্ণের অপেক্ষাও অন্ত্যজ বর্ণের ব্রাহ্মণ অস্পর্শীয় ও নিকৃষ্ট। অন্ত্যজ জাতির পুৰোহিতদিগকে বর্ণব্রাহ্মণ বলে। স্প্রব্রাহ্মণ যেমন বর্ণব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেন, এক বর্ণের ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের ব্রাহ্মণকে ঠিক সেইরূপ অবজ্ঞা করিয়া থাকে। অন্ত্যজ জাতিগণও এক জাতির ব্রাহ্মণদ্বাবা অন্য জাতির কর্ম কবায় না। অন্ত্যজ জাতির মধ্যে সকল জাতিরই ব্রাহ্মণ আছে, নাই কেবল ডোম ও মেহতরের। ডোমেব পুৰোহিতের নাম পণ্ডিত এবং পণ্ডিত জাতিতে ডোম। মেহতরবাব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিছুই মানে না, তাহার পক্ষ দ্বাবা সকল কাজ করাইযা লয। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অনেক অন্ত্যজ জাতিব আর এক জাতীয় পুৰোহিত আছে ; ইহাবা তত্ত্ব জাতীয় পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যথা বাগ্-দীর পণ্ডিত, পোদের পণ্ডিত। এইরূপে দেখা যায়, কতকগুলি অন্ত্যজ জাতি ব্রাহ্মণও

গ্রহণ কবে এবং পণ্ডিতও রাখে। কিন্তু আজি কালি চারিদিক হইতেই শুনিতে পাওয়া যায় যে এই সকল জাতি-পণ্ডিত ক্রমেই মরিয়া আসিতেছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের কুলশত্রু নির্মূল হইতেছে। প্রায় সর্বত্রই পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃণা কবে, তাহারা উহাদিগকে আপনাদের অন্নের হস্তা বলিয়া মনে কবে; বলে যে ব্রাহ্মণ হইতেই তাহাদের পদমর্যাদা মান সম্মান লুপ্ত হইয়াছে। *

এস্থলে আমার একটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। পাকাপাকি কথিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু সন্দেহ বড়ই প্রবল হইয়াছে, না বলিবার থাকিতে পারিতেছি না। আপনাবা জানেন বাঙ্গালার অনেক অধিবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছে। যাহাবা সম্পূর্ণ মুসলমান হইয়াছে, তাহাদের ত কথাই নাই। কিন্তু অনেকগুলি জাতি আছে, তাহারা অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান। এই অর্ধ হিন্দু ও অর্ধ মুসলমান অনেকগুলি প্রাচীন লোকজ

* এই স্থলে “যোগী” নামক একটি জাতির নাম উল্লেখ করা আবশ্যিক। যোগীরা গৃহস্থ, বর্ণাশ্রম ধর্মের বাহিরে অবস্থিত। ইহঁরা গোড়ার সম্মানী ছিলেন পরে গৃহী হইয়াছেন। ইহঁদের অনেক আচার ব্যবহার সম্মানীদের জ্ঞাব। সম্মানীদের জ্ঞাব সরিলে ইহঁদের সমাধি হয়। কিন্তু সমাধির পূর্বে ইহঁদের মৃগাশি হইয়া থাকে। এই গৃহস্থ সম্মানীদের দশকর্মাদি স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞ লোকদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ লোকের নাম ভট্টাচার্য। ইহঁদের শিবোমনি প্রভৃতি উপাধি আছে। গ্রাম্য নারিতে ইহঁদের ক্ষৌরকর্ম করে। ইহঁদের মধ্যে অনেক শ্রেণীবিশিষ্ট আছে। তাহার মধ্যে অনেক রাতীর যোগীর ব্রাহ্মণ গুরুও আছে।

তাহাদের জাতির কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে আমরা আঠার জাতি। আঠার জাতির নাম কেহই কবিত্তে পারিল না। কিন্তু পোটা পাঁজাবি নিকাবী ও গৃহী-বেদে যে এই শ্রেণীভুক্ত তাহা সকলেই স্বীকার করিল। ইহঁরা লক্ষী পূজা যষ্টী পূজাও করে এবং তাঁজিয়া লইয়াও বেড়ায়। কলিকাতার একজন পোটারকে জিজ্ঞাসা কবায় সেও বলিল হাঁ আমরা হিন্দু মুসলমান দুই বটি। আবও জিজ্ঞাসা কবায় বলিল আমরা দুই বটি কিন্তু মবিলে গোব দিই।

আমার সন্দেহ হয় যে যাহারা ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত দুই মানে তাহারা পূর্বে হয় বৌদ্ধ না হয় পণ্ডিত ধর্মাক্রান্ত ছিল, ক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ব্রাহ্মণ গ্রহণ কবিয়াছে কিন্তু পূর্ণ পণ্ডিত ছাড়িতে পারে নাই। কিন্তু পণ্ডিতগণের পসাব কমিয়া যাওয়াতে তাহারা ক্রমে নির্মূল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই সকল জাতি-পণ্ডিত, ধর্ম-পণ্ডিত হইতে বিভিন্ন, ধর্ম-পণ্ডিতের প্রভাব এখনও কমে নাই। শালিখার তিন জন ধর্ম-পণ্ডিত আছেন। তাঁহারা সকলেই বোত্রাপন্ন লোক, তাহাদের মধ্যে এক জন পোদ।

গুরুবা প্রায়ই ব্রাহ্মণ; কিন্তু ব্রাহ্মণ গুরুবা অন্ত্যজ জাতিকে মন্ত্র দেন না, দিলে সমাজে তাঁহাদের ঠেলিয়া রাখে। কেবল চৈতন্যধর্মাবলম্বী গোস্বামিগণ সকল জাতিকে মন্ত্র দিয়া থাকেন। এতদ্বিত্ত বৈষ্ণব ও কায়স্থ জাতীয় অনেক গুরু আছেন, তাঁহারা চৈতন্য দেবের নিজ শিষ্যের বংশধর, তাঁহারাও সকল জাতিকে মন্ত্র দিয়া থাকেন।

চৈতন্যধর্মাবলম্বী গুরুবা অন্ত্যজ জাতিকে মন্ত্র দিলে তাহাদের জাতি যায় না। এই কারণে অন্ত্যজ জাতির লোক অধিকাংশই চৈতন্যমন্ত্রে দীক্ষিত। চৈতন্যধর্মাক্রান্ত ভিন্ন অন্ত সামাজিক ব্রাহ্মণ কখনই অন্ত্যজ জাতিকে মন্ত্র দেন না। কিন্তু অনেক স্থানে বর্ণব্রাহ্মণই সেই বর্ণের গুরুও হইয়াছেন। কেবল এই সকল স্থানেই অন্ত্যজ জাতির মধ্যে চৈতন্য ভিন্ন অন্ত মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

অন্ত্যজ জাতির সহিত চাতুর্ভর্ণ্যের ত এই সম্পর্ক গেল, ইহা ছাড়া আর এক সম্পর্ক আছে, জল লইয়া আর খাওয়া লইয়া।

শূদ্র ত ব্রাহ্মণের দাস স্মৃতবাঃ শূদ্রের জল ব্রাহ্মণে খাইতেও পারেন। শূদ্রের অন্নও অনেক স্থলে খাইতে পারিতেন। তবে কলিতে আদিত্য পুবাণের নিষেধ আছে বলিয়া সে কাজ হইতে পাবে না; তবুও আপৎকালে যদি শূদ্রাঙ্গ খাওয়া যায়, তবে মনস্তাপের দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। কিন্তু অন্ত্যজ জাতির মধ্যে যদি কেহ চাতুর্ভর্ণ্যের দাসত্ব করিতে আসে, তবে তাহার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ হইবে? কৈবর্ত ও গোয়ালার জল, খাওয়া ভিন্ন সকল কর্যেই ব্যবহৃত হইবে। বাগ্দী হুলের জলও তাই, ইহাদের আনীত গঙ্গাজল পানযোগ্য হইবে। কিন্তু অন্ত্যজ জাতির জল কোন ব্যবহারে আসিবে না। তাহারা গঙ্গাজল আনিলে পাত্রাস্তব না করিলে ব্যবহার্য্য হইবে না। আর স্বর্ণকার, হুজুব প্রভৃতি যে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণাণ্যে নিকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সহিত চাতুর্ভর্ণ্যের কোন রূপ সম্বন্ধই থাকিবে না। অন্ত্যজ জাতির

মধ্যে গোয়ালার হুজু ও দধি এবং তীওবেব চিড়া চাতুর্ভর্ণ্যের ব্যবহার করিতে হয় স্মৃতবাঃ চাতুর্ভর্ণ্যের চক্ষে ইহা বা একটু উচ্চ জাতি।

আহার বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহিত অন্ত্যজ জাতির সম্পর্ক পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অন্ত্যজ জাতির অন্ন আহাৰ করিলে ব্রাহ্মণের যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহার বাব আনা, বৈশ্যের পক্ষে আট আনা ও শূদ্রের পক্ষে চাবি আনা মাত্র। নিষেধ ব্রাহ্মণের পক্ষেও যেকপ, ক্ষত্রিয় দিগের পক্ষেও সেইরূপ। তবে নিষেধ না মানিলে ব্রাহ্মণের যেকপ সাজা, ক্ষত্রিয়দিগের তাহা অপেক্ষা কম এই মাত্র। কিন্তু নিকৃষ্ট জাতি মধ্যে যদিও সকলেই ব্রাহ্মণের ভাত খাইবে কিন্তু বৈজ, কায়স্থের ভাত খাইতে অনেকেরই বাঙ্গী নহে। কৈবর্ত গোয়ালার খাবেই না। বাগ্দী বাও খাইতে গোল করে। চণ্ডালেরা খায় খাযনা। তীওরেরা খাযনা। কেবল বাঙ্গী কাওবাব বলে যে তাহারা চাতুর্ভর্ণ্যের অন্ন এমন কি কৈবর্ত ও গোয়ালার অন্নও গ্রহণ করে, তাহার আপনাদের অপেক্ষা নীচ জাতির লুচি খায়।

আমরা মনে করি এই অন্ত্যজ জাতির সব এক একটা স্তত্র জাতি অর্থাৎ যেমন কায়স্থ বলিতে একটা জাতি বুঝায়, কৈবর্ত বাগ্দী বলিতেও সেইরূপ এক একটা জাতি বুঝায় এবং সেইরূপ বোধ আছে বলিয়াই আমরা উহাদিগকে সঙ্কর বর্ণ বলিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হই। সম্প্রতি বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত জাতিই চাতুর্ভর্ণ্যের সঙ্কর, তন্তু সঙ্করও

সকল সঙ্কর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে জাতি প্রায় ফাঁক নাই। তাঁহারও সংস্কার ঐরূপ তিনি বাগ্‌দী, কৈবর্ত, চণ্ডাল সব একটা একটা জাতি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আমর সংস্কার সেকপ নহে।

আমরা শুদ্ধ কৈবর্ত জাতি জানি, কিন্তু কৈবর্ত তিন চাবিটী স্বতন্ত্র জাতির সমষ্টি। চাসী (ইহা বা উত্তর বাটী ও দক্ষিণবাটী এই দুই ভাগে বিভক্ত) জেলে কৈবর্ত ও মালা কৈবর্ত। চাসী বা জেলের সঙ্গে একত্রে বসে না, খায় না, এক পুৰোহিতে পূজা করিতে দেখ না। বিবাহের ত কথাই নাই।

বাগ্‌দী বলিতে আমরা একটা জাতি বুঝি কিন্তু বাগ্‌দী তেঁতুলে আছে, কুশমেটে আছে, ত্রয়োদশা আছে, জেলে আছে, আব মেটে আছে। ইহাদের মধ্যে ত্রয়োদশা তেব দিন অশোচ গ্রহণ করে; জেলেরা অত্যন্ত হেয় আব মেটেরা ব্রাহ্মণ মানে না, ঠাকুর দেবতা মন্দির না। আপনাবাই বিবাহ আদি করিয়া থাকে, বিবাহের সময় চালের উপর বা বুদ্ধিব তলায় একটা কুকুর বাঁধিয়া বাথে ও তাহাকে খাবার দেয়। আমাদের যেমন অগ্নি, বিবাহের সাক্ষী, মেটেদেব তেমন কুকুর, বিবাহের সাক্ষী। আপনাব কি মনে করেন এই পাঁচ প্রকার বাগ্‌দী এক জাতি, এক সঙ্কর-বর্ণ?

চণ্ডালদের মধ্যেও এইরূপ ছয় সাত প্রকারের চণ্ডাল আছে। তাহাদের মধ্যে সর ও সিউলি চণ্ডালেবা হুনে ও জেলে চণ্ডাল-দিগকে নাপিত পুরোহিত ও দেখ না। এই হুনে আব সিউলিট এক জাতি।

সঙ্কর বর্ণ ছিল, হইয়াছে ও হইবে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না ও পাবিবেন না। আমরাই আমাদের চক্ষের উপর সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি দেখিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বলিব যে সঙ্কর বর্ণ আদি বর্ণ অপেক্ষা বাড়িয়া উঠিতে পারে। বঙ্গদেশে চাতুর্কর্ণ্য লোক যত আছে, এক কৈবর্তের সংখ্যা তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক, কেমন করিয়া বলিব যে কৈবর্ত এই চতুর্কর্ণ্যের মধ্যে দুইটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-সঙ্করবর্ণের সঙ্কবে উৎপন্ন হইয়াছে। পুড়োঁরা সঙ্করবর্ণ নহে, তাহাত মল্ল নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমাব বোধ হয় কৈবর্ত, বাগ্‌দী, ধীবর, পোদ প্রভৃতি জাতিও পুড়োঁর স্থায় আধাদিগের প্রান্তবাসী জাতি ছিল। দেখুন না বঙ্গের উত্তর ভাগে সব রাজবংশী ভীবর, বাঢ় দেশময় কেবল বাগ্‌দী, দক্ষিণ দেশে কেবল পোদ ও কৈবর্ত। পুড়োঁদের স্থায় ইহাদের ও রাজ্য ছিল; উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণী ছিল, পুরোহিত ছিল, সব ছিল; বিষ্ণুপুবে বাগ্‌দী রাজ্য সকলেই জানে। মুসলমান বাঙ্গালা দখল করিলে আসাম কুচবিহার ও বঙ্গপুর অঞ্চলে অনেক ভীবর রাজাবা রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গপুবেব পালবংশ, কমতা পুবেব রাজাবা এবং বর্তমান কুচবিহারবংশ সকলেই রাজবংশী ভীবর বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল স্বতন্ত্র জাতির উপর প্রথম বৌদ্ধধর্ম আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কোন দেশ হইতে উঠিয়া গেলে তাহার ভগ্নাবশেষ পাওয়া দুর্বল। যতদিন লোকের ভিক্ষুগণের উপর শ্রদ্ধা থাকে, তাহা-দিগকে খাইতে দেয়, বাসস্থান নির্ধারণ করিয়া

দেখ। ক্রমে ভিক্ষুবা মবিষা বা ছাড়িয়া গেলে সব চুকিয়া গেল, সে দেশে যে বৌদ্ধ ছিল তাহাও জানিবার উপায় থাকে না। পাল বংশের ধ্বংসের পর্ববৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে বাঙ্গালায় বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ হইয়া সিংহলে যান। ১১৬১ সাল তিনি সিংহলে জীবিত ছিলেন। সিংহলেব রাজা তাঁহাকে বৌদ্ধাগম চক্রবর্তী উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত বৌদ্ধশতক নামক গ্রন্থে লেখা আছে, বাজাই আমার দণ্ড দিউন, সমাজই আমার তাড়াইয়া দিউক, পণ্ডিতগণই আমার নিন্দা করুন আর বান্ধবগণই আমার ত্যাগ করুন, আমি যে বুদ্ধের শরণ লইয়াছি, তিনি আমার শরণ। এই সময়ে অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তিব্বতের আধুনিক বৌদ্ধধর্ম, বাঙ্গালী ভিক্ষু দীপদ্রব কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। আমার বোধ হয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন বংশীয় রাজগণ পালবংশ ধ্বংসের পর্ব বৌদ্ধদিগকে নিগ্রহ করিতেন। তথাপি বাঙ্গালী ও মগধে ১৪৪৭ সাল পর্য্যন্ত দুই এক খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্ম আস্তে আস্তে লোপ হইয়াছে। কিন্তু যখন যেখান হইতে লোপ হইয়াছে, সেখানে তাহার আর কোনচিহ্ন পর্য্যন্তও থাকে নাই; ব্রাহ্মণ ধর্ম সেইসেই স্থানে বর্গব্রাহ্মণ পাঠাইয়া তত্রত্য অন্ত্যজদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ফকীর লইয়া বৌদ্ধ ধর্ম, ফকীর মরিয়া গেলেই চুকিল। বর্গ ব্রাহ্মণের সেরূপ নহে, এত ফকীরের ধর্ম নহে;

একজন মবিল, তাহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সেই কার্য চলিবে। ব্রাহ্মণ গ্রহণ করার পর জাতির ভিতরকার বন্দোবস্ত যেমন ছিল, তেমনি রহিল, হবার মধ্যে ব্রাহ্মণ নুতন হইল। তাহাদের একটি স্বতন্ত্র জাতি ছিল। সেইটী একটি দীর্ঘ জাতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। এই সকল অন্ত্যজ জাতির মধ্যে অনেক জাতির একটি পূর্বা গবর্ণমেণ্ট আজিও আছে। এক জায়গায় ১০০ ঘর কাওবা বাস করে। তাহাদের এক জনকে ডাকিয়া তাহাদের জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উহাদের ব্রাহ্মণ আছে, সে বলিল আমাদের পবামাণিক আমাদের রাজা। পবামাণিক পদটি ইলেক্টিব্ কিন্তু যত দিন পবামাণিকের বংশ থাকে ততদিন ইলেক্টিব্ হয় না। পরামাণিককে সাহায্য করার জন্য চারি পাঁচ জন মেটপবামাণিক থাকে। সভা হইলে যে সম্মানসূচক পান ও স্নপাণি পরিবেশন করে, তাহার নাম বারিক। হাড়ী শাফার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি স্বতন্ত্র পদ আছে। দেখুন এ সকল বন্দোবস্ত কিছুই বদলায় নাই।

অন্ত্যজ জাতিগণকে ব্রাহ্মণ লইয়াছে কেহ বলিতে পারে না। লোকে বলে উহাদের ব্রাহ্মণ ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ। অনেক খুজিয়াছি, আজিও ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ খুজিয়া পাই নাই। প্রায়ই রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণই উহাদের যাজকতা করিয়া পতিত হইয়াছে দেখিতে পাই। যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি সেই বলিয়াছে ৫৭ পুরুষের মধ্যে তাহারা পতিত হইয়াছে। কেবল কৈবর্ত ব্রাহ্মণ বোধ হয় পুরাণ ব্রাহ্মণ। কাবণ, লোকে

বলে বল্লাল সেন যখন কোন কার্যবশতঃ কৈবর্তগণের উপর বড় খুসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার। তাঁহার নিকট পুরোহিত ব্রাহ্মণ পাইবার জন্ত বর প্রার্থনা করে; তিনি কোন ব্রাহ্মণকে রাজী করিতে না পারিয়া শেষ এক জন হাড়ীব গলায় পৈতা দিয়া বলিলেন এই তোমাদের ব্রাহ্মণ, তাহারাও তাহাতেই খুসী হইয়া গেল। বল্লাল সেন যখন কৈবর্তের জন্ত ব্রাহ্মণ খুজিয়া পান তখন যে তিনি সমস্ত অস্ত্রজ জাতিকে ব্রাহ্মণ দিয়া গিয়াছেন একথা বিশ্বাস হয় না। উহাদের ব্রাহ্মণ গ্রহণ সম্বন্ধে এখন অনেক অল্পসঙ্কানের প্রয়োজন। বঙ্গের সমস্তভাগ কি উহাদের ব্রাহ্মণ ছিলেন? বিশ্বাস হয় না—একটা প্রকাণ্ড দেশে যদি সবে ৭০০ ঘরমাত্র ব্রাহ্মণ থাকে, তাহাদের কি হীন যাজ্য বৃত্তি কবিবার প্রয়োজন হয়? বিশ্বাস হয় না।

ব্রাহ্মণ গ্রহণের পূর্বে এই সকল অস্ত্রজ জাতির বাজক ছিল; ইহারা প্রায়ই ক জায়গায় বাস করিত, অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি মিলিয়া এক একটা জাতি হইত; প্রত্যেক ক্ষুদ্র জাতির ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ছিল। তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বৃত্তি ছিল। সকল জাতিতেই দেখিতে পাওয়া যায় মৎস্যজীবী নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই মৎস্যজীবীদের মধ্যে আর একটা কথা আছে। বাগ্দী তিওর প্রভৃতির মধ্যে ত জেলে আছেই, তাহাছাড়া আবার জেলে ও মালা নামক দুইটা মৎস্যজীবী বস্ত্রজ জাতি আছে। জেলে ও মালার পার্থক্য অতি চমৎকার। যে জাতিতে

জেলে আছে, সেই জাতিতেই জেলে ও মালা এই দুই প্রকারের জেলে আছে। মালারা ডাঙ্গায় উঠিয়া মাছ বেচিতে পায় না, তাহা হইলে তাহাদের জাতি যায়। জেলেরা জেলে মাছ বেচিলে তাহাদের জাতি যায়।

অস্ত্রজ জাতির কিরূপ সভ্যতা ছিল তাহা দেখিতে হইল তীরবের দেশে কৃষিও মৎস্য ব্যবসায় প্রধান ছিল আর কিছু বিশেষ ছিল না। বাগ্দীরা তেঁতুলের চাষ করিতে শিখিয়াছিল। চণ্ডালের দেশে সিউলিরা উত্তা-নাদিকরিতে জানিত। কৃষি মৎস্য বিক্রয়; গাছ পালা প্রভৃতি করা, পশু পালন, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কার্য তাহারা পারিত না। বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোক যদি উহাদের মধ্যে থাকিত তাহা হইলে বাণিজ্যজীবী কোন না কোন অবাস্তর জাতির নাম শুনিতে পাইতাম, কিন্তু তাহা পাই না। বোধ হয় এদেশের বাণিজ্য চিরকালই বৈশ্য ও শূদ্র জাতীর বণিকগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহাদেরই মধ্যে বৌদ্ধদিগের বড় প্রাভুর্ভাব ছিল। বৌদ্ধ অবদান জাতক, যাহাই পড় কেবল দেখিবে শ্রেষ্ঠী ও বাণকের কথা। কুমারিল ভট্ট একস্থানে বলিয়াছেন, বুদ্ধ, বুদ্ধ, বুদ্ধ কি কবিয়াছেন? তিনি ত ক্ষত্রিয় হইয়া প্রতীগ্রহ কবিত্তে আরম্ভ করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ বৃত্তি অবলম্বন করায় তিনি ত পতিত, তাঁহাব আবার শিষ্য কতকগুলো শূদ্রকে লইয়া তাহার আবার একটা দল হইয়াছে।

এই সকল জাতির মধ্যে একটা বড় কোঁক্কর ব্যাপার আছে। ইহাদের কাহারও জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহারা কখন

চলিত নামটী প্রকাশ কবিবে না। একটা না একটা প্রকাণ্ড সংকুত কথা কহিয়া বসিয়া থাকিবে। চণ্ডালকে জিজ্ঞাসা কর সে বলিবে “নমঃ শূদ্র” বোধহয় নমঃ শূদ্র শব্দের অর্থ শূদ্রকে নমস্কার করে যে। পদটী সংকুত ব্যাকরণ অঙ্কশাস্ত্রে সিদ্ধ হয় না কিন্তু প্রাকৃতও পালিতে এরূপ সমাসেব অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুচিকে জিজ্ঞাসা কর আপনারা?—আজ্ঞে আমরা কইদাস, অর্থ কি জানি না—বোধ হয় রোহিতাশ্ব হইবে। পুড়োঁকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার উত্তর সর্কা-পেকা কোঁতুক কর—আজ্ঞে আমরা ‘পুণ্ডরীকাক’—অর্থ কি পুণ্ডরীকাকভগবানই জানেন। পোদকে জিজ্ঞাসা কর সে বলিবে মহাশয় আমরা পদ্মরাজ। কাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা কর সে বলিবে মহাশয় আমরা কায়পুত্র। ব্রহ্মার কায় হইতে আমাদের উৎপত্তি।

প্রবন্ধ ক্রমে অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে আর শ্রোতৃবর্গের সময় নষ্ট কবিত্তে চাই না। উচ্চতর শ্রেণীগণের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। নানা কারণে বলাও আমার পক্ষে বিশেষ উচিত নহে। তাঁহারা আপনাদিগের প্রাচীন ইতিহাস বাহির করিতেছেন ও করিবেন। তবে আমাবর্ত্তাহাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাস্ত আছে। তাঁহারা আপনাদিগকে হয় উচ্চবর্ণধরের সঙ্করে উৎপন্ন বলিয়া অথবা খাঁটি বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এরূপ হওয়ার কিছু মাত্র অসম্ভব নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা এক্ষণে যজ্ঞোপবীত গ্রহণে উৎসুক হইয়াছেন। অনেকে গ্রহণও করিয়াছেন। কিন্তু গ্রহণ করিবার পূর্বে ত্যাগ করা হইয়া-

ছিল কেন? সেটাব একবার সন্ধান করিলে ভাল হয় না? বাঙ্গালার একটা খাঁটি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সঙ্কর আছে, তাহাবাত বিবাহের পূর্বেই আজিও পৈতা লব। বিনা পৈতার বিবাহ করে না। পৈতা লয় বলিয়া তাহা-দের নাম হইয়াছে জানা; জানা শব্দ হিন্দী জনো হইতে উৎপন্ন। তাহারা আঙুরি জাতির একটা অবাস্তব বিভাগ। ইহাবা আজিও পৈতা লব তবে ইহাদেব অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর লোক পৈতা ত্যাগ করিয়াছে কেন?

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে তথাপি শেষকালে এতদ্ভা কথ্য বলিতে হইতেছে যদি কেহ আমায় জিজ্ঞাসা করেন; জাতিভেদ ভাল কি মন্দ? তাহা হইলে আমি বলির উহাতে ভাল ও হইয়াছে মন্দও হইয়াছে। উহা ভাল মন্দ দুইই। অন্তর্দেশের অন্তরূপ প্রণালীতে যেমন ভাল মন্দ দুই আছে ইহাতেও সেইরূপ আছে। এখন কথা এই এরূপ জাতিভেদ মানিয়া চলা উচিত কি না?

তাঁহাতে আমার উত্তর এই যে যদি স্মৃতি মানিতে হয় তবে জাতিভেদও মানিতে হইবে। যদি স্মৃতি অঙ্কশাস্ত্রে পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ হয়, যদি স্মৃতি অঙ্কশাস্ত্রে দত্তকপুত্র গ্রহণ করা হয়, যদি স্মৃতি অঙ্কশাস্ত্রে বিবাহ করিতে হয়, তবে স্মৃতির মত জাতিভেদ মানিতে হইবে। রাজ ব্যবহার দ্বারা যত টুকু স্মৃতি বিলুপ্ত করা হয় নাই ততটুকু স্মৃতি আজিও আমাদের আইন। আইন মান্ত করিয়া চলা সকল শ্রমলোকের কর্তব্য। না করিলে তাহার অলোকস্ব হানি হইবে। সুভরাং পুনাম রক্ষণ করিতে হইলে, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে জাতিভেদ

মানিয়া চলিতে হইবে। মানিয়া চলিলেই আমাদের যথার্থ দেশ-হিতৈষিতাও জাতি হিতৈষিতা প্রকাশ পাইবে। আমাদের উচিত, যতদিন আব একজন বঘুনন্দন না উঠিতেছেন, অথবা কলিব প্রথমে যেমন হইয়াছিল কতকগুলি মহাত্মা মিলিত হইয়া আমাদের স্মৃতি না বদলাইয়া দিতেছেন ততদিন অন্ততঃ আমাদের গকে উহা মানিয়া চলিতে হইবে। যদি পরিবর্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, বঘুনন্দন আপনিই হইবে অথবা আপনিই পাঁচজনে মিলিত হইয়া পরিবর্তন করিয়া দিবে। যতক্ষণ সেই পরিবর্তন হয় ততক্ষণ আমি একা বা তুমি একা 'মানিব না' বলিয়া বসিয়া থাকিলে সত্যই আইনের অবমাননা করা হইবে। যদি বল আইন না মানিলে সাজাদিবাং ত লোক নাই, তবে আমবা মানিব কেন। না মানিলে এক আমাব কি করিবে? সাজাদিবাং লোকন কে বলিল? সমাজ আছে। কিন্তু সমাজ ত সাজা দেয় না। সমাজ চুপ্ করিয়া আত্ম। অনেক স্থানে সমাজ একেবারে চুপ্ করিয়া আছে সত্য, অনেক স্থানে আবাব নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজ সহ্যও করেনা। সমাজের অবস্থা এ বিষয়ে যে খুব ভাল তাহা আমি বলিনা। কিন্তু তথাপি আইন মানিয়া চলা ভাল, কাংগ সমাজ চুপ্ করিয়া থাকিলেও ছুই লোকে ত তোমায় জব্দ কবিত্তে পারে। আবাব কতস্থলে একজন দোষ করিলে সমাজ তাহার বেলা চুপ্ করিয়া গেল; আব একজন ঠিক সেই দোষ কবিলে সমাজ চুপ করিয়া বহিল, কিন্তু পূর্বকাল

অপরাধী শেষ অপরাধীকে জব্দ করিবার জন্ত সমাজকে উত্তেজিত কবিত্তে লাগিল। ছুই একস্থলে একপ জব্দ করিত্ত কৃতকার্য ও হইয়াছে। কাংস্ব ও ব্রাহ্মণ দুজনে উইলসেনেব হোটেলে খাইতে গিয়াছে। ব্রাহ্মণ হঠাৎ বগড়া কবিয়া চীৎকাং করিয়া বলিল, উইলসন সাংসেব আমাব জাতি মাংবিল, কাংস্বেব সঙ্গে আমায় একটেবিলে খাইতে দিয়াছে। একপ গল্পও ত শুনা গিয়াছে। অতংব আমি বলি, আইন মানিয়া চলাই ভাল, তাহাতে কোন গোল নাই। আব যদি পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া থাকে, আইস সকলে মিলিয়া আইনেব যাংহাতে পরিবর্তন হয় তাংহা কবি। কিন্তু যতক্ষণ আইন বলবৎ আছে, ততক্ষণ উহাকে অতি অবশ্য মানিয়া চলা উচিত। ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কাংহাব কথা কাংহাব যো নাই। তুমি যদি সম্বাস্ত্রিক না কব, সে জন্ত আমিও তোমায় কিছু বলিতে পাংবিং না, সমাজও তোমায় কিছু বলিতে পাংবিং না। তুমি যদি তোমাব জাতিং উপযুক্ত উপাসনাংদি না কব সে প্রত্যবাংয়ের ভাগী তুমি হইবে, আমি হইবনা। কিন্তু তুমি যদি আইন-বিকল্প কাজ কর আমি রাম হবি এবং সমাজ সকলেই তোমাব বিরোধী হইব। আমাদের আইন তিন প্রকাংব,—আচাংব ব্যবহাংব ও প্রাংশ্চিত্ত। ইহার মধ্যে যে অংশ শুদ্ধ পংবকালের সহিত সম্পর্ক, সে অংশ আপন বিচ্ছা বুদ্ধি পুণ্যও প্রাক্তনের উপব নিক্ষেপ করিয়া যে অংশ লইয়া পৃথিবীংব লোকের সহিত সম্পর্ক সে অংশ মানিয়া চলা একান্ত আবশ্যক।

ভাবপ্রকাশ নামক বৈয়াকরণ গ্রন্থ ।

ডাক্তার উদয় চাঁদ দত্ত বলেন যে ভাব প্রকাশ হিন্দুদিগেব শেষ প্রধান বৈয়াকরণ গ্রন্থ । ইহা ভাব মিশ্র নামক গ্রন্থকার চবক প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন কবিয়াছেন । সঙ্কলন ভিন্ন ইহাতে কতকগুলি নূতন ঔষধ ও নূতন বোগেবও বিষয় আলোচিত হইয়াছে । উপদংশ বোগ এদেশে পোটুগীজ-দেব আগমনে প্রচলিত হয় । ঐ বোগ এই গ্রন্থে ফিবঙ্গী বোগ নামে বর্ণিত হইয়াছে । যখন এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তখন অহিফেন এদেশীয় ঔষধেব মধ্যে চলিত হইয়াছিল এবং সর্ক প্রকার বোগেই ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । স্বর্ণ, বৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, হবিভাল, সৈকো প্রভৃতি বিষুন্ধাকারে ঔষধ-রূপে ব্যবহৃত হইতেছিল এবং চবক প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব ব্যবহৃতাবদিগেব নির্দিষ্ট উদ্ভিজ্জ ঔষধ সকলকে প্রচুর পরিমাণে লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ-প্রবেশ হইয়াছিল । ফলতঃ ঐ সময়ে হিন্দুদিগের নিদান ও চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতিব চরম সীমাষ আরোহণ কবিয়াছিল । ডাক্তার ওয়াইজ বলেন যে, ভাব-প্রকাশ তিন শত বৎসর হইল বচিত হইয়াছে । ফলতঃ ইহা অধিকতর প্রাচীন হওয়া সম্ভব নহে ; কাবণ, চৌবচিনি নামক দ্রব্য এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে । ফ্লাকিজব ও হান্‌বাব সাহেবের মতে চীনদেশীয় বনিকেরা গোয়া অঞ্চলের

পোটুগীজ দিগকে ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্রব্য উপদংশেব ঔষধ বলিয়া পরিচয় দেয়, অতএব, ভাব-প্রকাশ অবশ্যই ঐ সময়ের পব প্রকাশিত হইয়াছে ।

ভাব-প্রকাশেব চিকিৎসা-প্রণালী ও ভৈষজ্য-নির্ণয়-প্রণালী নূতন নহে । উহা পূর্বতন মহর্ষিদিগেব বিনির্দিষ্ট, মূল সূত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে । তাহা এই, — স্বাদ্ব্য লবণ বায়ু কষাঘ স্বাদুতিক্তকাঃ ।

জয়ন্তি পিত্তং শ্লেষ্মাণং কষাঘ কটুতিক্তকাঃ ॥

অর্থাৎ যাহা কিছু মধুব, যাহা কিছু শুষ্ক, যাহা কিছু লবণ, তাহা বায়ু নাশ কবে । যাহা কিছু কষাঘ, যাহা কিছু মধুব, যাহা কিছু তিক্ত, তাহা পিত্ত নাশ কবে । আর যাহা কিছু কষাঘ, যাহা কিছু শুষ্ক, যাহা কিছু তিক্ত, তাহা শ্লেষ্মা নাশ কবে । ইহাতে অবশ্য একথাও বলা হইল যে, কোন ব্যক্তির বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইলে, তাহাকে মধুব ঔষধ দ্বারা শান্তি কবা যাইতে পাবে, এবং যদি তাহা পিত্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হয় তবে তাহাকে এরূপ ঔষধ দিতে হইবে যাহা তিক্ত কষাঘ অথবা উভয় স্বাদ-মিশ্রিত । এই সূত্রেব অনুগমন কবিয়া আমবা বোধ হয় অক্লেশে বলিতে পারি যে, কুইনাইন পিত্তশ্লেষ্মা জ্বের মর্হৌষধ ; কিন্তু কুইনাইন বাতজ্বরে ব্যবহৃত কবা

হাইতে পারেনা। হিন্দুদিগের ভৈষজ্য বিচার এই সনাতন সূত্রের উপর স্থাপিত আছে।

অনেকে কহেন যে, ইংবাজীতে যাহাকে (Nervous system) বা স্নায়ব-সংস্থান কহে, আমাদের বায়ু শব্দে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। সর্ব স্থলেই এইরূপ অর্থ হইতে পারে কিনা তাহা আমরা জানিনা; আমাদের মতে বায়ুজনিত রোগ আশী প্রকার। শাস্ত্রে ঐ সকল রোগের নাম নির্দিষ্ট আছে, আমবা তদনুসারে ঐ সকল রোগের চিকিৎসা করিতে পারি। শাস্ত্রে পিত্ত জনিত রোগ চল্লিশ প্রকার এবং স্নেহা জনিত রোগ তুড়ি প্রকার নির্দিষ্ট আছে।

উপরে লিখিত হইয়াছে যে হৃদ অঙ্গসারে ঔষধ বিচার করিয়া চিকিৎসা করা যায়। এই নিয়ম অবিশ্য সম্বন্ধেই বলবান বুঝিতে হইবে। বিষাক্ত ঔষধ সকল এই নিয়ম অধীন নহে। তাহাদিগকে হৃদ অঙ্গের প্রয়োগ করা হইবেনা। সর্ব প্রকার বিষ ঔষধের মধ্যে অমৃত নামক বিষ আমাদের যেরূপ প্রিয় এরূপ আর কোন বিষই নহে। ইহাকেই আমাদের দোকানদারেরা মিঠে বিষ ও হোমিওপ্যাথিকেরা একোনাইট্ কহিয়া থাকেন। শাস্ত্রে ইহাকে সচরাচর অমৃত না বলিয়া বিষ শব্দেই উল্লেখ করা হয়। অথবা বিষ শব্দের উল্লেখ করিলে অমৃত ভিন্ন অপর কোন বিষ বুঝিতে হইবে না। হোমিওপ্যাথেরা কহেন যে একোনাইট্ তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ। তাঁহারা কহেন যে, এই ঔষধ তাঁহাদের অহঙ্কার ও গৌরবের ভিত্তি-স্বরূপ। হোমিও

প্যাথিকশাস্ত্র মহাত্মা হানিমান্ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু একোনাইট্ বহু পূর্বে হইতে আমাদের শাস্ত্রে প্রচলিত আছে। অতএব বোধ হয় আমরা এরূপ অল্পমান করিলে দোষ হইতে পারেনা যে, হানিমান্ একোনাইট্ আমাদের নিকট গ্রহণ করিয়াছেন। হানিমান্ এই ঔষধ যে যে রোগে ব্যবহার করিয়াছেন, আমরাও যে ইহাকে সেই সেই রোগে ব্যবহার না করিয়া থাকি এরূপ কে কহিতে পারেন। হোমিওপ্যাথেরা এই ঔষধ নিম্নলিখিত রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন যথা; প্রবল রক্তপিত্ত, শরীরের কোন অংশের নূতন প্রদাহ, গোধ বিশেষতঃ জ্বর জনিত নূতন শোথ, বীসর্প, বৃক্কজ্বর, অতিসার, বিস্ফটিকা সন্ন্যাসরোগ, যুগ্মী, ধমুট্টকার, বেদনা, বাত, হৃদ্রোগ, স্মৃতিকা-জ্বর, প্রমেহ, আর্দ্র পীড়া, অজীর্ণ, শিরোরোগ ইত্যাদি।

নক্সভোমিকার অর্থাৎ কুচীলা, ভাব-প্রকাশে বিষমুষ্টি শব্দে উল্লিখিত আছে। আর্সেনিক অর্থাৎ সৈকো, দারুমুচ প্রভৃতি নামে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্পবিষ নবজরে বিহিত আছে। ট্রামোনিয়ম্ অর্থাৎ ধুতুরার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। গোপাল ভট্ট ও শালধর অজীর্ণ ও বায়ুরোগে নক্সভোমিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারেরা একোনাইট্ অর্থাৎ অমৃতের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, পারদ ভিন্ন এরূপ আর শ্রদ্ধা কোন বিষেই করেন নাই। নক্সভোমিকাই হউক্, আর আর্সেনিকই হউক্, আর সর্পবিষই হউক্ বা আর যে কোন উৎকৃষ্ট ব্যাধিনাশক দ্রব্যই হউক্,

একোনাইট্ প্রত্যেকেবই পরিবর্তে ব্যবহার করা হইয়াছে। এমন কি যেখানে নক্স-ভৌমিকা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেখানেও একোনাইটের সঙ্গে ভিন্ন পৃথক রূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিতে সঙ্কোচ বোধ করা হইয়াছে। শাস্ত্রে আমাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই, সুতরাং আর্যেবা যে কোন কোন কারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নক্স-ভৌমিকা প্রভৃতির স্থানে মধ্যে মধ্যে একোনাইট্ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমরা বিশেষ কবিতা বুঝাইতে পারিতেছি না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেছি যে ডাক্তার হেম্পেল যে কারণে কহিয়াছেন যে একোনাইটেব ক্রিয়ার আতিশয্য আসেন্নিকের ক্রিয়ার সঙ্গে সমান, বোধহয় আর্যেবা সেই কারণেই আসেন্নিকের পরিবর্তে অনেকস্থানে একোনাইট্ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্তই বোধহয় আগবা গ্রীহা যন্ত্র প্রভৃতি সংযুক্ত নানা প্রকার পূর্বাতন জবেও একোনাইট্ প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য হইয়া থাকি। হোমিওপ্যাথ ও এলোপ্যাথেরী ঐ সকল স্থানে আসেন্নিক

* এলোপ্যাথেরা পূর্বে পূর্বে এই ঔষধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। ডাক্তার গ্যারড বলিডেন যে একোনাইট্ একপ্রকার তীব্র বিদ্যুৎ, উহা ঔষধের যোগ্য নহে অতএব উহার বিববে বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এলোপ্যাথিক শাস্ত্র ক্রমশঃ বর্তমানে উন্নত হইতেছে, এক্ষণে ততই ইহার আদর করিতেছে। ইহাতে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, যে ঔষধ হিন্দুরা মতান্তরে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা কেবল দিন দুই হইল এলোপ্যাথিক দিগের জ্ঞানগম্য হইতে পারিয়াছে। ইহা আমাদের কম গৌরবের বিষয় নহে।

ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাহা হউক আমরা এই সকল স্থলে একোনাইট্, পারদের সঙ্গে ব্যবহার কবিতা আসিতেছি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা অত্যন্ত কম বলিয়া সুখ্যাতি আছে। কিন্তু বিবাক্ত, ঔষধের মাত্রা আমাদের ও বড় অধিক নহে। দেখুন হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে কাঁচা একোনাইট্ সুরাসহযোগে প্রয়োগ করা হয় কিন্তু আমরা সেই একোনাইট্ গোমুত্রে তিনদিন পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখি অথবা তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ অগ্নিতে গোমুত্ৰ-সহযোগে পাক করিয়া থাকি। ইহাতে বিবভাগ অধিকাংশ ঘোঁত হইয়া গেলে আমরা সেই একোনাইট্ ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকি এবং তৎকালে ইহার মাত্রা সচরাচর গুড়ে এক গেনের পঞ্চমাংশের বড় অধিক ব্যবস্থা করা হয় না।

ডাক্তার স্মিথ বলেন যে একোনাইটেব জীবনশক্তি শক্তি কুইনাইনের নীচেই। অবশ্য কুইনাইনের নিষ্কাশন করিতে কে সাহস করিবে? কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, কুইনাইনের পর্য্যায় নিবারক শক্তি একোনাইটের অপেক্ষা অধিক হইলেও একোনাইটের অন্যান্য গুণ উহার অপেক্ষা অধিক। তন্মধ্যে একটা গুণ এই যে একোনাইট্ অবকালে ও অরবিচ্ছেদে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু কুইনাইন অরকালে ব্যবহার করা যায় না। আর রসস্থ জরে কুইনাইন অপেক্ষা একোনাইটের কার্যকারিতা অধিক। ইহা ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন। আমরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছি যে, গ্রীহা রহিত পূর্বাতন ম্যালেরিয়া জরে একোনাইটেব

কার্য্যাকাবিতা অধিক। আমরা ইহাও দেখি-
যাছি যে, কুইনাইনের অতিসেবনে ম্যালেরিয়া
দেশে যে এক প্রকার পুণাতন জ্বব হইতেছে,
তাহাব নিবারণে কুইনাইন অশোকা একো-
নাইটেব কার্য্যাকাবিতা অধিক। পিত্তশ্লেষ্মা
জ্ববে কুইনাইনের কার্য্যাকাবিতা ও বাতপিত্ত
ও বাতশ্লেষ্মা জ্ববে একোনাইটেব কার্য্য-
কাবিতা অধিক। ম্যালেরিয়া বিষে যে
অজীর্ণদোষ অতিসার দোষ ও গ্রন্থীদোষ
ঘটিয়া থাকে, তাহাব নিবারণে একোনাইট
উপাদেয় ঔষধ।

ঔষধ বিশেষেব সেবনে মানবশরীরে যে
সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, সে সকল লক্ষণ
হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র তন্ন তন্ন কবিয়া পরীক্ষা
করিয়াছেন। আমরা ঐ সকল লক্ষণ
তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া থাকি যথা,—
বায়ুজ পিত্তজ ও কফজ। হোমিওপ্যাথিকেরা
কহেন যে একোনাইট সুস্থশরীরে
কবিলে মানুষ কখন হাসে কখন কাঁদে।
আমবা বলি যে একোনাইট সুস্থ শরীরে
সেবন কবিলে মানুষেব বায়ু কুপিত হয়।
ফলতঃ আমবা যাহাকে বায়ু পিত্ত কফ
বলিয়া থাকি, পাঠক! তাহাব প্রকৃত অর্থ
ধারণা কবিলে আমাদেব বিশেষ প্রশংসা
কবিবেন সন্দেহ নাই।

• “বিষস্ত বিষমৌষধম্” বলিয়া যে একটা
কথা আছে উহা আমাদের শাস্ত্রেবই কথা।
কিন্তু এই কথাটি আমবা যে অর্থে ব্যবহার
করিয়া থাকি, বোধ হয় হোমিওপ্যাথেরা
সে অর্থে ব্যবহার করেন না। চরকেব মতে
স্বাবব (উদ্ভিজ্জ বিষ বা ধাতুবিষ) বিষ, জঙ্গম
(জঙ্গবিষ যথা সর্পবিষ ইত্যাদি) বিষের প্রাতি-

ষেধক। যথা,—কুহুরদষ্ট ব্যক্তিকে অমৃত
বিষ অর্থাৎ একোনাইট প্রয়োগ করা যায়,
ইহা এক্ষণে এলোপ্যাথেবাও স্থিৰ করিয়া-
ছেন। চরক কহিয়াছেন যে, বিষপীড়িত
ব্যক্তিব অস্ত্রাচ্চ চিকিৎসাব পৰ বিষনির্ষণ
না হইলে পীতবিষ ব্যক্তিকে জঙ্গম বিষ
ও দষ্টবিষ ব্যক্তিকে স্বাবব বিষ প্রয়োগ
কবিবে।* তাঁহাব মতে জঙ্গম বিষেব গতি
শরীরেব নিম্ন দিকে ও স্বাবব বিষেব বেগ
শরীরেব উর্দ্ধদিকে। অতএব এই দুই বিষ
পরস্পরকে আঘাত কবে। বোধ হয়
হোমিওপ্যাথেবা একপ অর্থ করেন না।

আমাদের ঔষধে বহুসংখ্যক অবিষ
উদ্ভিজ্জ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকল
ঔষধেব প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা হোমিও-
প্যাথি মতেব অনুবর্তী নহি। হোমিও-
প্যাথি শাস্ত্রেব মত এই যে, যেহেতু সিঙ্কোনা
সুস্থ শরীরে সেবন কবিলে জরোৎপাদন
কবে, অতএব অনুমান কবিতো হইবে যে
সিঙ্কোনা জ্বব নিবারণ কবে। এক্ষণে দেখা
যায় যে ধনে পলতা মবিচ প্রভৃতি অনেক
দ্রব্য আমরা সুস্থ শরীরে তাহারেব সহিত
ব্যবহার কবিয়া থাকি, কিন্তু আবার একপ
কতকগুলি বোগ আছে, যাহাতে আমবা
এই সকল দ্রব্য ঔষধ রূপে সেবন কবিয়া
থাকি, কিন্তু তাহা বলিয়া একপ কখনই

* মহাভারতেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।
ভীমসেন কালকূট প্রভাবে নিঃসজ্জ হইয়া অশ্বমথ
হইলে সর্পগণ তাঁহাকে দংশন কবিবাজিল।
সর্পগণেব জঙ্গম বিষ দাবা ভীম-শরীরেব স্বাবব
বালকূট বিষের তেজ একেবাবে বিলুপ্ত হইয়া গেল।
ভীমসেন বাঁচিয়া উঠিলেন।

অসুস্থমান করিতে পারা যায় না যে, যেহেতু ধনে, পলতা বা মরিচ কতকগুলি বোগ নিবারণ করিয়া থাকে, সেই হেতু ঐ সকল সামগ্রী সুস্থ শরীরে সেবন করিলে অবশ্যই সেই সকল বোগ উৎপন্ন হইবে। আমাদেব শাস্ত্রেব রসায়ন ও বাজীকরণ অধ্যায়ে একপ অনেক ঔষধ আছে, যাহা লোকে সুস্থ শরীরে সেবন করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পাবে, অথচ যাহা সেবন করিলে হুঃসাধ্য যক্ষ্মা বোগেবও আবাম হওয়া সম্ভব। অতএব এস্থলে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আমাদেব শাস্ত্রে খাটিল না।

হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে ঔষধ মিশ্রণ করিবার ব্যবস্থা নাই কিন্তু আমাদেব শাস্ত্রে বিপবীত ব্যবস্থা আছে। এমন কি আমাদেব চন্দ্রনাদ্য নামক তৈলে ১০২টী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করা হয়।

আমাদেব শস্ত্রনাথ বস নামক ঔষধে হরিতাল, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, সৈকো, একোনাইট, পাবদ, ধুতুবা ও অহিফেণ এই আটটী বিষ আছে। তন্নিম্ন উহাতে আবও কয়েকটী অবিশেষ্যবোব সংযোগ আছে। ভিন্ন ভিন্ন ঔষধে মানব শরীরে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য উৎপন্ন হয়, হোমিওপ্যাথেবা ঐ সকল কার্য বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ১০২ দ্রব্যেব একত্র মিশ্রণ করিয়া প্রয়োগ করিলে যে সকল কার্য উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহাবা পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। আমাদেব চরক ও তাঁহার শিষ্যেবা ঐ সকল কার্য পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়াছেন।

হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি অপেক্ষা আমাদেব উৎকর্ষ একটী বিষয়ে স্থিরীকৃত

আছে। আমাদেব তৈল ও দ্রুত সম্বন্ধীয় যে সকল ঔষধ আছে তাহা তাঁহাদেব নাই। কে না বলিবে যে মেডিকেল কলেজেব ইংল-পাতালেও যে সকল পক্ষাঘাত বোগী ও বায়ু বোগী প্রতিকার প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাবা ও অনেকে অনেক সময়ে আমাদেব তৈল ও দ্রুত সেবন করিয়া আবোগ্য লাভ করিয়াছেন; আমাদেব দেশে এমন কোন লোক নাই, যিনি এই সকল তৈল ও দ্রুতের বিষয় অবগত না আছেন এবং উহাদেব নামে প্রীতিপূর্বক নমস্কার না করিয়া থাকেন। এমন কোন কোন ইংবাজী শিক্ষিত নব্য থাকিতে পাবেন ইহাবা এদেশীয় কোন কিছুব নাম শ্রবণ মাতেই ঘৃণাপ্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু অতিবিস্তৃত পুস্তকপাঠে অবসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকেও হযত কতবাব শিবোদ্দেশে আমাদেব তৈলেব মর্দন ভাব সহ্য করিতে হইয়াছে। এমন কি অনেক সময়ে অনেক ইংবাজী পীড়িত হইয়াও আমাদেব তৈলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল তৈল ও দ্রুত হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি সম্প্রদায়েব নাই।

এতদভিন্ন আমাদেব শাস্ত্রে রোগ আবোগ্য করিবার আবও তিনটী উপকরণ আছে। যথা;—বস্তি, বিবেচন ও বমন। বস্তি শব্দেব অর্থ পিচ্কারী। আমরা ইহা সর্ক-প্রকার বোগেই বিশেষতঃ বায়ু বোগে প্রয়োগ করিয়া থাকি। আমাদেব পিচ্কাবীর প্রকাবভেদ এত অধিক যে এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কবা যায় না। পাঠক এই গ্রন্থেব বস্তি পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন। এত প্রকাব বস্তি

এলোপ্যাথ্যদিগকে ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। আমাদের বিবেচন সকল সাধারণতঃ পিস্ত-নিঃসারক রূপে ব্যবহৃত হয়; অথবা এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ বচন আছে যে পিস্ত জনিত বোগ সকল বিবেচন দ্বারা অপসাবিত করিবে। আমাদের এমন দুই একটি বিবেচক ঔষধ আছে, যাহা ভ্রাণ যোগে মলযন্ত্রের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। এমন দুই একটি বিবেচক আছে যাহা বস্ত্রে মাখাইয়া সেই বস্ত্রে গাত্র আচ্ছাদন করিলে বিবেচন হইয়া থাকে।

আমরা আমাদের বমনকারক ঔষধ সকল প্রায়ই স্নেহের প্রকোপে ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বস্তি সম্বন্ধীয় উৎকর্ষেই আমাদের গোঁবর অধিকমানে হয়। দ্রুতগত্যক্রমে আমাদের বস্তি আমাদের অঙ্গ চিকিৎসার ত্রাস্ত্র আমাদের অব্যবহার্য্য হইয়াছে। ইহাৰ কারণও স্পষ্ট। পাছে কোন প্রকার অশৌচ হয় এই ভয়ে আমরা বোগের মলযন্ত্র বা ক্তাদির সহিত সাক্ষাৎ সন্ধ্যক বাধিতে অনিচ্ছুক। এক্ষণে বাজাব অনুগ্রহে

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার প্রচাৰ হওয়াতে মেডিকেল কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রেরা চরক প্রভৃতির অধ্যয়নে অনায়াসে সাহসী হইতে পারিবেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় বস্তি ও অঙ্গচিকিৎসা সম্বন্ধে কালে যে আমাদের শাস্ত্রে বহুতর গভীরস্থান ব্যাখ্যা লাভ করিতে পারিবে তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই।

সর্পবিষ চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে এত কথা আছে যে তত আর কুত্ৰাপি নাই। অতি তীব্র দংশনও আমাদের মতে অসাধ্য হয় না। তবে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত করা হইয়াছে, তাহা পবিশ্রম ও ব্যাধ-সহযোগে প্রস্তুত করিয়া বৎসবান্তে দুই একটি মাত্র দবিত্ত সর্পদষ্টের চিকিৎসায় ফল লাভ কি এইরূপ ভাবনার উদয় হওয়াতেই বোধ হয় আমাদের বৈজ্ঞানিক সর্পদংশন চিকিৎসায় বিবাগী হইয়া থাকিবেন। কিন্তু গবর্ণমেন্টের উচিত যে মেডিকেল কলেজে এই সকল ঔষধের পরীক্ষা জন্ত আদেশ প্রদান করেন।

শ্রীযশোদানন্দন সবকাব।—

জৈনধৰ্ম্ম।

(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ।)

পূৰ্ব্ববারে বৌদ্ধভিক্ষুগণের দশশীল ও জৈনভিক্ষুগণের পঞ্চমহাব্রতের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এ গুলি যে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণের

নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত আমরা বৌধায়ন-সূত্র হইতে ভিক্ষুগণের অবশ্য কর্তব্য পাঁচটী

প্রধান কর্মের কথা উক্ত কবিব ।

বোধায়ন-সূত্রে ভিক্ষুগণের এই পাঁচটা প্রধান কর্ম বলিয়া লিখিত আছে,—

- ১—প্রাণি-বধে বিরতি ।
- ২—সত্য প্রিয়তা ।
- ৩—পবকীয় বস্ত্রতে লোভ-শূন্যতা ।
- ৪—জিতেন্দ্রিয়তা ।
- ৫—দানশীলতা ।

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণের উপবোক্ত প্রথম চারিটা কর্মের সহিত জৈনভিক্ষুদিগের প্রথম চারিটা মহাব্রতের যথাক্রমে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রথম চারিটা শীলের সহিত ঐরূপ ক্রমিক ঐক্য লক্ষিত হয়না । ইহাতে স্পষ্ট অনুমান হইতেছে যে জৈনগণ বৌদ্ধগণের নিকট উক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করেন নাই, বৌদ্ধগণের অপেক্ষা প্রাচীন ও সমধিক মাননীয় ব্রাহ্ম^{১২} ভিক্ষুগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । পঞ্চম নিয়মটা হিন্দু ও জৈন সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে পবম্পর বিভিন্ন বটে । কিন্তু মহাবীবেব আবির্ভাবের পূর্বে জৈনগণের পঞ্চম নিয়মটা সংস্থাপিত হয় নাই ; ভগবান্ নিগ্রহ্ননাথ মহাবীর উক্ত নিয়মটা জৈনভিক্ষুগণের ব্রতমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া যান । ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণের নিয়মাবলীর সহিত বৌদ্ধ ও বিশেষতঃ জৈন ভিক্ষুগণের অতি সুন্দর ঐক্য লক্ষিত হয় । গোতম-সূত্রে ভিক্ষুকৃত্যশ্রকরণে এইরূপ লিখিত আছে ;—

১—ভিক্ষুগণ—‘অনিচয়’ হইবেন অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্ত কোন বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না । (জৈম এবং বৌদ্ধভিক্ষুগণের

ও স্ব স্ব সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া বাধা অত্যন্ত নিষিদ্ধ । অপরিগ্রহ জৈন ভিক্ষুগণের একটা মহাব্রত, ঐহিক পরার্থ সমূহের প্রতি অচ্যুত পবিত্যাগ করা বিশেষতঃ পার্শ্বিক কোন বস্তুই আমার নহে, এই প্রকার সংস্কার লাভ করাকে অপরিগ্রহ বলে । এমন কি তাঁহারা বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি যে সকল অত্যাবশ্যক পরার্থ আপন আপন সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া বেড়াইতেন সে গুলিকেও ধর্মোপকরণ মাত্র বিবেচনা করিতেন, নিজেব সম্পত্তি বলিয়া একবারও মনে করিতেন না ।)

২—‘উর্ববেতা’ হইবে । (এটা জৈনভিক্ষুগণের চতুর্থ মহাব্রত ও বৌদ্ধগণের পঞ্চম মহাশীল ।)

৩—বর্ষাকালে ‘ঋবশীল’ হইবে অর্থাৎ বাসস্থান পবিবর্তন করিবেন না । (নিয়মটাও বৌদ্ধ ও জৈনভিক্ষুগণ প্রতিপালন করিয়া কন^{১৩} কর্ন ।)

৪—অপবাহু ও প্রতিদিবস ‘অনিবৃত্ত’ অর্থাৎ একবার মাত্র ভিক্ষা করিবেন ।

(জৈনভিক্ষুগণও প্রতিদিন একবার ভিক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি একদিন অপেক্ষা অধিক কাল অনাহারী থাকিলেন, তিনি দুই বাব ভিক্ষাচরণ করিতে পাবেন । জৈমগণ পাছে তাহাদেব বিবোধিগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই ভয়ে প্রাতে অথবা মধ্যাহ্নে ভিক্ষার্থে গমন করেন । এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুগণ লোকের আহাণ হইয়া না গেলে তাহাব বাটীতে ভিক্ষা করিবেন না ।)

৫—‘নিবৃত্তাশী’ হইবে অর্থাৎ উত্তম উত্তম খাদ্যবস্তু ভোজন করিবার বাসনা পরিত্যাগ

করিবে। (ইহা জৈনভিক্ষুগণের পঞ্চম মহা-
ত্রত অপরিগ্রহেব অন্তর্গত)।

৬—বাকু, চক্ষু ও কৰ্ম্ম সংযত হইবে।
(ইহাই জৈনগণের ত্রিগুণ্ড)।

৭—কোপীন আচ্ছাদনেব জন্ত একখানি
বস্ত্র পরিধান করিবে। (পরিচ্ছদ সম্বন্ধে
জৈনগণের নিয়মাবলী ইহা হইতে বিভিন্ন।
জৈনভিক্ষুগণ উলঙ্গ থাকিতে পাবেন অথবা
এক খণ্ড, দুই খণ্ড অথবা তিন খণ্ড বস্ত্র ব্যব-
হা করিতে পাবেন। সচবাচর যুবা বলিষ্ঠ
ভিক্ষুগণ এক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন।
মহাবীর উলঙ্গ হইয়া ভিক্ষার্থে ভ্রমণ কবি-
তেন। জিনতুল্য ব্যক্তিও মহাবীরেব দৃষ্টান্ত
অনুসরণ করিতেন।

৮—কেহ কেহ বলেন একখানি ধৌত
জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিবে।

৯—ওষধি ও বনস্পতি গণের ফল, শিত্র
ও বন্ধল না পড়িয়া গেলে গ্রহণ করিবে।
(জৈনগণও এই নিয়ম পালন করিয়া থাকে,
এ বিষয়ে তাঁহারা ব্রাহ্মণসন্ন্যাসিগণের
অপেক্ষা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়া-
ছেন। শাক ও ফলমূলাদির জীবনেব
চির বর্জমান থাকিতে তাঁহারা সে সকল
বস্তু ভোজন করেন না।)

১০—এক গ্রামে দুই বাজি বাস করিবে
না।

(মহাবীর কোন গ্রামে এক রাত্রের
অধিক বাস করেন নাই।)

১১—সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিবে অথবা
একটা শিখা মাত্র রাখিবে। (জৈনভিক্ষুগণও
সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবার সময় মস্তক
মুণ্ডন করিয়া ফেলেন।)

১২—বীজবধ পরিত্যাগ করিবে। (জৈন-
ভিক্ষুগণও বীজ, অকুব প্রভৃতি বাহাতে
আহত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান
থাকেন।)

১৩—যে ব্যক্তি হিংসা কবে ও যে ব্যক্তি
অনুগ্রহ কবে তাহাদেব উভয়ের প্রতিই সম-
ভাব অবলম্বন করিবে। (মহাবীরেব
গাত্রে কীট মশক মক্ষিকাদি জীবগণ বেড়া-
ইয়া বেড়াইত ও ভয়ানক কষ্ট প্রদান করিত।
তিনি ধীরভাবে সে সমুদয় কষ্ট সহ্য
করিতেন।)

১৪—‘অনাবস্তী’ হইবে। (নিগ্রহনাশ
জীবনেব শেষভাগে জীবন অথবা মৃত্যু ইহা-
দের মধ্যে কোনটিব জন্যই সাকাঙ্ক্ষ হই-
তেন না।)

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণের কর্তব্য কষ্টের
সহিত জৈন ও বৌদ্ধভিক্ষুগণের নিয়মের
সামঞ্জস্য দেখাইবাব জন্য উপরে যেকপ
গৌতম-সূত্র হইতে প্রমাণ সমূহ উদ্ধৃত করা
হইয়াছে, বৌদ্ধাশ্রম-সূত্র প্রভৃতি অন্যান্য
প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ও সেইরূপ ভূবি ভূবি
প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে।
এস্থলে সে সকল অনাবশ্যক বোধে উল্লেখ
করা হইল না।

সম্প্রদায় ত্রয়ের মধ্যে ঐক্যসম্বন্ধে যত-
দূর্বল হইয়াছে, তাহার দ্বাবাই দেখিতে
পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণসন্ন্যাসিগণই জৈন ও
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণেব আদর্শ। বৌদ্ধগণের সহিত
জৈন সম্প্রদায়েব যে সকল ধর্ম্মগত ঐক্য লক্ষিত
হয়, জৈন্যধর্ম্মাবলম্বিগণ তাহা বৌদ্ধগণের
নিকট গ্রহণ করেন নাই, প্রাচীন হিন্দুগণের
নিকট গ্রহণ করিয়াছেন। স্মৃতবাং ধর্ম্মগত

সামঞ্জস্য দেখাইয়া জৈনসম্প্রদায়কে বৌদ্ধ ধর্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সপ্রমাণিত করিবার চেষ্টা নিফল ।

এস্থলে তর্কক্ষেত্রে একটি আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণই বৌদ্ধ অথবা জৈন ভিক্ষুগণের নিকট নিয়ম গুলি গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব । কাবণ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম অতি পুরাতন ; ইহা যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অনেক পূর্বকালবত্তী সে বিষয়ে অসম্ভব সন্দেহ নাই । দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধগণ প্রথম অবস্থাতে বহুকাল ভারতের একটি মাত্র প্রদেশে বাস করিতেন, স্মৃতবাং তৎকালে তাহাদের আচার ব্যবহার সমস্তভাবতবর্ষ-বাগী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণ কি প্রকারে অমুকরণ করিতে সক্ষম হইবেন ? তৃতীয়তঃ—গৌতম প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ, ঐহাদের গ্রন্থে ভিক্ষুগণের কর্তব্য সমূহ পবিত্রাবস্থাপে বিহিত হইয়াছে, বৌদ্ধধর্মের পূর্বসময়ের লোক । আব গৌতম, বোধিবান প্রভৃতি স্মৃতিকারগণকে বৌদ্ধধর্মের পববত্তী বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাঁহারা যে ধর্মসম্বন্ধে বৌদ্ধগণের অমুকরণ করিবেন, ইহা বিশ্বাস হয় না । কাবণ তাঁহারা বৌদ্ধগণকে আধুনিক ও ভণ্ড বলিয়া অতিশয় ঘৃণা করিতেন । স্থণিত বিধিক্ষি-গণের নিকট তাঁহারা কখনই পবিত্র সন্ন্যাস আশ্রমের কর্তব্য কর্ত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই । বৌদ্ধগণ বৎ ব্রাহ্মণগণকে জ্ঞান ও আচার ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বিশেষ সম্মান করিতেন । স্মৃতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহাদের গ্রহণ না করিবার কিছুই কারণ

দেখিতে পাওয়া যায় না ।

এবিষয়ে আর একটি তর্ক উঠিতে পারে যে যদিও বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণগণের অমুকরণ করিয়া থাকেন, জৈনগণ কিন্তু ব্রাহ্মণগণের নিকট নিয়ম গুলি গ্রহণ না করিয়া বৌদ্ধগণের নিকট গ্রহণ করিয়াছেন । বাস্তবিক ইহা সম্ভবপব নহে । কাবণ ব্রাহ্মণ ও জৈনগণের মধ্যে ধর্মগত সামঞ্জস্য অধিক, বৌদ্ধগণের সহিত তত নহে । আব জৈনগণ বৌদ্ধগণের অপেক্ষা অতীব প্রাচীন ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধগণকে অমুকরণ করিবেন কেন ?

আমরা এপর্যন্ত যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর ভগবান্ মহাবীরের জীবন-চবিত, জৈন ভিক্ষুগণের পালনীয় কৃত্য সমূহ অথবা জৈন ধর্মসম্বন্ধে অন্য কোন আচার ব্যবহারেব সম্যকরূপে কিছই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে উৎপন্ন বলিতে পারা যায় । এক্ষণে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মগত একরূপ কয়েকটি প্রধান পার্থক্য দেখাইব যাহাতে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বিবেচনা হইবে ।

১। বৌদ্ধগণ আত্মার সত্তা স্বীকার করেন না, কিন্তু জৈনগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন । হিন্দুগণের সহিত এবিষয়ে তাঁহাদের এইমাত্র মতভেদ যে তাঁহারা আত্মা বিশ্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করেন না ।

২। বৌদ্ধগণের পঞ্চসঙ্কল ইহাদের প্রভূত বিভাগের বিষয় জৈনশাস্ত্রে লক্ষিত হয় না ।

৩। জৈনগণ বলেন যে বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা, অগ্নি, জল এবং বায়ুও জীব আছে। কিন্তু বৌদ্ধদার্শনিকগণ একথা অস্বীকার করেন।

৪। মতি, ঋত, অবধি, মনঃপর্যায় এবং কেবল এই পাঁচটি প্রমাণজ্ঞান জৈনধর্ম, শাস্ত্রেব প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৌদ্ধ-শাস্ত্রেব এই প্রকার প্রমাজ্ঞানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুনর্জন্ম, পূর্বকৃত কর্মের ফলভোগ এই কয়েকটি বিষয় উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল সামঞ্জস্য হিন্দুশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং জৈনগণ যে বৌদ্ধগণের নিকট এগুলি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলা যাইতে পারে না।

কেহ কেহ মহাবীবেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন; কিন্তু বলেন যে জৈনধর্মগ্রন্থ হইতে মহাবীবেক প্রাচীন জীবন চরিত ও জৈনধর্মের ইতিহাস ও পাইবার কিছুমাত্র আশা করা যাইতে পারে না। কাবণ ঐ সকল গ্রন্থ জৈনধর্ম সংস্থাপিত হইবার সহস্র বর্ষ পবে লিখিত হইয়াছিল। আর উক্ত সহস্র বর্ষ মধ্যে জৈনধর্ম কিছুই প্রাদুর্ভাব লাভ করে নাই, অস্তান্ত ধর্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া অতি সামান্য ও সন্ধীর্ণ-ভাবে প্রবর্তিত ছিল। সুতরাং পুস্তক লিখিত হইবার সময় জৈনধর্মের প্রকৃত ইতিহাস ও ধর্ম-প্রণালী লাভ করিবার বিশেষ উপায় ছিল না।

প্রথম অবস্থাতে জৈনধর্ম বহুকাল অতি সামান্য সম্প্রদায় ছিল একথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সচরাচর দেখিতে

পাওয়া যায়, বৃহৎ বৃহৎ ধর্মসম্প্রদায় অপেক্ষা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়সমূহ অতি যত্নপূর্বক তাঁহাদের ধর্মের গুঢ় বিষয় ও ইতিহাস রক্ষা করিয়া থাকে; যাহাতে বিজাতীয় ধর্ম-প্রণালী ও আচার ব্যবহার তাহাদের ধর্ম মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সে বিষয়ে তাহারা বিশেষ সাবধান থাকে। যিহুদী ও পাবসীগণ এ সম্বন্ধে নাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতএব জৈন সম্প্রদায় বহুকাল অতি সামান্য ছিল বলিয়া জৈনগণ যে তাহাদের ধর্মের ইতিহাস ও তথ্য অবিকৃতভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যেখানেই ধর্মসম্বন্ধে জৈনগণের মধ্যে একটু সামান্য মতভেদ ঘটিয়াছে, সেইখানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে অমনি জৈনগণের মধ্যে শাখা-ভেদ প্রবর্তিত হইয়াছে। জৈনগণের দিগম্বর ও শ্বেতাশ্বর সম্প্রদায় ও শ্বেতাশ্বরগণের মধ্যে সাতটি দলভেদ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কল্লহৃতের স্থবিরাবলী পাঠ করিলে স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে জৈনস্থবির অর্থাৎ ধর্মোপদেশকগণের গীণ, কুল, ও শাখাভেদ যেরূপ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারাই বুঝিতে পাওয়া যায় প্রাচীন জৈনগণ স্বসম্প্রদায়ের বংশাবলী ও ইতিহাস রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ সচেতন ছিলেন।

আব মহাবীবেক নির্বাণের ৯৮০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪৫৪ খৃষ্টাব্দে দেবধিগীরী সমগ্র জৈন সিদ্ধাস্ত সমূহ সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে লিখিতহয় বলিয়া, যে প্রবাদ আছে তাহার মর্ম এরূপ নহে যে, দেবধিগীরী জৈনধর্ম-শাস্ত্র প্রথমে লিখিবদ্ধ করেন। আমাদের

অনুমান হয়, পাছে সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জৈনধর্ম শাস্ত্র লোপ প্রাপ্ত হয় এই ভবে দেবধিগণী তাঁহার পূর্ব-বচিত প্রভূতগ্রন্থাবলী সংগ্রহ কবিয়া তৎকালেব প্রধান প্রধান জৈন গুরু-গণেব সাহায্যে জৈনধর্মগ্রন্থের একটি সর্ক-বাদিসম্মত সংস্করণ করেন। এই ঘটনাব পূর্বে যে জৈনগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয় নাই একথা বিশ্বাস হয় না। অধ্যাপনাকালে জৈন গুরুগণ পুস্তকেব সাহায্য না লইয়া স্ব স্ব অসামান্য স্মৃতিশক্তিবলে শিষ্যগণকে ধর্ম শিক্ষা প্রদান করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাবা স্মৃতি উদ্বোধনার্থ ও আপন আপন সন্দেহ অপনোদন করিবাব জন্য, ধর্মশাস্ত্র সমূহ লিপিবদ্ধ কবা আবশ্যক মনে করেন নাই, ইহা বোধ হয় না। বাস্তবিক জৈনগুরুগণ তাঁহাদের ধর্ম সংস্থাপিত হই-বাব পর সহস্র বর্ষ পর্যন্ত ধর্মশাস্ত্রসমূহ কেবল মুখে মুখে অভ্যাস করিয়া রাখেন নাই। তাঁহাবা যে পুস্তকাকাবে লিখিয়া রাখিতেন, তাহার অল্পকাল অনেক যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনদিগের প্রাচীন জ্যোতিষতত্ত্ব পর্যালোচনা কবিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐসদেশীয় জ্যোতিষ এদেশে প্রচলিত হইবাব অনেক পূর্বে উহা বচিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে জ্যোতিষ সঙ্কল্প একরূপ অনেক অসম্ভব কথা বলা হইয়াছে, যাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় গ্রন্থকারগণের ঐস দেশীয় জ্যোতিষ কিছু মাত্র জানা ছিল না। খৃষ্টের তৃতীয় অধবা চতুর্থ শতাব্দে ভারতবর্ষে ঐসদেশীয় জ্যোতিষ প্রচলিত হয়। অতএব জৈন-গণের ধর্মগ্রন্থ উহার পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

জৈনধর্মগ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। কিন্তু ঐ প্রাকৃতের সহিত অন্যান্য প্রাকৃত অপেক্ষা পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থেব অধিক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। আচাৰ্য্য ও সূত্রকৃত্য নামক প্রাচীন জৈনগ্রন্থে বৈতালীয়চ্ছন্দ অনেক কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বৈতা-লীয়চ্ছন্দ পালিভাষায় লিখিত ধর্মপদ নামক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের বৈতালীয়চ্ছন্দ অপেক্ষা পবকালবর্তী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ললিতবিস্তবে ও মহাযান সম্প্রদায়স্থ বৌদ্ধগণের অন্যান্য গাথা পুস্তকে যে বৈতা-লীয়চ্ছন্দ আছে, তাহার অপেক্ষা উহা প্রাচীন। এইরূপে ছন্দ সম্বন্ধে আবও অনুসন্ধান কবিলে প্রমাণ হয় যে হীনযান সম্প্রদায়ের পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ যে সময়ের এবং মহাযান সম্প্রদায়েব ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ যে সম-য়ে জৈনধর্মগ্রন্থ ঐ উভয়েব মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হইয়াছে। পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ খৃষ্টের পূর্বে চতুর্থ শতাব্দে সংকলিত হয়। ৬৫ খৃষ্টাব্দে ললিতবিস্তর চীন ভাষায় অনুবাদ হয়। অতএব প্রচ-লিত জৈনধর্মগ্রন্থ খৃষ্টেব পূর্বে চতুর্থ হইতে প্রথম শতাব্দীর মধ্য-সময়ে রচিত হইয়াছে। আর যখন মহাযান-সম্প্রদায়স্থ বৌদ্ধগণের ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা পালিভাষায় লিখিত হীন-যান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের সহিত জৈন-গ্রন্থের ছন্দের অধিক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন খৃষ্টের পূর্বে চতুর্থ শতাব্দীর কিছুকাল পরেই বোধ হয় প্রচলিত জৈনধর্ম গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আমাদের

এই অল্পমানের সহিত খেতাবের জৈনগণের পরিশিষ্ট পর্ব নামক পুস্তকে লিখিত বিবরণের একা হইতেছে। উক্ত পুস্তকে আছে যে পাটলিপুত্র নগরের ভিক্ষুসংঘে খৃষ্টের পূর্বে চতুর্থ শতাব্দের শেষে অথবা তৃতীয় শতাব্দের আবেস্তে আচাৰ্য্য প্রভৃতি অঙ্গ-নামে অভিহিত ১১খানি জৈনগ্রন্থ বচিত হয়।

অতএব ৪৫৪ খৃষ্টাব্দে দেবধিগণীর সময়ে অর্থাৎ জৈনধর্ম সংস্থাপিত হইবার সহস্র বৎসর পবে জৈনগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল একথা অস্বাভাবিক। আমবা দেখাইয়াছি যে দেবধিগণীর আট শত বৎসর পূর্বে বর্তমান জৈনপুস্তক বচিত হইয়াছে। আর এই সকল গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্বে, পূর্ব নামে কথিত ১৪ খানি জৈনধর্ম গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। দিগম্বর ও খেতাবের উভয় সম্প্রদায়ই জৈনগণই একথা বলিয়া থাকেন। সমবায়্য ও নন্দীসূত্র নামক পুস্তকেই সকল গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া যায়। পূর্ব নামক জৈনগণের লুপ্ত ধর্মগ্রন্থে জৈনগুরু ভগবান্ মহাবীর তাঁহার সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সহিত যে সকল বাদানুবাদ কবিয়াছিলেন, তাহাই সন্নিবেশিত ছিল। মহাবীরের নির্বাণের বহুকাল পরে যখন উক্ত বাদানুবাদ পাঠ করিবার লোকেব আব তাদৃশ আবশ্যক ও আগ্রহ রহিল না, তখন জৈনগণ তাঁহাদের ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও ইতিহাস লাভ করিবার জন্য অঙ্গ-গ্রন্থগুলিই সমধিক আদরে পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পূর্বনামক পুস্তকগুলি লোপ পাইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে

তাহাতে প্রমাণ করা হইল যে জৈনধর্ম উৎপন্ন হইবার সহস্র বর্ষ পবে উক্ত ধর্মগ্রন্থ লিখিত হয় নাই। বাস্তবিক মহাবীরের নির্বাণের পর হইতে দেবধিগণীর সংস্কার প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত, এই সহস্র বৎসরের মধ্যে ববাবব যে জৈন পুস্তক বিদ্যমান ছিল, তাহা আমবা দেখাইলাম। অতএব জৈনধর্ম গ্রন্থ অবিস্মৃত স্মৃতবাং তাহা হইতে ঐ ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব ও আত্মপূর্বিক ইতিহাস পাইবার আশা নাই, একথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। জৈনধর্ম যে বৌদ্ধধর্মের মত প্রাচীন, জিনদেব মহাবীর যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এ সম্বন্ধে আমরা দুই একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

জৈনসূত্রে ভিক্ষুগণের নাম “নিগ্গহু” এবং জীলোক ভিক্ষাশ্রম অবলম্বন করিলে তাহার নাম “নিগ্গহু” বলিয়া অভিহিত আছে। ববাহ মিহির ও হেমচন্দ্র জৈন ভিক্ষুগণকে নিগ্রহু বলিতেন। শঙ্কবাচার্য্য ও আনন্দগিবি বিবসন, মুক্তাশ্ব প্রভৃতি নিগ্রহু শব্দের প্রতিকপ শব্দদ্বারা জৈন ভিক্ষুগণকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অশোক অল্পশাসনপত্রে শ্রমণ হইতে বিভিন্ন এক প্রকার ধর্ম সম্প্রদায় এই অর্থে নিগ্রহু শব্দ লিখিত আছে আর ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে উহা জৈন নিগ্রহু শব্দ। বৌদ্ধগণের ত্রিপিটক মধ্যে বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বী নির্গহু নামে এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপিটক বৌদ্ধগণের সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ; অশোক অল্পশাসন পত্র তাঁহাদের অতি প্রাচীন কীর্তিনিকেতন।

ইহাদের মধ্যে যখন জৈন ভিক্ষুগণের নাম বহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই জৈনগণ বৌদ্ধগণের স্তায় প্রাচীন। আব এই দুই সম্প্রদায়েব মধ্যে যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রতি-
 ষ্টিত চলিয়া আসিতেছে, তাহাব আবও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ বলেন যে অজাতশত্রু বৌদ্ধ হইবাব পূর্বে স্বীয় পিতা শ্রেণিকবিন্দিসাবকে হত্যা কবিয়াছিলেন, এবং তিনি প্রথম বয়সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও মন্দভাব ছিলেন। কিন্তু রাজা অজাতশত্রু প্রথম হইতেই জৈনগণকে অনেক সাহায্য কবিতেন বলিয়া জৈনগণ তাঁহাকে পিতৃহত্যা অপবাদ হইতে নির্দোষী কবিবাব বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছিলেন। তাঁহাবা বলেন যে শ্রেণিক অজাতশত্রুব প্রতি অত্যন্ত অগ্ন্যব্যবহার কবাত্তে রাজা অজাতশত্রু তাঁহাকে বন্দী কবিয়া বাথেন। পবে তাঁহাব মাতা অনেক অল্পনয় বিনয় কবিলে তিনি আপন পিতৃদেবেব বন্ধন মোচন কবিবাব জন্ত কুঠাব হস্তে গমন করেন। শ্রেণিক অজাতশত্রুকে কুঠাব হস্তে তাঁহাব নিকট গমন কবিত্তে দেখিয়া মনে কবিলেন যে রাজা তাহাকে বধ কবিবাব জন্ত আসিয়াছে। তখন তিনি পুত্রের হস্তে হত হওয়া অপেক্ষা আত্মঘাত শ্রেয়স্কর ভাবিয়া নিজেই আত্মঘাতী হইয়াছিলেন। তৎপরে অজাতশত্রু পিতৃশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উন্মাদপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন।

মথুরা নগরীতে কঙ্কালি নামক স্থানে একটি বৃহৎ চিপি আছে। চিপিটির দৈর্ঘ্য ৪০০ ফুট, প্রসার ৩০০ ফুট এবং গড় উচ্চতা ১২ ফুট। স্বাক্ষর কনিংহাম সাহেব এই

স্থানটী খনন কবিয়া প্রাচীনভাবতের অনেক কীর্তিকলাপ বাহিব কবিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কাবে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে পূর্বকালে মথুরা নগরীতে জৈনগণের ভাষা-
 নক প্রাদুর্ভাব ছিল। এখানে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাব মধ্যে অনেক গুলি মনুষ্য মূর্ত্তি। ঐ সমস্ত মনুষ্য মূর্ত্তি উল্লঙ্গ।

আব প্রতিমূর্ত্তি গুলিতে যে সকল খোদিত লিপি আছে তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তন্মধ্যে বর্জমান ও মহাবীর এই দুইটী নাম লেখা আছে। এতদ্বিন্ন তৎকালে জৈনস্ববীবগণের যে গণ, কুল ও শাখাভেদ ছিল তাহাব ও উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ একজন জৈনস্ববিবেব ৯টী গণ, কুল ও শাখাব নাম লেখা আছে। কল্পহৃত্তেও ঠিক ঐ নাম গুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

শাকদ্বীপী রাজা কনিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসু-
 দেবেব অল্প অল্পসাবে ঐ সকল খোদিত লিপিক্ত বৎসব লিখিত হইয়াছে। লিপি-
 গুলিতে উক্ত রাজগণের নাম আছে। শাক-
 দ্বীপী রাজগণের অল্পের মোটামুটি কাল নির্ণয় কবিয়া লইলে প্রমাণ হয় যে মথুরা-
 বাসী জৈনগণ অন্ততঃ গৃষ্টের প্রথম অল্পে
 বিবিধ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বিশেষ
 সমৃদ্ধিব সহিত বর্জমান ছিলেন।

অতএব জৈন সম্প্রদায় যে উক্ত সময়ের
 কয়েক শতাব্দ পূর্বে সংস্থাপিত হইয়াছিল,
 তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং
 জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের ন্যায় প্রাচীন।

আব উক্ত খোদিত লিপিতে যে নির্ঘূহ
 নাথের মহাবীর ও বর্জমান এই দুইটী নাম

আছে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থে নিগ্রহ নাথ ও নাটপুত্র এই দুই নামের উল্লেখ আছে। নাট নামে কত্রিষবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিবা মহাবীরের নাম নাটপুত্র।

জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে উৎপন্ন নহে, উহা বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় প্রাচীন, উহার ধারাবাহিক ইতিহাস ও ধর্মগত নিগূঢ় তত্ত্ব জৈন-গণের পুস্তকে পাওয়া যায়, এই সকল বিষয়

জমাণ করিবার জন্যই আমাদের বর্জমান প্রবন্ধের অবতারণা। জৈনধর্ম কোন সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে, জিনদেব মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন কিনা, এবং কোন সময়েই বা মহাবীরের নির্বাণ লাভ হইয়াছে, এ সমুদয় বিশদরূপে লিখিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যিক।

ত্রিভবিমোহন বিজ্ঞানচূষণ।

কে তুমি ।

কে তুমি বিপিন কোলে কোল আলো!
হাসি মাথা স্নকোমল
স্নখাভাবে টলমল
মানস নখন পবে কপখানি ধবি,
কি জানি কি নববাগে
বসিয়ে আমার আগে,
কহিতে কহনা কথা বলি বলি কবি।
কে তুমি হাসিব খেলা
খেলিবারে দুই বেলা,
আমার স্নমুখে থাক ; কে তুমি স্নন্দবি ?

২

কে তুমি কুসুম গাথ হাত বুলাইয়া ;
আপন যেযেব মত,
যতন কবিয়ে কত,
অল্পম হাসি হাসি দাও হাসাইয়া।

তোমাঘ পেয়েছে বলে,
লতা হেসে পড়ে ঢলে,
অতুল হাসির স্নখা উথলিয়ে যায়।
এমন স্নন্দর হাসি
হাসিবারে দিবানিশি
কে তুমি ; কেমন কবে শিখাইলে তার !

৩

ফুটন্ত কুমুদ দলে স্নমুদ্র কমলে,
স্নন্দ মলয় সনে,
স্নগন্ধ কুসুম বনে,
কে তুমি, বিবাজ দেবি। সলিল হিল্লোলে।
কুমুদিনী বঙ্গ স্থলে,
শশী সবসীর জলে.
হাবু ডুবু খাষ যথা আছ তুমি তার।
সঙ্গী কবি ভাবদলে,
শশী অনন্তের কোলে,

হেসে হেসে ভেসে যায়; আছ তুমি তাই ।

৪

বুঝিব মানস কবি বুঝিতে না পাবি ।
কোথাব তোমার বাস,
কোথা থাক বারমাস,
সব ঠাই দেখি তোমা, এ কেমন নারী !
যে দৃশ্বে নয়ন চায়,
তোমায দেখিতে পায়,
তুমি আছ তাই দেবি সে আছে তোমায ।
তোমায চিনিব বলে,
নিত্য আসি এই স্থলে,
কে তুমি, তথাপি কেন লুকাও আমায় ।

বস্তু ৫

এটা কি কলস তব মানসমোহন ।
প্ৰেমিক মানস লোভা,
যেই আলয়ের শোভা,
সুবৃণ্ত হৃদয় মোর জাগায় এখন ।
এই যে চৌদিকে মোর
প্রেমে মত্ত রসে ভোর
মুখ টিপি হাসে যাবা এরা কি তোমাব,
সুন্দরী সঙ্গীগণ,
অথবা অতুল ধন,
অনন্ত এ বিশ্বব্যাপী তব অলঙ্কার ।

৬

তু কি সুন্দর ওরা রূপ গরিমায়,—
তু কি রূপের ভালি
অঞ্জলি দিইবে বলি,
তু কি রূপের ফুলে সাজাতে তোমায়,
এত শোভা যত্ন করে
করিয়াছে অকোপকে ?
অথবা অঙ্গর কিছ আছে দেখি তার !

তুই ভুলাতে আঁখি

ঘুবিব কি রূপ দেখি ?

দেখিব কি সে সকলে আলেখ্যের প্রায় ?

৭

ওই যে অপূৰ্ণ শোভা আঁখি প্ৰীতিকব,
ওই যে কানন তরু
ধবে আছে রূপ চারু,
ওরাকি কেবল দেবি শোভাব আকব ?
ওই যে প্ৰকাণ্ড বৃক্ষ
ঘেরিয়াছে অন্তবীক্ষ,
বয়স গভীর ভাব মুখে লেখা তার,
গভীর্য জড়িত হাসি,
হাসিতেছে দিবা নিশি,
ওটাকি কেবল দেবি ভূষণ তোমাব ।

৮

দ্বিস্ত চঞ্চলতা বশে আনন্দিত মনে
ওই ছোট তরুগুলি
কি যেন কি কথা বলি
হাসি হাসি কথা কয় সমীৰণ সনে ।
হেলিয়া হুলিয়া পড়ে,
পুনঃ তাব ঘাড়ে চড়ে,
খেলিতেছে নিবস্তর কছু নহে স্থিৰ,
প্ৰীতিপূৰ্ণ হাসি ভরা
চারু চক্ষু চায় ধবা,
ওরাকি একটা অংশ তোমাব নিধির ?

৯

কোথাও পাদব কোলে কোথা ধরাভলে,
ওই যে কানন লতা
মধুরতা কোমলতা
মাথা মুখে কত কথা বলিছে সকলে ।
কেহবা পাদব অঙ্গে,
কেহবা তুমির সঙ্গে,

মিশিয়া মনেন স্থখে দিতেছে বাহার ।

সমীরণ চলে গায়,

নিজ ভাবে গলে যায়,

ওরাকি কেবল দেবি অঙ্গ অলঙ্কার ?

১০

শুধু কি ও কপে নব মুগ্ধ হবে বলে,

বল, বল গো আমায়

এ মোহিনী লতিকার

চারুকণ্ঠে কণ্ঠহার কবিয়াছ ছলে ।

শুধু কি সাজিবে বলে

সাজায়েছ এ সকলে ?

নানা বর্ণ ফল ফুলে কবেছ সজ্জিত ।

কেবল মানব মন,

ভুলাইতে ও আনন,

তাই কি বিবিধ বর্ণে ভবন বজিত ?

১১

মহামূল্য মণি আদি শোভন ভূষণ

মানব যা ধবে গায়

হে দেবি সে তুলনায়

বল বল এবা কভু হবে কি তেমন

এবা কি তাদেব মত,

প্রাণশূন্য অবিবত,

এবা কি তাদেব মত কিছু যেন নয় ?

কভু কি এ গহনায,

নর অলঙ্কার প্রায়,

মোহবদ্ধ করি নরে মানবহ লয় ?

১২

অপদার্থ অচেতন অনর্থকারণ,

সে গহনা এব সনে

মিলাতে বাসনা মনে ;

ছি ছি ছি ! লজ্জার কথা কেমন সে মন !

কখন সে অলঙ্কার,

অঙ্গ আঁখি অঙ্গকার,

হুচায়ে হৃদয় হৃদে শোভিতে কি পারে ?

তবে যে ইহাষ তায়

প্রভেদ ঠেলিতে চায়

ধিক সে মানব মন শত ধিক তারে ।

১৩

গভীর অজ্ঞান ডোব কঠিন বন্ধনে

আছে বদ্ধ চিত্ত যাব,

সে বুঝিবে কি তোমার,

তব এ শোভাব অর্থ বুঝিবে যেমনে ?

কে তুমি কিসের বলে,

কোন ছলে কি কৌশলে,

মন্ত্র মুগ্ধ কবি মত্ত মাণ্ড হুলাও

নিত্য নিত্য কত জন

কবে তোমা দরশন

কহ দেবি কয় জনে স্বরূপ জানাও ।

১৪

অনিত্য স্থখের লাগি মানবের মন

ভ্রমিতেছে নিবস্তর,

তাই দেবি ও অন্তর

প্রেম চক্ষে একবার না হেরে কখন ।

তাই নিত্য আসি যাই,

দেখেও না দেখা পাই,

কেমনে দেখিবে বল আঁখি যে অজ্ঞান ।

বাহির সৌন্দর্য হেরে,

মিছে কাজে মন করে,

কেমনে নিশ্চিত হুয়ে করে তোমা ধ্যান ।

১৫

মুখ দেখে ছুঁয়ে যায় কে দেখে অন্তর ।

অক্লেশে আশ্রয় পায়,

কে কষ্ট ভুগিতে চায়

কে পড়িবে হৃদয়ের জলন্ত অক্ষর ।

তাই দেবি নিত্য আসি,

ও রূপ সাগবে ভাসি,-

মনোবদ্বৈ গলে ঘাই কবি না যতন ।

নিবমাবে প্রবেশিয়া

অতি যত্নে অধেশিয়া

সে গভীর জল হতে তুলিতে বতন ।

১৬

কেমনে জানিব তব শোভা সমুদয় ;—

বারা নানা রূপ ধরে,

এ অস্তবে খেলা করে,

কেমনে জানিব তাবা শোভা শুধু নয় ।

কেমনে জানিব তারা,

জীবন্ত জীবনে ভরা,

কেমনে জানিব দেবি তাদেব অস্তবে,

মানবের আত্মা সনে

বাঁধা দৃঢ় সুবন্ধনে,

অপরূপ আত্মা এক সদা বাস করে ।

১৭

কেমনে জানিব চাঁদ শুধু চাঁদ নয়;—

কেমনে জানিব তার,

ভিত্তিরের ও আঁধার,

হৃদয়ের ও কলঙ্ক এত প্রভাময় ।

অভাগা আগে কি জানে,

এত ভাব শশিসনে,

তাহলে কি শুধু রূপে এত হাসি হাসি ।

হৃদয়ে একাধ্রু মনে,

চাঁদ হৃদয়েব মনে,

এক না করিবে হই রূপেব প্রয়াসী ।

১৮

কে জানিত প্রকৃতির শোভাধাব ছবি ;—

তাবকা গগনতলে,

কমল সরসিজলে,

তরু কোলে খছোতিকা নভঃশিরে ববি ।

অগণ্য একটা প্রাণ,

অসংখ্য সসীম স্থান,

অধিকার করি প্রাণে প্রাণ মিশাইবে ।

কে জানে নীবব ববে,

পরাণ মাতিয়ে যাবে,

কে জানিত অন্ধকাব এত হাসাইবে ।

১৯

কে জানিত আগে দেবি এই ভূমণ্ডল ;—

অগণ্য রূপটী যার

দেখিলাম একাকাব

কে জানিত আগে দেবি তুমি সে সকল ।

এটা ওটা সেটি নয়

সকলেই একময় ।

কে জানিত আগে দেবি এ বিপুল ধরা ;

শুধু না রূপের ডালা,

এক প্রাণে প্রাণ ঢালা,

অসংখ্য অগণ্যকোটী দেবতায় ভরা ।

শ্রীকাল—

সনাতন ধর্ম ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

সনাতন ধর্মের স্বরূপ ।

ধর্মের স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ দেখা কর্তব্য যে, কোন্ শাস্ত্রে ধর্মের কল্প আকারে কল্পিত হইয়াছে । ববাহ-পুবাণে কথিত আছে যে,—

“স সিন্ধুঃ প্রজাতাদৌ পালনঞ্চ ব্যচিস্তয়ৎ ।
তস্মাচ্চিস্তয়তস্তদ্বাদক্ষিণাং শ্বেত কুন্তলঃ ।
প্রাধ্বব পুরুষঃ শ্বেতমালাহুলেপনঃ ।
তংদৃষ্টোবাচ ভগবান্চতুষ্পাংস্তাংকৃত্যুগে ।
ত্রৈতয়াংত্রিপদচাসৌদ্বিপদো দ্বাপবেহভবৎ ।
কলাবেকেন পাদেন প্রজাঃ পালয়তে প্রবঃ ।
ষড্ভেগহোব্রাহ্মণানাং সত্রিধ্যাক্ষত্রে ব্যবস্থিতঃ ।
দ্বিধা বিশোকধা শূদ্রে স্থিতঃ সর্কগতঃ প্রবঃ ।
গুণদ্রব্য ক্রিয়া জাতি চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ণিতঃ ।
ত্রিশ্লোকোহসৌম্বতোবেদে স সংহিত পদক্রমঃ ।
তথা আত্মজ্ঞানকাব দ্বিধিবাঃ সপ্তহস্তবান্ ।
উদাত্তাদিত্রিভির্কক্ষ এবং ধর্মো ব্যবস্থিতঃ” ।

প্রথমতঃ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি কিরূপে সৃষ্টি করিব, কিরূপেই বা প্রজাপালন হইবে । ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ হইতে শ্বেতমালাধারী, শ্বেতাহুলেপনবিভূষিত শ্বেতকুন্তলবিরাজিত এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন । ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, এই পুরুষ ধর্মনামে বিখ্যাত হইয়া

সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ ও কলিযুগে একপাদ হইয়া প্রজাপালন করিবেন ; ইনি দ্বাদশকলায় পূর্ণ হইয়া, ছয় কলায় ব্রাহ্মণ, তিন কলায় ক্ষত্রিয়, দুই কলায় বৈশ্য এবং এক কলায় শূদ্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন । ইহাঁর পদচতুষ্টয় গুণ দ্রব্য ক্রিয়া ও জাতি নামে অভিহিত হইবে । সংহিতা পদ ও ক্রমঅনুসারে ইনি বেদে ত্রিশ্লোক বলিয়া বিখ্যাত হইবেন । আত্মজ্ঞে দুইটি প্রশ্নবই ইহাঁর দুইটি মস্তক বলিয়া বিখ্যাত হইবে । অকাব উকাব মকাব নাদ বিন্দু কলা ও কলাতীত এই সপ্ত অঙ্গ সপ্ত আশ্বার এবং প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কারত্ব, অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র পঞ্চীকৃত ভূত ইহাঁর সপ্ত হস্ত । ইনি সত্ত্ব বজ্রঃ ও তমঃ এই তিন গুণে এবং উদাত্ত অনুদাত্ত ও সবিৎ এই তিন স্ববে বদ্ধ থাকিবেন । বামন পুরাণে কথিত আছে,—

ধর্মস্বভার্য্যাহিংসাখ্যা তস্মাংপুত্র চতুষ্টয়ম্ ।
লংপ্রাপ্তমুনি শাদ্বীল যোগশাস্ত্রবিচারকম্ ।
জ্যৈষ্ঠঃ সনৎকুমারোহভূৎ দ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ ।
তৃতীয়ঃ সনকো নাম চতুর্থশ্চ সনন্দনঃ ।
সাত্ত্ব্যবেত্তাবমপরং কপিলংবোচুমাস্তুরিং ।
দৃষ্টু পঞ্চশিখং শ্রেষ্ঠং যোগযুক্তং তপোনির্মম ।
জ্ঞানযোগং নতেষুর্জ্যায়াংসোহপি কনীয়সাম্ ।
ধর্মের ভার্য্যা অহিংসারগর্ভে চারিপুত্র উৎপন্ন হইয়া ছিলেন,—ইহাদের নাম সনৎ-
কুমার-সনৎকুমার-সনৎকুমার-সনৎকুমার-

কুমার, সনাতন, সনক ও সনন্দ, ইহঁদের যোগশাস্ত্রের বিচারক ও পবনজ্ঞানী; পবে সাত্যশাস্ত্রবেত্তা তপোনিধি কপিল বোচু আশ্রুতি ও পঞ্চশিখ জন্ম গ্রহণ করিয়া যোগ-যুক্ত হইলেন, পবন্ত তাঁহারা জ্যেষ্ঠ সনৎকুমার প্রভৃতির নিকট প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পাবেন নাই। বিষ্ণুপুত্রের কথিত আছে,—
শ্রদ্ধালক্ষীধৃতিস্বষ্টিঃ পুষ্টিমেধা তথা ক্রিয়া।
বুদ্ধির্লজ্জাবপুঃশাস্তিঋদ্ধিঃ কীর্তি জ্ঞানোদয়ী।
পত্ন্যর্থং প্রতিজ্ঞাহ ধর্মোদ্যাক্ষানীঃ প্রভুঃ।

ধর্ম জ্ঞানোদয় দক্ষকন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। ঐ কন্যাদিগেবনাম শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শাস্তি, ঋদ্ধি ও কীর্তি।

শ্রদ্ধা কামধ্ব জীর্দপং নিয়মং ধৃতিরাক্ষজং।
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিবিস্ময়ত।
মেধাশ্রুতং ক্রিয়াদণ্ডং নয়ং বিনয়মেবচ।
বোধঃ বুদ্ধি স্তম্ভা লজ্জা বিনয়ং বপুরাক্ষজং।
ব্যবসায়ং প্রজ্ঞেত্বৈব ক্ষেমং শাস্তি বস্ময়ত।
সুখং ঋদ্ধি ধনঃ কীর্তীরিত্যেতে ধর্ম স্তনবঃ।

ধর্মের সহযোগে শ্রদ্ধা হইতে কাম, লক্ষ্মী হইতে দর্প, ধৃতি হইতে নিয়ম, তুষ্টি হইতে সন্তোষ, পুষ্টি হইতে লোভ, মেধা হইতে শ্রুত, ক্রিয়া হইতে দণ্ড নয় ও বিনয়, বুদ্ধি হইতে বোধ, লজ্জা হইতে বিনয়, বপু হইতে ব্যবসায়, শাস্তি হইতে ক্ষেম, ঋদ্ধি হইতে সুখ এবং কীর্তি হইতে যশ নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্মের পৌত্র ও কামের পুত্রের নাম হর্ষ। ভাগবতে কথিত আছে ধর্মের জ্ঞানোদয় পত্নীর মধ্যে শ্রদ্ধার গর্ভে ঋত, মেজীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শাস্তির গর্ভে সুখ, তুষ্টির গর্ভে মুদ, পুষ্টির

গর্ভে গর্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, মুষ্টির গর্ভে নব ও নাবাষণ, তিতিকার গর্ভে ক্ষেম এবং হ্রীব গর্ভে প্রশ্রয় উৎপন্ন হইয়াছে।

এস্থলে আত্মবক্ষিক অধর্মের পুত্রাদিও বলা যাইতেছে, যথা, মার্কণ্ডেয় পুত্রাণে—
হিংসাভার্য্যাদ্বধর্মস্য তস্যাজ্জ্ঞে তথানৃতম্।
কন্যাচ নিকৃতি স্তাভ্যাং স্মৃতৌদৌনবকংভবং।
মাষাচ বেদনা চৈব মিৎসুং দ্বযমেতযোঃ।
ভযাজ্জ্ঞেহথ বৈমাষা মৃত্যুং ভূতাপ হারিণম্।
বেদনা স্মৃত্যুতপ্যপি দুঃখং যজ্ঞেহথ বৌরবাৎ।
মৃত্যোর্ব্যাধিজরা শোক তৃষ্ণাঃ ক্রোধশ্চ জজিবে।
দুঃখোত্তরঃ স্মৃতায়েতে সর্বে চাধর্মলক্ষণাঃ।

অধর্মের ভার্য্যার নাম হিংসা। অধর্মের সহযোগে হিংসা হইতে অনৃত নামক পুত্র এবং নিকৃতি নামক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল; পরে অনৃতের গুণসে নিকৃতির গর্ভে শ্মা ও নরক নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ভয়ব পত্নীর নাম মাষা এবং নরকের পত্নী বেদনা। ভয়েব গুণসে মাষার গর্ভে ভূতাপ-হাবী মৃত্যু জন্ম পবিগ্রহ কবে। নরকের সহযোগে বেদনা হইতে দুঃখ নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। মৃত্যুর পাঁচটা পুত্র এই পঞ্চ পুত্রের নাম ব্যাধি, জবা শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ ইহারা সকলেই পূর্ব পুরুষ অধর্মের লক্ষণাক্রান্ত ও অশেষ দুঃখের আকর। মৃত্যুতনয়-গণের ভাষাও নাই, পুত্রও নাই, কারণ, ইহারা সকলেই উর্দ্ধবেতা।

ধর্মমূল যথা মৎস্তপুরাণে—

“অজ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদরাতপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃসত্যম্ভ্রুকোশঃ ক্রমা ধৃতিঃ।
সনাতনস্ত ধর্মস্ত মূলমেতদ্ভূতদরাসদম্”।

অত্রোহ, অলৌভ, ইন্দ্ৰিয়-সংযম, সৰ্ব-
ভূতে দয়া, তপশ্চৰণ, ব্রহ্মচৰ্য্য, সত্য, সকলের
প্রতি অহুকম্পা, অস্ত্রে অপকার কবিলেও
ক্ষমা এবং ধৃতি ; এইদশটা সনাতনধর্মের
তুর্কীমূল। মনু বলিয়াছেন,—

“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্ৰিয়নিগ্রহঃ।

দ্বীর্ঘজীবা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্মলক্ষণং।

ধৃতি, ক্ষমা, ইন্দ্ৰিয়-সংযম, পবিত্রতা হবণে
অপ্রবৃত্তি, শাবীক্ষিত্রা ও মানসিক নিঃশ্রলতা,
নিবিদ্ধ কার্য্যান্তর্য্যানে লজ্জা, জ্ঞান. সত্যনিষ্ঠা,
অক্রোধ এবং বিকাবের কাবণ সবেও চিত্তেব
স্থিরতা এই দশটা ধর্মের লক্ষণ।

পদ্মপুবাণে ভূমিখণ্ডে কথিত আছে,—

“ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসাচ প্রবর্ততে।

দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমাশৌচেন বল্লভ।

অহিংসয়া শূশান্ত্যাচ অস্ত্রে যেনাপি বর্জ্যতে।

এতৈর্দশ বিধৈবৈবৈধর্মমেব প্রসূচয়েৎ।

ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তপশ্চৰণ, দান, নিয়ম, ক্ষা

শৌচ, অহিংসা, শান্তি, ও অস্ত্রে এই দশটা

চিহ্ন দ্বাৰা মনুষ্যকে ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞানিতে

পাৰা যায়। পদ্মপুবাণের উক্ত খণ্ডে আছে,—

“পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্

শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়বিধঃ ধর্ম লক্ষণম্।

সংপাত্রে দান, ত্রীকৃষ্ণে মতি, মাতা

পিতার পূজা, ধর্ম শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, সৰ্ব ভূতে বলি

প্রদান ও গোগ্রাস প্রদান এই ছয়টা লক্ষণ

দ্বারা জ্ঞানিতে পাৰা যায় যে, এই ব্যক্তি

বৈষ্ণবেব মধ্যে ধার্মিক। ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত

পুবাণে প্রকৃতিখণ্ডে কথিত আছে,—

“শালগ্রামো হরেমুর্জিগ্নগল্লাথশ্চ ভারতম্।

কলেদর্শ সন্থস্রাস্ত্রযর্ঘ্যো ত্যক্তা হরেঃ পদম্।

সবধ ধর্ম সত্যঞ্চ বেদাশ্চ গ্রাম্যদেবতাঃ।

ব্রতং তপশ্চানশনং ষযুস্তৈঃ শাঙ্ক মেবচ”।

শালগ্রাম, বিষ্ণুমূর্ত্তি ও জগন্নাথ ইহঁদা

কলির দশ সহস্রবৎসর অতীত হইলে ভারত

বর্ষ পরিত্যাগ পূর্বক বিষ্ণু পদে লীন হইবেন।

এই সময় গ্রাম্য দেবতা, সন্থগুণ, ধর্ম, সত্যযুগ

সত্য কথা ও সত্য ব্যবহার, চতুর্বেদ, তপস্তা,

একাদশী প্রভৃতি অনশনব্রত, তাঁহাদের

সহিত গমন করিবেন। ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণে

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ধর্মের নিত্য আধাব ও

ধর্মের অগম্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে যথা,—

“যত্রস্থানং তবাধাবৌ বদামি শ্রয়তাংবিভো।

বৈষ্ণবেষু চ সর্বেষু যতিষু ব্রহ্মচারিষু।

পতিব্রতাসু প্রাজ্ঞেষু বানপ্রস্থেষু ভিক্ষুযু।

নৃপেষু ধর্মশীলেষু সৎসু সর্বেষু জাতিষু।

দ্বিজসেবিষু শূদ্রেষু সৎসংসর্গস্থিতেষু চ।

এষু ত্বং সততং পুণ্যে ধর্মবাজ বিরাজসে।

যুগে যুগে তবাধাবা এতে পুণ্যতমা জনাঃ।

ধর্ম। যে যে স্থান চাৰি যুগেই তোমাব

নিযত আধাব হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ

কর। বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিগণ, যতিগণ, ব্রহ্ম-

চারিগণ, পতিব্রতা রমণীগণ, তপস্জ্ঞান সম্পন্ন

জনগণ, বানপ্রস্থগণ, ভিক্ষুগণ, ধর্মশীল

রাজগণ, সাধুগণ, ধর্মাহুসারে ক্রয় বিক্রয়-

কাৰী বাণিজ্যজীবী জনগণ, দ্বিজসেবাপরা-

য়ণ শূদ্রগণ, সাধুসংসর্গস্থিত জনগণ এই

সমুদায় পুণ্যতম মনুষ্যে তুমি চাৰি যুগেই

নিরন্তর পূর্ণ মাত্রায় অবস্থান কবিবে ; এই

সমুদায় মহাত্মা তোমাব নিত্য আধার, এই

সমুদায় স্থলে তুমি কদাপি ক্লেশ বা তুর্কল

হইবে না। তৎপরে নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

“অশ্বখ বটবিষেযু তুলসী চন্দনেষু চ।

দেবার্হেযু চ পুষ্পেষু বিস্তমানোহসি-শাখিষু +

দেবালয়েষু তীর্থেষু সত্যং শগদগৃহেষু চ ।
বেদবেদাঙ্গশ্রবণজনেষু চ সভাসু চ ।
শ্রীকৃষ্ণগুণনামোক্ত শ্রুতিগীতস্থলেষু চ ।
ব্রত পূজা তপোস্থায় যজ্ঞ সাক্ষিস্থলেষু চ ।
দীক্ষাপবীক্ষাশপথ গোষ্ঠ গোম্পদভূমিষু ।
গবাং গৃহেষু গোষ্ঠেষু বিচমানোহি পশুসি ।
কুশতা তেন ভবিতা ধর্ম এব স্থলেষু চ ।”

অখব বৃক্ষ, বটবৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষ, বিষ্ণপত্র,
তুলসী, চন্দন, দেব পূজার যোগ্য পুষ্প,
তুলসী বৃক্ষ, চন্দন বৃক্ষ, দেবপূজাযোগ্য
পুষ্প বৃক্ষ, দেবালয়, তীর্থ, সাধুভবন, বেদ
বেদাঙ্গশ্রবণপাষণ জনগণ, বেদপাঠাদির
সভা, শ্রীকৃষ্ণেব গুণকীর্তনস্থান, শ্রীকৃষ্ণেব
নামকীর্তনস্থান, কৃষ্ণাদি দেবচবিতসঙ্গীত
স্থান, ব্রতস্থান, পূজাস্থান, তপোস্থান, আশা-
সাবে কার্যস্থান, যজ্ঞস্থান, সাক্ষিস্থান, দীক্ষা
স্থান, পাপ পুণ্য পবীক্ষার স্থান, শপথ স্থান,
গোপ্রচাবস্থিত গোম্পদ ভূমি, গোগৃহ ও
গোষ্ঠ এই সমুদায় স্থলে তুমি নিষত বিচমান
পাকিবে ।

ধর্মের অগম্য স্থান যথা,—ব্রহ্মবৈবর্ত
পুবাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ৪২ অধ্যায়ে—
“এতদন্তেষু কুশতা যদগমঞ্চ তচ্ছৃণু ।
পুংস্কলীযু তদগৃহেষু গৃহেষু নবঘাতিনাং ।
নবঘাতিষু নীচেষু মূর্ধেষু চ খলেষু চ ।
দেবতঃ গুরুবিপ্রশ্চ পাল্যানাং ধনহারিষু ।
আসন্নরেষু ধূর্তেষু চৌরেষু রতি ভূমিষু ।
হুরোদর শ্রবাপান কলহানাং স্থলেষু চ ।
শালগ্রাম সাধু তীর্থ পুবাণ রহিতেষু চ ।
দম্ব্য ঐশ্বেষু দেশেষু তালচ্ছায়াশ্চ গর্ভিষু ।
অসিজীবী মসীজীবী দেবল গ্রাম যাজিষু ।
বৃষবাহ স্বর্ণকার জীবহিংসোপজীবীষু ।

ভর্তৃমিন্দিত নাবীষু জীজিতেষু চ পুংসু চ ।
দীক্ষা সন্ধ্যা বিষ্ণুভক্তি বিহীনেষু দ্বিজেষু চ ।
সাপ কচ্ছা বিক্রযিষু স্বযৌষিধিক্রযিষ্ঠ ।
শালগ্রামশ্রবগ্রহভূমিক্রযিষু প্রভো ।
মিত্রদ্রোহি কৃতঘ্নেষু সত্য বিশ্বাস ঘাতিষু ।
শবণাগত হীনেষু আশ্রিতঘ্নেষু তেষু চ ।
শশ্মমিত্যোক্তিশীলেষু তথা সীমাপহাবিষু ।
কামাৎ ক্রোধান্তথালোভান্মিত্যা সাক্ষি
প্রবাদিষু ।

পুণ্য কর্ম বিহীনেষু পুণ্য কর্ম বিবোধিষু ।
স্বাত্ম মেতেষু নিন্দোষু নাধিকাব স্তব প্রভো” ।
ধর্ম । আমি পূর্বে যে সমুদায় স্থান
নির্দেশ কবিয়াছি, তদ্ব্যতীত অস্ত্রস্থানে
তুমি কুশ ও দুর্কল হইয়া পড়িবে । বিশে-
ষতঃ তোমাব যে যে স্থান অগম্য তাহা
নির্দেশ কবিয়া দিতেছি শ্রবণ কর । পুংস্কলী
বমণী নবঘাতক, পুংস্কলী বৃহ, নবঘাতকেব
গৃহ নীচাশয়, মূর্ধা, খল, যাহারা দেবতা
গুরুব্রাহ্মণ ও প্রতিপাল্য ব্যক্তিব ধন হরণ
কবে তাহাদশ ব্যক্তিগণ, অসৎলোক, ধূর্ত,
চোর, চরনাবীসঙ্গমস্থান, পাশক্রীড়াস্থান,
শ্রবাপানস্থান, কলহস্থান, যে সমুদায়
ব্যক্তি শালগ্রাম সেবা সাধুসঙ্গ, তীর্থগমন
ও পুবাণ শ্রবণ করে না তাহাদশ ব্যক্তিগণ,
দম্ব্যগ্রস্ত দেশ, তালবৃক্ষচ্ছায়া, অসিজীবী,
মসীজীবী, দেবল, গ্রাম যাজক, যে ব্যক্তি
ব্রহ্মদ্বারা শকটচালন করে এবং যে ব্যক্তি
ঐক্লপ শকটে গমনাগমন কবে তাহাদশ ব্যক্তি,
স্বর্ণকার, জীবহিংসাই যাহার উপজীবিকা
তাহাদশ ব্যক্তি, ভর্তৃবিদ্বেষিণী রমণী, জৈণ
পুরুষ, যাহারা দীক্ষিত হয় নাই, সন্ধ্যা করে
না ও বিষ্ণুভক্তিবহীন তাহাদশ দ্বিজগণ,

কৃত্যবিক্রয়ী মনুষ্য, ভাৰ্য্যা বিক্রয়ীমনুষ্য, শালগ্রাম বিক্রয়ী মনুষ্য, ধৰ্ম্মগ্রন্থ বিক্রয়ী মনুষ্য, দেবতাবিক্রয়ী মনুষ্য, মিত্রদ্রোহী, কৃতদ্বন্দ্ব, সত্যভঙ্গকাৰী, বিশ্বাস-ঘাতক, শবণাগতপ্রতিপালনবিমুখ, আশ্রিত-ঘাতক, নিরুদ্ভব মিথ্যাবাদী ও সীমাপহারী মনুষ্য, যাহাবা কাম ক্রোধ বা লোভ নিবন্ধন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাদৃশ পাপভুগণ, যে সমুদায় মনুষ্য পুণ্যকৰ্ম্ম-বিহীন, যাহাবা পুণ্যকৰ্ম্ম বিবোধী সেই সমুদায় নিন্দনীয় ও স্থগিত স্থানে তোমাব অবস্থান বা গমন করিবাব অধিকার নাই।

গুরুদ পুৰাণে কথিত হইয়াছে;—

“সত্যং দমস্তপঃশৌচং সন্তোষঃ ক্ৰান্তিবার্জিবন্ম।

জ্ঞানং শমোদযাদান মেধধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ।

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাশ্রোহঃ

প্রবর্ততে।

লোভাশ্রোহঃ মায়া চ মানো মৎসবএব।

বাগ্ধেবানুতক্রোধ লোভ মোহ মদোজ্জিহ্বাঃ।

যঃ স শাস্তঃ পরং লোকং যতি পাপবিবর্জিতঃ।

দেবতা মুনয়ো নাগা গন্ধৰ্ব্বা গুহ্যকামিরাঃ।

ধাৰ্ম্মিকং পূজয়ন্তীহ ন ধনাঢ্যং ন কামিনং”।

সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয় সংযম, তপস্বী, শৌচ অৰ্থাৎ কাৰিক ও মানসিক নিৰ্ম্মলতা, সন্তোষ, ক্ৰান্তি, গুহুতা, জ্ঞান, শাস্তি, দয়া, দান এই একাদশটি সনাতন ধৰ্ম্ম। লোভ হইতে ক্রোধেব উৎপত্তি হয়, লোভ হইতে পরদ্রোহ ও উপস্থিত হইয়া থাকে, লোভ হইতে মোহ, মায়া, মান ও মাৎসৰ্য্য এতৎ সমুদায়েব আবির্ভাব হয়। যে ব্যক্তি রাগ, ধেব, অনুতাচরণ, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ পরিত্যাগ কবিত্তে

পাবিবাছেন, তিনিই শাস্তি লাভ কবেন এবং সেই ধৰ্ম্মান্বাই পাপ মুক্ত হইয়া পরলোকে গমন কবিত্তে পাবেন। দেবগণ, মুনিগণ, নাগগণ, গন্ধৰ্ব্বগণ, গুহ্যকগণ ও মনুষ্যগণ সকলেই ধাৰ্ম্মিক ব্যক্তিব পূজা কবেন, কোন ব্যক্তিই ধনাঢ্য ও কাম পবতদ্ব লোকের পূজা বা প্রশংসাদি কবেন না।

মহুসংহিতা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ কত্রিয় প্রভৃতি জাতি বিশেষের পৃথক পৃথক ধৰ্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন স্থলে সম্প্রদায় বিশেষেব ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্ম নিরূপিত আছে এথা বামন পুৰাণ ১১ অধ্যায়ে—

“সুকেশিকুবাচ”।

“কিংলকণে ভবেদ্ধৰ্ম্মঃ কিমাচরণ সৎক্রিয়াঃ।

যমাস্ত্রিত্য ন সীদন্তি দেবাচ্চাস্ত তদুচ্যতাম্”।

ঋষব উচুঃ।

দেবানাং পবমোধৰ্ম্মঃ সদা যজাদিকাঃ

ক্রিয়াঃ।

স্বাধ্যায় বেদবেত্ত্বং বিষ্ণুপূজা বতিঃ স্মৃতিঃ।

দৈত্যানাং যাহশালিঃ মাৎসৰ্য্যং যুদ্ধ সৎক্রিয়া।

বিন্দনং নীতি শাস্ত্রাণাং হবশক্তি কদাচ্ছতা।

সিদ্ধানামুদিতোধৰ্ম্মো যোগ যুক্তি রত্নস্তমা।

স্বাধ্যায়ং ব্রহ্মবিজ্ঞানং ভক্তির্দ্বাভ্যামপিস্থিরা।

উৎকৃষ্টোপাসনং জেবং নৃত্যবাঞ্ছোবু বাদিতা।

সবস্বত্যাং স্থিরা ভক্তি গীৰ্দ্ধকো ধৰ্ম্মউচ্যতে।

বিজ্ঞাধরত্মতুলং বিজ্ঞানং পৌরুষে মতিঃ।

বিজ্ঞাধবাণাং ধৰ্ম্মোহংগ ভবাচ্চাং ভক্তিরেব চ।

গান্ধৰ্ব্ব বিজ্ঞাবৈদিত্বং ভক্তিঃ স্থানো তথা

স্থিরা।

কৌশল্যং সৰ্কশিল্পেবু ধৰ্ম্মঃ কিস্পূৰুযঃ স্মৃতঃ।

ব্রহ্মচৰ্য্য মমানিত্বং যোগাত্যাস রতি দৃঢ়া।

সৰ্কত্রে কামচাবিত্বং বৰ্ম্মোহংগ পৈতৃকঃ স্মৃতঃ।

ব্রহ্মচর্য্যং যতশিষ্যং অপ্যজ্ঞানঞ্চ বাকস ।
নিয়মা ধর্ম বেদিষু মার্গঃ ধর্মঃ প্রচক্ষতে ।
স্বাধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ দানং যজ্ঞনমেষচ ।
অকার্পণ্য মনাযাসং দধা হিংসাক্রমাদযঃ ।
জিতেন্দ্রিয়ং শৌচঞ্চ মাদ্রল্যং ভক্তিকৃত্যতে ।
শঙ্করে ভাস্করে দেব্যাম ধর্মোহয়ং মানবঃ

মৃতঃ ।

ধনাধিপত্যং ভোগানি স্বাধ্যায়ে শঙ্করার্চনাং ।
অহংকার মর্শৌচঞ্চ ধর্মোহয়ং ভক্ত্যকেশিত ।
পরদাবাভিমর্ষিঞ্চ পবার্থেহপিচ লোভুপ ।
স্বাধ্যায়ে জ্যৈষ্ঠকে ভক্তি ধর্মোহয়ং বাকসঃ

মৃতঃ ।

অবিবেকতাংহ্যজ্ঞানং শৌচহানি বসত্যতা ।
পিশাচানাময়ং ধর্মঃ সদাচামিষ গুরুতা ।
যোনিস্ত দ্বাদশে তাঃ সহধর্ম্মান্ত রাকস ।
ব্রহ্মণ কথিতাঃ পুণ্যা দ্বাদশৈব গতিপ্রদাঃ” ।

মুকেশি কহিলেন, ধর্মের লক্ষণ কি ও
আচার অহুষ্ঠানই বা কিরূপ, কিরূপ ধর্ম
আশ্রয় কবিলে দেব গুরুর্ষ প্রভৃতি অবসর
হবেন না? ঋষিগণ কহিলেন, সর্বদা
যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অহুষ্ঠান, বেদ উপনিষদ
প্রভৃতি অধ্যয়ন, বেদ ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি
জ্ঞান, বিষ্ণু পূজার রতি, কর্তব্যাকর্তব্য
স্মরণ এই সমুদায় দেবগণের ধর্ম, এই ধর্ম্ম-
বলস্বী মনুষ্যকে দেবধর্ম্মাবলস্বী বলা যায় ।

১। সর্বদা বাহবল প্রকাশ, মাৎসর্য্য,
বুদ্ধ শালিতা, নীতি শাস্ত্র জ্ঞান ও তামসিকা-
ওণ অবলম্বন এই সমুদায় দৈত্যদিগের ধর্ম,
এইরূপ ধর্ম্মাবলস্বী ব্যক্তিকে দৈত্য ধর্ম্ম-
বলস্বী বলা যায় । ২। সর্বদা যোগাহুষ্ঠান
ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, কায়িক ও মানসিক ভক্তি
ও ঐক্যপ্রভা এবং ব্রহ্ম বিজ্ঞান এই সমুদায়

সিদ্ধগণের ধর্ম, বাহ্যর এইরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন
করেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধ ধর্ম্মাবলস্বী বলা
যায় । ৩। উৎকৃষ্ট রূপে উপাদান, সর-
স্বতীর প্রতি দৃঢ় ভক্তি, নৃত্য গীত ও বাদ্যে
নিপুণতা এই সমুদায় গন্ধর্ব্বগণের ধর্ম্ম, এই
ধর্ম্মাবলস্বী মনুষ্যগণকে গান্ধর্ব্ব ধর্ম্মাবলস্বী
বলা যায় । ৪। অতুল বিজ্ঞান, বিজ্ঞা-
ধাবণ, পৌরুষ প্রকাশে মতি এবং ভগবতী
ভবানীর প্রতি ভক্তি এই সমুদায় বিজ্ঞাধব-
দিগের ধর্ম্ম এবং এইরূপ মনুষ্যগণকে বিজ্ঞা-
ধর ধর্ম্মাবলস্বী বলা যায় । ৫। গান্ধর্ব্ব
বিজ্ঞান নিপুণতা, মহেৎসবের প্রতি দৃঢ় ভক্তি
এবং সমুদায় শিল্পশাস্ত্রে বিচক্ষণতা এই
সমুদায় কিন্নরগণের ধর্ম্ম এইরূপ ধর্ম্মাশ্রিত
মনুষ্যগণকে কিন্নর ধর্ম্মাবলস্বী বলা হইয়া
থাকে । ৬। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, অভিমান
শূন্যতা, সর্বদা যোগাভ্যাসে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি
এবং চারিত্য এই সমুদায় পিতৃগণের ধর্ম্ম,
ঈদৃ ধর্ম্মাশ্রিত মনুষ্যগণকে পৈতৃক ধর্ম্মাব-
লস্বী বলা যায় । ৭। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন,
পরিমিত আহাব, অপবহস্তা বিজ্ঞান, নিয়ম,
ধর্ম্মজ্ঞান এই সমুদায় আর্য্য ধর্ম্ম, এতদধর্ম্মাবলস্বী
মনুষ্যগণকে ঋষিধর্ম্মাবলস্বী বলা যায় ।
৮। মনুষ্যগণের ধর্ম্ম এই যে, বেদ ও ধর্ম্ম
শাস্ত্র অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, সৎপাত্রে
দান, দেবতার পূজা, অকাতরতা, ক্রেশ
সহিষ্ণুতা, দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, অন্তের
প্রভৃতি ওণ সমুদায়, জিতেন্দ্রিয়তা, কায়িক
ও মানসিক নির্মলতা, শ্রেয়স্কর কার্যের
অহুষ্ঠান এবং শঙ্কর, ভাস্কর ও ভগবতী
ভবানীর প্রতি ভক্তি, এতদধর্ম্মাবলস্বী ব্যক্তি-
গণকে মানব ধর্ম্মাবলস্বী বলা যায় । ৯।

ধনেব অধ্যাক্ষতা, বিষয় ভোগ, বেদাদি অধ্যয়ন, শব্দবেব অর্চনা, অহঙ্কার এবং কাযিক ও মানসিক অন্ত্রিতি এই সমুদায় গুহকগণেব ধর্ম, ঈদৃশ ধর্মাপ্রিত মনুষ্যকে গুহকধর্মাবলম্বী বলা হইয়া থাকে । ১০ । পবল্লী হবণ, পবধনে লোভ, বেদাদি অধ্যয়ন ও শব্দবেব প্রতি ভক্তি এই সমুদায় বান্ধস ধর্ম, ঈদৃশ স্বভাষাপন্ন মনুষ্যদিগকে বান্ধস ধর্মাবলম্বী বলা যায় । ১১ । অবিবেকিতা অজ্ঞান, কাযিক ও মানসিক নিম্নলতা ত্যাগ, অসত্য নিষ্ঠা এবং মাংসলোলুপতা এই সমুদায় পিশাচগণেব ধর্ম, এইরূপ ধর্মাবলম্বী মনুষ্যগণকে পিশাচ বলা যায় । ১২ । এই ষাটশ বিধ সম্প্রদায়েব ষাটশ প্রকাব ধর্ম ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত হইয়াছে। ইহাব মধ্যে যিনি যে ধর্মাবলম্বী হইবেন তাঁহাব গতিও সেইরূপ হইবে, অর্থাৎ দেব ধর্মাবলম্বী হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ধর্মাবলম্বী হইলে গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ধর্মাবলম্বী হইলে রাক্ষস ও পিশাচ ধর্মাবলম্বী হইলে পিশাচ হইয়া উঠিবেন ।

ক্রীমস্তাগবতে সংক্ষেপে ধর্ম ও অধর্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে যথা,

“বেদপ্রণিহিতো ধর্মোহধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ” ।

অর্থাৎ বেদ বিহিত কার্যেব অমুষ্ঠানই ধর্ম এবং বেদে নিষিদ্ধ কার্যেব অমুষ্ঠানই অধর্ম । মহাভাবতে কথিত হইয়াছে,

“অহিংসা লক্ষণোধর্মো হিংসাচাধর্মলক্ষণঃ” ।

সর্বত্র অহিংসাই ধর্ম এবং হিংসাই অধর্ম ।

ধর্ম দীপিকাতে কথিত হইয়াছে,

“বিহিত ক্রিয়াষা সাধ্যো ধর্মঃ পুংসাং গুণো-

মতঃ ।

নিষিদ্ধ ক্রিয়া সাধ্যঃ সন্তোষধর্ম উচ্যতে” ।

বেদ ও ধর্মশাস্ত্রেব বিধানানুসারে যে কার্য করা যায় তদ্বারা মনুষ্যেব যে একটা শুভাদৃষ্ট জন্মে তাহাই ধর্ম, বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ কার্য কবিলে যে একটা দুর্দৃষ্ট জন্মে তাহাই অধর্মশব্দে কথিত হইয়া থাকে । ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুবাণে প্রকৃতি খণ্ডে ইহার পোষকতা হইতেছে যথা,

“বেদ প্রণিহিতং ধর্ম কর্ম তন্মঙ্গলং পরম্” ।

বেদ ও ধর্মশাস্ত্রেব বিধান অনুসারে যে কার্য করা যায় তাহাই ধর্ম কর্ম এবং তাহাই পবম মঙ্গল দায়ক । অগ্নি পুরাণে কথিত হইয়াছে,

“এষ ধর্মো মহাসন্ত্যাগো দানভূত দয়া তথা ।

ব্রহ্মচর্য্যং সদাসত্য মনুক্রোশো ধৃতিঃ ক্ষমা ।

সনাতনস্ত ধর্মস্ত মূলমেতৎ নমাসতঃ” ।

মহাবিগণ ! আমি যে সমুদায় দানাদির কথা কহিলাম, তদ্বারা মহাধর্ম সঞ্চিত হয়, পবন্ত আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, ত্যাগ স্বীকাব, দান, সর্বভূতে দয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, নদা সত্য নিষ্ঠা, সকলেব প্রতি অনুকম্পা, ধৃতি ও ক্ষমা এই আটটি সনাতন ধর্মের মূল ।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বাবা ধর্মের আকার কি তাহা এক প্রকাব নিকপিত হইল, এক্ষণে ধর্ম শব্দ কিরূপে নিম্পন্ন হইয়াছে তাহা একবাব দেখা কত্তব্য । “বু” ধাতুর অর্থ পোষণ কবা, ধাতুর উত্তর “ম” প্রত্যয় করিয়া ধর্ম শব্দটি নিম্পন্ন হইয়াছে, প্রকৃতিও প্রত্যয়যোগে এইরূপ অর্থ নিম্পন্ন হইতেছে যে, যিনি সকল মনুষ্যকে পরিপোষণ করেন তিনিই ধর্ম । এখানে অন্নাদি ভক্ষণ দ্বারা শরীরের পুষ্টিহর

বটে, কিন্তু তদ্বারা শরীরী আত্মাব পুষ্টি হয় না। চৌর্ধ্য অসত্য বাক্য প্রভৃতি দ্বারা জীবের উৎকর্ষ সাধন হয় না, প্রভূত অপকর্ষই হইয়া থাকে, স্মৃতবাং তাহা অধর্ম। শাস্ত্র কারেরা জ্ঞানকে ধর্মের মধ্যে গণনা করেন না, তাঁহাবা কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত কবিয়া কর্মকাণ্ড জনিত ফলকেই ধর্ম ও অধর্ম এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা আপাতত কর্ম ও জ্ঞান উভয়কেই ধর্মের মধ্যে গণনা করিলাম, পবে যখন জ্ঞানকাণ্ডের উন্নত শাখায় উপনীত হইব তখন কর্মকাণ্ড হইতে জ্ঞান কাণ্ডকে পৃথক্ কবিয়া লইব। ধর্ম দীপিকা ব্রহ্মবৈবর্ত পুৰাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্মের যেকোন লক্ষণ করা হইয়াছে ধর্মশাস্ত্রের অর্থ অনুসারে ও সেই লক্ষণ সঙ্গত হইতেছে। এস্থলে আমরা একপদ স্বরূপও বলিতে পারি যে, যদ্বাচা মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান হয়, তাহাই ধর্ম। আহার বিহাবাদি দ্বারা ঐহিক মঙ্গল হয় বটে, কিন্তু তদ্বাচা পারত্রিক মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, স্মৃতরাং আহার বিহাবাদি ধর্মের মধ্যে পরিগণিত নহে। হঠযোগ সাধনাদি স্থলে পবিত্রিত আহারাদি আবশ্যক, স্মৃতরাং সেস্থলে পরিমিত আহারাদিও ধর্মের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। হঠযোগ দ্বারা ধর্ম সঞ্চয় হয়, তৎকালে পরিমিত আহার বিহার প্রভৃতি তাহার সহকারী।

এস্থলে একপদ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, কোন কোন সন্ন্যাসী পঞ্চতপ্য হইয়া তপস্যা করিতেছেন, কেহ কেহ উর্দ্ধবাহু হইয়া আছেন, কেহ কেহ ক্রুদ্ধের পত্র

জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া তপঃ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেবত ঐহিক মঙ্গল দেখিতেছি না, তাঁহাদের কি ধর্মামুষ্ঠান হইতেছে না? যদি ঐহিক মঙ্গল না হইলে ধর্মামুষ্ঠান বলা না যায় তাহা হইলে উক্ত সন্ন্যাসীদিগকে কি ধার্মিক বলা যাইবে না?

আমরা দেখিতেছি, উক্ত বিধ পঞ্চতপ্য ও উর্দ্ধবাহু প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ বহুবিধ কায়িক কষ্ট স্বীকার কবিতেন, তদ্বাচা তাঁহাবা হুঃখ অনুভব কবিতেন বা সুখ অনুভব কবিতেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। সুখ ও হুঃখের কাবণ কি? এস্থলে মনুস্মৃতিলাভে,

“সন্তোষঃ পরমাত্মায় স্মৃৎখ্যাং সংযতো বসেৎ ।
সন্তোষ মূলং হি সুখং হুঃখ মূলং বিপর্যয়ঃ” ॥

ইহাব তাৎপর্য এই যে, যিনি সুখ ভোগ কবিত ইচ্ছা করেন, তিনি বাসনা ত্যাগ পূর্বক একমাত্র সন্তোষ অবলম্বন কবিয়া অধ্যয়ন করুন; কারণ, একমাত্র সন্তোষই সুখের মূল এবং অসন্তোষই অশেষ হুঃখের কাবণ। উক্ত প্রকার কঠোর তপস্যায় বহু সন্ন্যাসিরা যদি বাসনা ত্যাগ পূর্বক সন্তোষ অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তোষও তন্মূলক সুখের পরিসীমা নাই এবং সেই সুখই তাঁহাদের শ্রেয়। ঈদৃশ অবস্থায় উক্ত কঠোর তপস্যায় নিরত সন্ন্যাসিদিগকে অস্বাভাবিক লক্ষণ অনুসারে পবম ধার্মিক বলা যাইতে পারে কারণ, হুঃখ পরিহার পূর্বক সুখলাভই মনুষ্যগণের পক্ষে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল।

পরন্তু যদি ঐ কঠোর ব্রত পরায়ণ ব্যক্তিগণ বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া থাকেন

তাহা হইলে তাঁহাদের মনে সন্তোষের আবির্ভাব হয় নাই। ঈদৃশ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষ-তপা প্রভৃতি হইতে কষ্ট হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? যাহার উত্তম শয্যা শয়নের ইচ্ছা আছে, তিনি যদি পুণ্য সঙ্ঘের লোভে ভূমি শয্যা শয়ন করেন, যাহার কামিনী সন্তোগের ইচ্ছা আছে, তিনি যদি নির্জনে পর্কত গুহায় বসিয়া থাকেন, যাহার চর্ক-চোষা লেহু পেয় আহ্বারের ইচ্ছা আছে তিনি যদি অরণ্য মধ্যে থাকিয়া গলিত পত্র ভক্ষণ করেন তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে ধার্মিক বলিয়া নির্দেশ কবিতো পারি না, পবিত্র একপ বলিতে পাবি যে, তাঁহারা ধার্মিকের ন্যায় বাস্তব্যবহার কবিতেন। কলূতঃ মনই ধর্ম ও অধর্মের কর্তা, শবীর সহকারী মাত্র।

যাহারা জম্বাঠমী একাদশী বা শিবরা-ত্রির উপবাস করিয়া ক্ষুধা বা পিপাসা নি-
ব্বান কোন বস্তু ভক্ষণ বা পান করিতে
স্বক হয়েন, অথচ লোক লজ্জাভয়ে কষ্ট

করিয়া ও নিবৃত্ত থাকেন, আমাদের লক্ষণ
অনুসারে তাঁহারা ধার্মিকের মধ্যে পরিগণিত
হইতেছেন না। নিতান্ত ক্ষুধা হইলে জল
বা দুগ্ধ পান করা কর্তব্য, আত্মাকে কষ্ট
দেওয়া কোন ক্রমেই ধর্মের অনুমোদিত
নহে। অতএব আমরা বলিতেছি যদ্বা-
ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান হয় তাহাই
ধর্ম। নিয়মিত আহাব বিহার প্রভৃতি না
হইলে শবীর বক্ষা হয় না এবং শবীর ব্যতি-
রেকে ও ধর্মোচ্ছান হইতে পাবেনা, সুতরাং
নিয়মিত আহাব বিহার প্রভৃতি সনাতন
ধর্মের সহকারী বলিয়া নির্দেষ্ট আছে।

আমাদিগের কথিত ধর্ম লক্ষণ, স্নেহ ধর্ম
সম্পূর্ণরূপে যাইবে না, ইহার অর্দ্ধাংশ মাত্র
যাইতে পাবে, তাহাতে স্নেহদিগের পক্ষে এই
রূপ লক্ষণ হইবে যে, যদ্বা-
হয় তাহাই ধর্ম। আহাব বিহারাদি সহিত
স্নেহ ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

ক্রমঃ—

শৈলজা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

সুরমালা ও নীরমালা কে? ষোগেশ
ও ভবেনই বা কে? এ বিষয় কিছুই বলা

হয় নাই। হাবড়ার পশ্চিম খানাকুল কৃষ্ণ-
নগর বলিয়া একটি গ্রাম আছে। উক্ত
গ্রামে পঞ্চানন স্তায়রস বলিয়া একটি লোক
বাস করিতেন। উক্ত পত্নী ও তদ্বিকটস্থ

আমের লোকেরা তাঁহাকে দেবতার স্তায় মান্ত কবিত। তাঁহার মত স্তায় শাস্ত্র কেহ জানেন না বা জানিলেও বাঙ্গালায় তাঁহার মত কেহ উক্ত শাস্ত্র পড়াইতে পাবেন না এই তাহাদিগের ঐক্য বিশ্বাস ছিল। কলিকাতায়ও অনেক ঘর তাঁহার ধনী যজমান ছিল। শ্রাদ্ধে কবিতা লিখিয়া—সত্য কুট শ্লোকের অর্থ কবিতা বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জন কবিতা গিয়াছেন। হু দশ খানা জমীও কিনিয়াছিলেন। স্ত্রাবরত্ন মহাশয়ের পবিত্রারের মধ্যে গিন্নি, পুত্র জীমান্ গোপীনাথ স্ত্রাবরত্ন, পুত্রবধু এবং একমাত্র পৌত্রী স্ত্রাববালা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। এই কয়েকটা বাখিরা স্ত্রাবরত্ন মহাশয় স্মৃতে ইহলীলা পবিত্রাগ করেন।

গোপীনাথের সংসারও প্রায় সেইরূপ ছিল; কেবল একটা কি ও দুইটা মালী অধিক বাখিয়াছিলেন। পিতার অপেক্ষা বিষয়ের আরও একটু বেশী হইয়া ছিল, গোপীনাথ তাঁহার পিতার মত পবিত্রমী ছিলেন না। তিনি মাঝে মাঝে শিষ্যের বাড়ী ঘাভাভ কবিতেন। শিষ্যদিগের নিকট হইতে যাহা কিছু লইয়া আনিতে, তাহাতেই সংসার যাত্রা নির্বাহ হইত। বাকী আয়ে সমস্তই জমী ক্রয় করা হইত। গোপীনাথ একটা টোল কবিতা ছিল। টোলে অনেক ছাত্র গোপীনাথের ঘরওয়ানা স্ত্রায় পড়িতে আসিত।

গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় স্ত্রাবরত্ন মহাশয় স্ত্রাববালার বিবাহ জীমান্ হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত দিখাছিলেন। হরিশ্চন্দ্র কোন এক বিখ্যাত বণিকের 'বুড় কিপার'

ছিলেন। বর স্বয়ং কনে দেখিয়া পছন্দ করিয়া বিবাহ কবিতাছিলেন। বিবাহে স্ত্রাবরত্ন মহাশয়ের বড় কিছু ব্যয় হয় নাই, কারণ স্ত্রাববালা হরিশ্চন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার। তা বলিয়া হরিশ্চন্দ্রের বয়ঃক্রম বড় বেশী হয় নাই। আনুমান্য ২৫ কি ২৬ হইবে। দেখিতে কাল মুখশ্রী মন্দ নহে। বেতন শতাবধি টাকা—উপরি বিলক্ষণ।

স্ত্রাববালা ঠাকুর মার আদরের সামগ্রী, বউমার স্নেহের পাত্রী ও অঞ্চলেব একমাত্র ধন; হরিশ্চন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার স্বর্ণের সোপান ও ভালবাসার আধার। হরিশ্চন্দ্র আপিস কামাই কবিতেন, সাহেবের নিকট বকুনি খাইতেন, সমবয়স্কদিগের বিক্রপের আধার হইতেন। কখন কখনও হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক বিবাহ বলিয়া তাঁহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক কবিতেন। কলিকাতা হইতে শওর বাড়ী আসিতেন হুই এক দিন থাকিয়া চলিয়া যাইতেন, লক্ষ্য উপেক্ষা করিতেন, কখন কখন 'গাটবার'ও গণিতেন। স্ত্রাববালা পাড়ার স্ত্রী পাগলী ও স্নেহের পাত্রী, নীরবালার একমাত্র স্নেহের বন্ধু—প্রাণের প্রাণ। স্ত্রাববালার বয়ঃক্রম ছাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া প্রযোদশে পড়িয়াছে। ছাদশে বিবাহ হইয়াছে।

নীরবালা রামচন্দ্র বসুর কন্যা, রামচন্দ্র বসু এখানে আসিয়া জাবগা জমী ঘর বাড়ী করিয়াছেন। পঞ্চানন স্ত্রাবরত্ন মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতা হইতে আনিয়া তাঁহার প্রতিবাসী করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র জাতিতে কায়স্থ। রামচন্দ্রের বিষয়ে গ্রামবাসীরা

অনেক কথা চুপি চুপি বলি বলি করিত। কেহ বলিত জাতিতে কাষস্থ নহে—বৈষ্ণব হইবে;—কেহ কেহ বলিত আপিসেব সাহেবেব কিছু হাতাইয়া পলাইয়া আসি-
 পাছে। কেহ বলিত মহাজ্ঞকে ফাঁকী দিবার জন্ত এখানে বাস করিতেছে। আবার কেহ বলিত ওকপ লোক হইলে জাষবদ্দ মহাশয় তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিবেন কেন? এইকপ নানা লোকে নানা কথা বামচন্দ্র বসুর বিষয়ে বলিত। নিমন্ত্রণ হইলে সকলে খাইতেও আসিত তবে উক্ত পল্লীৰ কোন কাষস্থ ভদ্র লোকেব সহিত রামচন্দ্র বসুর আদান প্রদান হয় নাই, হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ রামচন্দ্র বসুর একটা কথা নীববালা ও একটি এক বৎসবেব শিশু সন্তান ভিন্ন আব পুত্র কথা ছিল না। বড় ছায়াব বিবাহ কলিকাতায় দিবেন মনে করি-
 ছিলেন—কার্য্যেও তাহাই করিয়াছিলেন। কলিকাতাব সিমুলিয়াব বিখ্যাত ধনী গঙ্গুল নাথ মিত্র মহাশয়েব জ্যেষ্ঠ পুত্র নবেন্দ্রনাথের সহিত নীববালাব বিবাহ দিয়া গোবীন্দানের ফল লাভ কবেন। নবেন্দ্রনাথ তখন বি, এ, পাশ করিয়া ‘ল’ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। নীব-
 বালা দেখিতে মন্দ নহে বয়ঃক্রম আট বৎসর এখন তাহাব বয়স দশ বৎসব। বিবাহ উভয় পক্ষেই খুব ধুম ধাম করিয়া দিয়াছিলেন। নীববালাব পিতাও ধনী বলিলে অত্যাক্তি হয় না। কলিকাতা হইতে খাবার সামগ্রী আনাইয়া ববযাত্রী ও কচ্ছা-
 যাত্রী খাওয়াইয়া ছিলেন। প্রতিবাসীরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল ও রামচন্দ্রের

সেই অবধি মান মৰ্যাদা সেখানে বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। প্রতিবাসীরা সেই অবধি তাঁহাকে যথেষ্ট মাত্ত ও সম্মান করিত, সেই অবধি তাহারা তাঁহাকে অস্ত চক্ষে দেখিতে লাগিল।

নীববালা সুরবালাকে প্রাণেব অধিক ভাল বাসিত। প্রাণেব কথা দুই জনে একত্রে বিবলে বসিয়া হইত। নীববালা ও সুরবালাব বিবাহ এক বৎসবেব ভিতরেই হইয়াছিল। নীববালাব ফুল শয্যাব গল্প সুরবালাকে বলিত। ফুল শয্যাব গল্প ভিন্ন নীববালাব বিরলে আব কোন গল্প বলিবার ছিল না। সুরবালাব অনেক ছিল। পূৰ্বেই বলিয়াছি সুরবালাব স্বামী সুরবালাকে প্রায় দেখিতে আসিতেন। নীববালা সুরবালাব প্রাণেব সহচরী, তাহাব নিকট কিছুই গোপন থাকিত না। সুরবালা, হবিশ্চন্দ্রকে বড় ভাল বাসিত, তাহাও নীববালাকে বলিত। নীববালা, বিবাহেব দিন চাৰি হাত এক হইলে তখন কেমন একটা নূতন প্রাণ হয়, সেই অবধি প্রাণে কেমন একটা নূতন বন্ধন পড়ে—কেমন একটা নূতন নূতন ভাব হয়—
 তাহাই সুরবালাকে বলিত। সুরবালা, শৈলজা কালযোগেশকে বিবাহ করিবে শুনিয়া হাসিয়া বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছিল—
 অপ্রতিভ হইয়া নীববালাব দিকে চাহিয়া হাসিয়া ছিল। অপ্রতিভ হইবার কারণ সুরবালাব স্বামী কাল। নীববালাও তাই হাসিয়া ছিল। সেই অবধি তাহারা দুই জনে কাল স্মরণ লইয়া তর্ক বিতর্ক করে না।

বিভা ।

[৩য় সংখ্যা]

সন ১২৯৪ সাল

১ম খণ্ড]

আদর্শ ইতিহাস ।

ইংরাজী ভাষায় যাহাকে History বলে, এক্ষণে ইতিহাস শব্দ সচরাচর সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঐ History শব্দের মূল বিষয়—প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত। কিন্তু পূর্বে প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া ইতিহাসবেত্তাগণ প্রায় বাস্তববৃত্তান্ত লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। নৃপতিগণের ক্রিয়াকলাপ, সন্ধি-বিগ্রহ ও বংশাবলীর যথাযথ বিবরণ দেওয়া ইতিহাসের প্রধান বিষয় ছিল। রাজকীয় ঘটনাবলীর প্রকৃত তথ্য ও প্রকৃত কাল নির্ণয় করিতে পারিলে ইতিহাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, পূর্বে ঘটনাবলীর স্মৃতি তারিখ এবং প্রকৃত বিবরণ লইয়া ইতিহাসবেত্তাগণের মধ্যে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত। ঘটনাবলী প্রকৃত হইলেও তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ নির্ণয় করা এবং সেই ঘটনাবলীর সমুদায় কারণ নির্ধারণ করা বড় সহজ কথা নয়।

আমাদের চক্ষুব সম্মুখে আজি যাহা ঘটয়া যাইতেছে, তাহারই প্রকৃত বিবরণ বাহ্যিক দৃষ্টি যখন দৃষ্টি হয়, তাহারই সমস্ত তথ্য ও কারণ নির্ধারণ করা যখন একপ্রকার অসাধ্য হয়, তখন প্রাচীনকালের রাজকীয় ঘটনাবলীর বিবরণ ও রহস্তোদ্বেদ করা যে আরও দুঃসাহস্য হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? তুমি স্বচক্ষে দেখিলে একজন মনুষ্য নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু যাই তাহার কারণ অনুসন্ধান ও সমস্ত বিবরণ জানিবার জন্য অনুসন্ধান করিতে যাইলে অমনি তুমি তাহার নানা প্রকাব বিবরণ ও কারণ শুনিতে পাইবে। কোনটী প্রকৃত কারণ, বা কোন বিবরণ সত্য, তাহা সপ্রমাণ করা বড় সহজ কথা নয়। এই বর্তমানকালে কাবুলে যুদ্ধ হইয়া গেল, আমরা শুনিতে পাইলাম। কিন্তু সেই যুদ্ধ প্রকৃত ঘটনা হইলেও তৎসম্পর্কীয় সমুদায় বিবরণও যে সত্য হইবে

এমত কোন কথা নয়। সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাহাব অর্ধেক কথা হয়ত প্রকৃত নহে। তন্মধ্যে অনেক কথা হয়ত প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনেক সত্য কথা প্রকাশ করিবার হয়ত যো ছিলনা। তন্মধ্যে অনেক কথায় হয়ত অপষণ ও লজ্জার কারণ ছিল বলিয়া গোপন কবা হইয়াছিল। যাহাবা মরিয়া গিয়াছে, তাহাবা কিছু বাঁচিয়া উঠিয়া প্রকৃত কথা প্রকাশ কবিতো আসিতেছেন, স্মৃতবাং যাহা ভাল শুনায, তাহাদেব সম্বন্ধে এমত কথা প্রচার কবাই যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ অনেক কাবণে ইতিহাসে প্রকৃত বিবরণ গোপন করা হয়। যাহা সেদিন ঘটিল তৎসম্বন্ধে যখন এতদূব মিথ্যা কথা রটনা কবা সম্ভব হয়, তখন বহু পূর্বকালেব ঘটনাবলী যে আরও অধিক মিথ্যা কথায় পরিপূর্ণ হইবে, তাহা আব বিচিত্র কি? পূর্বকালেব এক একটা ঘটনা এত মিথ্যা জল্পনায ক্রমে ক্রমে আবৃত হইয়া পড়ে যে, অবশেষে সেই ঘটনার প্রতিই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সে ঘটনা বাস্তবিক ঘটনা ছিল কিনা, তদ্বিষয়ে ও একদিন তর্কেব কথা হইয়া পড়ে। কারণ, যে বিবরণ জনসমাজে প্রচারিত থাকে, তাহা প্রায়ই মিথ্যা কথায় এবং নানা কল্পিত গল্পে পরিপূর্ণ। প্রকৃত বাজমঞ্জরা শুহ্য রাখিবাব জল্প বাহিবে মিথ্যা ঘটনা করা একটা রাজকৌশল বলিয়া অনেক সময় গণ্য হয়। ইতিহাস যতই পুরাতন হইয়া আইসে, তাহাতে ততই মিথ্যা কল্পনা, ও মিথ্যা অল্পমান প্রবেশ লাভ করে। কথা যুখে যুখে, ও বংশ পরম্পরায় পল্লবিত হইয়া পড়ে। অব-

শেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীন ইতিহাস এত মিথ্যা জল্পনায পরিপূর্ণ যে তন্মধ্যে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ কবা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায। ইতিহাস শেষে অল্পমান মূলক হইয়া পড়ে। এমত কি সন তারিখ পর্যাস্ত ভেস্তিয়া যায়। স্মৃতরাং অবশেষে এমত হয় যে, মূল ঘটনা সকলও সন্দেহ-স্থল হইয়া পড়ে।

শুদ্ধ বাজবংশীয়গণেব বিবরণ লিপিবদ্ধ কবিতো গিয়া ইতিহাসেব এইরূপ ছদ্মশা ঘটাতো ঐতিহাসিকগণ আপনাদিগেব কার্য ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তারিত করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান ঘটনাব কাবণাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা দেশেব আচারব্যবহার, রীতি নীতি, রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ, রাজকীয় ব্যবস্থাবলীব কারণও উদ্দেশ্য, প্রভৃতি সমুদায় বিষয় তন্ন তন্ন কবিয়া পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক সমবে অনেক তথ্য নির্ণয়ে বিলক্ষণ সহায়তাও পাইলেন। দেখিলেন, এক একটা ঘটনাব কারণ অসংখ্য, এবং ঘটনা সকল অনন্ত কারণেব ফল। ঘটনাসকল এমত গূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, একেব তথ্য নির্ণয় কবিতো গেলে, চারিদিক হইতে তাহাব অনন্ত সূত্র দেখা দেয়। স্মৃতবাং একটা ঘটনা বুঝিতে গেলে, সেই ঘটনা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ—দেশ, কাল ও পাত্রগণেব বিবরণ—জানা আবশ্যক হইয়া পড়ে। শুদ্ধ বাজনীতি বা রাজবিবরণ জানিতে পারিলে কিছুই জানা যায় না। তাও যদি জানা যাইত, তাহা হইলেও যাহা হউক। যাহা রাজনীতি ও রাজবিবরণ বলিয়া প্রচারিত, তাহা হয়ত প্রকৃত বিবরণ

নহে। প্রকৃত রাজনীতি, রাজমন্ত্রণা, ও রাজকৌশল জানা এক প্রকার অসাধ্য। যখন একজন সামান্ত লোকের ঘরের কথা প্রকাশ হয় না, তখন বাজার মনের কথা, ও রাজসংসারের গুটমন্ত্রণা কিরূপে সাধারণ জন-সমাজে জানিতে পারিবে? বহুকাল পরে একজন ইতিহাসবেত্তাই বা তাহা কিরূপে ঠিক অনুমান কবিতো পারিবেন? সুতরাং, কোন ঘটনা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে গেলে রাজদিক্ হইতে তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার আলোক লাভ কবা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া যায়। বাজাদেব দিক্ হইতে আলোকলাভ করা যখন অসাধ্য হইল, তখন সেই আলোক অন্তদিক্ হইতে গ্রহণ কবিতো হইবে। সেই আলোকলাভ কবিবার জন্ত শেষে ইতিহাসবেত্তাগণের এই কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল, তাঁহারা দেশের ও কালের সমুদায় বিবরণ অন্বেষণ করিতে গেলেন। ইতিহাস এখন শুদ্ধ রাজ-বৃত্তান্ত নয়, তাহা একটি দেশের অথবা সমাজের কোন বিশেষ কালের সমুদায় বৃত্তান্ত।

ঐতিহাসিকগণ সমগ্র পৃথিবীর সমুদায় কালের বিবরণ দিতে তত সাহসী হইতে পারিলেন না। কিরূপে পারিবেন? যখন এক বিশেষ কালের বিশেষ ঘটনার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা এত দুঃসাধ্য ব্যাপার, তখন সে ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিতে গেলে আরও নৈরাশ্রে পড়িতে হইবে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত করা যায়, যতই বিশেষ কালের বিশেষ ঘটনার আবহাওয়া যায়, ততনির্ণয় সম্বন্ধে বরং ততই সন্দিগ্ধ হইতে পারে। এই জন্য আধুনিক ইতিহাসবেত্তাগণ আর

বড় সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত কালের বিবরণ লিখিতে হস্তক্ষেপ কবিতো চাহেন না। এক্ষণে, ইতিহাসবেত্তাগণের অনুসন্ধান ক্ষেত্রে বিশেষ জনসমাজে ও বিশেষ কালে আবহাওয়া হইয়াছে। কাল বিশেষে আবহাওয়া বটে, কিন্তু সেই কালের প্রচুর অনুসন্ধানের তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই অনুসন্ধানের প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা সেই বিশেষ কালের বা বিশেষ জনসমাজের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া নিজ নিজ ইতিহাস পরিপূর্ণ করিতেছেন। এইরূপে ইতিহাসের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রধান ইতিহাসবেত্তাগণ যেমন বহুকালের বিবরণ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তেমনি তাঁহারা চাবিদিক্ হইতে এক বিশেষ কালের বিশেষ সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার জাঙ্গল্যমান চিত্র সঙ্কীর্ণ করিতে বসিয়াছেন। আধুনিক প্রধান প্রধান ইতিহাসে আমরা এই চিত্র দেখিতে পাই। মেকলে, কালাইল, ফ্রাউড, গ্রীন প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তাগণ এই সুরণি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহারা ইতিহাস ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন। ইতিহাস এক্ষণে শুদ্ধ রাজ বিবরণ নহে, তাহা বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের সমুদায় বিবরণ। তাহা আংশিক বিবরণ নহে, তাহা পূর্ণ বিবরণ। ইতিহাস এক্ষণে নীরস যুদ্ধ ও ঘটনার বিবরণ নহে, তাহা সমাজ বিশেষের, বিশেষ কালের দেদীপ্যমান চিত্র।

চিত্রের যাহা প্রয়োজন, সেই উপাদান দিয়া ইতিহাস এক্ষণে রচিত হইতেছে। বিবরণ সমুদায় এক্ষণে সঙ্কীর্ণ হয়, যদ্বারা

একটি চিত্রফলক প্রস্তুত হয়। দেশ ও কাল বিশেষের আচার ব্যবহাৰ, রীতি, নীতি, রাজবংশ ও প্রজাকুলের বিবরণ এবং সম্বন্ধ, সমাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা ও নিয়ম, গঠন ও অস্থান পদ্ধতি, এবং বিশেষ জাতির বিশেষ প্রকাৰ প্রকৃতি ও মানসিক ভাব এবং প্রবণতা প্রভৃতি যাহা কিছু জাতি ও কাল বিশেষের পূর্ণ পরিচায়ক হইতে পারে, তাহা ইতিহাসের উপকরণ মধ্যে ধৰ্তব্য হইয়া অপূৰ্ণ কৌশলে একপে বিশস্ত ও চিত্রিত হয় যে, পাঠকের মনে তাহাৰ অনুকূপ ছবি অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই ঐতিহাসিক চিত্রে কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। যে শক্তিদ্বারা চিত্র অঙ্কিত ও সজ্জিত করা যায়, সেই কল্পনাশক্তি ইতিহাস ক্ষেত্রে বরণ করিয়া শেষে বর্ণগৌরব ও রঞ্জন দিয়া চিত্র ফলাকে সৰ্ব্বদা সুন্দর করে। যে স্থলে যে উপকরণ ও কৌশল প্রয়োগ করিলে চিত্রের প্রভা এবং পরিষ্কৃতি হয় কল্পনা তাহা দিতে কষ্ট কবেন না। ইতিহাসে কল্পনাৰ কার্য এইরূপ বিস্তারিত ও প্রশস্ত। কল্পনা যে ইতিহাস ক্ষেত্রে কৃত্রাপি স্থল পাইবে পূৰ্বে এমত বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কল্পনা নহিলে কিছুই গড়া যায় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইতিহাসই কল্পনাৰ বিস্তারিত ক্ষেত্র। ফ্রাউড ও মেকলের কল্পনা ইংবাজজাতির ইতিহাসে, এবং গিবনের কল্পনা বোমজাতির ইতিবৃত্তে একবারে রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে। যিনি যে বৃত্তান্ত যখন বর্ণন করিতেছেন, তখন তিনি যেন তাহাকে জীবিত চিত্রবৎ করিয়া

দেখাইতেছেন। প্রকৃত ও নীরস ইতিহাসের স্থলে আমবা যেন একটি বর্ণোৎসাসিত কাল্পনিক চিত্র পাইলাম। অন্তরে একটি দৃশ্যকলক অঙ্কিত হইল। মনে মনে ভাব সকল গ্রথিত হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম না, কাব্য কি ইতিহাস পড়িলাম।

আধুনিক ইতিহাসে কল্পনার ক্রীড়া যেমন বিসারিত, দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রও তেমনি প্রসারিত। দর্শন চিন্তা করিতেছে, চিন্তা করিয়া কার্য কাৰণের সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছে, কল্পনা সেই সমস্ত চিন্তোপকরণ আনিয়া দিতেছে, যে দিকে যাহা পাইতেছে, তাহা চিন্তার কাছে আনিয়া দিতেছে। শুদ্ধ আনিয়া দিয়া ক্ষান্ত নহে, দর্শন যখন তন্ন তন্ন করিয়া তাহাদেব পরীক্ষা ও বিচার করিলেন, এবং বিচার করিয়া কার্য কারণ ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় এবং স্থাপন করিয়া দিলেন, কল্পনা সেই সমস্ত চিন্তাসম্মত বস্তুরাজি পাইয়া তাহাদিগকে গ্রহ মধ্যে এরূপে গ্রথিত করিতে বসিলেন, যে সেই নীরস দার্শনিক তত্ত্ব সমুদায় কাব্যের উজ্জ্বল বর্ণে প্রভাসিত হইল। দর্শনকে মূৰ্ত্তিমান করা, চিন্তাকে সবস করা, এবং ঐতিহাসিক তথ্যকে কাব্যকাব্যে পরিদৃশ্যমান করা কল্পনার কার্য। কল্পনা দর্শনকে কবিত্বে পরিণত করে। ইতিহাসে কল্পনার সামগ্রী যত, চিন্তাব সামগ্রী বোধ হয় ততোধিক। কিন্তু যে স্থলে চিন্তা শুদ্ধ নীরস চিন্তা রূপে প্রদর্শিত হয়, সে স্থলে আমবা শুদ্ধ দর্শনকে দেখি। ইতিহাস দর্শন নহে, ইতিহাস কল্পনা বঞ্জিত দর্শন। ইতিহাসের বিষয় সমুদায় চিন্তা ও দর্শনের সামগ্রী বটে, কিন্তু ইতিহাস

দর্শন ও চিন্তাতেই শেষ নহে। দর্শন ও চিন্তা যাহার প্রারম্ভ কবে, কল্পনা তাহাব শেষ করিয়া দেব। দর্শন ও চিন্তা ইতিহাসের যে সমস্ত সামগ্রী দেয়, কল্পনা তাহা দিগকে সজ্জিত ও সুশোভিত করিয়া সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করে। চিন্তায তাব সকল সমুদ্ভূত হয়, কল্পনা তাহাদিগের বেধাপাত করে। শুদ্ধ রেখাপাত নয়, অপূর্ণ কৌশলে অপূর্ণ রঞ্জে এবং বর্ণগোববে চমৎকার চিত্রফলক আঁকিয়া দেয়।

ইংরাজীতে যাহাকে History বলে, এবং এক্ষণে আমরা ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝি, তাহার আধুনিক পরিণাম কিরূপ হইয়াছে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিলাম। এই History-র চরমোৎকর্ষ কিরূপ, তাহা Macaulay কেমন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন দেখুন:—
“History, at present in its state of ideal perfection, is a compound of poetry and philosophy. It impresses general truths on the mind by a vivid representation of particular character and incidents. But, in fact, the two hostile elements of which it consists have never been known to form a perfect amalgamation; and at length, in our own time, they have been completely and professedly separated. Good histories, in the proper sense of the term, we have not. But we have good historical romances, and good historical essays. The Imagi-

nation and the Reason, if we may use a legal metaphor, have made partition of a province of literature of which they were formerly seized *per my et per tout*; and now they hold their respective portions in severalty, instead of holding the whole in common.

To make the past present, to bring the distant near, to place us in the society of a great man or on the eminence which overlooks the field of a mighty battle, to invest with the reality of human flesh and blood beings whom we are too much inclined to consider as personified qualities in an allegory, to call up our ancestors before us with all their peculiarities of language, manners and garb, to show us over their houses, to seat us at their tables, to rummage their old fashion wardrobes, to explain the uses of their ponderous furniture, these parts, of the duty which properly belongs to the historian, have been appropriated by the historical novelist. On the other hand, to extract the philosophy of history, to direct our judgment of events and men, to trace the connection of causes and effects, and to draw from the

occurrences of former times general lessons of morality and political wisdom, has become the business of a distinct class of writers. *

ইতিহাসের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, মেকলে তাহা সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইতিহাসের চরমোৎকর্ষ ও সম্পূর্ণ অবস্থায় তাহা একাধারে কাব্য ও দর্শন। ইতিহাসের কাব্যংশ কল্পনার সৃষ্টি। ইতিহাসে সেই কল্পনা ও চিন্তার কার্য মেকলে একে একে অতি পরিকার কবিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কল্পনা ইতিহাসে কি কবে? অতীতকে বর্তমান করা, দূরত্বকে নিকটবর্তী করা, মহাজনগণের সহবাস স্থখে সম্ভোগী করা, অথবা কোন মহাযুদ্ধের উপক্রমী উচ্চরসে আমাদেরগকে উত্তোলিত করা, আলৌকিক গুণ-ভূষিত ও মায়াময় রূপক—সমুচিত মহাত্ম্যগণকে রক্তমাংসময় দেহী—সেই মূর্ত্তিমান করা ও পূর্ব পুরুষগণ যেন সম্মুখীন হয়ে আমাদের সমক্ষে বিচরণ ও কথা-বলিয়া বেড়াইতেছেন এক্ষেপে তাহাদিগকে বর্তমান করা প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসের কার্য। অন্তরিক্তে আমরা দেখিতে পাই সেই ইতিহাস চিন্তার রাজ্য প্রসারিত করিয়া পুরাতত্ত্ব লব্ধদ্বারের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য বাহির করিতেছে। ঘটনা ও মানব চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া নানা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছে, কার্যকারণের শৃঙ্খলা ও পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছে, এবং অতীত ঘটনাবলীর সারো-

দ্ধার স্বরূপ নানা নৈতিক তত্ত্ব ও রাজধর্মের নিগূঢ় রহস্য সঙ্কলন করিতেছে। তিনি এইরূপে কল্পনাসৃষ্টি ও চিন্তার কার্য একত্রে মিশাইয়া পুরাতত্ত্ব বচনা করিতে পারেন, তাহারই পুরাতত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস নামেব যোগ্য। তিনিই যথার্থ বিরোধী ধর্ম-ক্রান্ত কাব্য ও দর্শনকে একাধারে মিশাইতে পাবিয়াছেন, যে ইতিহাসে এই মিলন সংঘটন হইয়াছে, সেই ইতিহাসই আদর্শ ইতিহাস। আদর্শ ইতিহাসে শুদ্ধ যে পুরাকালের ঘটনাবলী ও পাত্রগণের চরিত্র জীবিত বর্ণে চিত্রিত হয় এমনত নহে, সেই ভাবব ও জীবিত চিত্রের ফল স্বরূপ নানা-বিধ নিগূঢ় উপদেশ ও সারতত্ত্ব অন্তরে চির-অঙ্কিত হইয়া যায়।

ইংরাজী ইতিহাসবেত্তা মেকলে আদর্শ ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যে আদর্শ ইতিহাস আজিও ইতিহাসপূর্ণ ইউরোপ-বঙ্গে একখানিও লিখিত হয় নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন, ভারত ঋগ্বেদের বড় গৌরবের বিষয়, তাহারই শুদ্ধ যে সেই আদর্শ ইতিহাসের বাথার্থ্য অনুমান কবিয়াছিলেন এমনত নহে, সেই অনুমানের ফল স্বরূপ দুইখানি উৎকৃষ্ট আদর্শ-ইতিহাস লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে মেকলে যাহাকে ইতিহাসের চরমোৎকর্ষ Ideal state বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ আনুমানিক নহে, তাহা বাস্তবিক পন্থাৰ্থে পরিণত করা যাইতে পারে। সেই দুই গৌরবের নামকী, সেই দুই আদর্শ-দর্শিত ইতিহাস—অমর রামায়ণ ও মহাভারত। ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তা আজি যাহা আদর্শ ইতিহাস বলিয়া

* See Macaulay's Essay on Hallam's Constitutional History.

স্থির করিতেছেন, কত সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে যে তাহা স্থির হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্য্য এই, মেকলের আদর্শ ইতিহাস ব্যাখ্যার প্রতি পঙ্ক্তি মহা-ভাবতে প্রতীতি হইতেছে। কি তাহাব কাব্যংশ, কি তাহাব দার্শনিকংশ, যে অংশই দেখুন না কেন, দেখিতে পাইবেন, মহা-ভারত সর্ব্বাংশেই মেকলে নির্দিষ্ট আদর্শ ইতিহাসের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র মহাভারত পাঠ অথবা শ্রবণ করিয়া আমরা কি কল লাভ করি? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে ব্যাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন আজিও আমরা তাহা প্রত্যক্ষবৎ বর্ত্তমান দেখিতেছি। কালের ও স্থানের দূরত্ব আমাদের মানস চক্ষু হইতে অপনীত হইয়াছে। সকলই আমাদের সমক্ষে জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের সমক্ষে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ক্রমাগত সমুদায় দেদীপ্যমান দেখিতেছি। যে সমস্ত রসোদয়ে সেই সেই যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল, সেই সমুদায় রসে আজিও আমরা ভাসিতেছি। সেই উচ্চ রসের শিখরে উঠিয়া আমরাও মহা যুদ্ধের আবেদন দেখিতেছি। ভীষ্মাদি মহাভূতগণের সহবাস ক্ষুধে সুখী হইতেছি। আমাদের নিকট অতীত কিছুই নাই। সেই প্রাচীন যমাজের সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বভাষা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। তখনকার নীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ভাব ভক্তি, শিষ্টাচার প্রভৃতি সমুদায় বিবর আত্মপূর্ব্বিক আমরা জাবিষ্টে পরিয়াছি। এতদূর জানি, যে বৈষ্ণব প্রকণকার বর্ত্তমান যমাজের

বিবর ততদূর জানি কি না সন্দেহ। সুবি-
ষ্টিবাদি পাত্রগণ কি বাস্তবিক জীবিত
লোকের চিত্র, কি কাল্পনিক রূপকময় চিত্র
তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। আবার
ওদিকে ব্যাসেব অগাধ জ্ঞান সমুদ্রের কি,
সীমা করিয়া উঠিতে পারা যায়? তাঁহার
জ্ঞানের প্রগাঢ়তা, গভীরতা ও প্রসারতা
দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া বাইতে হয়।
ইউবোপীয় পণ্ডিতগণেব কাছে বাইতে এক
দিন লোকের সাহস হইতে পারে, কিন্তু
অকুলনীয় ও সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসের পাণ্ডিত্যের
কাছে বাইতে একেবারে নিবাস হইতে হয়।
এক দিন আমরা দেবতার দিকে চাহিতে
পারি, কিন্তু ব্যাসের দিকে চাহিতেও সাহস
হয় না। যদি সর্ব্বজ্ঞতা কেবল মুখের কথা
না হয়, তবে ব্যাসই তাহার সত্যতা সপ্রমাণ
করিয়াছেন। তাঁহার কাছে ভূত ভবিষ্যৎ,
বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে। তিনি কাল-
জয়ের ফলাফল ও গূঢ় রহস্য লোকলোচনের
সমক্ষে চিত্রবৎ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন।
তাঁহার নীলালঙ্কার বিস্তীর্ণ চিত্তাক্ষেত্র
বিশাল উর্ধ্বর মহাভারত। তাঁহার চিত্তাব
প্রসার ও দার্শনিক তত্ত্বের গুল্লীবতা দেখিলে
ঠিক স্থির করিতে পারি না, তাঁহাকে এক
জন মহা দার্শনিক বলিব, না কবি বলিব।
নিখিল বেদ মেদাস্ত ও দর্শনের সমুদায় তত্ত্ব
আলোড়ন করিয়া তিনি যে শারোদ্ধার
করিয়াছেন, তাহা অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট
হইয়া চিরদিনের জন্য বিন্দু হইয়া থাকিবে।

বর্ত্তমান যুগে মেকলে প্রকৃত ইতিহাসের
লক্ষণ যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা আমি
বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। ইতিহাসের

লক্ষ্য কি, তৎসম্বন্ধে মেকলে সংক্ষেপে বলিয়াছেন:—“It impresses general truths on the mind by a vivid representation of particular character and incidents. To extract the philosophy of history, to direct our judgment of events and men, to trace the connection of causes and effects, and to draw from the occurrences of former times general lessons of moral and political wisdom, has become the business of a distinct class of writers.” এতদপেক্ষা ইতিহাসের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় আর অধিকতর বিশদ হইতে পারে না। মেকলে যাহাকে General truths এবং General lessons of moral and political wisdom বলিয়া ইতিহাসের লক্ষ্য বুঝে বিবৃত করিয়াছেন, আমাদেরও ঐ বিষয় ঠিক তাহাই কবিয়াছিলেন। এই দেখুন ইতিহাসের প্রতিপাদ্য ও লক্ষ্য একই নষ্ট রূপে এই নোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমম্বিতম্।

পূর্ববৃত্ত কথায়ুক্ত মিতিহাস প্রচক্ষতে ॥”

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশ সমম্বিত পুরাবৃত্তেব নাম ইতিহাস। ইতিহাসের বিষয় পুরাবৃত্ত এবং তাহার লক্ষ্য ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষসাধক উপদেশ। নিজ মহাভারত মধ্যেও আমরা ইতিহাসের সেইরূপ উদ্দেশ্য দেখিতে পাই। মহাভারতও বলিতেছে, সাংসারিক ব্যক্তিগণের অবতারণা কবিয়া তাহাদের কর্তব্য ফলাফল প্রতিপাদন

করা ইতিহাসেব লক্ষ্য। মহাভারতের যে অংশে ইতিহাস আছে, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় নিজে ব্যাসই এইরূপ বলিতেছেন;— ইতিহাস প্রদীপেন মোহাবরণ ঘাতিনা।

লোকগর্ভগৃহং কুৎস্নং যথাবৎ প্রকাশিতম্।

তৈমিষারণ্যবাসী ঋষিবৃন্দ সৌতিকে মহাভারতীয় ইতিহাস কথা বিবৃত করিতে বলিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ কহিতেছেন,—

“মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে, মহর্ষি বেদব্যাসের আজ্ঞানুসারে, ঋষি বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়ের নিকট পরিতুষ্ট হৃদয়ে যথাবিধানে যাহা কীর্তন করিয়াছিলেন, যাহা চতুর্কেদের সারাংশে পরিপূর্ণ, এবং যাহাতে আশ্রয় বিষয়ক সম্যক মীমাংসা আছে, নানা শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া যাহা রচিত, যাহা ব্রহ্মজ্ঞানমিধান, সেই ভাবত ইতিহাস আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।”

সেই ঋষিসমাজও মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়াছিলেন। স্মৃতবাং বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেই ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য রূপে স্থির কবিয়াছিলেন। আজি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বাহ্য স্থির করিতেছেন আমাদের ঋষিগণ কত সহস্র বৎসর পূর্বে তাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের দেহ পুরাবৃত্ত দ্বারা গঠিত হইবে কিন্তু সেই দেহীর মুখে সমাজ ও রাজনীতির উপদেশ কীর্তিত হইবে। মহাভারতে ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছে। মহাভারতের সমস্ত দেহ পুরাবৃত্তে রচিত কিন্তু তাহার অস্থান ও শাস্তি-

পূর্বরূপ মুখদেশে কেবল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মোক্ষ প্রতিপাদক উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ বাক্য প্রতিষ্ঠিত কবিবাব দ্বন্দ্বই মহাভাবত রচিত হইয়াছে। এজন্য মহাভারতের অন্ত-তব নাম জয়। যাহা দ্বাবা সংলাপ জয় হয়, যাহা পুরুষার্থ চতুর্থেব হেতু, সেই গ্রন্থেব নাম জয়।

চতুর্থাং পুরুষার্থাণামপি হেতো জযোদ্রিয়াম্।

যিনি সমগ্র মহাভাবত পাঠ বা শ্রবণ কবিয়া উঠিবেন, তাঁহার মনে সেই পাঠেব বা শ্রবণেব কল স্বরূপ সেই গ্রন্থ লিখিত বৃহৎ চিত্র এত জীবিতবর্ণে অঙ্কিত হয় যে তিনি তৎকালের সমাজকে প্রত্যক্ষবৎ নেত্র সমক্ষে জাজ্ঞামান দেখিতে থাকেন। এত দূর জাজ্ঞামান দেখিতে থাকেন যে গ্রন্থ বর্ণিত পাত্র ও পাত্রীগণকে যেন সশরীরে বর্তমান দেখিতে পান। ভারতের বৃহৎ ব্যাপার যেন সম্মুখেই সমস্ত উপস্থিত রহিয়াছে। এই বৃহৎ ব্যাপার সমুদায় মনকে একেবারে অধিকার করিয়া বসে। এত দূর অধিকার কবে? এত অসংখ্য বিষয় মনে একেবারে প্রবেশ লাভ কবে যে, মনের সমস্ত ধারণাশক্তিও অভিজুতপ্রায় হইয়া যায়। সেই সমস্ত বিষয় ধারণা করিতেই মনে স্থান হয় না, তা কল্পে তাহাদিগকে আশ্রয় করিবে। যদি আশ্রয় করিতে না পারে, তবে পর্যালোচনা করা অসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং, তাহাদের ধারণাতেই মন এত অধিকৃত ও অভিজুত হইয়া পড়ে যে, তাহাদের গুণগুণ দেখিতে বা বিচার করিতে আর অবকাশ ঘটে না। শ্রোতা বা পাঠকের

মনে মহাভাবতের ঐতিহাসিক গুণ যত অঙ্কিত হয়, তাহার কাব্যগুণ তত প্রকাশ হইতে পার না। পাঠ বা শ্রবণ কলের চিত্রাঙ্কন হৃদয়ে সর্বদাই সমুদিত থাকে। মন কাব্যগুণ দেখিতে ভুলিয়া যায়। এজন্য আমবা দেখিতে পাই যে, যে ঋষিগণ মহাভাবত পাঠ বা শ্রবণ কবিয়াছেন তাঁহারা মহাভাবতকে ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লোমহর্ষণ পুত্র সৌতি যখন নৈমিষারণ্যে ঋষি সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে বেটন করিয়া বসিয়া বলিলেন;—“ভগবন্, বেদ-ব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, স্মৃতিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ যাহা শ্রবণ কবিয়া অশেষ প্রশংসা কবেন, এবং বৈশম্পায়ন সপ্নযজ্ঞে জনমে-জয়েব, নিকট যাহা কীর্তন কবিয়াছেন, আমরা সেই ইতিহাস শ্রবণ কবিত্তে সান্তি-শাস্তি নির্লাভ করি।”

এই ঋষিসমাজ মহাভাবতকে ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক শ্রোতার নিকট ইহার ঐতিহাসিক গুণ এত বিশদবরণে প্রতীত হয়, যে নিজের ব্রহ্মা ইহাকে কাব্য বলিতে একটু সঙ্কচিত হইয়াছিলেন। ব্যাস যখন নিজ প্রণীত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, ব্রহ্মা তখন যেন, ইহাকে কাব্য বলিতে একটু কিস্ত কবিয়াছিলেন। ব্যাস ব্রহ্মাকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন :—ভগবন্, আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি। ব্রহ্মা বলিলেন :—“তুমি অম্রাবধি সত্য ব্যবহার করিয়াছ, এবং সর্বদা ব্রহ্মবা-দিনী বাণীমুখে উচ্চারণ করিয়া থাক, এক্ষণে যখন সপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া

নির্দেশ করিলে, তখন এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়াই পবিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে।”

এস্থলে দেখা যায়, ব্যাস ইহাকে কাব্য বলিয়াছেন বলিয়াই যেন ব্রহ্মা কাব্য নামে মহাভাবতকে আখ্যাত করিলেন, নহিলে যেন তিনি ইহাকে জ্ঞাব কিছু বলিতেন। বাস্তবিক ব্রহ্মা বিলক্ষণ জানিতেন যে সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের মনে মহাভাবতের ঐতিহাসিক গুণ এত জ্ঞান্যাসে প্রতীত হইবে যে তাহা বা ইহাকে সচরাচর ইতিহাস বলিয়াই গণ্য করিবে। মহাভারতে কাব্য গুণ প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও সাধারণ লোক-লোচনের সহজে তাহা উপলব্ধি হইবে না। এজন্য ব্রহ্মাও ইহাকে একটু সঙ্কুচিত ভাবে কাব্য বলিয়া গিয়াছেন।

সঙ্কুচিত ভাবে কাব্য বলিবারই কথা। কারণ যদিও ইহা কাব্য হয়, ইহার ঐতিহাসিক গুণ ভেদ কবিতা কাব্যগুণ প্রবেশ লাভ করা বড় সহজ কথা নয়। ইহার সমস্ত শবীর ঐতিহাসিক আবরণে সাজানো। সেই আবরণ ভুলিলে, তবে ইহার কাব্যরস-ভাষিত সৃষ্টি সকল দেখিতে পাইবে। সে আবরণ সহজে লোক লোচন হইতে মুক্ত হয় না। যাহা বা কার্যকে ইতিহাস হইতে প্রভেদ করিতে জানেন সেই জ্ঞানীগণের চক্ষু হইতে যখন সে আবরণ নীড় মুক্ত হওয়া সহজ কথা নহে, তখন যাহারা কাব্য ও ইতিহাসের ভিন্নতা করিতে জানেন না তাহাদের চক্ষু হইতে সে আবরণ মুক্ত হওয়া কিরূপে সম্ভব? কারণ, মহাভারতীয় চিত্র সকল এত পরিপাটি ও ভাষার যে, যিনি তাহা দর্শন করিয়াছেন তিনি তাহা সমুদায় জীবিত

ভাবে বর্তমান দেখিয়াছেন। ইহাতে এত লোকচরিত্রের সমাবেশ, এত কাণ্ড কারখানা যেন সমগ্র মহাভাবত মধ্যে সমুদায় প্রাচীন সমাজ বিজ্ঞমান রহিয়াছে। এত অগণ্য লোকের সমাবেশ যে, সমুদায় প্রাচীন সমাজ যেন একস্থানে উদ্ভিত হইয়াছে। এত ঘটনা প্রাচুর্য্য ও বৃহৎ ব্যাপারের সমাবেশ, যেন প্রাচীন কাল হস্তামলকবৎ প্রতীক্ষমান হয়। শত বৎসরের সমাজচিত্র এক গ্রন্থে কথিত ও অঙ্কিত! অথচ চিত্রের গুণ-পনা এত, যেন সমস্ত জীবিতবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে। সমাজের সর্বদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রিত করিয়া, শুদ্ধ দেশ নয় সমগ্র সমাজের সকল পাত্রগণকে জীবিতভাবে বিজ্ঞমান করিয়া, এক সমাজ নয়, এই ভারতবর্ষের নানা দেশের নানা সমাজের ষাষথচিত্রাঙ্কন প্রদর্শন করিয়া প্রাচীনকালে সমুদায় হিন্দু সমাজ কিরূপ ছিল তাহার সমগ্র ও পূর্ণচিত্র ব্যাস মহাভাবত মধ্যে দিয়া গিয়াছেন। সমস্ত জ্ঞানের এইরূপ পূর্ণ চিত্র আছে বলিয়া ব্যাস তাহার গ্রন্থকে মহাভারত নামে খ্যাত করিয়াছেন। যাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমস্ত জ্ঞান ভরা হইয়াছে, তাহারই নাম মহাভারত। যিনি এই মহাভারত পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাহার নিকট সেই পাঠ ও শ্রবণ ফল স্বরূপ মহাভারতকে এক বৃহৎ ইতিহাস বলিয়াই প্রতীতি হয়,— যে ইতিহাস মধ্যে সমুদায় প্রাচীন আৰ্য্য-সমাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত রহিয়াছে।—

মেকলের আদর্শ ইতিহাসের ব্যাখ্যা যেমন মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, রামায়ণেও তজ্জপ। আমরা মহাভারতের ঐতিহাসিক গুণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, রামায়ণ সম্বন্ধেও

তাহা সপ্রমাণিত হইতে পাবে। বাঙ্গালীক ও বামাষণকে ঐতিহাসিক ভাবে ভূষিত করিতে ক্রটি করেন নাই। বাঙ্গালীকির কালে প্রাচীন আৰ্য্যসমাজ যেরূপ ধর্ম্মাচাবে প্রবৃত্ত এবং শৌর্য ও বীর্য সম্পন্ন ছিল, বামাষণে তাহাব স্থলপট্ট চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাসেব প্রতিভা কাব্য সৃষ্টি বিন্যাস করিয়া তন্মধ্যে সর্ববিধ আচারব্যবহার ও অপবাপর সমাজচিত্র দিযা আৰ্য্যসমাজ মধ্যে যেমন স্থায়ী ভাবে বিচরণ কবিয়া বেড়াইয়াছে, বাঙ্গালীকিব প্রতিভাও তেমনি নিখিল ভাবত মধ্যেবমণকরিয়া বেড়াইয়াছে। অযোধ্যাহইতে চিত্রকূট, চিত্রকূট হইতে ঋষ্যমুখ, ঋষ্যমুখ হইতে লঙ্কাধীপ পর্যন্ত বাঙ্গালীকির কল্পনা পর্যটন কবিয়া বেড়াইয়াছে। কি লোকালয়েব প্রাচীন আৰ্য্য সমাজ কি অরণ্যবাসিগণের পুণ্য আশ্রমপদ, কি দক্ষিণাপথের বনরমণকাবী বানব জাতিব রাজ্য, * কি রাক্ষসপূর্ণ স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য্যচিত্র, বাঙ্গালীকি সকল প্রাচীন ভাবতের কোন আৰ্য্য কল অনার্য্য সমাজে চিত্রাঙ্কনে ক্রটি কবেন নাই। তিনি এই সমস্ত চিত্র দর্পণবৎ প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। প্রাচীন মুনিঋষিগণের আশ্রমস্থল আমরা যেন কল্পনায় আজি অভূতব করিতেছি। লঙ্কার ধুমধাম প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। অযোধ্যার রাজৈশ্বৰ্য্যেব চিত্রপট মনে চির অঙ্কিত হইতেছে।

* ভারতের দক্ষিণ দেশ সমূহ অত্যন্ত বন সম্বুল ছিল। যেমানবজাতি তথ্যবাস করিত, তাহারা অত্যন্ত বনরমণকারী ছিল বলিয়া বাঙ্গালীকি তাহাদের নাম বানরজাতি দিযাছেন। নহিলে রাজ্যগণের বানর-

প্রাচীন অযোধ্যার রাজ্য, রাজপুত্র, বাজমহিষী ও পৌবগণ যেন আমাদের নেত্রে আজিও বিচরণ কবিয়া বেড়াইতেছেন। আবণ্য দেশের ঋষিসমাজ চিত্রবৎ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বাস্তবিক, বামাষণও সর্বাংশে ঐতিহাসিক আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে। সেই আদর্শ সম্বন্ধে বামাষণ ও মহাভাবত উভয়ই তুল্য। উভয়ই আৰ্য্যঋষির অতুলনীয় কীর্তি। এই দুই ইতিহাস ও কাব্য ঋষিগণের অমূল্য সম্পত্তি। ঋষিগণের যদি আর কিছু সম্পত্তি না থাকিত, শুদ্ধ এই দুই মহাসম্পত্তি ও কীর্তি লইয়া তাঁহারা জগন্ময় বিজয় লাভ করিয়া আসিতে পারিতেন।

পূর্ণচন্দ্র বসু ।

জাতি বাস্তবিক পশুজাতি নহে। বামাষণের কোম হলে তাহারা পশুরূপে ব্যাখ্যাত হব নাই। তাহাদের সমাজ-মনুষ্য সমাজ ছিল। তাহাদের রাজ্য ঠিক মনুষ্য রাজ্য ছিল। তাহাদের সম্রাট ও সম্রাট অতি পরিতোষিত ছিল। ভিক্ষুকরূপী হনুমানের সহিত রাম সম্রাটের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহার সম্রাটবাবু রাম কি বলিবাছিলেন দেখুন—

"বাহার স্বকৃৎ ও সামবেদে সুশিক্ষিত নহে, তাহারা কদাচ ইহঁর স্তাব এইরূপ বাক্য কখনে সমর্থ হবনা। আর ইনি সমগ্র ব্যাকরণাদি শব্দশাস্ত্র ও বিলক্ষণ রূপেবহবার আলোচনা করিয়াছেন, অন্যথা স্বদৃশ সাধুপদ প্রয়োগে কখনই সমর্থ হইতেন না। বিস্তর কথা কহিলেন, তথাচ একটীও অপশব্দ ইহঁর মুখ হইতে বিনির্গত হয় নাই।"

এই বানরজাতির রাজ্য কোশল, আচারাদিও আৰ্য্যধর্ম্মানুযায়ী ছিল। রাজা সুগ্রীব ও তাহার অমাত্যগণ অত্যন্ত ধর্ম্মশীল ও সাধু বলিয়া সর্বত্র পরিচিত ছিলেন।

সন্ন্যাসী ও উদাসীন সংবাদ ।

উদাসীন । সন্ন্যাসী ঠাকুর ! আমার একটা উপায় বলিয়া দেন । আমি বড়ই মনের অশুখে আছি ।

সন্ন্যাসী । কেন বাপু, তোমার কি হয়েছে ? তোমার এই পূর্ণ ঘোঁষন, সংসার ধর্ম কবগে, মন ভাল হইয়া যাইবে ।

উদাসীন । সংসারে যে মন বসে না তার উপায় কি ?

সন্ন্যাসী । কেন ব'য়ে গেছ নাকি ।

উদাসীন । আজ্ঞে ব'য়ে গেলেত মনেব স্নেহই থাকতেন, কিন্তু তা পাব্লেম কৈ ? বাবাব কাল হোল, মাৰ্গজালাত হ'ল সেই অবধি ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি । যেন সন্ন্যাসী বেব কিছুতেই আব আট নাই ।

সন্ন্যাসী । গাঁট চুড়োটা ক'সে বাঁধনি বুঝি ?

উদাসীন । আজ্ঞে বিবাহ কবি নাই ।

সন্ন্যাসী । তবে আর আঁট থাকবে কোত থেকে । যাও, দেখে শুনে একটি রাঙা দেখে বউ কব'গে যাও, মন ভাল হ'য়ে যাবে ।

উদাসীন । তাহাতেও প্রবৃত্তি হয় না । সে প্রবৃত্তি থাকিলে পাস কবা যুবতী মেয়ে পেয়েছিলাম ; কিন্তু তাহাতেও ত ইচ্ছা বা উৎসাহ হয় না ।

সন্ন্যাসী । ইচ্ছাটা কি ?

উদাসীন । সেইটাইত বুঝ্তে পাচ্চিমে ।

সন্ন্যাসী । তোমাব ইচ্ছাটা আমার খুঁজে

বেব ক'বে দিতে হবে ? এ মন্দ কায নথ ।

উদাসীন । আজ্ঞে ঠিক তা নয় । যার মনেব একপ অবস্থা, অর্থাৎ যে নিজের অভাব নিজে বুঝিতে পারে না, তার একটা ব্যবস্থা আপনাব দ্বাৰায় হয় না কি ?

সন্ন্যাসী । হয়,—যদি সে লোক সত্যবাদী হয় ; যদি তার মনের সবটা দেখিতে পাই, আর যদি সে আমার কথা মত কায করে ।

উদাসীন । আমি সত্য কথা कहিয়া থাকি, এবং আপনাব কথা মনে লাগিলে তার মত কায কবিতো রাজি আছি ।

সন্ন্যাসী । তোমার গত জীবনের ঘটনাগুলি যতদূর মনে আছে, যথাযথ বলিয়া যাও দেখি । দেখো বাপু, কোন স্থান গোপন কোরোনা । রোগ লুকাইলে চিকিৎসা চলিবে না ।

উদাসীন । বলি । ইংবাজি ১৮৫৭ সালে জন্ম, বাল্যকালে খুব দুইছিলাম, খেলাতে খুব মজবুত ছিলাম এবং খেলুড়ীদের বড় ভাল বাসিতাম । তাঁদের সঙ্গে অধিকক্ষণ ছাড়াছাড়ি হ'লে ব্যস্ত হইয়া উঠিতাম ; স্থানান্তরে কোথাও যাইতে হইলে তাদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতাম । এই ভাবে বৎসর ১৩।১৪ যায় । ইহার মধ্যে বিশেষ ঘটনা কিছু নাই । তারপব পাঠ্যাবস্থা । লেখা পড়া করেছি, এন্ট্রেন্স

এল্. এ. বি. এ পাশ কবেছি। বিষয় কৰ্মও কবেছি। এ সময়েব মধ্যেব প্রধান ঘটনা একটি সহপাঠীকে বড় ভালবাসি। এত ভালবাসি—বুঝি ছী পুরুষে তত ভাল বাসা হয় না। কিন্তু যত বড় হইতে লাগিলাম, দেখিলাম আমার বন্ধু বৈবশিক লোক হইয়া উঠিলেন, আমার ভালবাসায় তিনি আর বড় মনোযোগ করিলেন না। তিনি বে, থা, কবিলেন, পুত্র কন্তা হইল, তাঁর মনটা সব তাঁর ঘবে পড়িল, আমি দেখিয়া গোপনে কাঁদিলাম। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য হইল। আমাকে কেহ বিবাহ করিতে বলিলে সংসারেব অকৃতজ্ঞতা মনে হইয়া অস্বীকার করিতাম। পিতা পীড়াপিড়ি করিতেন না, মা জেদ্ কবিতেন, কিন্তু তখন বুঝি নাই, তখন তাঁবে অবাধ্য হইয়া ছিলাম। তারপর উভকেই হারিয়েছি। শেষে শিক্ষিতা জনৈক মহিলাব সহিত পবিচয় হইল, তিনি অবিবাহিতা। দিন কতক তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রেমও কবিলাম, কিন্তু তাও ভাল লাগিল না। সর্বদাই মনের ভিতর কি একটা অভাষ বোধ করিতাম, বুঝিতে পাবিতাম না সে কিসের অভাব।

সন্ন্যাসী। টাকা উপার্জন করিয়াছ ?

উদাসীন। আজ্ঞে, তাও করেছি, যত উপার্জন করেছি, খরচও তত করেছি, টাকার নেসা আমার নাই।

সন্ন্যাসী। বশস্বী হইতে চেষ্টা করিয়া ছিলে ?

উদাসীন। তাও করিয়াছিলাম। বশও কিছু পাইয়াছিলাম, লোকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলে গণ্য মান্য করিত, কিন্তু তাতেও

মুখ হ'ত না। মনের শৃঙ্খতা ত ঘুচিল না।

সন্ন্যাসী। যাহাকে চলিত কথাষ ধর্ম কৰ্ম বলে তা কিছু কবেছ ?

উদাসীন। ধর্মটা আমি স্থির কবিতে পারি নাই। লোকেব ভাল কবার নাম, যদি ধর্ম হয়, তাহা একটু আধটু কবেছি এবং এখনো সুবিধা পেলে কবিতে ইচ্ছা কবে, কিন্তু এক জনের ভাল কবিতে গেলে অপরের ত কিছু মন্দ হয়, আর কাবো না হোক, নিজেবত হয়। সেই জন্ত সেটা ঠিক ধর্ম কৰ্ম কি না তাহা বুঝিতে পারি না। তবে সংসারবশতঃ পরের ভাল করিতে ইচ্ছা করে এবং কবিবার চেষ্টাও করি।

সন্ন্যাসী। (উদাসীনেব প্রতি খানিকক্ষণ লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন) তোমার হিসাবে মনেব শৃঙ্খতাই তোমার প্রধান বোগ। সংসারের কিছুতেই তাহা ছোঁইনা। দেশ পর্যাটন কবিয়াছ ?

উদাসীন। কবিয়াছি। ভাবতবর্ষেব অনেক স্থান দেখিয়াছি।

সন্ন্যাসী। হিমাচল ?

উদাসীন। দেখিয়াছি।

সন্ন্যাসী। সাগর ?

উদাসীন। দেখিয়াছি।

সন্ন্যাসী। পঞ্জাব বা কাশ্মীরা ? অথবা কাশ্মীর ?

উদাসীন। দেখিয়াছি।

সন্ন্যাসী। মুক্ত হও নাই ?

উদাসীন। রূপে মুক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু গুণে মুক্ত হই নাই।

সন্ন্যাসী। একা থাকিতে ভাল লাগে ?

উদাসীন। বড়।

সন্ন্যাসি। সেতুবন্ধ রামেশ্বর দেখিয়াছ ?
উদাসীন। না।

সন্ন্যাসী। দেখিও। কিন্তু ব্যবস্থা ঠিক
তাহা নহে বোধ হয়। সংসারের অকৃত-
জ্ঞতা দেখিয়া বিবাহ করিতে চাহ না ? রম-
ণীর কোন অকৃতজ্ঞতা দেখিয়াছ ?

উদাসীন। অকৃতজ্ঞতা দেখি নাই,
স্বার্থ দেখিয়াছি।

সন্ন্যাসী। তুমি নিজে স্বার্থ কতটুকু
ছাড়িতে পার ?

উদাসীন। মনের মত লোক পাইলে
আপনাকে ভুলিতে পারি।

সন্ন্যাসী। তবে ছাড়িলে কি ? তোমার
আশাটা বড়, তুমি নিজে ছোট। বড়টা
পাইয়া ছোটটা ছাড়িলে, তোমারিত জিৎ
হইল।

উদাসীন। তবে কি আমিও স্বার্থপর ?

সন্ন্যাসী। তোমার চেয়ে স্বার্থপর ১৫/৭

উদাসীন। সে কি কথা ? আমি ৭/১৫
অল্প কত স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছি।

সন্ন্যাসী। কবে ? কোথায় বল।

উদাসীন। আমি আমার বাল্য বন্ধুর
অল্প কত কবিতাছি।

সন্ন্যাসী। তুমিই ত বল তাঁহার জীতে
স্বার্থ বোধ হইত না, তিনি তোমার ভালবাসা
ছাড়িয়া বিষয় কর্ণে মন দিতেন। স্বার্থ
তাঁহার না তোমার হইত ?

উদাসীন। শিক্ষিতা মহিলায় অল্প প্রাণ
পণ করিয়াছিলাম।

সন্ন্যাসী। তিনি কি বলিতেন ?

উদাসীন। বলিতেন আপনি খুব বড়
লোক হউন, যেন মানে জানে ধর্ম খুব

শ্রেষ্ঠ লাভ করুন, তাহা ছইনেই আমি
স্বার্থী হইব।

সন্ন্যাসী। তুমি কি বলিলে ?

উদাসীন। কিছু বলি নাই। বুকিলাম
তিনি বড় লোকের গৃহিণী হইতে চান। সেই
দিন হইতে বিদায় লইলাম।

সন্ন্যাসী। এখানেও কি তুমি আপ-
নাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে ?

উদাসীন। খুব ভুলিয়া ছিলাম।

সন্ন্যাসী। কিছু না। তুমি আপনাকেই
ভোর হইয়াছিলে। বাপু! কিছু স্বার্থত্যাগ
করিতে শেখ, স্বার্থ পাইবে ?

উদাসীন। কি করিয়া শিখিব।

সন্ন্যাসী। ভালবাস।

উদাসীন। ভালত বাসিয়াছিলাম।

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না।

উদাসীন। ভালবাসা কাহাকে বলে ?

সন্ন্যাসী। পরের জন্ত ক্রেশ স্বীকার
করার নাম ভালবাসা।

উদাসীন। জ্ঞাত করিয়াছি।

সন্ন্যাসী। ছাই করিয়াছ, নিজের ভাবনা
ভাবিয়া মরিয়াছ। যে ফান্সা কাঁদিয়াছ
তাহার তোমার নিজের স্বার্থ হইত, বাহার
তোমার প্রেম করিত, তাঁদের ক্রেশ হইত।
নিজের স্বার্থ হয় না এমন কান্না পবের জন্ত
কাঁদিত শিখিও স্বার্থ পাইবে।

উদাসীন। কাহাকে ভাল বাসিব ?

সন্ন্যাসী। প্রথমে স্বীকর্ষ, পরে
সংসারকে।

উদাসীন। যদি বিবাহ না করিয়া
সংসারকে ভাল বাসি।

সন্ন্যাসী। কখনও বুকিলাম না। সংসার

রের কাহাকে ভাল বাসিবে ? তোমার সংসার কে ?

উদাসীন । মনুষ্য জাতিকে ?

সন্ন্যাসী । মিছা কথা । বে একজনকে ভালবাসিতে পারে না, সে কি দশ জনকে ভালবাসিতে পারে ?

উদাসীন । হীলোক মহিলে কি ভাল-বাসা হয় না ?

সন্ন্যাসী । না । পুরুষ পুরুষকেও ভাল বাসে কিন্তু সে ভালবাসা শিখায় হীলোকে । জগতে ভালবাসার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্তই ভগবান হীলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন । যে কখন কোন হীলোককে ভালবাসে নাই, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য । তোমার মা নাই, তোমার স্বী নাই, তোমার কণ্ঠা নাই, তোমার কার কাছে বাইতে বলিব । যদি তোমার ভনী থাকেন, তাঁর পদপ্রান্তে বসিয়া ভালবাসা শিক্ষা করগে যাও । তাহার পর বিবাহ করিয়া স্বীকে স্থানী করিও, মনের শৃঙ্খতা ঘুচিয়া যাইবে ।

উদাসীন । আমার এ অকূল ভালবাসার আশা বাস্তবিক হৃদয়ে কুলাইবে কেন ?

সন্ন্যাসী । কুলাইবে । উহার (Extensiveness) ব্যাপকতা থাকিবে না বটে, কিন্তু উহার (intensity) প্রগাঢ়তা বাড়িবে ।

উদাসীন । এতকণে হইয়াছে, আর কুলাইতে পারিতেছি না ; আমি এই দুই জিনিষের সমাবেশ দেখিতে চাই, তাহারই জন্ত মন আকূল । সে জিনিষ কোথায় পাইব ?

সন্ন্যাসী । তোমার যদিও তাহা ঠিক নহে । কিন্তু সে-জিনিষ অনেক পাওয়া যায়

এবং কতক তোমার প্রকৃতির লোকের পক্ষে প্রেমেও পাওয়া যায় ।

উদাসীন । আমি সেই প্রেম শিখিব, আমার তাহার পথ বলিয়া দিম ।

সন্ন্যাসী । সে তোমার কাঙ্ক্ষা নহে ! চৈতন্ত 'রা'—বলিয়া 'ধা'—না বলিতে বলিতে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া যাইতেন ? তুমি পারিবে ?

উদাসীন । সে ত ভক্তির কথা ।

সন্ন্যাসী । প্রেমের আধিক্য হইলেই ভক্তি আসিবে, যে যত প্রেমিক সে—তত ভক্ত ।

উদাসীন । তত ভক্তির পাজী জগতে পাইব ?

সন্ন্যাসী । কেন পাইবে না, যে তোমার মনুষ্য সম্পাদনের অর্থ নিজের সর্বস্ব পণ করে তাহার প্রতি ভক্তি হয় না ?

উদাসীন । সে ত আপনার স্বথের জন্তই তত্ন করিবে ।

সন্ন্যাসী । ও তোমার ম্যাণ্ডলিন সাহেবের মানিকের খেয়াল । আপনাকে ক্রেশ দিয়া পরের মনুষ্য সম্পাদনের নাম স্বার্থ ত্যাগ । ইহার দৃষ্টান্ত তুমি সংসারে অনেক হলে পাইবে ।

উদাসীন । পরের কষ্ট দূর করিবার সময় তাহার কষ্ট আগে ভাবি না নিজের কষ্ট আগে ভাবি । তাহার ক্রেশ দূর করিলে নিজের মনে সুখ হইবে বলিয়াই তাহার সুখ দূর করিতে বাই নতুকা নিজের সুখ কিছুই নাই জামিলে কে পরোপকার করিতে ক্রেশ স্বীকার করে ?

সন্ন্যাসী । স্বার্থপরতার সুখ কিছু নাই

এমন লোক লগতে দেখে নাই ?

উদাসীন। না।

সন্ন্যাসী। হিন্দু সংসারে অবীরা বিধবা।

উদাসীন। তিনি যে সংসারে থাকেন, সেই সংসারের সকলকার সুখ সম্পাদন করিয়াই তাঁহার সুখ।

সন্ন্যাসী। যদি নিজের সুখের জন্ত দশ জনের সুখ সম্পাদন কবিতো কোন ক্রেশকেই ক্রেশ বলে মনে না হয়, তাহা হইলে সেই আত্মসুখ, স্বার্থ হইলেও তাহা নিন্দনীয় নহে। স্বার্থকথাটা নিন্দার কেন, না সাধাবণে উহা বজ্র পবেব অনিষ্ট কবিতো পাবে। এমন কোন প্রবৃত্তিই নাই, যাহা হইতে শুভ অশুভ দুই উৎপত্তি হইতে পাবে না, উহা বসদব্যবহারে শুভ ও অসদব্যবহারে অশুভ উৎপন্ন হয়। সেই সদ অসদ বিচাৰ জন্ম জ্ঞানের আবশ্যক। সে জ্ঞান সাধনা সপেক্ষ। ভূমি কতকগুলি গ্রন্থ উদবস্তু করিয়াছ, তুমি তোমার জ্ঞান কিছুই হয় নাই।

উদাসীন। এখন সে জ্ঞান কিভাবে উপায় ?

সন্ন্যাসী। বিবাহ কবগে যাও।

উদাসীন। বিবাহ করিলে সে জ্ঞান হইবে ?

সন্ন্যাসী। হইবে। বিবাহও সাধনা ; যাহা না বুঝে না তাহা বিবাহকে আমোদের কাজ মনে কবে, সেইজন্য অধঃপাতেও যায়।

উদাসীন। আপনি ?

সন্ন্যাসী। আমি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস আমার ব্রত, আমার ত্রিকূলে কেহ নাই, সংসার ধর্মও আমি করিয়াছি, বুদ্ধ বয়সে এই কঠোর ব্রত লইয়াছি।

উদাসীন। আপনার কি সংসার ধর্ম সকলি শেষ হইয়াছে ?

সন্ন্যাসী। না। সংসারের সকল ধর্ম কে পরিশোধ করিতে পাবে ?

উদাসীন। তবে আবার সংসার ধর্ম করুন না কেন ?

সন্ন্যাসী। আমার দে বয়স নাই—সে শক্তি নাই, সে উৎসাহ নাই, আমার বয়সের উপযোগী ব্রত আমি লইয়াছি।

উদাসীন। এ ব্রতের ফল ?

সন্ন্যাসী। মোক্ষ।

উদাসীন। সংসারী ?

সন্ন্যাসী। তাহারও মোক্ষ আছে।

উদাসীন। আমি সন্ন্যাস লইব।

সন্ন্যাসী। তোমার কাজ নহে। ভূমি ইঞ্জিয় জয় করিতে পারিবে ?

উদাসীন। আপনি ইঞ্জিয় জয় করিয়াছেন ?

সন্ন্যাসী। কবিয়াছি বৈকি। আমার কোন অভাব নাই।

উদাসীন। তবে আপনি কি লইয়া আছেন।

সন্ন্যাসী। সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানিচান্নি। দৈক্যতে যোগ যুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

উদাসীন। বড় কঠিন কথা বটে। কিন্তু আমার কি ইঞ্জিয় জয় হয় না ?

সন্ন্যাসী। হইবেনা কেন ? কিন্তু ভগবান্ তোমার যে ইঞ্জিয়াদি দিয়াছেন, তাহার সদব্যবহার করিলেও তোমার মোক্ষ আছে, ইঞ্জিযেব বশীভূত না হইলেই হইল। সংসার ধর্ম পালনের জন্ত ইঞ্জিয়ের যতটুকু চালনা আবশ্যক ঠিক ততটুকু চালনা করিলে

তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই পতিত হইবে। ইহাও বড় কঠিন কাজ। কিন্তু তোমাব বশেষে ইচ্ছিয়েব একান্ত নিগ্রহ আবে কঠিন কাজ। সহজ পথ থাকিতে জটিল পথে কেন যাইবে ?

উদাসীন। কোন পথে অধিক সুখ ?

সন্ন্যাসী। তোমার গুরু স্পেন্সর সাহেবের কাছে শিখিয়াছ, সুখই জীবনের উদ্দেশ্য, আমি আমার গুরুব কাছে শিখিয়াছি,—

“যো ন হৃদ্যতিন দ্বেষ্টি।

ন শোচতিন কাংক্ষতি।

শুভাশুভ পবিত্যাগী।

ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।”

উদাসীন। আপনাবত আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, আপনি মোক্ষের অভিলষী।

সন্ন্যাসী। আছে বৈকি। আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট কবিবাব জন্তই ত এই সাধনা করিতেছি।

উদাসীন। অভিলষিত বস্তু না পাইলে যদি আপনার আকাঙ্ক্ষা বহিত হইল না, তবে আব আপনার নিরাকাঙ্ক্ষ হইবার সাধনা কৈ হইতেছে ?

সন্ন্যাসী। আমার অভিলষিত বস্তুকি ?

উদাসীন। মোক্ষ ?

সন্ন্যাসী। মোক্ষলাভ করিয়া কি পাইব ?

উদাসীন। আত্মসুখ ?

সন্ন্যাসী। স্ত্রেচ্ছা ত পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছি, আবার সে কথা বল কেন ?

উদাসীন। তবে মোক্ষ কি ? মোক্ষের ফল কি ?

সন্ন্যাসী। ফলে আমার অধিকার নাই, আমি কণ্ঠ করিতেছি মাত্র। ভগবানের

উক্তি পালন করিতেছি মাত্র। ভগবানের উক্তি পালন কবিবার জন্ত আমার আকাঙ্ক্ষা আছে। আত্মসুখের জন্ত যে আকাঙ্ক্ষা তাহাই নিন্দ্য, অন্যের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তাহাই সাধনা।

উদাসীন। তবে এ জীবন কি শুধুই গোলামী কবিবাব জন্ত ? আজীবন পরের জন্ত খাটিয়া মরিব ? নিজেব ইহাতে কিছুই নাই ?

সন্ন্যাসী। তুমি কার ?

উদাসীন। আমি আমার।

সন্ন্যাসী। কে বলিল ? তুমি পদে পদে পরাধীন, কি জড় প্রকৃতির, কি সংসারের, অধীন না হইয়া তুমি একদণ্ড চলিতে পাব না, তবে তোমাব এ আত্মসম্বিতা কেন ? বাহাদেব হইয়া জন্মিয়াছ, তাহাদেব সেবা করিবে না এই কি তোমাব শিক্ষা ?

উদাসীন। তবে কি স্বাধীনতা নাই ?

সন্ন্যাসী। স্বাধীনতা কাহাকে বল ?

উদাসীন। সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রভুত্ব ?

সন্ন্যাসী। আবাব “নিজেব” বলিতেছ কেন ? “নিজের” তোমাতে কিছুই নাই।

উদাসীন। তবে আমি কি ?

সন্ন্যাসী। তোমাব অন্তরে যে আত্মা বিবাজ করিতেছেন, তুমি তাঁহার। তোমাব এ দেহ মন ইত্যাদি সকলি তাঁহার সৃষ্টি, তুমি তাঁহা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উদাসীন। কৈ আমিত আত্মা বলিয়া কোন বস্তুর অধুভূতি পাই না।

সন্ন্যাসী। পাইবে। সাধনা কর।

উদাসীন। আপনি কি আত্মাকে দেখিতে পাইতেছেন ?

সন্ন্যাসী। দেখিতেছি বৈকি ? এ
দেখ ;—

“অনেক বাহুদর বস্ত্র নেত্রং ।
পশ্যামি হাং সৰ্বতোহনন্তরূপম্ ।
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং ।
পশ্যামি বিদ্বেশব বিদ্বৎপ ।

* * * *
তাবা পৃথিব্যোরিদ মন্তবং হি
ব্যাপ্তং ঘটৈ কেন দিশন্ত সৰ্বা
দৃষ্টভূতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥”

ক্রমশঃ—

কুশীনগর ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

আমবা গতবাবে মহাত্মা কাবলীলকে
কুশীনগরের নিবিড় জঙ্গলাভ্যন্তরে ভগ্নাবশিষ্ট
অগাধ ইষ্টক বাশির মধ্যে বুদ্ধ প্রতীকার
সংস্কার কার্যে নিযুক্ত বাথিয়া গিয়াছিলেন ।
তিনি স্বহস্তে দিনবাত্রি পবিত্রমা/কবিয়া
অল্পে অল্পে সিংহাসন থানি ও নির্মাণ প্রতী-
মাটির পুনঃ সংস্কার সম্পাদন কবিয়া উঠি-
লেন । ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টক ও ধূলিবাশির
মধ্যে এবং সিংহাসনের অভ্যন্তরে নির্মাণ
প্রতিমার যে সকল অংশ প্রাপ্ত হইলেন,
তাহা বিশেষ পরিশ্রম ও প্রণিধান পূর্বক
বথাস্থানে সংস্থাপিত কবিলেন । কিন্তু ইহাতে
ও সে প্রতিমার সর্কাবব সম্পূর্ণ হইল না ।
তখন তিনি অন্তান্ত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা অবশিষ্ট
অংশ পূরণ কবিলেন এবং ক্রমে বথম প্রস্ত-
রের ও অভাব হইল তখন বিলাতী মাটির
দ্বারা সে কার্য সম্পাদন করিয়া লইলেন ।

নির্মাণ-প্রতিমা সম্পূর্ণ হইলে কাবলীল
সাহেব সিংহাসনের পুনরুদ্ধার কার্যে ত্রুটি
হইলেন । পূর্বে সিংহাসনের চাবি কোণে
চাবিটা ভাস্করকার্যে খোদিত প্রস্তবময় স্তম্ভ
ছিল । কিন্তু তাহার মধ্যে ছুইটাবই পাওয়া
গেল না ।

বড় বড় পাথরের টালী আড় করাইয়া
সিংহাসনের পার্শ্বদেশ নির্মিত হইয়াছিল ।
কিন্তু সে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেল না ।
যাহা পাওয়া গেল, তাহাতে কেবল একদিক
মাত্র পুনর্নির্মিত হইতে পাবে । কাবলীল
সাহেব উহা দ্বারা সিংহাসনের পশ্চিম পার্শ্ব
ছাইয়া দিলেন । পশ্চিম ধারে সিংহাসনের
সহিত সংলগ্ন তিনটা প্রস্তর নির্মিত মল্লব্য
মূর্তি ছিল । উহার মধ্যমটির পশ্চাৎভাগে
অতি প্রাচীন অক্ষরে কয়েকটি কথা লেখা
ছিল, তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া জানা

গিয়াছে যে হরিবল নামক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্মাণ মহাবিহারেব শোভার্থ ঐ প্রস্তবময় মূর্তিটা প্রদান করিয়া ছিলেন।

সিংহাসন ও প্রতিমা পুনর্নির্মিত হইলে কাবলীল সাহেব দেখিলেন যে প্রতিমাটি যদি এই ভাবে অবস্থিত থাকে তাহা হইলে সংযোজিত প্রস্তব সকল উঠিয়া ও নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব তিনি উহাব উপর বঙ্কর আবশ্যক মনে কবিলেন। এক্ষণে তিনি মস্তকেব চুলগুলি কাল রঙ করিলেন, যে কাপড়গুলি পবান ছিল, তাহাতে সাদা রঙ করিলেন এবং শরীরের অন্তান্ত ভাগে দীর্ঘ রক্তাক্ত হবিদ্রা রঙ করিলেন।

পাছে দেশীয় মিস্ত্রীগণেব হস্তে ভার দিলে তাহারা খাবাপ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে কারলীল সাহেব সমস্ত নিজ হস্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন। নির্মাণ প্রতিমাব রঙ দেওয়া সম্বন্ধে অনেকে কারলীল সাহেবকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন। প্রতিমা সংস্কারের কয়েক বৎসর পরে গারিক সাহেব কুশীনগর দর্শনার্থ তথায় গমন করেন। তিনি বলেন ঐ রঙ দিয়া কারলীল ভাল কাজ করেন নাই। তবে কিনা কয়েক বৎসর পবে রঙ উঠিয়া যাইবে, তখন নির্মাণ-প্রতিমার নিজ জ্যোতিঃ বিকশিত হইবে কিন্তু গারিক সাহেবের জ্ঞান উচিত ছিল যে প্রতিমা সংস্কার কার্য একবিধ প্রস্তরে সম্পন্ন হয় নাই। উহাতে দুই তিন প্রকারের প্রস্তর দিতে হইয়াছিল। সুতরাং রঙ দেওয়ার বিশেষ দয়কার হইয়াছিল। রঙ উঠিয়া গেলে নির্মাণ-প্রতিমার জ্যোতিঃবিকাশ হইবে না বরং দেখিতে বিকৃত হইবে। বিলাতী

মাটির জোড় দেখা যাইবে। দুই তিন প্রকারের পাথর দেখা যাইবে এবং পাথর কয় হইবাও যাইতে পারে। আমাদের বিবেচনার আট দশ বৎসর অন্তর একবার রঙ দেওয়া আবশ্যক।

প্রতিমা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির সংস্কার বিষয়েও কারলীল সাহেবকে মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। যখন মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের সমস্ত রাবিশ ফেলিয়া দেওয়া গেল, তখন দৃষ্ট হইল মন্দিরের ভিত্তি কোথায় ৫ ফুট, কোথায় ৬ ফুট, কোথায় ৭ ফুট, কোথায় ১০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। বাহিরের দিক হইতে মাপিলে যত পাওয়া যায়, ভিতরের দিক হইতে আবার তত পাওয়া যায় না। ছাদ একেবারে পড়িয়া গিয়াছে। ভিত্তির অনেক স্থান একরূপ অবস্থায় ছিল যে কখন পড়িয়া গেল তাহার স্থির নাই। কাবলীল সাহেব সেই ভগ্নপ্রাচীর অংশ সকল ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং ভিত্তি গাঁথিতে আরম্ভ করিয়া কাবলীল সাহেব ক্রমে ১২ ফুট উচ্চ করিয়া তুলিলেন এবং বাহির দিকে ভিত্তি ক্রমে সরাইয়া দিয়া পোস্তার স্থায় করিয়া দিলেন। মন্দিরের ভিতরটা পরিষ্কার করিবার সময় কয়েকটি ইটের চাপ পাওয়া গিয়াছিল। পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইল যে ঐ চাপ গুলি খিলানের অগ্রভাগমাত্র। একটি জানালার খিলানের, একটি দ্বারের খিলানের, একটি ছাদের খিলানের, ছাদটী খিলানে নির্মিত ছিল। খিলানগুলি সুন্দর এবং মোচার অগ্রভাগের স্থায়। অগ্রভাগের ইটের অমাত্র দেখিয়া খিলান কত বড় ছিল এবং কিরূপ বক্রভাবে অবস্থিত

ছিল তাহা একপ্রকার জানা গেল । তৎ-
দৃষ্টে ঘর জানলা ও ছাদ নির্মিত হইল ।

নিৰ্দ্ধারণ-প্রতিমার সংস্কার কার্য সমাপন
না করিয়া ছাদ নির্মাণ কবিবার কোন উপায়
ছিল না । কাবণ গৃহটী অগ্রে নির্মাণ কবিয়া
নাইলে তাহার মধ্যে কিরূপে সে প্রকাণ্ড
প্রতিমা প্রবেশ করান যাইবে । বিশেষতঃ
অগ্রে প্রতিমা নির্মাণ হইয়াছিল বলিয়াই
সেই প্রতিমার রক্ষার্থে মন্দিরের আবশ্যক
হইয়াছিল । আরও মন্দির-এবং প্রতিমা
দৃষ্টে একপ প্রতীকমান হয় যে প্রতিমার
অম্লরূপ কবিয়াই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল,
মন্দিরবেব অম্লরূপ করিয়া প্রতিমাব নির্মাণ
কবা হয় নাই । কাবলীল সাহেব প্রতিমা
ও মন্দির সংস্কার-কার্যে এই প্রথাই অব-
লম্বন করিয়া ছিলেন । কিন্তু অগ্রে প্রতিমা
সংস্কার কার্য সমাপন কবিয়া সেই ভগ্নসাহেব
পুনঃ সংস্কার কবিতো তাঁহাকে বিলক্ষণ দৃষ্ট
পাইতে হইয়াছিল ।

ছাদটী যদি কড়ি, ববগা ও টালী দিয়া
ছাওয়া হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে এত
কষ্ট পাইতে হইত না । কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ
করা হইয়াছে যে কয়েকটী ইটের জমাট দৃষ্টে
উহা যে খিলানে নির্মিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন
সন্দেহ রহিল না ।

কারলীল সাহেব প্রথমতঃ প্রতিমাটী
বজ্রদ্বারা আবৃত করিলেন এবং তাহার
উপর কতকগুলি নরম মাদুর বিছাইয়া
দিলেন । তৎপরে বাঁশ ও মাদুর দিয়া
বাঁচাব মত করিয়া উহাকে ঢাকিয়া ফেলি-
লেন । ইতি পূর্বেই তিনি আড় দেওয়ালের
উপরি ভাগটী খিলানের মত করিয়া গাঁথিয়া

নইয়াছিলেন । এক্ষণে তিনি লম্বা দেওয়াল
দুইটীর ভিতর দিকে কাদার গাঁথনি ১ ফুট
চওড়া ৬ ফুট উচ্চ দুইটী দেওয়াল গাঁথিয়া
নইলেন । এবং তাহার উপরি ভাগটী
বাঁশ দিয়া ছাইয়া ফেলিলেন । এতদ্বারা
প্রতিমাটী সম্পূর্ণরূপে বক্ষিত হইল । পবে
একটী আড় দেওয়ালের অগ্রভাগ হইতে
আর একটী আড়দেওয়ালের অগ্রভাগ
পর্যন্ত একটী বাঁশ ফেলিয়া দিলেন এবং
যে দুইটী লম্বা কাঁচা দেওয়াল ভুলিয়াছিলেন
তাহার অগ্রভাগ হইতে এই বাঁশের উপর
কতকগুলি বাঁশ কাৎ কবিয়া ছাইয়া ফেলি-
লেন এবং তাহাদেব অগ্রদেশগুলি পূর্কোক্ত
বাঁশটির সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিলেন ।
এই কাৎকবা বাঁশ গুলিতেও কাদা ও
গোময় দিয়া কাল বৃদ্ধ প্রস্তুত করিয়া নই-
লেন । সেই কাল বৃদ্ধের উপর মোচার
অগ্রভাগেব ত্রায় খিলান প্রস্তুত হইল ।
খিলান সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া গেলে
জানলা দিয়া এই সমস্ত মাল মসলা বাহির
করিয়া লওয়া হইল । ঘর প্রস্তুত হইলে
দৃষ্ট হইল যে প্রতিমার কিছুমাত্র ক্ষতি হয়
নাই ।

মন্দিরের পার্শ্ববর্তী রাবিশ ইট ইত্যাদি
পরিকার করিতে করিতে পুরাণ মন্দিরের
চুড়াটি তাহারই মধ্যে পতিত হইয়া রহিয়াছে
দৃষ্ট হইল । চুড়াটি বেমেরামত ও ভগ্নাব-
স্থায় পতিত হইয়াছিল, কারলীল সাহেব
উহা পুনর্নির্মাণ করিয়া বখাছানে প্রতি-
স্থাপিত করিলেন ।

মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি দরওয়ান
ছিল, সাহেব বিশেষ বজ্রসহকারে বেটিকে

পুনর্নির্মাণ করিলেন । কিন্তু এই দরদালানটি পুনর্নির্মাণ করিবার সময় তাহাতে বহুসংখ্যক মন্দিরের অস্থি, অস্ত্রার ও ভস্ম দৃষ্ট হইল । মন্দিরবেব যে দ্বারটি ছিল, তাহার কবাটের বাজুব যে টুকু পাওয়া গেল তাহাও অস্বাভাবিক । দ্বারটির হাঁসকল ও ভূমনি যে অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইল । সুতরাং কুশীনগর হইতে বৌদ্ধ-দিগকে দূর করিবার সময় তাহাদের মন্দিরটি যে অগ্নিসাৎ করিতে হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কে যে এই পবিত্র মন্দিরে অগ্নিপ্রদান করিয়াছিল তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই । সে যেই হউক, হিন্দুই হউক বা মুসলমানই হউক, বৌদ্ধদেবী ব্রাহ্মণই হউক বা প্রতিমাধেবী মহামায়ীই হউক কারলীল সাহেবের প্রযত্নে এতদিনের পর তাহাদের সমস্ত মনোরথ ব্যর্থ হইয়া গেল । যে মন্দির ধ্বংসের জন্য তাহারা অগ্নিদেবের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই মন্দির আবার নবীকৃত হইল । যে প্রতিমা তাহারা ভাসিবা চুরিবা লুণ্ঠন করিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহাও পূর্বাঙ্গী প্রাপ্ত হইল । কারলীল সাহেবের যত্ন, যত্ন ও অধ্যবসায় কেশত শত ধন্যবাদ । এই কার্য্য করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে যে টাকা দিয়া ছিলেন, সে টাকা ফুরাইয়া গেল, ভাঙ্গা পিস্তুল-কার্য্য তাঁহার মনোমত হইল না, তখন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আপনার বেতন হইতে বারশত টাকা খরচ করিলেন । তাঁহার বেতন বোধ হয় চারি শত টাকা অধিক নহে । তিনি এই

কার্য্যের জন্য আপনার তিন মাসের বেতন ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না । শুদ্ধ তাহাই নহে, তিনি পাছে কেহ মন্দিরবেব কোন ক্ষতি করে এইজন্য অনেক দিন ধরিয়া ছুইটা লোক নিজ ব্যয়ে মন্দির রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এই সকল অধ্যবসায়শীল নিম্নার্ণ লোক হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের পুনরুদ্ধার কতকটা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ।

কারলীল সাহেব এই যে অগাধ পরিশ্রম করিলেন, প্রাণপণে যত্ন করিলেন, সাত আট মাস ধরিয়া একাকী নিবিড় জঙ্গল মধ্যে বাস করিলেন । এবং অকাতরে অর্থব্যয় করিলেন, ইহার জন্য তিনি কি পুরস্কার পাইতে পারেন ? বর্তমানেও কিছুই দেখি না, অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিবে, অনেকে তাঁহাকে আত্মঘাতক বলিবে এবং অনেকেই নাস্তিবিধ কদম্ব বিশেষণে তাঁহাকে বিভূষিত করিবে । কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যখন লৌহ বস্ত্র, বাষ্পীয়পোত প্রভৃতির সহায়তায় চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, মানচুরিয়া, কোরিয়া, সাইবিরিয়া, বর্ম্মা, সায়াম, সিংহল, তিব্বত, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি নানা দিক্দিগন্ত হইতে পরম সৌগতগণ ভগবানের ভবলীলাব শেষ তীর্থ সন্দর্শন করিতে আগিবে তখন তাহারা মন্দির মধ্যে ভগবৎ প্রতিমা দর্শনের পূর্বে নিশ্চয়ই কারলীল সাহেবকে পরম বোধি সূত্র বোধে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা অর্চনা করিবে এবং তাঁহার নামাঙ্কিত শিলাশাসনকে পরমারাধ্য বস্তু বোধে নমস্কার করিবে ।

ঐকরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।

মরণ ।

মরণ নূতন নহে। টাকশালের টাকার মত ঘরে বাহিরে মরণের সহিত সাক্ষাৎকার হইতেছে। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ বস্তুটির নাম ধাম আমরা কিছুই জানি না। টাকশালের টাকার মত উহা চলিত—এই মাত্র জানি। উহার ইতিবৃত্ত জানি না; জানিবাব প্রয়োজনও দেখি না। আমাদের সুবৃষ্টির ভঙ্গ নাই। মায়াবশে চৈতন্য অচৈতন্য বলিয়া, অচৈতন্য চৈতন্য বলিয়া প্রতীত হয়। মায়ার মত চন্দ্ৰা ভ্রমতে নাই। ঠিক যেন কোন নিপুণ ভাস্কর এক বিচিত্র তুলিকাধারা বস্তু-মাত্রের প্রাকৃত রূপ গোপন করতঃ বিভিন্ন বর্ণ প্রকটিত করিতেছে। যেমন এতদ্রূপ কপোত উড়িয়া গেলে প্রান্তর ভূমিতে একটি কিৎকালীন কাল ছায়া পড়ে, আমাদের জীবন স্থলীতেও মরণের চিন্তাতে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছায়া পড়ে না।

আমরাই আমাদের নিকট চিরন্তনী প্রহেলিকা। মরণেই কি জীবের অবসান। মরণ বস্তুটিই বা কি? মায়ুব এত মরণের ভব করে কেন? আমাদের জীবনসরিৎ মাহাকাভসমুদ্রের তরঙ্গাবর্তে মিশিতেছে। আশিও ত মরিব। অতএব আমার এ প্রশ্ন তুলিবার অধিকার আছে—মরণের পর কি হইবে?

অনন্তের সহিত সঙ্গীমের, চিরন্তনের সহিত কণিকের এখানে সাক্ষাৎকার হই-

তেছে। এই ববনিকা উদঘাটনের চেষ্টা ধৃষ্টতা হইতে পারে। কিন্তু ক্ষুধা পিপাসার জায় এই জিজ্ঞাসা আমাদের সাংসদিক ধর্ম।

দেখ, মৃত্যু কি স্নানর বস্তু। ইহার তুল্য রমণীর কি আছে? মৃত্যুব করস্পর্শ কি কোমল, কি স্নিগ্ধ! মায়ুব যে সমস্ত বস্তুব জন্য ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায় তাহাদের কি মৃত্যুর সহিত উপমা হইতে পারে। প্রেম একটি স্নানর বস্তু; কিন্তু ইহা মাদক। সহস্র সহস্র জীবন সাক্ষাৎকার করিতেছে—ইহাতে কি অধৈর্য্য, কি উদ্বেগ, কি উন্মাদ। ইহা একটি বিষবীজ। ইহাতে কি ক্ষুধা, কি কদির চাঞ্চল্য, কি বেগবৎ জীবনশ্রোতঃ। অশান্তিই ইহার শাস্তি; অধৈর্য্য ইহার আত্মা। কিন্তু মৃত্যু হিমস্পর্শ শশিকরা-পেক্ষাও স্নিগ্ধ। কি অমৃতদ্রব্য মৃত্যুব কোমল কর হই গলিয়া পড়িতেছে। বতকণ পর্যন্ত প্রেম মৃত্যুর করস্পর্শ সুখ অমৃতব না করে, তাবৎ ইহার সিজি নাই, ইহার দেবত্ব নাই। বস্তুতঃ মৃত্যু পবীক্কা না করিলে কিছুই সিজি নাই। অধৈর্য্যের, অশান্তির ঘূর্ণনের জীবন এক মুহূর্তে স্থির শান্ত নিরুদ্ধেগ, মিস্কোভ। মারা মারি, কাটাকাটি ছুটাকাটির এককালে নিবৃত্তি। লোভ নাই, হিংসা নাই, বিদ্ভাঙ্গন লব ঘূর করিয়াছে।

ইহজীবনের সহিত তুলনা করিলে মৃত্যু এইরূপই বটে; কিন্তু ইহার পব—কে বলিতে পারে কি হইবে? কেহ কেহ বলেন মানব জীবন প্রবণভূমিতে অধঃপতিত জড়পিণ্ড সদৃশ। যাবৎ শক্তি রহিবে তাবৎ যুবিবে চলিবে। শক্তি নিঃশেষিত হইলে প্রবণভূমি অধঃস্থল লব্ধ হইলে পিণ্ডের গতি অবসান হইবে। মানুষ একটি আত্মবাজি। সোরা গন্ধকের সমবাধে তাপ গঠিত হয়; অগ্নিসংযোগে সেই তাপ ইন্দ্রিয় যতগুলি বর্ণ সব বিকাশ কবে। পশ্চাৎ তাপাবসানে নিজের খেলা সমান করিয়া মাটির বাজি মাটিতে পড়ে। সেই রূপ মানব জীবন, ইহারা বলেন, সজ্জাত গঠিত বলের বিকাশ। চৈতন্ত্য ঐ বলের পরিণাম মাত্র। ঐ বলের অবসানে জড়পিণ্ড জড়ত্ব গ্রহণ করিবে। ভাঙে মন্দ নয়; এমন কি কতকটা সুন্দরও বটে। প্রদীপের নির্ক্ষণের মত আমাদের অবসান হইবে। আত্মবাজির মত ক্ষণিক লীলার পর আমরা মৃত্তিকায় মিশাইব।

কিন্তু কথাটা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। জড় হইতে চৈতন্তের উৎপত্তি যখন এ পর্য্যন্ত সপ্রমাণ হইল না, তখন জড়ের বিনাশে চৈতন্ত বিনাশ কিরূপে সম্ভবে? জীবনের আদির ব্যাখ্যাও বা অন্তের ব্যাখ্যাও তাই। জড়ের প্রাক্ যদি চৈতন্ত স্বীকার করিতে হয়, পশ্চাৎও স্বীকার করিতে হইবে। অন্ততঃ অস্বীকার করিবার কোন বিশেষ যুক্তি দেখা যায় না।

আরও একটা কথা এই—মানব মনের সহিত এরূপ মতের মিল নাই। যনঃক্ষেত্রে এরূপ

বহুবীজ আছে বাহা এই ক্ষুদ্র জীবনে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ক্ষুদ্র বীজে তাহার অদৃষ্ট লিপি লিখিত রহিয়াছে। বীজ যে পর্য্যন্ত পরিপাক লাভ না করে সে পর্য্যন্ত বীজের জীবনাবসান হইতে পারে না। ক্ষুদ্রতম মুহূলে তাহার ভবিষ্যৎ গুণ আছে। মুহূলের অলক্ষিত শক্তি পুষ্প ভাবে বিকসিত হয়; আবার ফলভূৎ বৃক্ষে ঐ পুষ্পে নিহিত শক্তি ফল-ভাবে বিকাশ লাভ করে। বীজেরও অকাল মৃত্যু আছে; মুহূলেরও অকাল মৃত্যু আছে। কিন্তু যেমন বিধি বিরহে ব্যভিচার সম্ভাবনা, মৃত্যুর কোন বৈধ কাল না থাকিলে অকাল মৃত্যু থাকিত না। শৈশব মৃত্যুর কাল নহে, কারণ তখন পূর্ণবিকাশ হয় নাই। শৌর্য্যবৃদ্ধ মৃত্যুর কাল নহে—কারণ তখন বিকাশের স্থিতি হয় নাই। বার্দ্ধক্য মৃত্যুর কাল, কারণ তখন সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, বিকাশের ভোগও হইয়াছে। আবশ্যক তাহা নহে, অধঃপাতেরও সূত্রপাত হইয়াছে। কি শৈশব, কি বার্দ্ধক্য দুই যৌবনের অপেক্ষা করে।

এইরূপে আমরা স্থির করি যতকাল মানুষের চিন্তাক্ষেত্রে যে সকল বীজ উদ্ভূত আছে তাহার কলবৎ না হয়, ততকাল মানুষ মরিতে পারে না। মানব হৃদয়ের মুহূল সকল ভাবি পুষ্পোদ্যম প্রচার করিতেছে। আমাদেরই আত্ম জীবনের আদিম অঙ্ক উহার শেষ অঙ্ক প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে। মানব জীবনের শেষ অঙ্ক কখন সম্পন্ন হইবে; কোন্ ঘটনার উপর যবনিকা পতন হইবে?—যখন কোরকগুলি

ফুটিবে—বখন বীজ ফলে পর্য্যবসিত হইবে ।
কিন্তু সে দিন আসিবাব নহ । অসীম উন্নতি
ইহার আশা , অনন্তত্বাতিমুখে এই আশ্বাব
গতি । মানবের অন্তর অদ্ভুত নিত্যবর্দ্ধমান
দীক্ষের ক্ষেত্র । কখন কি সসীম অসীম
হইতে পাবে—সান্ত অনন্ত ? কখনই নহে ।
সূর্য্যের গতি বিপর্য্যয় হইতে পাবে, স্বভাবের
চিবন্তনী গতি ব্যাহতা বিপর্য্যন্তা হইতে
পাবে, কিন্তু সসীম অসীমের সান্তানন্তের
ভেদক বেথা বিলীন হইবাব নহে—বিলীন
হইবেও না । অতএব মীমাংসা এই, মানুষ
মরে না । এ পারেও যেমন সে পাবেও
তেমন । ধূমকেতুব স্থায় অবিশ্রাম পরিক্রমণ
উহার অদৃষ্ট লিপি । পড়িতেছে—উঠিতেছে
—কখনও অগ্রসর, কখনও পশ্চাৎদর্শী—
কিন্তু ঐ দূরতম তীর্ধের যাত্রী এক অলভ্য
লক্ষ্যে অক্ষিযোজন করিয়া চলিয়াছে ।

সৌর জগতের সহস্র সহস্র গ্রহোপগ্রহ যেমন
এক চিরন্তন কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া ঘুরি-
তেছে, অথচ কেন্দ্রের নিকট এক পদও
অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, সেইরূপ অসী-
মত্বের উপর, অনন্তত্বের উপর দৃষ্টি যোজন
করিয়া মানব ঘুরিতেছে—অথচ লক্ষ্যের
অসীম দূরত্ব বশতঃ মানবের পরিক্রমণে লক্ষ্য
অক্ষত বহিষাছে । কাবণ সসীম বুদ্ধায়তন
হইলেও কখন অসীম হইতে পারে না ।

অতএব আমরা দেখিলাম যে মৃত্যু
যেমন একত্র অন্ত, অপবত্র আদি । একত্র
যেমন শাস্তিময়, বিরামময় । অপরত্র আর
এক ধাবনকুর্দনময় জীবনের অস্বাবতাব ।
মৃত্যু জীবের অবসান নহে, এমন কি কিয়ৎ-
কালীন নিদ্রাও নহে । অনন্ত তীর্থ ভ্রমণে
মৃত্যু একটি নূতন বস্ত্র পরিগ্রহ মাত্র ।

জ্ঞানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ।

নিদ্রা ও স্বপ্ন ।

গীত ।

এস গো স্নানিত্রা দেবী,
জগত তোমাতে সেবি
সংসার যাতনা নিত্য করে পরিহার ।
নিত্য নব বল ধরে,
নিত্য নব রূপ পরে,
তোমার মহিমা নিত্য করবে প্রচার ॥
যদিও কৃতান্ত জায়া,
সব জীবে কর দয়া,
ঐহ পর হুই লোক কর ব্যবধান ।
সম্মুখে স্বধ-যামিনী,
পশ্চাতে কাল-বজ্রনী,
মোহ রূপে হুই দিক কর আবরণ ॥

এস গো স্বপন এস,
তুমিও এখানে 'বস',
তোমার নিকটে মম আছে নিবেদন ।
হুঃখী ভাপ্পী মুঢ় জনে,
সদা আশা বিতরণে,
নাহি কেহ এ ছুবনে তোমার সমান ॥
অনাথ সনাথ হয়,
দরিদ্র সম্পদ পায়,
সন্তপ্ত জনের হয় সন্তাপ মোচন ।
বিচিত্র তব ভাণ্ডার,
হেঁড়া কাঁথা মণি হার,
হতাশ, আশঙ্কা, হুঃখ, প্রেয়, সাহস, মিলন ।
জীবেত্রপাল চক্রবর্তী ।

বিরলে ।

১

বিবল বিজন নদীর কুল ;
বিরল বিজন বন ;
বিরলে একটা ফুটেছে ফুল,
কানন জ্বলয় ধম ।

২

বিরলে একটু মলয় বায়
ফিরে যেন কার আশে ;
লুটায় পড়িল ফুলেরি পায়,
খল খল নদী হাসে ।

৩

কোকিল কোথায় লুকায়ে বসি
পরাণ খুলিয়া ডাকে ;
সে সুর লহরী বিবলে পশ্চি
কাননে জড়িয়ে থাকে ।

৪

একটা তারকা আকাশ তলে
আছে ক্লার পথ চাই ,
একটা তারকা নদীর স্নেহে
দশটা দেখিতে পাই ।

৫

কপের মাধুরী কহিব কত,
আকাশের এক পাশে,
অঁধার সংসারে আশার মত
এক কোঁটা চাঁদ হাসে !

৬

এক কোঁটা মেঘ সাধের তবি,
আলোকে পুলক দিয়া,

অনন্ত আকাশে ভরসা করি
একেলা দিতেছে থেয়া ।

৭

শ্রোমের চাহনি চাঁদের চোকে,
বাতাসে শ্রোমের গান ,
ধিকি ধিকি ধিকি তারকালোকে
মরা ধরা পাঁচ প্রাণ ।

৮

মুচকি হাসিল কানন তায,
জলেতে হাসিব মেলা ;
মাধ আধ হাসি গাছের ছায়
থেলিছে শ্রোমের থেলা

৯

গগনের চাঁদ গগনে বসি,
চাঁদের মায়া কি জানি !
জ্বলয় আকাশে প্রকাশে শশী
হয়ে আর এক থানি ।

১০

সুদূরে সৈকত সুহাস মুখে
ভাসিছে নদীর জলে,
ধরগ ছাড়িয়া যুমায়ে সুখে
নীহারিকা ধরাতলে ?

১১

নিকটে নিবিড় গাছের গায
জোনাকি সেজেছে ভালো,
ধরায় একটু আকাশে প্রায়
জীবন্ত তারার আলো ।

১২

নীরবে নিশির শিশির পড়ে ;
নীরবে শ্রবাস চলে ;
নীরবে লতার অলকা নড়ে ;
নীরব লহর জলে ।

১৩

নীরব নিরুন্ম অলস-মাথা
হেথায় হোথায় সব ;
যুমায পাখী মুখে দিয়া পাখা,
ভনি কিঁ কিঁ কিঁ কিঁ বব ।

১৪

আকাশ পাতাল অলসে চোলে ;
অলস চাঁদের মুখে ;
অলস গাছেব অলস কোলে
লতিকা যুমায শ্রুখে ।

১৫

শ্রুতি হেথায় হৃদয়ে বাধি
শ্রুত শান্তি শিশু হুটী ;
চুমায় দৌহার কমল আঁখি,
হেসে দৌহে কুটিকুটি ।

১৬

আলোক আঁধারে অন্ধুট দেখা,
অপরূপ ভাঁজ করা ।
শ্রোমের মূবতি হেথায় লেখা
নীলিম বসন-পর। ।

১৭

স্বাধীন সমীরে স্বাধীন প্রাণ
চাহে থাকে এক পাশ,
শোকভাপ বধা নাপায় স্থান,
বংসারের হা হতাশ ।

১৮

হেথা কাল মুখ মাহুষে নাই,
কাঁদে প্রাণ তাব তরে,
দেব ভাব তার দেখিতে পাই
বিবলে বিরাজ করে ।

১৯

অন্তরের মেঘ সরিয়া যায়,
পুঁছে যায় মনোকালি ;
হৃদে তারা শব্দী প্রকাশ পায়,
শতেক আলোক জ্বালি ।

২০

কল্পনা হেথা খেলে ভোজবাজি
বিরলে আপন মনে ;
মলিন জগতে ফুটায় মাজি
ভাজে গড়ে কণে কণে ।

২১

বিরলে একটা সবাই সাজে,
কে কারে না রাখে ঢাকি ;
বাসনা এসব একটা মাজে
একটা হইয়া থাকি ।

২২

বিরল আকাশে চাঁদের রেখা,
বিরল সলিলে হাস ;
বিরল হৃদয়ে কে দেয় দেখা,
আকাশ চাঁদের ভাব ?

২৩

বিরল বিজ্ঞান বহিছে নদী,
বিরল যে দিকে চাই ;
পাপ লোকালয় কে চায়, যদি
মনের মাছ্য পাই ?

২৪

বিরলে নীরব ধেমন তরি
বহে ওই শ্মশ্রু মনে ;
ভাসি এ বিরলে তেমনি কবি
কাল স্রোতে তাব সনে !

২৫

না চাহি ধরার অপর শ্মশ্রু,
না চাহি শ্রবণ বাস ;

বিরলে তাকারে রব সে শ্মশ্রু,
বসিয়া তাহারি পাশে ।

২৬

না পড়ে নধনে নিমেষ যথা,
না চাহে অপর ঠাই ;
মজে না উপজে অপর কথা,
বিরলে বাসনা তাই ।

শ্রীপঃ—

সিপাহি যুদ্ধে ব্রিটিশ নীতি ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

পূর্ববর্ণিত বিভাগের রাজধানী অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ভারতে যখন মুসলমান আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ইউরোপীয় বণিকগণ যখন বাণিজ্যব্যবসায়ের প্রসঙ্গে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করে নাই, তখনও এই রাজধানী হিন্দুদিগের মধ্যে পবিত্রতীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ এইখানে আসিয়া আপনাদিগকে পরিষুদ্ধ বোধ করিতেন, এবং ইহার পাদদেশপ্রবাহিত পবিত্র সলিলসঙ্গমে অবগাহন করিয়া চরিতার্থ হইতেন। মুসলমানদিগের আধিপত্যসময়েও এইস্থান অপ্রসিদ্ধ ছিল না। দিল্লীর প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট এইখানে একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্মাণ

করেন। ইংরেজের আধিপত্য সময়ে উহা অনেক অংশে সংস্কৃত ও শুদ্ধ হয়। সমগ্র উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের শাসনকর্তা এই শ্মশ্রু নগরে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থানের অজ্ঞাগার যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ ছিল; এবং ইহার রাজকীয় কোবাগারে বর্ণনীয় সময়ে উনিশ লক্ষ টাকা ছিল। যখন মিরাতের সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অজ্ঞধারণ করে, তখন ঐ প্রসিদ্ধ স্থলে কোন ইউরোপীয় সৈনিক ছিল না। উহার প্রসিদ্ধ দুর্গে এবং দুর্গের চারি মাইল দূরবর্তী সৈনিক নিবাসে ছয়গণিত এতদ্বৈদ্য পদাতিক দল, একদল এতদ্বৈদ্য কামান রক্ষক, এবং পাঁচদল এতদ্বৈদ্য ভিন্নপ্রদেশবাসীসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল।

দুর্গের বাহিরে সৈনিক নিবাসে যে এত-
দেশীয় সৈনিকদল অবস্থিতি কবিতেছিল,
অযোধ্যা ও বিহার প্রদেশের লোক লইয়া
সে দল সংগঠিত হইয়াছিল। ইঙ্গরেজ যে
সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধে অগ্রী হইয়া ভারতে আপ-
নাদের অধিকার স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন,
সেই সকল যুদ্ধে এই সৈনিক দল ইঙ্গবেজের
সহায় হইয়াছিল। ইহার রণক্ষেত্রে ইঙ্গবে-
জের পার্শ্বে স্বকৌশলে বণনৈপুণ্য দেখাইয়া
বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়াছিল এবং
প্রকৃত যুদ্ধবীরের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত
হইয়া ইঙ্গবেজ গবর্ণমেন্টের নিকট গৌরবা-
ধিত হইয়াছিল। পূর্বে ইহাদের প্রভুভক্তি
কখনও বিচলিত হয় নাই। গবর্ণমেন্টও পূর্বে
ইহাদিগকে কখন সন্দেহেব চক্ষে চাহিয়া
দেখেন নাই। ইহা বা উপস্থিত সময়ে কোষা-
গাব রক্ষার ভাব গ্রহণ করিয়া ছিল। দুইজন
লোক ইহাদিগকে গবর্ণমেন্টের নি-
উদ্ভেজিত করিবার প্রয়াস পাওরাতে ইহারা
তাহাদিগকে কতৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করে।
এবং গবর্ণমেন্টের পক্ষ সমর্থন জন্য দিল্লীতে
ঘাইতে উদ্যত হয়। এই জন্য ভারতের
গবর্ণর জেনারেল ইহাদের প্রভুভক্তির প্রশং-
সাবাদে বিমুগ্ধ হন নাই। কিন্তু শেষে ঘটনা-
বৈগুণ্যে ইহাদের বুদ্ধিবৈগুণ্য ঘটে। যে
সাত্ৰুই এখন ইহাদিগকে এক সময়ে গবর্ণমেন্টের
অধিকার রক্ষায় উদ্ভেজিত করিয়াছিল, সেই
সাত্ৰুই এখন ইহাদিগকে গবর্ণমেন্টের উদ্ভেদ
সাধনে উদ্ভেজিত করিয়া ফুলে। গবর্ণমে-
ন্টের পূর্বতন রাজনীতির দোষে ইহাদের
সাময়িক নীতি পর্য্যুদস্ত হয় এবং ইহাদের
প্রভুভক্তি ভয়বহ বিপ্লবের অভয় সাধকে

নিমজ্জিত হইয়া যায়। ইহারা সহসা অস্ত্র
পরিগ্রহ পূর্বক ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান
হইয়া সমগ্র জনপদে যতীর আশঙ্কা ও
আতঙ্কের রাজ্য বিস্তার করে। ইহাদের
আক্রমণে ইঙ্গরেজগণ নিহত হন, ধনাগার
লুণ্ঠিত হয়। অবশেষে ইহা বা ছত্রভঙ্গ হইয়া
চারিদিকে পলায়ন করে।

উক্তদল ব্যতীত আর একদল সৈনিক
পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতিব ভিন্ন অধিনায়কের
অধীনে বশিত হইতেছিল। ইহা বা দীর্ঘকায়,
দীর্ঘশ্রব, সাহসী ও প্রভূত বীরত্বসম্পন্ন
ছিল। লর্ড ডালহৌসী বিজয়লব্ধ সম্পত্তি
বলিয়া পঞ্চসরিৎবর্ধিত যে বিস্তৃত রমণীয়
রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনাধীন কবেন,
এই সকল সৈনিক পুরুষ, সেই ইতিহাস-
প্রসিদ্ধ অপূর্ব বীরত্বের বিফুরগক্ষেত্র রাজ্য
হইতে সংগৃহীত হইয়াছেন। নয় বৎসর
পূর্বে ইহারা স্বদেশেব স্বাধীনতারক্ষার্থ
ব্রিটিশ সৈনের সম্মুখীন হইয়া আপনাদের
শূরত্বের একশেষ দেখাইয়াছিল। ইহাদের
পরাক্রমে, ইহাদেরই বণনৈপুণ্যে আলিবল,
ফিরোজ সাহ, সোত্রাও ও চিনিয়াবান্দা
যুদ্ধক্ষেত্রের কাহিনী পবিত্র ইতিহাসে অক্ষয়
অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। অবশেষে
পরাজিত হইয়া এই সকল বীর পুরুষ ব্রিটিশ
পতাকার অধীনে সজ্জিত হয়। এক সময়
ইহারা বাহাদুরের পরাক্রম বিনষ্ট করিবার
অন্ত সময়ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল, পরিব-
র্তনশীল সময়ের অনন্তমহিমায় এখন তাহা-
দের পক্ষ সমর্থন জন্যই আপনাদের জীবন
উৎসর্গ করে।

১১ই যে উদ্ভেজিত বিপ্লবিত্ত্ব

আক্রমণে যখন স্মিরাটে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন এই স্থানের ইউরোপীয়গণ নিক্ষেপে প্রচণ্ড নিদ্রাঘোর সুদীর্ঘ দিনের সাবভন বয়সে স্বেচ্ছাচরিত উপভোগ করিতে ছিলেন। কেহ কেহ রমণীয় বৃক্ষবাটিকায় প্রণয়িনী বা প্রিয়বয়স্ক সমভিব্যাহারে বেড়াইতেছিলেন। কেহ কেহ এতদংশীয় সৈনিক পুরুষদিগের স্বেচ্ছাচরিত বাস্য স্তন্যিয়া আপনাদের আশ্রমে আপনারাষ্ট পরিভ্রমণ হইতেছিলেন। কেহ কেহ বা সময়স্বল্পদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে আমোদ উপভোগ করিতে ছিলেন। সিপাহিদিগের সমুখানে মিবাটের ইউরোপীয়গণ যখন প্রাণের দাস্তে উদ্ভ্রাণ হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতেছিলেন, অনেকে বা নিদ্রাক্ষণ অজ্ঞাঘাতে নিহত হইতেছিলেন, তখন উপস্থিত স্থানের ইউরোপীয়েরা এইরূপ আনন্দভোগে আকোশিত হইয়া স্বেচ্ছাচরিত ভাগিয়া বেড়াইতে ছিলেন। অবিলম্বে তাহাদিগকেও যে, স্মিরাটপ্রবাসী ইংরেজদিগের দশায় পতিত হইতে হইবে, তাহাদের মস্তকের উপরে অবিলম্বে যে, অশনিপাত হইয়া ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপত্তি করিবে, তখন তাহারা স্বপ্নেও ভাবা ভাবেন নাই।

১১ই মে এইরূপে নিক্ষেপে স্বেচ্ছাচরিত হইল। ১২ই মে তাড়িত রাজ্যের স্মিরাটের বার্তা যুদ্ধের মধ্যে আনিয়া গেল। ১৪ই তারিখে ঘটনার অন্তিমস্থিত বিবরণ উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়গণ বিশ্বাসে ও ভয়ে অভিভূত হইয়া যুদ্ধের যুদ্ধের সর্বপ্রাণের বিভীষিকার চমকিত হইতে লাগিলেন। কাম্বোয়ে, গুলীতে সাক্ষরণ কোকোর মধ্যে

এই বিবদ লইয়া আকোশন হইতে লাগিল। প্রত্যেকেই প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত এই অশুভ বিবদ লইয়া আকোশন করিতে লাগিল। সর্বব্যাপী দ্বন্দ্বাস সকলকেই সমভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ইউরোপীয়গণ যেমন প্রতিক্ষেপে আপনাদের সমুখে মৃত্যুর করাল ছায়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন, জনসাধারণও তেমনি আপনাদের জাতিনাশ, ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় উদ্ভিগ্ন হইয়া প্রতিক্ষেপে ভয়াবহ রক্তের বিকট দৃষ্টদেখিতে লাগিল। ইহাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস অস্তিত্বে, কোম্পানি সকলকেই আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট অবশেষে প্রকৃত্তি ঘোষণা পত্রকার্য সাধারণের বিশ্বাস দূর করিতে চেষ্টা পাইলেন। কোম্পানি যে, কখন কাহারও জাতি বা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না, সকলেই কোম্পানির রাজ্যে নির্জিবাসে আপনাদের ধর্ম্মের অনুশাসন রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহা ঐ ঘোষণাপত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত করা হইয়াছিল।

১৫ই মে সাধারণের উদ্দেশ্যে ও আশঙ্কা এবং তৎপ্রযুক্ত গভীর উদ্বেগনা কিরদংশে কমিয়া গেল। কিন্তু বহুলা বাজারে শক্তের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে আশঙ্কা আবার বাড়িয়া উঠিল। ১৮ই তারিখে দিল্লীর সংবাদে জনসাধারণ অধিকতর উদ্বেজিত হইয়া উঠিল। স্মিরাটের সিপাহীগণ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। দিল্লীর বুদ্ধ কাহারও শাসন সমগ্র হিন্দুস্থানের সকাট বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। রোবেরের প্রসিদ্ধ রাজধানীর

আবার মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সৈনিক পুরুষগণ ইকরেজদিগকে দূরীভূত করিয়া আবার মোগল সম্রাটের মহামহিমায় খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার করিতেছে। বাজাবে বাজারে বখন এই সংবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল, পল্লীতে পল্লীতে বখন এই কথা লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল, তখন আর সাধারণে স্থির থাকিতে পারিল না। সিপাহিরাও চিন্তার আবর্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। তাহারা সকলেই গভীর উত্তেজনার বিচলিত হইয়া উঠিল। এদিকে উপস্থিত স্থানের ইউরোপীয়গণ আত্মবক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অল্প কিছুতেই তাহাদের আর মনোযোগ রহিল না। কিরূপে দুর্গ নিরাপদ থাকিবে, ধনাগার রক্ষা পাইবে, আপনারা শিউপ ভরস্কর শত্রুর আক্রমণে অক্ষত থাকিবে, এখন ইহাই তাহাদের মনোযোগের প্রধান বিষয় হইল।

প্রতিদিন দিল্লী হইতে নানা হুঃসংবাদ পহঁছিতে লাগিল। ঐ হুঃসংবাদে নগরবাসী ইউরোপীয়গণ প্রতিদিন অধিকতর ভীত ও অধিকতর উদ্বেগ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ধনাগারের সমুদয় অর্থ দুর্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু কেহ কেহ ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে অবশেষে উহা পরিত্যক্ত হইল। যেহেতু দুর্গে টাকা রাখিলেই উত্তেজিত সিপাহিগণ সর্ব প্রথমে ঐ টাকার লোভে দুর্গ অধিকার করিতে দলবদ্ধ হইবে। স্থানীয় ইউরোপীয়গণ সকলে সশস্ত্র সৈনিক দলভুক্ত হইয়া নগর

রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার পূর্বাবস্থায় ছিল। সুতরাং নানাস্থান হইতে নানাসংবাদ যথাসময়ে পহঁছিতে লাগিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেব সংবাদ বড়ই আশঙ্কাজনক হইয়াছিল, এদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতার সংবাদ কিছুই ছিলনা।

আশঙ্কার উদ্বেগে মে মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। জুন মাসের প্রথম কয়েক দিন যে সংবাদ আসিল, তাহাতে ইউরোপীয়দিগের উৎকর্ষা অধিকতর বাড়িয়া উঠিল। ৪ ঠা জুন হইতে টেলিগ্রাফের তার অকর্ষণ্য হইয়া পড়িল। আর তাহা হইতে কোন সংবাদ আসিল না। ঐ দিন অপরাহ্নে কতিপয় বর্জাবহ দ্রুতগতি আসিয়া ইউরোপীয়দিগকে সংবাদ দিল যে, তাহাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী প্রধান নগর উত্তেজিত সিপাহিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ঐ সকল সিপাহি এক্ষণে তাহাদের অভিযুগ্মে আসিতেছে। এখন স্থানীয় ইউরোপীয়দিগের সমক্ষে সঙ্কটময় কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল। "সকলে মুহূর্ত্ত মাত্রাৎ বিলম্ব না করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। নগরে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাহারা এই জুন দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইল।

ঐ রাজি বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল; কিন্তু উহার পরবর্তী রাজিতেই কালাতক যমের বিকট ছায়া আসিয়া ইউরোপীয়দিগকে ঢাকিয়া কেলিল। হুঃসংবাদে সিপাহিদল উত্তেজিত হইয়া তাহাদের আকিসর দিগকে আক্রমণ করিল। হুই

একজন আকিসর মাত্র এই আক্রমণ হইতে কোনও রূপে নিষ্কৃতি পাইলেন। দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের পূর্ণমূর্তি চারিদিকে বিকাশ পাইল। উত্তেজিত জনসাধারণ সমবেত হইয়া কারাগারের করেদীদিগকে বিমুক্ত করিল। হুই হাজার করেদী এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়া উত্তেজিত লোকের দল পরিপুষ্ট করিয়া ফুলিল। এখন শৃঙ্খলার প্রাধান্য রহিল না, নিয়মের শাসন থাকিল না, রাজকীর বিধিব্যবহার মর্যাদা দেখা গেল না। সকলেই এখন সর্বপ্রধান হইয়া কিরিকীর শোণিতে আপনাদের বিশেষ-বুদ্ধির পরিতর্পণে অগ্রসর হইলেন। হুগেরী বাহিরে যাহারা ছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই উত্তেজিত লোকের হস্তে নিহত হইল। এ দিকে ধনাগার বিলুপ্ত হইল। গৃহ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। চারিদিকে ভয়ঙ্করী অনল-শিখা, নিদারুণ ভস্মশূণ্য ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভয় দ্রব্যাদি বিপ্লবে অপূর্ণ শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। ৭ই হইতে ১১ই জুন পর্যন্ত এইরূপে অবাধে ভয়ঙ্কর কার্য্য অচ্যুত হইল। এই সপ্তকালে অভ্যন্তরীণদিগের অনেকে ইকরেজদিগের সাহায্য করিয়াছিল। ইহাদের অটল বিশ্বাসে ও ইহাদের প্রভুত্বভিঙ্গে ইকরেজেরা সে সময়ে বড় উপকৃত হইয়া ছিলেন। শিখ সৈন্ত এ সময়ে ইকরেজদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাদের স্বদেশীরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিচালনা করিতে বিবুদ্ধ হয় নাই। ১১ই জুন অপরাহ্নে অবরুদ্ধ ইকরেজদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। ঐ সময়ে একজন বাহনী, হুস্ক, স্বজাতিহৈতবী অঘচ

কঠোরহৃদয় বীরপুরুষ সৈনিক দল সহ হুগেরী প্রবেশ করিয়া ইউরোপীয় দিগের সময়ে অধিকতর আশাভবসা উদ্বীষ্ট করিয়া দিলেন।

উত্তেজিত জনসাধারণ ক্রমে ইতস্ততঃ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। হুগেরী সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইল। নগরে আবার ইকরেজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সর্বধ্বংস কার্য্যের শেষ হইল না। বিপ্লবের প্রতিঘাতে আবার ভয়ঙ্কর কাণ্ড অচ্যুত হইতে লাগিল। যখন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইকরেজগণ আপনাদের প্রীবন রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তখন কলিকাতার মন্ত্রিসভা বিপক্ষদিগকে কঠোর শাস্তি দিবার জন্য কঠোরতর আইন প্রচার করেন। এই আইনের বলে জনসাধারণের অমূল্য জীবন বিচারপতিদিগের হস্তে জীড়ার সামগ্রী হইতে উঠে। উপস্থিত বিভাগে এখন এই কঠোরতর আইন প্রচারিত হইল। কেবল সেনাভিত্তি নীল এই আইনে বিধ্বংসের রাজ্য বিস্তার করেন নাই। সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত বিচারাধ্যক্ষ, তাহার সহকারী, এমন কি বিচারবিভাগের বহিষ্ঠৃত লোকের হস্তেও এই আইন পরিচালনের ভার সমর্পিত হইল। বিভাগের কমিশনার, জজ, আসিষ্টান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, সিভিল সার্জন, সকলেই উপস্থিত আইনের মহিমায়, মানবের অমূল্য জীবনের বিধাতা পুরুষ হইয়া উঠিলেন। এই সকল বিচারক উত্তেজিত জনসাধারণের ক্রুরতার আপনাদিগের গৃহ সকল বিলুপ্ত ও ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া ছিলেন, আপনাদের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রাঙ্গদিগকে ব্যস্ততার সহিত হুগেরী

আমিবার কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং
প্রতিহিংসা ইহাদের হৃদয়ে নিরন্তর আগরূক
ছিল। ইহা বা সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ লোককেই
ঘোরতর শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি-
লেন। বাহারা এইরূপ শত্রুব বুদ্ধিতে
বিচলিত হইয়া বলবতী প্রতিহিংসায় ভূক্তি-
লাধনে উন্মূহ ছিলেন, এখন তাঁহারা ইহা-
লাধারণের জীবনরক্ষণ বা ইহাদের জন্ত
বিচারকের পবিত্র আসনে সমানীত হইলেন।

উপস্থিত সময়ে ঐ সকল লোকের হস্তে
উক্তরূপ কঠোরতম শাস্তির পরিচালনের
ভার সমর্পণ করা, অবশ্যই গবর্ণমেন্টের উচিত
হয় নাই। বাহারা সর্বত্র বিপ্লবের রাজ্য
বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগকে কঠোর
শাস্তি দেওয়া অবশ্য সঙ্গত। কিন্তু এইরূপ
শাস্তি প্রদানের সময়ে সুবিচারের, সন্ধান
করাও কর্তব্য, শত অপরাধীর বিমুক্তি হয়,
তাহাও ভাল, তথাপি একটি নিশ্চয়
ব্যক্তির প্রাণদণ্ড সন্নীতির অঙ্গমোদিত নহে।
গবর্ণমেন্ট এ সময়ে যে উদ্দেশ্যে উপস্থিত
আইম প্রচার করিয়া ছিলেন, যদি দূরদর্শী
উপযুক্ত লোকের হস্তে উহার পরিচালন-
ভার থাকিত, তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের
সেই সাধু উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হইত।
কিন্তু সম্মিবেচনা ও বীরত্বের অভাবে তাহা
হয় নাই। যে বিধি হুটের দমন এবং
শিষ্টের পালন ও বক্ষণের উদ্দেশ্যে বিবিধ
ও প্রচারিত হইয়াছিল, বিচারের দ্বায়ে
তাহা শিষ্টের দমন ও প্রাণহরণেরও প্রথম
যন্ত্ররূপ হইয়া উঠে। বিচারকের বিচার-
দ্বায়ে প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক আপনী-
দের অমূল্য জীবনে অলাজলি দিতে থাকে।

এই সময়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেক্টে-
মেন্ট গবর্ণর ঘোষণা করিয়া ছিলেন
যে, গবর্ণরজেনেরলের বিনা অনুমতিতে
বিশ্রোহীদিগের প্রাণদণ্ড হইবে না। কিন্তু
সেনাপতি নীল এই ঘোষণার মনোযোগ
দেন নাই। এই সময়ে পরলোকগত মহাত্মা
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পোর্ট্রিট পত্রের
সম্পাদক ছিলেন। তিনি নির্ভীক চিত্তে
গভীর ঘৃণা ও বিরাগের সহিত আপ-
নার প্রদিক্ত সংবাদপত্রে ঐ বিষয়সম্বন্ধে
এই ভাবে লিখিয়াছিলেন যে, “যদি গবর্ণর
জেনেরল প্রাণ্ট লাহোরের (উঃ পঃ প্রদেশের
লেক্টেমেন্ট গবর্ণর) আদেশ বক্ষা না
করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও
স্বাভাবিক করা উচিত। যদি এতদেশীয়
দিগকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি
নীলের বৈরনির্ধ্যাতমপ্রণালী অনুসারে
কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে লর্ড কানিং ও
তাঁহার সমস্তাঙ্গণ ও যেম কতিপয় কনাইর
হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবা এদেশ হইতে
শীঘ্র প্রস্থান করেন। কিন্তু যদি তাহারা
এখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজত্বের মণি
স্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহা হইলে ককথা-
দেবতা, বুদ্ধদেবতার স্থান অধিকার করিয়া
উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের লোকদিগকে সর্ব-
ক্ষণ হইতে রক্ষা করুন।” * বদেহহিতৈষী
রাজনীতিজ্ঞ, লেখকভ্রষ্টের আবেগময়ী
লেখনী হইতে একসময়ে এইরূপ গভীর মর্শ-
স্পর্শী বাক্য নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু সে

* প্রযুক্ত খান হামগোশাদ সারগান প্রণীত
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ১২ পৃষ্ঠা ১।

সময়ে সেনাপতি নীল * ব্যতীত আরও অনেকে সর্ববিধাঙ্গের রাজা বিস্তার করিয়া বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলকেই সমভাবে সজ্জস্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। ঘোরতর প্রতীহিংসার তাহাদিগের বিবেক বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া ছিল, এবং গভীর উত্তেজনার ভাব-বহু তরঙ্গে তাঁহাদের ন্যায্যপরাযণতা, সমদর্শিতা ও উদারতা ভাসিয়া গিয়াছিল।

বিচারবিভাগেব বহিষ্ঠূত যে তিন জনের হস্তে সামরিক আইন পরিচালনের ভাব ছিল, তাহাদের একজন ৬০ জনের, আর একজন ৬৪ জনের এবং সিবিল সার্জেন ৫৪ জনের ফাঁসীর আদেশ দেন। ইহাদের

* উপস্থিত সময়ে ১৭ই জুন সেনাপতি নীল আপনার দৈনন্দিন লিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন — “বিদ্রোহী দিগেব সহিত সম্মিলিত হইবার অপরাধে সৈয়দ ইস্মাঈল নামক একজন সোয়ার আমাব সমক্ষে বিচারার্থ আনীত হব। এ ব্যক্তি কুড়ি বৎসর কাল গবর্ণমেন্টেব কর্ম করিয়াছিল। আমি অবিলম্বে তাহাকে ফাঁসি দিবার আদেশ দেই। এই ব্যক্তিকে লইয়া আমি ছয় জনেব প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিবাছি। এরূপ কার্য যে আমাকে করিতে হইবে, তাহা আমি কখন ভাবিনাই। ঈশ্বর দেখিবেন, আমি ন্যায়পরতার সহিত কার্য করিবাছি। আমি জানি, যে, আমাকে বিশেষ কঠোরতার পরিচয় দিতে হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত ঘটনা দেখিলে আমার অপরাধ সার্জনীর হইবে, অংশের মঙ্গলপ্রজন্য এবং স্বদেশেব ক্ষমতা ও প্রধান্য রক্ষার নিমিত্ত আমাকে এরূপ করিতে হইয়াছে। ইত্যাদি।” ‘কে’ সাহেব এই লিপি উদ্ধৃত করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেনাপতি নীলের ধর্মভাব ও দাবির জ্ঞান ছিল। সেনাপতি বহুসংখ্যক লোকের প্রাণদণ্ড করেন নাই। কিন্তু এসবক্ষে সাধারণ বিশ্বাস অন্যতর।
kaye Sepoy war Vol II. P. 269, note.

অপরাধের বিবরণ এবং সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য-বন্দী কোন কাগজপত্রে রক্ষিত হয় নাই। এক ব্যক্তির নিকটে এক থলিয়া নুতন পয়সা ছিল বলিয়া তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। বিচারক মনে করিয়াছিলেন যে এই ব্যক্তি ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, অথবা সিপাহিরা পয়সা ফেলিয়া টাকা লইবার অস্ত্র ব্যগ্র হওয়াতে, সে, এই পয়সার থলিয়া কুড়াইয়া লইয়াছে। গবর্ণমেন্টেব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার একমাসেরও অধিক কাল পরে একদিন পনের জনকে তৎপর দিন ২৮ জনকে বিদ্রোহ ও ধনাগার লুণ্ঠন অপরাধে ফাঁসী দেওয়া হয়। কিন্তু ইহারা যে উত্তেজিত সিপাহি, তৎসময়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই অপরাধে এক দিন ১৩ জন লোকের ফাঁসী হয়।

উক্ত সিপাহিদিগকে নদী পার করিয়া দিবার অপরাধে বিচারকের আদেশে ছয় জন ফাঁসীকাঠে প্রাণ বিসর্জন করে। উপস্থিত সময়ে প্রাণদণ্ডই প্রত্যেক অপরাধীর একমাত্র শাস্তি ছিল। প্রত্যেক অপরাধী বিচারসময়ে যদি তাহাব অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এবং যথোপযুক্ত প্রমাণাদি লইয়া যথোচিত দণ্ড রিহিত হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু এ সময়ে উক্তরূপ কার্যপদ্ধতির অনুসরণ করা হয় নাই। বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আপনার স্বদরগত বেদনা ও উদ্দীপ্ত প্রতীহিংসার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। বিপ্লবের ছয় মাস পরে জজের আদেশে ১০০ জন এবং মাজিষ্ট্রেটের আদেশে ৫০ জনের ফাঁসীর

আদেশ হয়। উপস্থিত স্থানে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য নগরে একটি বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর ফাঁসীকাঠ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ ভীষণ বধ্যভূমিতে উপনীত হইয়া অভি-
মুক্ত ব্যক্তিগণ দলে দলে ফাঁসীকাঠে লম্ব-
মান হইতেছিল। পূর্বোক্ত বিচারকদিগেব
একজন এই সমবে লিখিয়াছিলেন “যেসকল
পন্নীর লোক আমাদের বিপক্ষতা করিয়াছে,
আমরা সেই সকল পন্নীর লোকদিগকে দণ্ড ও
বিনষ্টকরিয়াছি। এইরূপে আমরাও আমাদের
প্রতি হিংসাব তৃপ্তি কবিয়াছি। যাহাব গবর্ণ-
মেন্টের বিরুদ্ধাচরণ কবিয়াছে, এবং গবর্ণমে-
ন্টের অমুগত লোকদিগের প্রতি নির্ভূবাচরণ
কবিয়াছে, আমি তাহাদিগের বিচারকার্যে
নিযুক্ত হইয়াছি। প্রতিদিন আমরা ৮। ১০
জন লোককে ফাঁসী কাঠে ঝুলাইয়াছি।
জীবনমরণেব ভার আমাদিগেব হস্তে আসি-
য়াছে। আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে, পন্নী-
ধীদিগের কাহাবও জীবন রক্ষা করা হইবে
না। সরাসরি বিচারে প্রত্যেক অপরাধী
প্রতি প্রাণদণ্ডেব আদেশ দিহিতেছে।
দণ্ডিত ব্যক্তির গলায় দড়ি বাঁধিবা তাহাকে
গাভের নীচে গাড়ীর উপর দণ্ডায়মান রাখা
হয়; শেষে গাড়ী চালাইবা সে ফাঁসবদ্ধ
হইয়া ঝুলিতে থাকে।” * সংযোগ

* Martin, Indian Empire Vol. II. P. 301

বিচারক আপনার উদ্দাম প্রতিহিংসা
পরিভূপ করিয়া এইরূপ গর্ষ প্রকাশ
কবিয়াছিলেন। সৈনিক কণ্ঠচাবিগণ অপেক্ষা
দেওয়ানী কণ্ঠচাবিগণই এইরূপ সর্বধ্বংসের
পবাকাঠা দেখাইবা ছিলেন। জলাদ ও
মুদ্রফবাসদিগের বেতন কমাইবা দেওয়া
হইয়াছিল। এই বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর
করিবাব সমবে মজিষ্ট্রেট এই হেতুবাদ
দেখাইবা ছিলেন যে, এতদ্বারা প্রত্যেক
ব্যক্তিকে ফাঁসী দিতে দশটাকা করিয়া
বাঁচিবা যাইবে। ব্যয় সংক্ষেপের সহিত
এইরূপে লোকসংক্ষেপ করা হইয়াছিল
লোহিত ফিতার সহিত লোহিত শোণিতের
কি অপূর্ণ সংযোগ!” *

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত ।

* কলিকাতা রিবিউ নামক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র
একজন সুযোগ্য লেখক উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে এই
ভাব প্রকাশ কবিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহার
অর্থ উপলব্ধি কবিবা বোধ হব উক্ত লেখককে
বক্তব্য দিতে উদাসীন হইবেননা। এহলে কৃতজ্ঞ-
তার সহিত ইহা ও উল্লেখ কবা আবশ্যক যে, সিপাহী
বিদ্রোহেব এই বিবরণের জন্য উপস্থিত প্রবন্ধ লেখক
উক্ত লেখকের নিকট বিশেষ ঋণী। Calcutta
Review, Vol. XXXI. 1858, A district
during a rebellion.

ক্রিয়া ও বিরাম ।

মাহুকের জীবন ঘড়ীর পেতুলান্য।
পূর্বোবর্তনে ও প্রত্যাবর্তনে নির্ধারিত ক্রিয়া-

তেই আমাদের স্বাধ ব্যাহত হয়। মাহুকের
জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত নিয়ত ছুটিতেছে।

এ কার্যের পথ ও কার্য । একটী কার্য শেষ হইতে না হইতে অপবটী হাতের কাছে উপস্থিত । আবার সেটী হইতে হইতে অপব একটী উপস্থিত । ঠিক যেন রক্ত-বীজেব ঝাড় । মানুষে কাজের ভরে নত হইয়া পড়িয়াছে, হাঁকাইতেছে । তাহাব জীব আর সহ্য কবিতে পাবে না । অশ্বখামার মত কতক্ষণ সুবিবে । সে শাস্তি ভিক্ষা কবিতেছে । শাস্তি মানব জীবনের মেরু । দিগ্‌নির্ণয় চিত্রের সৃষ্টি বেরূপ অবস্থাব রক্ষা কর সে উত্তর মেরুর দিকে মুখ করিয়া থাকিবেই থাকিবে । মানুষেব জীবও সেইরূপ । সহস্র কার্যেব ভিতব তাহাকে ফেলিয়া দাও ; নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দিও না ; তথাপি সেই নীতাকুণ্ডুর অধিবাসী হিমপ্রদেশ কল্পনার চিত্রে অঙ্কিত করিয়া ধ্যান করিতেছে । মানুষের মন ত শুনিবে না, সেই শাস্তি শাস্তি চীৎকার । সিসিকসেব শিলাপি ও উঠিতেছে, নামিতেছে, কিন্তু এই অবিবাম বীণামেব একমাত্র উদ্দেশ্য শাস্তি । ইন্দ্রিয় ব্যাপ্তি সহস্র মহতী হইলেও চিত্তের নিগূঢ় প্রদেশে সেই চিরন্তনী শাস্তি ভিক্ষা । প্রবু করি ক্রিয়া ও বিরামের সময় কোথায় ?

কবি বলেন, বিজ্ঞানবিৎ বলেন বিশ্বের অণুতম প্রদেশেও অসীম সমবায় মৈপুণ্য আছে । বিশ্ব একটী মহামেল । বহির্কিরোধ থাকিতে পারে । 'অজ্ঞ নর বুঝিতে পারে না । কিন্তু কল্পপ্রবাহের জাঘ অলঙ্কিত ভাবে অন্তর্মেল বহিতেছে । কই ক্রিয়া ও বিরামের সমবয় যদি না থাকে, সেই সমতাত কাটিয়া গেল । বিশ্বের সহিত

মানব আকঙ্কার মৈত্রী কাটিয়া গেল । বিরোধই বলীয়ান হইল । তবে গবেষণা করিয়া দেখ কোথা সমবয় । এরূপ হইতে পারেনা যে এই মহা শিল্পবিবচিত মহাসাম্যভূমি মহাবজ্র এক স্থলে বিসংহুল । যদি গুঢ় সাম্য আমরা ধবিতে না পারি সে মানুষের ক্ষুদ্রতা, শিল্পীর নিদা নহে ।

যে দিন প্রথম নর জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেই দিন হইতে চিন্তাক্ষেত্রে এই সমস্তার অবতারণা । মানুষের এ জিজ্ঞাসা স্বতঃসিদ্ধ । এ কঠিন প্রশ্নেব এতকাল অবতারণা হইয়াছে কিন্তু সিদ্ধান্তের স্থিরতা হয় নাই । ভিন্ন মুনির ভিন্ন মত । একবাক্য এ প্রশ্নে হয় নাই, হইতে পাবে না । কিন্তু তাহা বলিয়া কি প্রশ্নের লঘু হইয়াছে ? সিদ্ধান্তের অস্বৈর্য্য প্রশ্নের গুরুত্ব হ্রাস করিতে পারে না ।

শাস্তিভিক্ষা ও ক্রিয়াব্যাপ্তি দুইটীই স্বতঃসিদ্ধ । আমাদের দুইটীই রাখিতে হইবে অর্থ । উহাদের বিবোধ ভঞ্জন করিতে হইবে । বেদান্তের দর্শন শাস্তির পক্ষপাতী ; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ক্রিয়ার পক্ষপাতী । একদল বলেন চিত্ত বিশ্রামে থাকিবে । পঞ্চবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞান আকর্ষণ কর, বিষয়কে অতিক্রম কর, তাহা হইলে শাস্তি হইবে । সম্পূর্ণ বিরাম—অনিবৃত্তি অপ্রবৃত্তি বিরাম—কর্মতৃষ্ণা বিনাশ-জীবের মুখ্য মঙ্গল । অশাস্তি জীবিতসংহারিণী—শাস্তি মোক্ষদায়িনী ।

পাশ্চাত্যদর্শন বলেন কার্যই সব । কার্য্য শক্তির বিকাশ । সূর্য যেমন রশ্মি বিরহিত হইয়া থাকেন না, রশ্মি যেমন সূর্যের অন্তিম বিকাশ, কার্য্যও মানুষের সেইরূপ । বিকাশ

ও অস্তিত্ব একই কথা। বিকাশ বিহীন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অস্তিত্ব বিহীন বিকাশ থাকিতে পারে না। নির্বিকাস সভ্য ও অসভ্য একই জিনিষ। অতএব মানুষ ক্ষিয়াতে ব্যাপ্ত হও। মহামতি কাণ্ট যিনি পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের এক যুগাবতাবণ কবেন— তিনিই বলিয়াছেন যে জগতে কিছুই স্থিরতা নাই। কেবল কার্যের। কার্যই গরিষ্ঠ, কার্যই স্থিৰ; কার্যই সব।

এই দুইটা দল হইল। একদল মৌনীর নিবস্তুরপাদি বোধ হইয়া শৈলশৃঙ্গে যোগ-নিরত হইলেন। শান্তিই তাহাদের উপাস্য-দেবতা। বৃদ্ধবৃদ্ধের মত আত্মবিলোপই তাঁহাদের মোক্ষ। মনস্তত্ত্বের হা হা ধ্বনি তাহাদের কাহুছ সঙ্গীত। লোকেবহুদয় বিদারক বোদন অপূৰ্ণ অস্বাভাবিক। অসংখ্য মানব চুল্লীর ভীষণ ধূমোদগম মহাযজ্ঞের হিতাহুত্বই আছতি। কিছুতেই চিত্তের বিকাবনাই, শান্তিও ভঙ্গ নাই। মনঃ সংযম বশতঃ সংসার-বুদ্ধি বিলোপ হইয়াছে। আব একদল আজ এখানে, কাল সেখানে, আজ সমুদ্রে, কাল স্বর্ণক্ষেত্রে, আজ পৰ্ব্বত শৃঙ্গে, কাল আকর গহ্বরে নির্বিকার নিঃশান্তি ঘুবিতেছে। কেহ অৰ্থ সন্ধানে, কেহ পুণ্যাচরণে কেহ স্বাধীনতা-রক্ষণে বিভ্রত। ঘোর সংসারবর্ষে ঘুবিতেছে। শান্তি শান্তি বলিয়া একত্র চীৎকার। কার্য

বশতঃ অপবিত্র। আমাৰ এই দুইটা মিশাইব। সমন্বয় লক্ষ বস্তু আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইবে।

প্রশ্ন কবি, শান্তি ও ক্রিয়া এই দুইটা বস্তু কি একেবারে ভিন্ন? শান্তি ও ক্রিয়া একত্র থাকিতে পারে। মেলই শান্তি। মেলভঙ্গ অশান্তি। বিশ্ববিধি অমুসারিণীক্রিয়া শান্তির চবম সীমা। সৌবজগতের অবিরাম ঘূর্ণনই প্রকৃত বিবাম। যেখানে বিধির ভঙ্গ সেখানে অস্ব-নৃত্য। এই বিবিধ ঘটনা পবম্পরা-বিশিষ্ট মহাবিশ্ব মহাশান্তির উদাহরণ। পৃথ্বীর অণুতম প্রদেশেও এক চিবস্তন বিধির বিকাশ। বৈদিক ক্রিয়াই শান্তি। যে শ্রোত চলিয়াছে সেই শ্রোতে জীবন চালিয়া দেও-ই শান্তি। মেল শান্তির জীবন।

ই মহাবিবোধের সমন্বয় বেদান্তও প, — বিজ্ঞানের সম্মিলন হইল। শান্তি ও ক্রিয়ার চিবস্তন বিবোধ অপমৃত হইল। উভয়েব অত্যাশ্চর্য্য অতিদৃঢ় ও নিকট। বর্ণক্ষেত্রে তম্বালুসৈনিক প্রধান শান্তি ভঙ্গ-কাবী ক্ষেত্রে অলস উদাসীন ব্যক্তি ও নিরুদ্ধে নিত্য ব্যাপ্ত জন—এ উভয়েই তুল্যমূল্য। দুই ব্যক্তিই শান্তি হইতে সমদূৰে অবস্থিত।

জ্ঞানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ।

শৈলজা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

পরিচয় ।

শৈলজা হবিশ্চন্দ্র বসুর কন্যা । হবিশ্চন্দ্র বসু একজন ধনী বনিযাদী জমিদার ছিলেন । বাৎসরিক প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আয় ছিল । এখন হবিশ্চন্দ্র অতিশয় গরিব, সংসার কাযক্লেশে চলে, জীর গহনাদি বিক্রয় কবিয়া হু এক খানি জমী নূতন ক্রয় কবিয়া ছিলেন, তাহাবই আয়-স্বন তাঁহাব জীবিকা । শীলাব সাহেবেব সহিত ব্যবসা কবিত্তে গিয়া তাঁহাকে দেউলিয়া হইতে হইয়াছিল । নগদ টাকা যাহা কিছু ছিল, তাহা সমুদায়ই গিয়া ছিল । শেষ দেবাব ৩য়ে জমীজমা সমস্ত আশ্বাসী নায়েব মতি ঘোষেব নামে বেনামী কবিয়া ছিলেন । মতি ঘোষও সময় ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত আয়সাৎ কবিল, হবিশ্চন্দ্র চৌদ্দপুরুষে জমীদার নাম হইতে খারিজ হইলেন । রায় মতিলাল ঘোষ সেই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, আত্মীয় স্বজনেরা হাসিতে লাগিল ।

শৈলজার মার শৈলজা অনেক বয়সের মেয়ে । সকলেই বলিত শৈলজাব মার ছেলে হবেনা । শৈলজাকে অসময়ে দরিদ্র অবস্থায় হইতে দেখিয়া সকলেই বলিল “আলস্মী এত দিন চুপ করিয়া কোথায় বসিয়া ছিল, সময় বুঝিয়া আসিয়া জুটিয়াছে” । শৈলজাকে

আলস্মী বলিতে শুনিলে শৈলজাব পিতা দুঃখিত হইতেন, শৈলজাব মাব চক্ষে জল আসিত । আদব কবিয়া কত কথা বলিয়া মুখ-চুখন কবিতেন । বলিতে কি শৈলজা তাঁহাদিগের আঁধাবগৃহে এখন বাতিব আলো । শৈলজা এখন তাঁহাদিগেব হৃদয়াগাবেব শান্তি । শৈলজাব মা যখন বন্ধনাদিকবিয়া ও বাসনাদি মাজিয়া অতিশয় কষ্ট হইত, কাবণ শৈলজার মা পূর্বে কখন এই সকল কার্য্য কবেন নাই, তখন তিনি শৈলজাব মুখ চুখন কবিয়া সেই কষ্ট নিবারণ কবিতেন । শৈলজাব পিতা যখন তাঁহার পূর্ব ও আধুনিক অবস্থাব বিষয় ভাবিতেন, দুঃখ ও অহুতাপে প্রক্সলিত হইতেন, তখন শৈলজাব মুখখানি তাঁহাব শান্তির আধার হইত । যখন বিশ্বাসী মতি ঘোষের আচরণের বিষয় ভাবিয়া ক্রোধে অধীর হইতেন, তখন শৈলজার মুখচুখনই তাঁহার শিব প্রকৃতির কাবণ হইত । এখন শৈলজা হরিশ্চন্দ্রেব দরিদ্র কুটারের একমাত্র ঐশ্বর্য্য ।

দরিদ্র সম্ভানেরা যেক্রমে প্রতিপালিত হয়, শৈলজা সেইক্রমেই প্রতি পালিত হইয়াছিল । শৈলজা দরিদ্র-কন্যা ; শৈলজাব মাতা যখন কোমল শিশু শৈলজাকে আলোহু খাওয়াইতেন, খাওয়াইতে খাওয়াইতে অশ্রুবিমোচন করিতেন ও তাঁহাকে শুয়াইয়া রাখিতেন, শৈলজা তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া পা হুঁড়িয়া খেলা করিত, কত কথাই কহিত, কত হাসিই

হাসিত, শৈলজার মা ও আবার হাসিত—
চক্ষু জল আপনি অপসারিত হইত। শীত কাল
আসিল। শৈলজার মা গরম জামা কোথায়
পাইবেন। একটা পাতলা কাপড়ের জামা
নিজে শেলাই কবিয়াছিলেন, তাহাই তাহাব
গায়ে দিয়া দিলেন ও আপনার কপালকে
ধিকার দিয়া চুপি চুপি কাঁদিতে লাগিলেন।
অল্পক্ষণ পরে শৈলজা ও কাঁদিতে লাগিল।
শৈলজাব ঘামে জামা ভিজিয়া গিয়াছে।
জামা খুলিয়া দিলেন, শৈলজা হাসিতে
লাগিল—শৈলজাব মাও মুখে আবার হাসি
দেখা দিল। শৈলজাব মুখচূষন কবিলেন।
এই সকল কথা আবার যখন শৈলজার মা
শৈলজার পিতার নিকট বলিতেন, তিনিও
শৈলজাকে আমাব “লক্ষ্মীমেরে” আমার
“আঁখার ঘরের বাতির আলো” বলিয়া
আদর করিতেন ও মুখচূষন কবিতেন। বর্ষা-
কালে পুৰাতন ছাদের ছিদ্র দিয়া জল পড়িয়া
যখন রাজে ঘর ভাসিয়া যাইত, বিছানা ভিজিয়া
যাইত, শৈলজা ভিজে বিছানা কিকপ
কবিয়া শুইবে, শৈলজার পিতা মাতা উভয়েই
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেননা;। শৈল-
জার মা শৈলজাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেন,
শৈলজার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, শৈলজা আর
মার কোলে থাকিতে চাহিত না—বিছানায়
নাভিত—ভিজা বিছানা চাপড়াইত, তাহাতে
ও সন্তুষ্ট হইতনা—হামা দিয়া বিছানা হইতে
ডুমে নাভিত—যেখানে অধিক জল থাকিত
সেইখানে গিয়া জল চাপড়াইয়া গায়ে মাখিত,
কত হাসিই হাসিত—জল লইয়া কত খেলাই
খেলিত; শৈলজার পিতা অবাক হইয়া তাহা
দেখিতেন, শৈলজার মা আবার হুছাইয়া

গাছাইবাঁধিছানা করিতেন—আবার শৈলজার
বাপ গা পুছিয়া দিয়া মুখচূষন করিতেন,
আবার শৈলজাকে ঘুম পাড়াইতেন।

চাঁদ ধবিতে সকল ছেলেই চাষ। শৈলজা
ও একদিন চাহিয়া ছিল। শৈলজাও এক-
দিন তাহাব জন্ত কাঁদিয়া ছিল—তখন তাহার
বয়স দুই বৎসর মাত্র কিন্তু যেদিন শৈলজাব
মা, শৈলজাকে চাঁদ ধরিতে পাবা যায না
বলিয়া বুঝাইয়া ছিলেন, সেই দিনেই সে
তাহা বুঝিয়া ছিল। আবার যখন চাঁদ
ধবিতে ইচ্ছা হইত, তখন সে তাহার
মার মুখ চাপড়াইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিত—
না।

পূজা আসিল। শৈলজাব পিতা মাতার
দুঃখের অবধি বহিল না। কোন্ পিতা
মাতাব প্রাণে না আপন শিশুসন্তানগুলিকে
ভূষিত করিতে ইচ্ছা হয়? সপ্তমী—সকল
শিশুই ভাল ভাল কাপড় ভাল ভাল পোষাক
পরিয়া বাহিব হইয়াছে—শৈলজা দরিদ্র
কথা—এক কালীন তাহাব পিতা জমীদার
ছিলেন বটে—কিন্তু এখন দরিদ্র। শৈলজাব
মা শৈলজাকে একখানি জালি রাঙাপেড়ে
নূতন কাপড় পবাইয়া দিলেন। শৈলজাব
তাহাতেই কতই আনন্দ—একবার সে মার
গলা ধরিয়া বলিতেছে ‘মা—কেমন কাপল
দেখ’—একবার পিতাব গলা ধরিয়া বলিতেছে
‘বাবা! কেমন কাপল দেখ’—শৈলজার
মাব সেই কথায় চক্রে জল আসিল—তিনি
বাহিরে যাইতে বারণ করিলেন—ইহাই
শৈলজার দুঃখ। পিতার দীর্ঘনিঃশ্বাস
পড়িল, ইহাই তাহার দুঃখ; নুব্বালা ও
নীৰ্ব্বালাকে কাপড় দেখাইয়া আদিত পারিল

না—এমন স্নান কর কাপড় দেখাইয়া আসিতে পারিল না—ইহাই তাহার দুঃখ ।

শৈলজা এইরূপ দুঃখ পূর্বে অনেক সময়ে অনেক বাব পাইয়াছে । পেট ভরিয়া গিয়াছে—তার মা তাকে আরও দুঃখাওয়াইবেন—ইহাই তাহার দুঃখ । বিড়াল তাহার উচ্চিষ্ট—একটু দুঃখাইতে আসিয়াছে—তাঁহার মা বিরালটাকে তাড়াইয়া দিতেন—ইহাই তাহার দুঃখ । বৃষ্টিতে গৃহ জলময় হইয়া গিয়াছে—সেই জলে একটু খেলা করিবে—তাব মা তাহা কবিতা দিতেন না—জোর করিয়া ঘুম পাড়াইতেন—ইহাই তাহার দুঃখ । আব চাঁদ ধরা যাবনা—ইহাই শৈলজার দুঃখ । ইহা ব্যতীত সে আর কোন দুঃখ জানিত না ।

ভবেন ও যোগেশ কে ? ভবেন আমা-দিগেব সুপরিচিত হরিশ্চন্দ্র বস্তুর বিশ্বাসী নায়েব—মতি ঘোষের পুত্র । মতি ঘোষের ভাল অবস্থায় ভবেন হইয়াছিল । ভবেনের অন্নপ্রাশনে বেশ দশটাকা খরচ হইয়াছিল । যে প্রজারা অবনতমস্তকে হরিশ্চন্দ্রের বাটীতে আসিয়া উপঢৌকন দিত, এখন তাহারা মতিঘোষকে দিতে লাগিল । কোন কোন প্রজা ঘাইবার সময় তাহাদের পুরাতন জমিদারের সহিত দেখা করিবার মানসে আসিত কিন্তু হরিশ্চন্দ্র, দুঃখে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না । প্রতিবাসী কাহারও বাটীতে নিমন্ত্রণও ঘাইতেন না । এমন কি বাটীর বাহিরও হইতেন না । জন করেক প্রজা প্রথমে মতি ঘোষকে কর দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু আইনেরমুখে শীঘ্রই সোচ্চার হইয়াগেল । মতিঘোষ অধিক দিন

বিষয় ভোগ করিতে পারেন নাই ভবেনকে দুই বৎসরের শিশু রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন । ভবেনকে দেখিতে মন্দ নহে । উপবেশ দাঁত দুটা কিঞ্চিৎ উচু—ইহা ভিন্ন তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের আব কোন ক্ষতি ছিল না । এখন বয়স সাত বৎসব—বাটীর গুরুমহাশয়ের নিকট—যে দিন ইচ্ছা হইত—পড়িত । গুরুমহাশয় বলিতেন সে কিছু অশ্রমশীল কিছু চঞ্চল—কিছু অভিমানী কিন্তু বুদ্ধিমান । অল্পেতেই কাঁদিত—অল্পেই হাসিত ।

যোগেশ, রামতনু মিত্রের পুত্র, দেখিতে স্ত্রীমণ্ড—মুখশ্রী অতি উত্তম, বয়স প্রায় সাত বৎসব ; বীর প্রকৃতি—বাটীর গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িত । পাঠ শীঘ্রই অভ্যাস করিতে ও বুঝিতে পারিত সচরাচর বড় লোকের ঘরের ছেলে যেরূপ হইয়া থাকে, যোগেশ সেরূপ ছিল না । যোগেশের পিতা ধনী—কলিকাতায় তাঁহার পাটের ব্যবসা ছিল—বেশ দশ টাকা উপাধি ও করিয়াছিলেন,—কলিকাতায়ও তিনি একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি ছিলেন । ৭ গিরিবালা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা—যোগেশ তাহার ছোট ;—একটি কন্যা একটি পুত্র বই আর তাঁহার সন্তানাদি ছিল না । গিরিবারার বিবাহ একটি মধ্যবিত্তের সন্তানের সহিত দিয়াছিলেন ।—জামাইটিকে গৃহেই রাখিয়া ছিলেন । গিরিবালা স্ত্রীমণ্ড—কিন্তু সে নিজে জানিত অতিশয় স্নান-বর্ণা—সে কাহারো বাড়ী যাইতনা, কারণ তাহার মত লোক সে খুঁজিয়া পাইত না—নিজেই বেশ ভূষা ব্যস্ত থাকিত—নিত্য নিত্য নূতন অলঙ্কারের অল্প পিতার নিকট আবাদ করিত । অলঙ্কার মাজিতে, সাবানে গাঢ়

মার্জন করিতে ও দর্পণ লইয়াই সমস্ত সময়
অতিবাহিত কবিত। অপব কোন গৃহকার্য
করিবার আর অবকাশ পাইতনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শয়ন গৃহ ।

সুরী আর সে সুরী পারী নাই। সে এখন
সুরবালা—ঘোড়শী রূপসী ললনা। সুর-
বালা পাড়ার সুরন্দরী মেয়ে। সুরন্দরী কেন
না হইবে? তাহাব মাতাঠাকুবানী অর্থাৎ
সুরবালার বোমা রূপবতী। পাড়ার পাঁচটি
মেয়ে একত্রিত হইলেই যে দিন রূপের কথা
উঠিত? সকলেই বলিত ওবা তিনজনই সুরন্দরী
তবে শৈলজাব মা নিখুঁৎ সুরন্দরী—আব সুর-
বালার মার মুখখানি একটু লম্বা আব কোন
দোষ নাই। সুরবালা সুরন্দরী তবে তার
নাকের মধ্যে একটি গাঁট আছে। সে
কেহ নীরবালার মাতাঠাকুবানীকেও সুরন্দরী
বলিত কিন্তু বড় কবস হইলে কি হইবে?
তাঁহাব গড়ন পেটন এখন ভাল নহে। মেয়ে
কমিটিতে তিনি সুরন্দরী নহেন, কিন্তু শৈল-
জাব রূপের প্রশংসা পাড়ার মেয়েদের মুখে
ধরিত না। সকলেই সমস্বরে বলিত এখন
সবে সাত বৎসর; বয়সে যে কি হইবে তা
বলা যায়না। বোধহয় জগতে এরূপ সুরন্দরী
থাকিবে কি না সন্দেহ। শৈলজা এখন
সাত বৎসরের।

নীরবালা উপরে আপন শয়ন কক্ষে
সকাল বেলাব বাসিপাঠ সমাপ্ত করিয়া
একখানি পুস্তক পড়িতেছিল। পুস্তক খানি
চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, বিষয় পরিশ্রম। এমন

সময় সুরবালা বীড় বীড় করিয়া কি বকিতে
বকিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, নীরবালা
সুরবালাকে দেখিতে পায় নাই। সে আপন
মনে পড়িতেছিল। সুরবালা বলিল:—

সই—প্রাণটা বেখে ধড়টা নিয়ে চলছ
জন্মের মত।

দোষ টোব মোব মিন্বে কিছু
কবেছিছ যত ॥

নীরবালা পুস্তক হইতে চক্ষু ফিরাইল—দেখিল
সুরবালার চক্ষু ছল ছল করিতেছে, মুখ
শুকাইয়া গিয়াছে সে প্রাণে যেন একটা
বড় আঘাত পাইয়াছে। নীরবালা বলিল
“ভাই! তুমি আবার কবে আমার কি অপবাদ
কবিলে যে ভাই আমি মনে কিছু কবি”
সুরবালার সেই বিমর্ষ বদনে এবার একটু
হাসি দেখা দিল। হাসিমুখে বলিল,

সই—অমন নইলে সুরী কিলো

ভালবাসে তোরে।

প্রাণটি দিয়ে প্রাণটি নিয়ে

কৈঁদে কৈঁদে মবে ॥

নীর। আবার কে কাহাকে কাহার প্রাণ
দিয়াছে?

সুর। এই আমি তোকে দিয়েছি তুই
আমাকে দিলেছিল।

নীর। কথাটা কি সত্যি?

সুর। সত্যি না কি আমি মিথ্যা
বলিতেছি—তা তুই আমাকে দিলেছিল
কিনা তা আমি ঠিক বলতে পারি না।

নীর। কথাটি কি প্রাণের কথা ভাই?
তাহা হইলে তাঁহাব দশা কি হইবে?

এবার সুরবালা নিস্তব্ধ—কেবল একটু
মুচ্ছকিয়া হাসিল। সে হাসির গভীর অর্থ

কেবল নীৰবালাই বুঝিল । কিন্তু সুরবালা সহজে ছটিবাব লোক নহে । সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিল “তা তুই যেমন তাঁব তাঁব কবিয়া পাগল আমি তেমন নই” । আবার নীৰবালা হাসিল । সুরবালা মাটিব দিকে চাহিয়া বহিল । নীৰবালাব মুখেব দিকে আব চাহিয়া থাকিতে পাবিল না । মনে মনে বলিতে লাগিল নীৰীপোড়াবমুখী একটা কথা বড় আঁতে ঘা দিয়া বলে, পোড়াব মুখীব আবার মুচ্কি হাসি আবো ভয়ানক ঠোঁকে আঁটিয়া উঠিতে পাবিনা । নীৰবালা সুরবালাকে অনেকক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিতে দেখিয়া হাত ধবিয়া বলিল “সুবি । কি হযেছে ভাই কোথায় যেতে হবে ? অমন শুকনো শুকনো দেখিতেছি কেন ? কাল কি চুল বাঁধনি ?”

সুবি । কোথায় আব যাব বল ভাই ? চুলোয় ?

নীৰ । হাসিতে হাসিতে বলিল “সে আবার কোথা ?”

সুবি । যে থায—ছাতের উপর ফুলের বাগান টবে আমগাছ ।

জুবর বেলায় দিবস বাণী
পবেন আঁধার সাজ ॥

নীৰ । সে আবার কোথায় ?

সু । যেথায়—কাঠা প্রমাণ ভূমিপদ
থাকে থাকে ঘর ।

দুহাত জমী রিশ হাত খুঁড়ে
করে থাকে সর ॥

না । “বুঝিলাম না” ।

সু । “বুঝিতে পারবিও না” ।

সুরবালা এই বলিয়া পুনশ্চ বলিল,—

যেথায়—বড় ছোট—সবাই সমান
কেউ কাবে না চায় ।

কেউ কারুব ধাব ধাবে না
আপন কাজে ধায় ॥

নী । সে ত স্বর্গ ।

সু । তবে নবক আবার কোথায় ? এই

বলিয়া আবার বলিল,—

যেথায়—বাব বনিতা ঘব বনিতা
পাশাপাশী বাড়ী ।

তাঁব কাছেতে বাস কবে

বেণে শুঁড়ি হাড়ি ॥

নীৰবালা অনেকক্ষণেই বুঝিতে পাবিয়া ছিল কেবল সুরবালাকে একটু চটাইবাব জন্য এইরূপ বলিতে ছিল । শেষ দেখিল সুরবালা চটিল না । তখন বলিল কোথায় ?—কলিকাতায় ?

নী । যেন এতক্ষণ বুঝিতে পারেন্ নি ;
তোঁর ঘোঁষা ন্যাকাম দেখে বাঁচিনা ।

সুবি । কলিকাতার উপর বড় চটা ।
আগে জানিত কলিকাতা কি এক মহাস্থান
হইবে । সেখানে টাকার আঙুল আছে ।

যে যায় সেই টাকা লইয়া আসে । যত কিছু
ভাল জিনিষ জগতে আছে, তাহা সমস্তই
কলিকাতায় পাওয়া যায় । তাহা না হইলে
অতলোক কলিকাতায় যাইবে কেন ? কলিকা-

তাই স্বর্গ এইরূপ সুরবালা জানিত । কাবণ
সুরবালাব পিতা যখন কলিকাতায় যাইতেন
তখন আশাতীত কত জিনিষই তাঁহাকে

আনিতে বলিতেন । তিনি তাহাই আনিয়া

দিতেন যখনই তিনি কলিকাতায় যাইতেন

তখনই কত টাকা আনিতেন । এই

সকল দেখিয়া শুনিয়া কলিকাতা যে কি

স্থান তাহা তাহার বুদ্ধিতে আসিত না—
তাহার চিন্তাশক্তি আসিত না। কিন্তু যে দিন
সুববালাকে কনে করিয়া লইয়া গেল, সেই
দিনই সে প্রথম কলিকাতা দেখিল—দেখিয়া
তাহার হৃবিভক্তি উড়িয়া গেল—হৃদয়ে এক
ভয়ানক ঘৃণাব উদ্বেক হইল।

সুববালার প্রায় আট দিন শব্দ বাড়ীতে
ছিল। সেই আট দিনে সে আশ খানা
হইয়া গিয়াছিল। স্নান করিয়া উঠিয়া মাথা
শুকাইতে পাশ নাই ফাঁকায় একটু বেড়িয়া
বেড়াইয়া ছাঁপ ছাড়িতে পাশ নাই, কাবণ
তাহার শব্দ বাড়ীটি অতিশয় ছোট, এক
কাঠা জমীর উপর তেতলা বাড়ী। একটি
ছোট পাতুকো, তাহার বিশ হাত নিচে জল।
সুববালার পক্ষে যে জলকষ্ট হইয়াছিল তাহা
নিঃসন্দেহ। তাই সে একটু বালাকাল
হইতে পিটপিটে। তাহার শব্দ বাড়ী পার্শ্বে
একটি বাববিলাসিনীর বাড়ী। আর
এক পাশে সোণার বেনেব, তাহার পাশে
গুড়িদেব, পিছনে হাড়ীর বাড়ী। কলিকাতায়
কাকের উপদ্রব ভয়ানক, এ বাড়ীর ভাত ও
বাড়ীর ছাদে, ও বাড়ীর ভাত এ বাড়ীর
ছাদে, সুববালার প্রথম দিন ছাদে মাথা
শুকাইতে গিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া আর
ছাদে মাথা শুকাইতে যাইত না। যে কয়দিন
সেখানে স্নান করিয়া ছিল, ভিজা মাথাতেই
থাকিত আর হবিব নিকট শীত শীত বাড়ী
যাইতে পারিলে সে, 'স' (এক পয়সা ও সিকি
পয়সা) পয়সার "হবিলুট" মানিত।

এ সকল কথা প্রায়ই সুববালার নীরবালাকে
বলিত। সুববালার প্রাণের কথা সমস্তই
নীরবালাকে বলিত, এ কথা যে নীরবালাকে

বলিবে তাহার আর বিচিত্র কি? সেই
শব্দ বাড়ী আবার সুববালাকে যাইতে
হইবে—প্রাণের বন্ধু নীরবালাকে—স্নেহের
আঁধার বোঁমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে।
সুববালার শব্দ বাড়ীটি কাবাগার মনে
কবিতা, সে একদিন কথায় কথায় নীরবালাকে
বলিয়াছিল "কাবাগারে শ্রমজনের সহিত
বাস করিলেও সে কাবাগারে বাস—কারা-
গারের ক্রেশ কোথায় যাইবে? নীরবালার
ইহাতে হাসিয়াছিল সুববালার যখন বলিল
তোব "ন্যাকাম দেখে আর বাঁচিনা" তখন
নীরবালার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কবে
যাবে"?

নীর। "তা জানিনা"। "বাবা" বাবাকে
চিঠি লিখিয়াছেন যে, "অনেক দিন হইল বধু-
মাতা ঠাকুরানী সেখানে বহিয়াছেন। এখন
তিনি বড় হইয়াছেন, আপনার সংসার
এখন আপনি আসিয়া বুঝিয়া বুঝিয়া লউন?
আমার সংসারে বধুমাতা ভিন্ন আর কেহ
নাই জানিবেন, এত দিন ছোট ছিলেন
বলিয়া আনিবার জন্ত কোন কথা বলি
নাই। এখন তিনি বড় হইয়াছেন"।

নী। "তাতে তোমার বোঁমা কি বলি-
লেন"?

সু। বোঁমা বলিলেন আমার মেয়ে এই
কয়দিনের মধ্যে একেবারে গিন্নি বাসি হইয়া
গিয়াছে। এই জন্তেই ত দোজবোরেকে মেয়ে
দিতে চাইনে—তাই আমার তাব ত্রিকুলে
কেউ নাই। এমন জায়গায় ও বে দেয়।

নীর। তাতে তোমার বাবা কি বলিলেন?
সুর। বাবা আর কি বলবেন বল ভাই।
তিনি বোঁমাকে বলিলেন এখন ত আর

সুব্বালা আমাদের সুব্বালা নয় যে আমা-
দেব জোর খাটিবে এখন তা'দেব। তা যাক
—একবার আব কিছু দিন এখানে বাধিবাব
কথা বলিব না শুনে—মাচাব—পাঠাইয়া
দিতে হইবে”। এই কথা বলিতে বলিতে
সুব্বালাব চক্রে জল আসিল, সুব্বালা
বলিল “বোধ হয় যাইতে হইল।”

নীব। “তার পর”।

সুব্বী। কবে যাব তাব ত ঠিক নাই।
আমাব বড় ইচ্ছা একবার তোদের সঙ্গে
শেষ আমোদ আফ্লাদ কহিয়া লই। বোধ
হয় এতে তোব অমত হবে না।

নীব। কোন বিষয়েই বা তোমার সহিত
কবে অমত হইবাছে—কি করিতে হইবে
বল না ?

সুব্ব। কাল সকালে আমি সকলকে বোন-
ভোজন করাইব।

নীব। কাকে কাকে বলিবে ?

সুব্ব। কাকে আবাব বলিব; পাড়ায় যত ছোট
ছোট ছেলে মেয়ে আছে তাদের সকলকে ?

নীব। তাহা হইলে চুপি চুপি যাইতে
হইবে, খুব ভোব বেলায় উঠিতে হইবে।
মাকে বলিব না।

সুব্ব। আমি খুব ভোব বেলায় উঠে
ডেকে নে যাব। তুই যাবিত ?

নীব। “যাব”।

সুব্ব। “যাবি” ?

নীব। “যাব”।

সুব্ব। “যাবি” ?

নীব। “যাব”।

সুব্বালা তখন আফ্লাদে বলিল

ঠিক সত্যি কলি সহ

থাকে যেন মনে ।

কাল সকালে যাব সবে

বত মাঝের গাঁর বনে ॥

নীবী বলিল “অত কহিয়া তাই আর
কে বলিতে হইবে না”। সুব্বালা
গেল।

ক্রমশঃ—

সমালোচনা ।

ভুল ।*

এই শোকতাপপূর্ণ সংসারে ভুলিয়া
থাকাই সুখ। ক্রন্দনশীল শিশু যেমন

জীড়া পাইয়া ভুলিয়া হাস্যপূর্ণ হয়, আম-
রাও তেমনি যখন আত্মহারা হই তখনই
একবার সুখী হই। কবি গাইতেছেন ;—

“তার কথা”

“সংসারের আপদ বিপদে

* নীতি কবিতা ঐশ্বর্যসুন্দর বড়াল প্রণীত ।

ভাবি যবে মঙ্গল মরণ,
কোথা হতে তাব কথা এসে
দিয়ে যাব জীবনে যতন।

আছে যবে স্মৃতি
বাঁচিব গো স'য়ে।

• মানব যখন বোদ্ধে থাকেন, তখন ছায়া চান, এবং যখন ছায়াব, তখন তখন বোদ্ধে চান। মানব যখন বিষয়-মোহে বিমুগ্ধ থাকেন তখন তিনি আত্মহারা হইয়া জাগরণে স্মৃথলাভ করেন। তাঁহাব চমক ভাঙ্গিলে তিনি জ্বল দেখিতে পান। কবি তখন গান,—

সংসারের আনন্দ স'য়ে
ভুলে থাকি সকলি যৎ,
কোথা হতে তাব কথা এসে
ব'লে যাব মঙ্গল মরণ।

কোথায় বিস্মৃতি।

বহিব কি স'য়ে? যাহা

যা ল'য়ে থাকিবে তাতেই অশ্রু লাগ
কেবল ভুলে। ভুলে থাকিই মুখ।
আব এক স্থলে গাইতেছেন,—

এই পথ দিয়ে গেছে, এখনো যেতেছো

শত শত দ্রোণ-ফুলে চরণ-অলঙ্কার-বেশ

এই পথ দিয়ে গেছে, চেয়ে চেয়ে

এখনো হবিণী চেয়ে, পথ-পানে ত

এই পথ দিয়ে গেছে, ভুলে ফুল, ডে শাখী,

নাড়া পেয়ে, সাড়া দিয়ে এখনো উড়িছে পাখী।

এই পথ দিয়ে গেছে, গেয়ে গেয়ে মুছ গান,

এখনো কাঁপিছে বায়ে সেই গুহু-গুহু তান।

এই পথ দিয়ে গেছে, ব'সে গেছে নদীকূলে

গেঁথে গেছে ফুল-মালা, প'বে যেতে গেছে ভুলে।

এই পথ দিয়ে গেছে, কেঁদে গেছে তরুছাষ,

এখনো সে অশ্রু-বিন্দু শিশিবে মিশেনি, হাষ।

কোথায় যেতেছে চ'লে, কে মোবে বলিয়া দেয়?

এ অশ্রু কে মুছে যাবে, এমালা কে তুলে নেয়?

কি তাব মনেব কথা, আমিত বুঝিনে কিছু।

কে দেখেছে তাব মুখ? আমি যে বয়েছি পিছু!

এই কবিতাময় গ্রন্থে আমরা "ভুলের" মুখ

অনেক স্থলে পড়িয়া মুখী হই, কিন্তু

অনেক স্থলে ও আবাব তাহা হাবাইয়া
অশ্রু হই। অনেক গুলি কবিতা এত
দুর্যোধ যে তাহাতে "ভুলের" মুখ বাহির
করা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। এই কবিতা-
বলিব প্রধান গুণ এই, তাহাতে আশ্রয়
ভার্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আশ্রয় আলাকে
প্রকাশিত। আমরা ভাবের আভাসমাত্র
পাই। যে কবিতা এক দিনের কেবল একটি
আলাকবোধ দেখাইয়া অন্ধ বিকসিত হয়,
সেই কবিতা গ্রন্থ পূর্ণ। তাহাতে যেন এক ভাব
জগতের ঈষৎ আভা দেখা দেয়। কিন্তু সে
ভাবভাণ্ডার সমুদায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বোধ
হয় কত বড় অতল গভীরে লুকায়িত আছে।
কবি যেন কিসের সঙ্কেতমাত্র দিতেছেন, সেই
সঙ্কেতে যাহা পাও তাহাই যথেষ্ট, কবি
আব বলিয়া দিতে চাহেন না। পাঠককে
সমুদায় বুঝিয়া লইতে হয়। কবি যেন এক
ভাবভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দেন। ভাবুক না
হইলে সে ভাবভাণ্ডার অন্ধকারে কণিতে
পাবেনা। অক্ষয় বাবু এই ভাবের কবিতার
আমাদিগকে মুগ্ধ করেন। তাঁহাব কবিতাব
গুণ যাহা তাহা দেখাইলাম, কিন্তু তাঁহাব
কবিতাব দোষ এই,—অনেক স্থলে সেই
ভাবভাণ্ডারের দ্বার ও সঙ্কেত বড় অন্ধকারে
আচ্ছন্ন আছে। যে খানে, সেই সঙ্কেত
ভাল প্রকাশিত হয় নাই সেখানে
কবিতাগুলি অত্যন্ত দুর্বোধ হইয়াছে
দ্বিতীয় দোষ এই, কবিতাগুলি অনেক
স্থলেই চটকিতেই পথ্যবসিত হইয়াছে।
অধিক লিখিতে গেলে কবিতা বিনষ্ট
হইবার সম্ভাবনা। এজন্য পাঠক অধিক
আমোদ লাভ কবিতা পাবেন না।
তৃতীয় দোষ এই, কবিতা ভাববিকাশ তত
সহজ ও পবিত্র হইতে পায় নাই, অনেক
কটা আচ্ছন্ন বাধিতে হইয়াছে। কবিতা-
গুলি সেই জন্য তত সবল ও প্রসাদগুণ
বিশিষ্ট হয় নাই। কিন্তু ভাল কবিতার গুণ
এই, পাঠ মাত্র তাহাব অর্থবোধ হয়। সেই
গুণ অক্ষয়বাবুর কবিতাবলিতে অধিক

দেখিতে পাওনা ঘাষ না। ভাল গীতিকবিতাব আৰ এক গুণ এই, তাহা এত মধুৰ হয় যে একবাব পড়িলে আপনি মুখস্থ হইয়া পড়ে। অক্ষৰবাবুৰ কবিতাৰ সে গুণও প্ৰায় দেখা ঘাষ না।

তবে তিনি ক্ৰমে সে গুণ অৰ্জন কবিতো পাবিবেন তাহাতে আমাদেব সন্দেহ নাই। অক্ষৰবাবু যে প্ৰকাৰ কবিতা লেখেন তাহাৰ সাধাৰণ দোষ গুণ উভয়ই দেখাইলাম। কিন্তু তাঁহাৰ কবিতাৰ আৰ একটা বিশেষ দোষ আছে। সেই কবিতাগুলি অল্পকরণ-গন্ধে দূষিত। বোধ হয় অল্পকরণ কবিতো গেলো কোন লেখকেবই স্বাভাবিক গুণেব ক্ষুৰ্তি হয় না। সে যাহা হউক, অক্ষৰবাবুৰ এই “ভুল” গ্ৰন্থেব কতিপয় কবিতা পাঠে আমরা আনন্দলাভ কৰিযাছি। এই গ্ৰন্থসম্বন্ধে আমবা একটি কবিতা উপহাৰ পাইযাছি, তাহা নিম্নে প্ৰকাশিত হইল।

“ভুল” পাঠে অক্ষয়কুমাৰেৰ প্ৰতি।

“কবিতাৰ কুশুম কাননে,
কাৰে সখে কৰেছিলে সাধি ?
সে না চায় জোছনাৰ ধাৰা
আপনি সে আঁধাবেব বাচি।
“সে মহে স্তম্বিনী পৰিমলে,
বধিব সে স্নেহেব ভাষাৰ,
ভাল বাসা নাহিক সে চায়
তাৰ তবে—কেন নিবাশায় ?

“নদী বহে কবি কুলু কুলু
শ্যামল প্ৰান্তৰ শোভাময় !
বিহঙ্গিনী সৌন্দৰ্য্য ছড়ায।
বৰি তোয়া দেখায় হৃদয়।
“কবিতাব অলকাৰ মাৰে
শুনিতে শুনিতে তাঁৰ বাঁদি,
ইহলোকে পুৰুষ সজিয়া,
লোকান্তরে চল হাই ভাসি।

“যাহা হতে মুক্ত হয়ে ছিলে
বদাণ অকৃত্য সেধা ঘোঁৰ,

ছিড়ে ফেল স্মৃতিব আলম্ব্য
আঁধা নিশি হবে সখা ভোব।

“আমাদেব আলম্বিতে এস
হেথাঁকাৰ প্ৰাণী ডলি যত,
আব কেহ কবেনা বোদন
কেঁদে কেঁদে হয়েছে বিবত।

“কেঁদে তাৰা শিখেছে হাসিতে
মুক্ত হবে ধবাৰ মাঝাবে,
ক্ষুদ্র শ্ৰেণ মান অভিমানে
ভাসেনা’ক নয়ন আসাবে।

“হৃদয়ের যে অমিয় ভাই !
পিয়ায, পুৰুষ ললনায
সে মধু, সে ফুল নাই বলে
রেখেছি অতৃপ্ত বাসনায।

“প্ৰণয়িনী মোদেব কবিতা
তাকেই পূজিব প্ৰাণতোবে
দিব তাৰে হৃদয়েবি স্মৃতি
বাঁধা সে রহিবে শ্ৰেণমডোৰে।

‘আয় সখা। আয় এ হৃদয়ে
ভালবাসা আছে বে হেথায
না ছিড়িবে বিশ্বাস বাঁধন
পড়িবে না অনল শিখায়।
‘চিত্তহীন তাই স্মৃধু ভুল
অতিশীল হ’ত যদি প্ৰাণ
এত ‘ভুল’ হ’তনা তা হলে
গাহিত না এদাৰুণ গান।

শ্ৰীবেনোথাবীলাল গোস্বামী

THE SPEECHES OF

Eminent Indian Gentlemen on
“Hindu Marriage Customs.” Delivered at the meeting held on the 6th August, 1887. At Sobhbazar Rajbati, Calcutta, convened by Kumar Neel Krishna and Kumar Binaya Krishna—

* শিবদাস ঘোষ শোভাবজ্জৰ ৰাজবাটিতে এই পুস্তক পাওৱা যায়।

আমরা এই পুস্তক খানি পাইয়া নানা কারণে সুখী হইলাম। প্রথম হিন্দু রীতি নীতির বিষয়ে আজ কাল লোকেব মতি গতি কিবিধাছে এইত এক প্রধান সুখের কথা। কয়েকদিন পূর্বে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু রীতিনীতির প্রশংসা করিলেই লোক অশিক্ষিত বলিয়া পবিচিত হইত। এখন আর তাহা হয় না। দেশের মান্য গণ্য লোক, এমন কি গোষ্ঠীপতি সভা বাজারেব মহাবাজ কুমার শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ ও শ্রীযুক্ত বিনয়কণ্ঠ বাহাদুর দ্বয় যত্ন করিয়া যে “হিন্দু বিবাহ” সম্বন্ধে বঙ্গের প্রধান প্রধান মহোদয়গণেব মতামত গ্রহণ কবিয়াছেন, ইহা ও কম সুখের কথা নয়। মহাবাজ কুমারদ্বয়েব হিন্দুরীতি, নীতিব প্রতি অনুবাগ দেখিয়া সকলই সুখী হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

এই পুস্তকে বাহাদুর বক্তৃতা উদ্ধৃত হইয়াছে সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বঙ্গের গোঁবব স্বরূপ। তাঁহাদের প্রত্যেকের ললিত মধুর বক্তৃতার সমালোচনা এই সংকীর্ণ স্থানে সম্ভব নয়। ডাক্তর বাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ কবিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোবিন্দ সোম এম, এ, বি, এল, মহাশয় “হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি” শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পাঠ কবেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, নবজীবন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অমরচন্দ্র সরকার বি, এল, প্রভৃতি মহোদয়গণ নিজের নিজের মন্তব্য অতি সুললিত ভাষায়, পবিষ্কার রূপে ব্যক্ত কবিয়াছেন। পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে ইহা বড়ই সুখের কথা।

শ্রীগদাধর শর্মা বিরচিত

গোবর্দ্ধন লীলা।

পৃষ্ঠা ৭০, মূল্য দুই আনা মাত্র।

কলিকাতা ৮০নং দীতারামঘোষের ষ্ট্রীট
এইচ. সি দত্ত কোং নিকট পাওয়া যায়

এখানি হান্তবসোদীপক পুস্তক। পুস্তক খানি কিরূপ তাহার নমুনা স্বরূপ হু এক স্থল উদ্ধৃত কবিয়া দিতেছি,—

“বড়সাধ গোবর্দ্ধনলীলা বর্ণন কবিব, কিন্তু হৃদয়ে ভাব নাই, ভাষাব জোর নাই, প্রেমের তরঙ্গ নাই, হৃদয়ের প্রস্রবণ নাই, অথচ আমি উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল মহাতবঙ্গে কাঁপ দিলাম; এই সমুদ্রেব পাব নাই। এই অপার, অনন্ত, অসীম, অপরিমেয়, মকরকুন্তীর-তিমি-তিমিঙ্গিল-সমাকীর্ণ ছুস্তব কাঙ্ক্ষারে * আমার দশা যে কি হইবে তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

আমার প্রথম ভবসা—গোবর্দ্ধন।

দ্বিতীয় ভরসা—গোবর্দ্ধনের রূপ।

তৃতীয় ভরসা—গোবর্দ্ধনের লীলা।

গোবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধনের রূপ, তাঁহাব লীলায় অকবি কবি হয়, অজ্ঞানী জ্ঞানী হয়, অবসিক বসিক হয়, অমূর্খ মূর্খ হয়—আর কত বলিব। তাই আমি নিতান্ত নির্ভরসা নই। তবে এখন প্রথমস্পর্শিচ্ছেদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বর্ণনাটি পড়িয়া আমাদিগের মনে হইতেছে যেন কোন একজন নব্য শুলেখক এইরূপ নদের চাঁদের বক্তৃতার স্থায় * * * “আপনি তুষ্ট আসিয়া পড়ে” গোচ বিস্তর বাঙ্গলায় পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাই গদাধর শর্মাও তাঁহাব গোবর্দ্ধন লীলা উক্তরূপ বর্ণনা কবিয়াছেন। তাবপর ৪৩ পৃষ্ঠায় গোবর্দ্ধনের সম্পাদকতার কাব্য। আজ কাল বাঙ্গলা ভাষা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার নমুনা—কেবল কথাব ছটা—ভাবের সম্পর্ক নাই।

“অহহ! ঘোর দুর্দৈব! সম্পাদক জীবন বড়ই বিড়ম্বনাময়! তাহা না হইলে সেই হৃদয় বিদারক, মর্ম্মঘাতী, প্রাণহারক কথা কখনই আমাদিগকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতে হইত না। যখন এই ব্রত গ্রহণ করি-

* মিরমুনা হি কবরঃ। যন্ত্রিনাথ।

যাছি তখনই বুঝিয়াছি আমাদের কপাল
পড়িয়াছে, চোকের জলেব বীধ ভাসিয়াছে,
“বক্রদ্বার” ছাড়িয়া কাঁদিবাব দিন পড়িয়াছে।
অধিক কথায় সময় নষ্ট কবিবনা। এখন
আবশ্য কবা যাদিক :—

“অহো কি গুণিলাম, বিনা মেঘে বজ্রা-
ঘাত। প্রাণ আকুল হইল, চিত্ত ব্যথিত হইল
অহবাত্মা শুকাইল, হৃদয় সন্তপ্ত হইল,
কুসুমকাননে কীট পশিল, পূর্ণিমাব চাঁদ মেঘে
ঢাকিল, বিনা ঝড়ে বিনা বাতাসে, বিনা
বায়ুতে অভ্রভেদী, অভ্রংলিহ গাছ ভূমিতলে
নিপতিত হইল, সেই স্মৃদর্শন সৌম্যমূর্তি,
প্রশান্তকীর্তি, মহাত্মা জগৎ ছাড়িলেন”
ইত্যাদি।

অতথানি লিখিয়া গাঁওলীকি “মহাত্মা
জগৎ ছাড়িলেন” কে ক তাহার সম্পর্ক
নাই।

তাবপব গোবর্দ্ধনের স্বীকারিতেও পুন-
বায় “আধ্যাত্মিক” বিবাহ। এই স্থানে
গদ্যধব ভারতচন্দ্র এখন নাই বলিয়া বড়ই
আক্ষেপ কবিয়াছেন। কি করিবেন
কাজেই নিজে ববেব রূপ বর্ণনা যথা
সাধ্য বামাগণেব মুখ হইতে বলাইয়াছেন,
পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭।

বব দেখি বামাগণ বলে হরি হবি।

শ্রামাব কপালে এত লিখেছিল হবি।

কিবা বুক কিবা মুখ, কিবা নাক কাণ,

দেখিলে ববেব রূপ উড়ে যায় প্রাণ।

কি পোড়া কপাল বোন্ মোদেব শ্রামাব,

হায। বিধি চাদে কৈল বাহুব আহার!

আপন আপন পতি সবেপ্রশংসিয়া,

পরস্পর কহে রামা বরেব নিশ্চিয়া।

গদিও আমার পতি কালা, কালামুখ,

নহে সে এমন! সই, এই মোর সুখ।

আর বামা বলে সই মোর পতি বুড়া।

এমন রাক্ষস চে’তে সে মাথার চূড়া।

আর বামা বলে বর বড় ছুড়ে। পেটা,

কড়ে রাঁড়ী ভাল, তবু এর মুখে কাঁটা।

আমার পতির কথা বলিহারি হাই,

কাল বটে, কিন্তু যেন ব্রজের কানাই।

আব বামা বলে তবে গুন মোব কথা,

শ্রামাব অদৃষ্ট ভেবে মনে পাই ব্যাথা।

আমাবু যে অন্ধপতি তাতে তবু সুখ,

যে বিকট দৃষ্টি বোন। ফেটে যায় বুক!

আব বামা বলে সই সোনাব শ্রামার

কে জানে হইবে বব যম অবতার।

কাল মুখে শোভে তাব কালকাল দাড়ি,

কালি পড়ে কাল যেন ভাত বাঁধা হাঁড়ি।

যে বলে মোব পতি কাল, তাব মুখে ছাই,

দেখে যাক্ চোক্ খাকি, এ বব বালাই!

তারপর গদ্যধব দেখাইয়াছেন ধর্মের আজি

কালি কেমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হইতেছে।

তাহাব নমুনা পৃষ্ঠা ৬১—

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা কবিলেন “প্রভো!

হাই তুলিলে তুড়ি দিবাব নিয়ম কেন

হইল—

হল। অতী-ই স্মৃদব প্রশ্ন! এই প্রশ্নেই

তোমার বুদ্ধির প্রার্থ্যা প্রকটীকৃত করিতেছে।

গুন,—মহুযা মাত্রেবই স্রোতস্বিনী বৃত্তি দশ

প্রকা, অধোদেশ হইতে ঐ বৃত্তি সমূহ

ঐ ক্ষুদ্র পাইতে থাকে। যে বৃত্তিব

প্রশ্ন ক্ষুদ্র হয় তাহকে অধঃস্রোতস্বিনী

বৃত্তি বলে। এইরূপ উর্ধ্বস্রোতস্বিনী, পূর্ব-

স্রোতস্বিনী, পরস্রোতস্বিনী উত্তব দক্ষিণ

পূর্ব-দক্ষিণ, পব-দক্ষিণ, পূর্বোত্তব, পবো-

ত্তবস্রোতস্বিনী বৃত্তিবকথা আর্ধ্য ঋষিগণ

বলিয়া গিয়াছেন। এই বৃত্তিব কোন এক

বৃত্তিব আধিক্য হইলে স্রুশ্রুয়া নাড়ী ক্ষীত

হয়। এই ক্ষীতিবশত প্রাণ বায়ু উর্ধ্বস্রো-

তস্বিনী বৃত্তির সহিত মিলিত হয়। ঐ

মিলন হাই, ঢেকুর, হাঁছি প্রভৃতিব সাক্ষাৎ

জন্মদাতা। তবেই দেখ, হাই প্রভৃতিব যথা

ক্রমে উদ্ভবে, প্রাণ বায়ুর বহির্গমনশক্তি

প্রবলা হয়। সেই জন্যই হাই তুলিলে

তুড়ি দিবাব ব্যবস্থা, ঢেকুর তুলিলে, ভয়

দেখাইবার ব্যবস্থা, আব হাচিলে “জীব”

বলিবার ব্যবস্থা। যদি আর্ধ্য ঋষিগণের

ব্যবস্থা মানিয়া চলা যায় তবে প্রাণের

বাবার ক্ষমতা আছে হাই-যের সঙ্গে বাছির হয় ?—

মহী। অহহ। কি চমৎকার ব্যাখ্যা ! সাধে কি বলি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ভিন্ন অর্থ্য ধর্মের অভ্যুত্থান অসম্ভব ?—

গো। আচ্ছা প্রভো। ত্রয়োদশীতে বার্তাকু ভক্ষণে পুত্রহত্যার পাতক হয় কেন ?

হল। বেশ, বেশ। তোমার মত ছাত্র দশ জন পাইলেই আমি হিন্দু ধর্মের একটা কিনারা কবিত্তে পারি। তোমার প্রশ্নের উত্তর শুন, প্রতি বস্তুবই শিবায শিবায তাড়িত প্রবাহ বিবাজমান। বার্তাকুতে পজ্জিটিভ তাড়িত প্রবাহ সর্ক্যাপেক্ষা বেশী। পিতা পুত্রে সম্বন্ধ আবার তাড়িত-প্রবাহ-ঘটিত। ত্রয়োদশী তিথিতে নেগেটিভ তাড়িত প্রবাহ পুত্রের শবীবে বিচরণ করে। স্মৃতবাং ত্রয়োদশীতে বার্তাকু ভক্ষণে পিতার শবীবে পজ্জিটিভ তাড়িত-প্রবাহ বেশী হয়। স্মৃতবাং

পুত্রের নেগেটিভ তাড়িত আকৃষ্ট হয়। অতএব পুত্রের মৃত্যু।

এই কথা শুনিয়া গোস্বর্দন ভেউ ভেউ ববে কাঁদিয়া গুরুদেবের চরণে লুটাইতে লাগিল। “আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি মহাপাতকী, আপনাব শ্রীকৃষ্ণের জন্য এই সকল প্রশ্ন কবিয়াছিলাম। আমার গতি কি হইবে ?”

হল। উত্তিষ্ট বৎস। আমার এইত কার্য্য। হিন্দু ধর্ম উদ্ধারের জন্য বন্ধ পবিকব হও, সকল পাপ দূর হইবে।

গোস্বর্দন লীলা যে একখানি হস্তবসোদীপক পুস্তক তাহার আব সন্দেহ নাই। ইহাতে “ভাড়া” নাই প্রকৃত বসিকতা যাহাকে বলি যাহাতে তাহাই আছে। সত্য বলিতে গাংকুস্তকখানি পাঠকালে আমরা হস্ত সধরণ করিয়া থাকিতে পারি নাই।

আমাদিগের সহিত ঐহাবা/পাত্রকা ও সম্বাদ পত্র পবিবর্জন কবিত্তেছেন ও সমালোচনা কবিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমবা চিববাধিত রহিলাম। স্থান অভাব প্রযুক্ত পত্রিকা ও পত্রগুলিব নাম উল্লেখ কবিত্তে পারিলাম না। অনেক পুস্তকেব সমালোচনাও তন্নিমিত্ত করিত্তে পারি নাই। পরবারে নাম ও বক্রি পুস্তকগুলির সমালোচনা কবিব।

বিভা ।

[৪র্থ সংখ্যা]

সন ১২৯৪ সাল

১ম খণ্ড]

বনবাদ ।

বনবাসের সূত্র প্রাচীন কালের মুনিঋষি-
গণ জানিতেন। তাঁহারা সেই সূত্রে সূখী
হইয়া সূর্যমণ্ডল প্রভৃতি প্রসাদের উদ্ভূত লীলা ঐশ্বর্য্য-
সূত্রে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। তাহারা বন-
বাসের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে এত মৌহিত হইয়া-
ছিলেন, যে লোকালয়ের কৃত্রিম ঐশ্বর্য্য তাহা-
দের চক্ষে ভাল লাগিত না। তাহাদের শান্ত
বসাম্পদ বনাশ্রমে হিংসা দ্বেষ্ট প্রবেশলাভ
করিতে পারিত না। সকলেই মিত্রতায়
ও সম্ভাবে মুগ্ধ হইয়া বনে সূত্র সচ্ছন্দে বাস
করিতেন। এমত কি, হিংস্র বন্ত পশুগণও
দ্বেষ্ট হিংসা পরিত্যাগ করিয়া নির্ঝিঁস্রে ঋষি-
গণ সঙ্গে একত্রে সম্ভাবে বিচরণ করিত। ঋষিগণ
তাঁহাদিগকে কখন হিংসা করিতেন

না, তাহারাও ঋষিগণের প্রতি বিদ্বেষ ও ঈর্ষ-
চিত্ত ভ্রূ. ব. দর্শন করিত না। কিন্তু আজ
সে প্রাচীন ঋষিসমাজ নাই, বনবাসের সে
সুখমাস্তিও নাই। সে বাসও নাই সে
অর্থব্যয়ও নাই। বাস-বাজহ কালে বন-
বাসে যে সূত্র সূত্র ও শান্তি ছিল, তাহা বাস-
যণ পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। সে শান্তি
কথঞ্চিৎ বিয়োৎপাদন হইলে, বাসচন্দ্র
অনতিবিলম্বে সে বিদ্রোহ উন্মোচন করিতেন।
তিনি যখন বনবাসে গিয়াছেন, এই রূপ
কত স্থানে কত বিশ্ব উন্মোচন করিয়া
আশ্রমপদের শান্তি বিধান করিয়াছেন।
নীতা যেন শাস্তিকপিনী হইয়া সর্বময় শান্তি
বিধান জগতই বাসের সঙ্গে বনবাসিনী হইয়া

* বাস্তবিক “বনবাদ” ও “বনবাস” শব্দ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে মুনি ঋষি-
গণ বনে বাস করিতেন কিন্তু বাসচন্দ্র ও নীতা এবং পাণ্ডবগণের বনবাস (Exile) চইয়াছিল।
এই প্রস্তাবে “বনবাদ” আশ্রম “বনবাস” ও গৃহীত হইয়াছে। তবে রামাদির “বনবাসের”
প্রধান্য থাকতে প্রস্তাবের নামকরণ “বনবাস” হইয়াছে।

ছিলেন। বামচন্দ্র যেখানে গিয়াছেন, সেই
 খানেই শাস্তি বিবাজিত হইয়াছে। সেকালে
 লোকালয়ে সুখ ছিল বটে, কিন্তু নিশ্চিত বন-
 বাসে তদপেক্ষা অধিকতর সুখ শাস্তিরূপে
 বিবাজিত ছিল। লোকালয়ে বিষয়
 সম্ভোগের সুখ, বনাশ্রমে সাত্ত্বিকভাবে
 প্রশান্তবাসের সুখ। অবণ্য-প্রধান ভাবতের
 সর্বত্রই তখন সংসার-ধাম। কি জনপূর্ণ
 রাজধানী, কি বিজন কানন, তখন সর্বস্থলেই
 লোকালয়। অযোধ্যাব রাজধানীতে তখন
 সংসার, প্রতি জনপদে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি
 গ্রামে তখন সংসার, আবাব মহাবনো, কাননে,
 ও নিকুঞ্জ তখন তাপসগণের সংসার। মুনি-
 গণও স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে সংসার বিবচন পূর্বক
 সুখে ও শান্তিতে অবস্থান করিতেন। বামা-
 য়ে মুনিষ্কমিগণের সংসার-শ্রম-সুখ ও বাণ-
 শ্রম শান্তির অনেক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।
 বামচন্দ্র বনবাসের দশ বৎসর কাল আশ্রমে
 আশ্রমে বসিয়াই সুখ-সচ্ছন্দে অতিবাহিত
 করিয়াছিলেন। নির্বাসিতা সীতাও অযো-
 ধ্যাব রাজস্থলে বন্ধিত হইয়াছিলেন বটে,
 কিন্তু বাণীক-আশ্রমে মুনি-কল্যাণের
 সহিত অতীব সুখসচ্ছন্দে তিনি বাস
 করিয়াছিলেন। এই জন্য বলি, সেই
 প্রাচীন কালে, সেই বাম-বাজ্র কালে বন-
 বাসেও সুখ ছিল। কবির কল্পনা এত
 সুন্দর যে, আমবা এক একবার বনবাসের
 সুখকে লোকালয়ের সুখ অপেক্ষাও অধিক-
 তর জ্ঞান করিতে থাকি। বামচন্দ্রের
 সহিত বনবাসে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া
 আমাদের একদা ইচ্ছা হয়, আমবাও মুনি
 ঋষিগণের সঙ্গে সেই রূপ আশ্রমপদে গিয়া

বাস করি। আবাব তখন বামবাজ্র কালে
 অযোধ্যাব সুখ দেগি, তখন আব সেই বন-
 বাসের সুখ তত প্রিয় জ্ঞান হয় না। কবি
 এইরূপ জগৎ সংসারময় সুখে পবিত্র
 করিতে পাবেন।

প্রাচীন ভাবতে অবণ্যও-কেমন লোকা-
 লয় ছিল, তাহাব বিশদ চিত্র আমরা বামা-
 য়ে দেগিতে পাই। তখনকার বন যে শুদ্ধ
 মুনিষ্কমিগণের পুণ্যাশ্রমে পবিত্র ছিল
 এমত নহে, এই আশ্রমের পথ
 সকলও অবণ্যবাসিগণের বিদিত
 ছিল। মুনিষ্কমিগণ আশ্রমে আশ্রমে সর্বদা
 যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের বনপথ
 অতি পবিত্র ও নিরুপদ্রব ছিল। তখন
 অবণ্যদেশ সকল কেমন ঋষিগণের পবিত্র
 ছিল, এই দেখুন তাহাব একটা পরিকার চিত্র
 প্রদত্ত হইয়াছে। মহাত্মা স্মৃতিষ্ক বামকে

"বাঘব। তুমি জ্ঞানকীর সহিত অগস্ত্যা-
 শ্রমে গমন কর। যেখানে মহর্ষি আছেন,
 আমি তাহাব পথ বলিয়া দিতেছি। তুমি
 এই আশ্রমের দক্ষিণে পঞ্চ যোজন পথ
 গমন করিলে একটা উজ্জল শ্রীসম্পন্ন আশ্রম
 দেখিতে পাইবে, উহা সেই মহর্ষি অগস্ত্যের
 ভ্রাতা ইগ্বাহব আশ্রম,—সেই বনের
 অধিকাংশই স্থলভাগ। উহা পিপ্ললীবনে
 পবিশোভিত এবং বহুবিধ পুষ্প ফলে অতীব
 বনীয়। তথ্য কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণ নিরন্তর
 মধুবসবে কূজন করিয়া থাকে। কোনস্থানে
 নির্মল জলপূর্ণ ও রাজহংস-শোভিত জলা-
 শয় বহিয়াছে, তাহাব ভূটে চক্রবাক
 সকল বিচরণ করিতেছে, এবং নানাবিধ

কমল কুম্ভমে ঐ সরোবর অতি সুন্দর দেখাইতেছে। বাম। তুমি এক বজ্রনী সেই আশ্রমে বাস করবে। যামিনী প্রভাত হইলে ঐ বনখণ্ডেব পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে এক যোজন পথ যাইবে, তাহা হইলেই মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। সেই বহু-পাদপ-শোভিত রমণীয় আশ্রমবনে তুমি জানকী ও লক্ষণের সহিত পবমানন্দে বিহাব করিতে পাবিবে।"

বাস্তবিক সেকালে বনদেশ সর্ব্বাংশেই শান্তি আশ্রম সংসাবধানে পরিণত হইয়াছিল। তথ্য জনপদ ও রাজধানীর কোলাহল ও পীড়ন ছিল না, অশান্তি ও উপদ্রব ছিল না, ভয় ও ভুৎ ছিল না, অথচ সংসারের সকলই ছিল। মুনিঋষিগণ অভ্যাগত অতিথিগণকে দশদিন আতিথ্য সংকাবে পরিভূক্ত করিতে পাবিতেন। শত শত শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। কখন কোন তপোব্রহ্ম অশান্তি উপস্থিত হইলে অমনি ঋষিগণ বাজসহায়তা গ্রহণ করিয়া তাহা নিবারণ করিতেন।

বামায়ণের অসৌখ্যাকাণ্ডে আমবা রাজধানীর ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা দেখিতে পাই। পূর্ব্বতন রাজধানীর ঐশ্বর্য্য সেই প্রাচীন কালেও কত মহার্হ ও বহুমূল্য ধনসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার বিচিত্র চিত্র রামায়ণে অঙ্কিত হইয়াছে। এই সৌন্দর্য্যে মন চমৎকৃত হইলে, আমবা একেবারে বনবাসে আসিয়া পড়ি। বনে অন্যবিধ সৌন্দর্য্য আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও কুসুমময় শোভার স্থলে প্রকৃতির মোহন মাধুরী দেখিবা নয়ন পরিভূক্ত হয়। চিত্রের

বৈপরীত্য হেতু এই শোভা যেন অধিকতর সুন্দর বোধ হয়। বাগ্মীকিব হস্ত-স্পর্শে সর্ব্বদেশ সুন্দর হইয়া পড়ে। যেখানে বাগ্মীকিব উদয় হইয়াছে, সেই খানেই অবগ্য নিকুঞ্জ-শোভা, সরোবর কমলবনের শোভা, নদীকূল কলহংসের শোভা, এবং চিত্রকূট নন্দন কাননের শোভা ধারণ করিয়াছে। বাগ্মীকি যেন সর্ব্বদেশে কুসুম বিকীরণ করিয়া যাইতেন। তাঁহার গীতা যেমন প্রতি তাপস-আশ্রমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তেমনি বনে বনে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া গিয়াছেন। এই দেখুন বাম বনপথে কিরূপে গমন করিতেছেন।

"বাম সর্বাঙ্গে থাকিয়া এবং মধ্যে জানকী ও পশ্চাত্তাগে ধনুস্পাণি লক্ষ্মণকে বাধিয়া বনমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পথে বিবিধ শৈলশ্রম্ব, রমণীয় কানন, নির্মল সলিলপূর্ণ স্রোতস্বতী, পুলিন-চাবী সারবন ও চক্রবাক সকল, বিকচকমলালঙ্কৃত ও জলচর পক্ষী সহিত বন্য তড়াগ, মদোন্মত্ত সর্পিণ্ড হবিগৃথ, দীর্ঘ-বিষাণ মহিষগণ, ও ঋমাবি কবী সকল দেখিতে দেখিতে দূরবনে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ভগবান্ মবীচিমালী অন্তাচল শিখরে অধিবোধন করিলেন। তখন সেই রম্য বনমধ্যে চতুর্দিকে যোজন-বিস্তীর্ণ বিকসিত বক্তোৎপল ও পুণ্ডরীক সমূহে সমলঙ্কৃত, সাবস কলহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিসকল, মৃগাল ভক্ষণাশয়ে সমাগত তীবন্তী 'গজবৃষে' পরিশোভিত ও প্রসন্ন-সলিল পূর্ণ এক রমণীয় সরোবর তাঁহাদিগের নয়ন পথে পতিত হইল। সমীপবর্তী হইবা মাত্র সেই সরো-

ববেব অভ্যস্তব হইতে স্তম্ভব গীত বাদিত্র-
র তঁহাদিগের কার্যকুত্রে পবিষ্ট হইতে
লাগিল। কিন্তু সঙ্গীতকাব্যী লোক সকল
দৃষ্টগোচর হইল না।”

। বাঙ্গালীকব বন এইরূপ সৌন্দর্য্যে ও
মাধুর্য্যে পবিপূর্ণ। বাম-বনবাসের দশ
বৎসর কাল তাঁহাব পবম স্মৃথে কাটিয়া
গিয়াছিল। তিনি লক্ষণ ও সীতা সঙ্গে
মুনিগণকর্তৃক সংকৃত হইয়া আশ্রমে
আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, বনেব নানাস্থানে
বিহার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং বিচিত্র
গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীবনে সীতাব কুসুম-
বন শোভিত নিকুঞ্জ কাননে নিশ্চিত হইয়া
প্রশান্ত স্মৃথে বাস করিয়াছিলেন। বাস্ত-
বিক, প্রকৃতি-সুন্দরী ব সৌন্দর্য্য-অঙ্কনে
বাঙ্গালীক সাতিশয় প্রীতলাভ করিতেন।
তাঁহাব বনে প্রকৃতিদেবী হাসিয়া
বেড়াইতেন।

বামায়ণের অবগ্যাকাণ্ড মধ্যে প্রবেশ
করিলে আমবা যেন যথার্থ কোন বনমধ্যে
ভ্রমণ করিতেছি, এমত অনুভূত হয়।
বাঙ্গালীক অনেক স্থলে বনেব সুন্দর চিত্র
দিয়া গিয়াছেন। তিনি এক এক স্থলে
তুলিকা হস্তে যেন স্বভাব-সৌন্দর্য্য চিত্রিত
করিয়া যাইতেছেন। কোথাও তাল
তমালের বৃহৎ অবগ্যানী ঘনচ্ছায়া আচ্ছা-
দিত, পত্রে পত্রে, গুস্ত্রে গুস্ত্রে, লতায় লতায়
জড়িত, এবং হিংস্র বনজন্তুতে নিদান্দিত ও
জ্বালিত; কোথাও মুনিগণের আশ্রমপদ
নিকুঞ্জ-শোভিত, হোমাগ্নিধূমে ধূসবিত
ও বেদগানে মুখরিত; কোথাও সরোবরে
কমলবন প্রফুল্লিত ও জলচর পক্ষিগণ-

সুশোভিত, কোথাও পঞ্চাপ্সরেব মধুর
নন্দীতবে পতিব্রজিত, কোথাও পার্শ্বভ্যদেশে
সুন্দর ওষধিমালাব পবিপবিত, কুসুম-কুসু-
মিত ও তরুমালাব আচ্ছাদিত; কোথাও
জানকী নানা বন দেশেব শোভা দেখিতে
দেখিতে মোহিত হইয়া যাইতেছেন;
কোথাও বা বন-পথেব জটিলতা ও কুটিল-
তায় বিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। কোথাও
কানন-লতা গাছে গাছে উঠিয়া বনশোভা
বাড়াইয়াছে, কোথাও বল্লবীযাহ সীতাকে
আলিঙ্গন কবিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।
বনবাসে বাম লক্ষণ ও সীতাদেবী যত দেশে
যত শোভা দেখিয়া বেড়াইতেছেন, আমবাও
তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই বনদেশেব তত
শোভা দেখিয়া বেড়াইতেছি। মনে হইতেছে,
আমবাও বামেব সঙ্গে বনবাসে আছি।
বামেব বনবাস প্রকৃত বনবাস, বাম বন
যতীত অন্যত্র গমন কবেন নাই। তিনি
ববাবব বনমধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি
বনে বনেই ভ্রমণ করিয়াছেন, বনে মুনি ও
ঋষিগণের আশ্রম দেখিয়া ও তাঁহাদিগের
সহিত আলাপ পবিচয় করিয়া বেড়াইয়াছেন।
সুতবাম আমবাও বামেব সহিত কখন বনের
বহির্দেশে আসি নাই। বনে বনে আমবা
চিবদিন বনশোভাই দেখিয়াছি। কিন্তু
মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবেব বনবাস একপ
নহে। যখন ভূমি ব্যাসেব বনে প্রবেশ
কবিবে, তখন আব তোমাব অনুভব হইবে
না যে, ভূমি বনবাসে আছি। ব্যাসেব
বনে স্থানে স্থানে যে সামান্য বন-বর্ণনা
আছে, তাহা এত ক্ষুদ্র যে, তাহা অন্য
বৃহত্তর ও উজ্জলতর চিত্রে চাকিয়া পড়ি-

বাছে। সে বনে বাহ্যজগতের স্বভাব-চিত্রকব কবির হস্তস্পর্শ যত না অল্পভব হয়, তদপেক্ষা দার্শনিক পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, অন্তর্জগতীয় নিগূঢ় বহুস্যা-চিত্র এবং ধর্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞ ঋষিৰ পাবমার্থিক কল্পনাব সৌন্দর্য্য অধিকতর অল্পভূত হইতে থাকে। ব্যাসের বনে সামান্য পার্থিব আবণ্য সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে প্রকটিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই সেই সৌন্দর্য্য কৈলাসের সর্গীয় কল্পনাময় সৌন্দর্য্যে বিমিশ্রিত হইয়া প্রক্ষুটিত হইয়াছে,—যক্ষবাজ্রের কুবেবেবঐশ্বর্য্যের সহিত সজ্জিত হইয়া বিকসিত হইয়াছে; সে সৌন্দর্য্য গন্ধমানবের অপর্ক বমণীয়তায় শোভিত হইয়াছে, গন্ধর্কদিগের মাধুরী ও লাবণ্যময় মোহন বেশে বঞ্জিত হইয়াছে, স্মেরু পর্বতের সুবর্ণ বজ্রনে বিভাসিত হইয়াছে, বাস্তবিক, তাহাতেও সর্গীয় দেবভাব মিশ্রিত হইয়াছে যে আমবা ঠিক অল্পভব কবিত্তে পারি না যে, সে সৌন্দর্য্যকে পার্থিব বলিৰ কি পাবমার্থিক কল্পনাব মানসিক সৌন্দর্য্যবিকাশ বলিৰ। বাল্মীকির মত ব্যাস শুদ্ধ বনে বনে ভ্রমণ কবিয়া বেড়াম নাই, তিনি পার্শ্বিৰ বনদেশ ছাড়িয়া, আমাদেব মর্ত্যধাম ত্যাগ কবিয়া অমরাপুৰীতে দেববাজ্রের সৌন্দর্য্য দেখিতে গিয়াছেন, এবং তাহাই অতি রমণীয় শোভায় চিত্রিত কবিয়াছেন। ব্যাস বনবাসী পাণ্ডবগণকে বনে বনে ভ্রমণ কবাইয়া যেন পবিতৃপ্ত হইলেন না, তিনি বনে বনে তত যেন নিজ তুলিকার উপযোগী চিত্রকরণের সামগ্রী পাইলেন না, এজন্য তিনি পাণ্ডবগণকে বন হইতে বাহির কবিয়া আনিয়া ভারতময়

তীর্থ পর্য্যটনে তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। তখন ব্যাস আপন কবিত্ত বিকাশের উপকরণ পাইলেন। তিনি নানা তীর্থের নানা বিষ সৌন্দর্য্য দেখাইতে লাগিলেন। ব্যাস বাল্মীকির মত শুদ্ধ বনে আবদ্ধ থাকিবার পাত্র নহেন, সমস্ত ভাবত যেন তাহাকে আবদ্ধ কবিত্তে পাবে না। বন, বৃহৎবন ও অবণ্যানী, নগব, উপনগব ও বাজধানী, পল্লী, উপপল্লী ও গণ্ডগ্রাম, তাপসকুঞ্জ, ঋষিৰ আশ্রম ও মহা-তীর্থধাম; পর্বত গুহা, সর্বোবব, নিকুঞ্জ, উপত্যকা, অধিত্যকা, তড়াগ, দীর্ঘিকা, নদ, নদী, প্রস্রবণ, কানন, বল্লবী, লতাকুঞ্জ, কিশলয়, পুষ্প, গুল্ম, উৎস, জলপ্রপাত, জলাশয় প্রভৃতিসকলই ব্যাসের কল্পনা আয়ত্ত করিতে চায়। ব্যাস এক দেশে এক দিকে আবদ্ধ থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি আকাশে পাতালে ও মর্ত্যধামে একদা ভ্রমণ কবিত্তে চাহেন। নিখিল ব্রহ্মণ্ড তাহাব জ্ঞান-নেত্রে উদ্ভাসিত হইতেছে। তিনি সমস্ত দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন, সমস্তই চিত্র কবিত্তে চান। পাণ্ডবগণকে বনবাসে আনিয়া ব্যাসের প্রতিভা যেন স্বাধীনভাবে একবার বিচরণ কবিয়াছে। এখানে তিনি মুকুতাবে সর্ব দেশে রেড়াইয়াছেন, এবং আপন প্রতিভার সর্বশক্তি বিকাশের অবসর পাইয়াছেন। এখানে কোন নির্দিষ্ট বিষয় তাহাব প্রতিভাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পাবে নাই। এজন্য ব্যাসের বনে আমরা বামাষণের মত তত পার্থিব বনের চিত্র অল্পভব কবিত্তে পারি না। বাল্মীকির বনের যে কবিত্ত তাহা ব্যাসের বনে বিদ্যমান থাকিলেও তত

অহুত হয না। কিন্তু ব্যাসেব বনে আমবা অতাবিধ কবিত্ত ও প্রস্তুতি দেথি। ব্যাসেব বন বাঙ্গীকিব বনেব মত যে শুদ্ধ বাত্ৰ স্তাব-সৌন্দর্য্যে পৰিপূৰ্ণ এমত নহে, সে বনে দার্শনিক পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য এবং তত্ত্বজ্ঞ ঋষিব ধৰ্ম্মালোচনা এত অধিক যে সময়ে সময়ে আমবা কবিকে হাবাইয়া পণ্ডিত ও ঋষিসমাজে অধিষ্ঠিত জ্ঞান করি। বাঙ্গীকিব বনে সেকুপ পাণ্ডিত্য স্থানে স্থানে বিজ্ঞান থাছিলেও তাহাব তত আধিক্য নাই। কিন্তু ব্যাসেব বনে ঋষিব মুখ হইতে সুদীৰ্ঘ ধৰ্ম্মবক্তৃতাময় বাক্য সকল অনর্গল শুনিতে থাকি। এক এক স্থানে মুনিব উপব মুনি আসিতেছেন আব বড় কড় শাস্ত্র কথা বলিতেছেন, ঋষিব উপব ঋষি প্রবেশ কবিত্তেছেন আব ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰেব বহুস্ত সকল বিকাশ কবিত্তেছেন। এতকালব প্রাচুর্য্যে আমবা ঠিক অহুতব কবিত্তে পারি না, যে আমবা বনে আছি, ক্রি পণ্ডিত সমাজে অবস্থান কবিত্তেছি। অর্থাৎ মাঝে আমবা বনদেবীকে হাবাইয়া যেন সবস্বতীকে মুক্তিমতী দেথি। আবাব মাঝে মাঝে আগাদের ঋষিগণ এমনি এক একটি চমৎকাব উপন্যাস কথা বলেন যে, তাহাতে আমবা বনবাসেব সকল দুঃখই যেন ভুলিয়া যাই। তখন আমাদেব সন্দেহ হয আমবা বনে, না কল্পনার রাজ্যে? বনেব পার্থিব কঠিন সৌন্দর্য্যকে ব্যাস কাল্পনিক স্তম্ভময় সৌন্দর্য্যে পৰিণত করেন।

ব্যাসেব বন আবাব শুদ্ধ বন নহে, তিনি বনে নগরশোভাও প্রকটন করিয়াছেন। তিনি বন শোভার সহিত নাগবিক শোভাও মিশ্রিত

করিয়াছেন। বাঙ্গীকিব বনে আমবা রামকে দেখি তিনি বনবাসে আসিয়া যথার্থ ত্যাগীর ক্রেশ অহুতব কবিত্ত বেড়াইতেছেন। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব বনে গিয়া শুদ্ধ ত্যাগীর ক্রেশে চিবদিন অতিবাহিত করেন নাই, সেই ত্যাগীর ক্রেশ কথঞ্চিৎ রাজৈশ্বর্য্য বিবচনে অপনীত হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডব নিতান্ত দীনভাবে বনবাসে ছিলেন না, সেই দীনতার সহিত কথঞ্চিৎ পরিমাণে বাজ-সুখ ও মিশ্রিত কবিত্ত ছিলেন। তাহাব রাজযাত্রীর স্তাব তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কবিত্ত বেড়াইয়াছেন। পঞ্চপাণ্ডবের আশ্রমে যাও সেখানে দেখিতে পাইবে- হাজার হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিত্য নিত্য সেবিত হইতেছে, সে আশ্রম অশ্ব বথ ও গজাদিতে পৰিপূৰ্ণ এবং বাজকেতনে সুশোভিত। জয়দ্রথ দ্রোপদীহরণেব পব দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডবগণ বথে বথে কেতনে কেতনে সজ্জিত হইয়া তাহাব বিরুদ্ধে ধাবমান হইতেছেন। সুযোধন পাণ্ডবগণকে বনবাসেব দুববস্থাৰ জন্ত মনোবেদনা দিবাব আশয়ে ঘোষাযাত্রা আসিয়া নিজেই মহালজ্জাৰ নিপতিত হইলেন। বৈত বনে পাণ্ডবগণ স্নান সচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন, গান্ধর্ব্বযুদ্ধে পাণ্ডবগণ তাঁহারই মত অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বক্ষা কবিলেন। বাস্তবিক ব্যাসের বন ইন্দ্রপ্রস্থেব অনেক ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। ব্যাস ও বাঙ্গীকিতে যে প্রভেদ তাহার কিয়দংশ উভয়ের বনপর্কে প্রকাশিত করে।

ব্যাসেব ঐশ্বর্য্যভাসিত বনে দ্রোপদী শোভা পাইতেন। বাস্তবিক ব্যাসের

দ্রৌপদী ও বাঙ্গালিকির সীতায় যে প্রভেদ তাহা উভয়ের বনবাস কালে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। বাঙ্গালিকির সীতা, বনবল্লরী কানন-সম্পত্তি, কাননের সুন্দর সবল শোভায় সেই সম্পত্তি যেন অধিকতর শোভিত হইত। সীতা বনে বনে বেড়াইতে যেমন ভাল বাসিতেন, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে, বোধহয়, তত ভাল বাসিতেন কি না সন্দেহ। তিনি ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমপদে মনের আনন্দে বিচরণ করিতেন। বনে কত কানন-গোড়া বিরচন করিয়া বাস করিতেন। বনবাসে সীতার সুখ, সীতার লীলা ও সীতার সহবাসে রামচন্দ্র সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদী কি বনবাসে প্রফুল্লিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তেমনি সুখী করিয়াছিলেন? এক এক দিন দ্রৌপদীর বাক্যবাণে যুধিষ্ঠিরের অটল প্রতিজ্ঞা ও ধৈর্য্য বৃদ্ধি বিচ্যুত হইবার উপক্রম হইত। কিন্তু সীতার চিত্ত বনবাসে বন-বল্লরীর স্থায় বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কানন-সমীরে ঈষৎ হেলিতেও হুলিতে ভাল বাসিত। অযোধ্যার রাজসুখেও সীতা অশোক-বনিকা নামক অস্ত্র-পুরস্হ উপবন মধ্যে বিচরণ ও অবস্থান করিতে ভালবাসিতেন। সেই সুখে সীতাকে কুশলে থাকিতে দেখিয়া রাম যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতেন। একদা তিনি সীতাকে কহিলেন, “বৈদেহি! তোমার সম্ভান লাভের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি কি অভিলাষ কর, তুমি এখন যাহা ইচ্ছা করিবে, আমি তাহাই সম্পাদন করিব।” তখন জানকী ঈষৎ হাস্য করিয়া রামকে কহিলেন,—“আর্য্য-

পুত্র। ফলমূলভোজী মুগিঋষিদিগের পবিত্র আশ্রম দর্শন করিতে এবং অস্ত্রতঃ এক রাত্রি তথায় বাস করিতে আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়।”

সীতার অভিলাষ এই রূপ বনবাসের। জন্ত এক এক বার বাঙ্গালিকির মাঝে মাঝে থাকিত হইত। বনে তিনি বনদেবীর মত উল্লাসে বরণ করিয়া বেড়াইতেন। বাঙ্গালিকি তাঁহাকে বনবাসে পঞ্চবটীবনে ও নিজ আশ্রম-কাননে, বাবগালবে অশোকবনে, এবং অযোধ্যায় অশোকবনিকার উপবনে শোভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্ত যেন বনে গিয়া দমিয়া গিয়াছিল। বনবাসে সীতার চিত্ত প্রসারিত, কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিল। দ্রৌপদী ঈর্ষ্যা মাঝে উল্লাসে বল-দর্পে বেড়াইতে অধিকতর ভালবাসিতেন। তাঁহার বনবাসে ঈর্ষ্যা-বিলাসে পূর্ণ ছিল। তিনি বনবাসে ঈর্ষ্যা-সুখ মিশাইয়া থাকিতেন। দ্রৌপদী ও সীতা উভয়ই যজ্ঞভূমি-সমুৎপন্ন প্রবৃত্তিকপিণী ছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালিকির সীতা যে ভাবে প্রবৃত্তিকপিণী, ব্যাসের দ্রৌপদী সে ভাবে প্রবৃত্তিকপিণী নহেন। সীতা ধর্ম্মাত্মা লক্ষণ ও রামচন্দ্রের প্রবৃত্তি, দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের প্রবৃত্তি। পাণ্ডবগণের সহিত দাশরথিগণের যেমন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, দ্রৌপদীর সহিত সীতারও তেমনি বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সীতা এই জন্ত বনবাস কালে অধিকতর রমণীয় বোধ হইয়াছিল। তাঁহার গুণসমূহ বনবাসে অধিক ফুটিত হইয়াছিল। দ্রৌপদীর গুণাবলী বনবাস-কালে অধিকতর উজ্জলরূপে প্রতীয়মান

হইয়াছিল। দ্রৌপদী যেন বনবাসের যোগ্য পাত্রী নহেন বলিয়া সেই গুণাবলী অবস্থা-বিপর্যয়ে দ্বিগুণ ভাঙ্গব বোধ হইয়াছিল। ব্যাস দেখাইলেন, তাঁহার দ্রৌপদী বনবাসে শোভা পাইবাবনহেন। সে দ্রৌপদী রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ও লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মী যখন বনে গিয়াছিলেন, বনও তখন ঐশ্বর্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সীতার বন, লতা কুম্ভ ও কর্ণিকাব কাননে শোভিত, দ্রৌপদীর বন অল্পক্ষেত্রে প্রাবিত, তৈজসে প্রভাসিত, এবং বাজৈশ্বর্যের ধুমধামে পরিপূর্ণ। জটাজুট ও বকুল ধাবী রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে বনে রক্ষা করিতেন, দ্বাবকাব ঐশ্বর্যবাজ ত্রিভঙ্গ মুবাবি ত্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর বনলজ্জা নিবাবণ করিতেন। সীতা চীবধাবী বামচন্দ্রের ভক্ত, দ্রৌপদী চূড়াধাবী ত্রীকৃষ্ণের ভক্ত। কৃষ্ণ বনমালী বেশে কুঞ্জবিহাবিগী বাধিকাব পার্শ্বে শোভা

পাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই বনমালীবেশে আজি বনবাসিনী দ্রৌপদীর পার্শ্বে শোভা পাইলেন না। ব্যাসের কল্পনায হবি দ্বাবকাবাজ রূপে দ্রৌপদীর বনে উদয় হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাবকায সত্যভামার পার্শ্বে ছাডিয়া একদা দ্রৌপদীর কানন-পার্শ্বে উদয় হইয়াছিলেন। দ্বাবকায দেখি সত্যভামা, বনে দেখি দ্রৌপদী। অযোধ্যাব সীতা,—দ্বাবকাব কুক্লিগী ও বনের বাধিকা। বামচন্দ্র কুঞ্জবিহাবী শ্রামরূপে সীতাকে আবাব বাধা রূপে পাইয়াছিলেন। বনে সীতার সৌন্দর্য যেমন অধিকতর প্রফুল্লিত দেখি, নিকুঞ্জেরাধাব সৌন্দর্য বনমালীপার্শ্বে ততই মনোহর বোধ হয়। বনের শোভা বনমালী, বনের শোভা চীবধাবী বামচন্দ্র। পঞ্চবটীর শোভা সীতা-দেবী, কুঞ্জবনের শোভা বাধাসুন্দরী।

পূর্ণচন্দ্র বনু ।

কলিকাতার প্রাকৃতিক পরিবর্তন ।

বঙ্গ কাল পূর্বে, অথচ বঙ্গীয় ভূভাগসংগঠন-কালের তুলনায় সমধিক আধুনিক সময়ে এতদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা বর্তমানের প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে নিশ্চয়ই যে বিশেষ বিভিন্ন ছিল, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত সময়ের বঙ্গের মানচিত্র যতাপি আমাদিগের সম্মুখে উন্মোচিত হইত, তাহা

হইলে অগ্গকাব বঙ্গের ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহিত যে উহার কত দূর প্রভেদ লক্ষিত হইত, তাহা আমবা সহজেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতাম। সমস্ত বঙ্গদেশের যে কি প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটয়াছে, এখানে সে বিষয়ের বিবরণ সন্নিবেশিত করা আমদিগের উদ্দেশ্য নহে, যেহেতু উহা আম-

দিগেব বক্তব্য বিষয়েব এবং অনুসন্ধানেনব সীমাব বহির্ভূত । মহানগরী কলিকাতাব নিম্ন প্রবাহিত ভাগীরথী আজ যে কপে বহমানা, পূর্বোক্ত সময়ে ঠিক সেই কপ অথবা অন্তরূপে প্রবাহিত ছিল—আমবা এস্থলে সেই বিষয়ের উল্লেখ কবিব এবং উক্ত নদী সংক্রান্ত অন্তান্ত তই একটি কথা ও বলিব ।

চিবকাল এক খাত দিয়া নদী প্রবাহিত হয় না । এই সত্যটি প্রাকৃতিক ইতিহাস, পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন । গর্ভ বালুকা-পূর্ণ হইলে, অথবা শোভেব কোন প্রকাব প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে, নূতন দিক দিয়া নদীৰ গতি হয় । বহু শতাব্দী পূর্বে, এক্ষণে যে প্রবাহিত স্রোতকে সুবোপায়গণ ‘হুগলী নদী’ নামে অভিহিত কবিয়া থাকেন উহাব অস্তিত্ব ছিল না । তৎকালে একক-কাব হ্যাব গঙ্গাবপ্রধান স্রোত পদ্মানদী দিয়া প্রবাহিত হইত না, ভাগীরথীই উহাব প্রধান পথ ছিল । উক্ত সময়ে গঙ্গাব স্রোত কাটোয়া, নবদ্বীপ, ত্রিবেণী প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম কবিয়া সাগব সঙ্গমে মিলিত হইয়া ছিল । (ক) গাঙ্গেব “ব” দ্বীপেৰ প্রথম যুগে সম্ভবত উক্ত নদীৰ দ্বাবায গঙ্গাব সমুদায় জল সমুদ্রে উপনীত হইত । (খ) পদ্মা

ভাগীরথী অপেক্ষা নূতন বলিয়া বিবেচিত হয় । ভাগীরথীই যে গঙ্গাব আদি স্রোত ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত নদীৰ তীবে অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, ত্রিবেণী এবং সাগব প্রভৃতি অনেকগুলি তীর্থ-স্থান সম্মিলিত । অতঃপ, পদ্মা নদীৰ তীবে একটিও দেখিতে পাওয়া যায় না । (গ) অমেকেই অবগত আছেন যে উক্ত নদীতে স্নান কবিলে হিন্দুদিগেব পুণ্য হয় না । পদ্মা তীববাসীগণ পুণোপার্জন্যার্থে অনেক কষ্ট স্বীকার কবিয়াও ভাগীরথীতে স্নান কবিতো আসিয়া থাকেন । (ঘ) ডাক্তাব বুকানান হ্যামিটন সাহেব বলেন যে “গঙ্গানদীৰ সঙ্গে কুশী নদীৰ সংমিলনে উভয়েৰ মিলিত জলবাসিব স্রোত প্রভাবে যে জলপথ উন্মুক্ত হয় তাহাই এক্ষণে পদ্মা নদী নামে

(ক) Vide selections from the Calcutta Review Vol II. “The Banks of the Bhagirathi” by Revd. J Long—Page 327.

(ঘ) ডাক্তাব বুকানান সাহেব বলেন—“I think it not unlikely that on the junction of Kosi with the Ganges, the united mass of water opened the passage now called Padma, and the old channel of the Bhāgirathi, from Songti (Suti) to Nadiya was then left comparatively dry. In this way we may account for the natives considering that insignificant channel as the proper continuation of the sacred river, as they universally do, a manner of thinking that unless some such extraordinary change had taken place would have been highly absurd”.

(ক) Vide Selections from the Calcutta Review Vol II. “The Banks of the Bhagirathi” by Revd. J. Long—Page 326.

(খ) ত্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, বি, এস, সি, (লণ্ডন) এফ, জি, এস, প্রণীত “প্রাকৃতিক ইতিহাস” ৫৮ পৃষ্ঠা ।

অভিহিত হইয়া থাকে"। এবং উপবোক্ত কাবণ বশতঃ সংজী বা স্মৃতীগ্রাম হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত ভাগীরথীবক্ষল অনেক পৰিমাণে শুষ্ক হইয়া পড়ে। ভাগীরথীর নিকটবর্তী স্থান সমূহেব সঙ্গে দ্বীপ, ডাঙ্গা, দহ, সাগব, প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা- দ্বাবাষ এই রূপ প্রতীতমান হয় যে, পূর্বে উক্ত স্থান সমূহেব নিকট বৃহৎ নদী প্রবাহিত ছিল। (ঙ) ভাগীরথীর পথেব অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, এবং অভাবধি হইতেছে। (চ) পূর্বে ভাগীরথী নবদ্বীপেব পশ্চিমে প্রবাহিত ছিল এক্ষণে নবদ্বীপ উহার পশ্চিমে অবস্থিত। (ছ) যে গর্ভে এক্ষণে টালিসনালা (খাল) (জ) প্রবাহিত উক্ত স্থানে প্রাচীন

(ঙ) Vide selections from the Calcutta Review Vol II "The Banks of the Bhagirathi" by Revd. J. Long—Page 327.

(চ) ত্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, বি, এস, এ, (লণ্ডন) এফ, জি, এস, প্রণীত "প্রাকৃতিক ইতিহাস" ৪৮ পৃষ্ঠা।

(ছ) ত্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, বি, এস, সি, (লণ্ডন) এফ, জি, এস, প্রণীত "প্রাকৃতিক ইতিহাস" ৪৮ পৃষ্ঠা।

(জ) খিদিরপুরের উত্তরবাহিত অথবা ডক ইয়ার্ডেব অব্যবহিত উপরে টালিস নালা বা খাল (Tally's Nallah or canal)। ইহা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কর্নেল টালি (Colonel Tally) কর্তৃক নিজ ব্যয়ে খনিত হব। এই খালকে এক্ষণে সাধারণতঃ টালি-গঞ্জের খাল বা কালীঘাটেব গঙ্গা বা আদিগঙ্গা বলিয়া থাকে। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দেব পূর্বে এখানে একটা খাড়া ছিল; উহা গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমাৰ সন্নিবেশিত থাকা প্রযুক্ত উহাকে গোবিন্দ-পুরের খাড়ী (Goviadapur Creek) বলিত।

কালে আদি গঙ্গাব গর্ভ ছিল। বর্তমান টালিসনালাৰ মুখ হইতে কলিকাতাব চারি ক্রোশ দক্ষিণে গড়িয়াগ্রাম পর্য্যন্ত উক্ত খাল ও আদিগঙ্গাব গর্ভ একই বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তৎপরে উক্ত গ্রাম হইতে গঙ্গাব আদিগর্ভ অগ্নিকোণাভিমুখে সমুদ্র দিকে চলিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। হাতিয়াগড় পর্য্যন্ত ঐ প্রাচীন গঙ্গাব গর্ভের চিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত স্পষ্ট পবিলক্ষিত হয়। এই স্রোত অতীত প্রাচীন কালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ঐ গর্ভোপরি অনেকগুলি পুষ্কবিলী শ্রেণী পবিশোভিত হইয়াছে। বাজপুৰ, হবিনাভি, বাবিপুৰ, জয়নগব প্রভৃতি অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দুদিগেব গ্রাম এই প্রাচীন গর্ভেব নিকট সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত স্থান সমূহেব লোকেবা এখন পর্য্যন্ত ঐ গর্ভোপরি খাত পুষ্কবিলী সকলকে গঙ্গানামে অভিহিত কবিয়া থাকেন, এবং উক্ত পুষ্কবিলী সমূহেব তীবে ঐ প্রদেশীয় লোকদিগেব শব্দ দাহ হয়। (ব)

(ব) The Hugli now flows a very different channel to what it did in olden times. The original course was identical with the present Tally's canal as far as Garia, about eight miles south of Calcutta from which point it ran to the sea in a south easterly direction. The old channel is still traceable as far as Hathiagarh Fiscal Division, where it loses itself. This channel long ago dried up. And the bed now consists of a series of tanks. Many large Hindu villages are situated on the banks of the old stream, which is

আধুনিক ভাগীবথী বা হুগলী রিভারের যে স্রোত এক্ষণে বিসপস্ কলেজের (Bishops College) নিম্ন হইতে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, বহু পূর্বে ঐ স্রোতের অস্তিত্ব ছিল না। এক্ষণে যে স্থানে টালিসনালা উহা এক সময়ে ঐ গর্ভোপরি প্রবাহিত ছিল। তৎপরে উহা যে যে স্থান সমূহ অতিক্রম করিয়া সমুদ্র সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া ছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে; সেই কারণে বশতঃ এস্থলে সে বিষয়ের পুনরবার উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কলিকাতার দক্ষিণস্থ গ্রাম সমূহেব লোকেরা টালিগঞ্জ আসিয়া তাঁহাদিগেব শব দাহ কবিয়া থাকেন, কাবণ উক্ত স্থান আদিগঙ্গার গর্ভ বলিয়া পবিত্র বিবেচিত। কলিকাতার দক্ষিণে প্রবাহিত হুগলী নদীর তীরে শব দাহ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাব কাবণ এই যে, এতদেশীয় লোকদিগের এইরূপ সংস্কার আছে যে, উক্ত স্রোত (টালিসনালায় মুখের নিকট হইতে এক্ষণে হুগলী নদীর যে স্রোত দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে) কৃত্রিম গর্ভোপরি প্রবাহিত তজ্জন্যই বর্তমান

called the Adi or original Ganges. The Hindus still consider the route of the channel sacred and burn their dead on the sides of the tanks dug in its bed.

Vide—"A statistical Account of Bengal" vol. I. Districts of the 24 Pergannahs and Sunderbunds—by W. W. Hunter Page 29.

স্রোতকে অনেক কাটিগঙ্গা- বলিয়া অভিহিত করেন। টালিসনালা কৃত্রিম বটে, কিন্তু পূর্বে ঐ স্থানই গঙ্গার গর্ভ ছিল বলিয়া, উহা এখনও হিন্দুদিগেব নিকটে পুণ্যভূমি বলিয়া আদৃত। স্রোতটির নাম এই কার্শ-নেই আদিগঙ্গা। (ঞ)

লং (ট) এবং বেনি (ঠ) সাহেব প্রভৃতি কলিকাতা বিষয়ক লেখকগণ বলেন যে, "এতদেশীয় লোকেরা এই আদিগঙ্গার গর্ভোপরি স্রোতকে বুড়িগঙ্গা বলিয়া থাকেন।" (ড) গঙ্গার এই স্রোত যে কোন সময়ে পরিবর্তিত হয় তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। ডাক্তার বুকানান হ্যামিলটন সাহেব বলেন যে, সম্ভবতঃ গঙ্গার সহিত কুশীনদীর সম্মিলনের সময় এই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিবে।

১০ বৎসর পূর্বে রেনেল সাহেবের দ্বারা সন্নিহিত মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া

(ঞ) Vide note—Selections from the Calcutta Review Vol. V. "Calcutta in the olden Times—Its Localities" by Revd. J. Long Page 179.

(ট) Ibid—Page 179.

(ঠ) "A Historical and Topographical sketch of Calcutta" by James Rainey Page 8.

(ড) ঢাকার নিম্নে প্রবাহিত নদীকে "বুড়িগঙ্গা" বলিয়া থাকে, ইহা অনেকেরই অবগত আছেন। কিন্তু টালিসনালা অথবা উক্ত স্থানের গঙ্গার আদিগতকে "বুড়িগঙ্গা" বলিতে শুনিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ "বুড়ি" ও "আদি" এই দুইটি শব্দের অর্থের নৈকট্য থাকা প্রযুক্ত উক্ত লেখকগণ এই রূপেই পণ্ডিত হইয়া থাকিবেন। "আদিগঙ্গার" স্থলে 'বুড়িগঙ্গা' দাড় করাইয়াছেন।

যাং সে, সবস্বতী একটি নদীর সহিত মিলিত হইতেছে। উক্ত নদী ডুমা, (Duma) নিশী-পূব, চণ্ডীতলা প্রভৃতি স্থান গুলি অতিক্রম করিয়া, বিসপস্ কলোজব নিকট শাঁকবাইল গ্রামে তগলী নদীর সহিত মিলিত হইতেছে সম্ভবতঃ এইটাই ভাগীরথীর প্রাচীন গর্ভ হইতে পারে। উহা শাঁকবাইল অতিক্রম করিয়া টালিসনাল পর্গাঙ্গ আসিয়া তৎপরে গড়িয়া, বারিপূব, রাজগঞ্জ হইয়া ডায়মণ্ড-হার্ভ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাসাগরের সঙ্গে মিলিত হইতেছে। তগলী নদীর তীব পর্গাঙ্গ হাওড়াব দক্ষিণ সীমান্ত সমগ্র ভূমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও জলা যুক্ত। তাহাই এক সময়ে ঐ স্থান নদীর গর্ভছিল বলিয়া অনুমিত হয়। (৮) পূর্বে কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান সমূহের লোকদিগের মত-দেহ বলিকাভাব অপব পাবে দাহ হইত; কাব্য তৎকালে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, গঙ্গার আদি স্রোত উক্ত স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল। তৎপরে উক্ত নদী উহাব পূর্বদিকে একটি নূতন প্রণালীতে বহিতে আরম্ভ হয়। কাহার কাহার এইকণ মত যে গঙ্গা ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরিয়া যাইতেছে। এই মতটী উপবোক্ত বিষয়ের কতকটা পোষকতা করিতেছে বলিয়া বোধ হইতে পারে। (৯)

(৮) Vide Selections from the Calcutta Review Vol. II "The Banks of the Bhagirathi" by Revd J Long, Page 324.

(৯) Vide Selections from the Calcutta Review Vol. II "The Banks of the Bhagirathi" by Revd. J. Long Page 337.

হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন যে, মহাকাব বাঙ্গালীকি বচিত রামায়ণ মহাকাব্যে পবিত্র সলিল গঙ্গার উৎপত্তির বিষয় এই রূপ উল্লিখিত আছে :—

অযোধ্যাব নৃপতি সগববাজা রামচন্দ্রের ত্রয়োদশ উদ্ধতন পুরুষ ছিলেন। তিনি নবনবতিবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। শতবার যজ্ঞ সম্পন্ন করিবাব আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু স্বর্গাধিপতি ঈশ্বর, যিনি শতবার যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া শতমধ বা শতক্রত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার আব একটি নূতন প্রতিযোগী ক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া ঈর্ষা-যুক্ত হইয়া উক্ত রাজার যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ পূর্বক পাতাল লোকে, যে স্থলে কপিল মুনি ধানে নিমগ্ন ছিলেন সেই স্থানে তাঁহার নিকট উক্ত অশ্ব লুকাইয়া রাখেন। এদিকে সগব রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্রগণ অনেক অল্পসঙ্খ্যানেব পব উক্ত স্থানে অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া কপিল মুনিকে চোর সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে বিশেষ রূপে গ্রহণ করেন। উক্ত মুনি ধ্যান ভঙ্গে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া অভিসম্পাত কবাত্রে উক্ত ষষ্টি সহস্র পুত্রগণ ভস্মীভূত হইলেন। সগব রাজার জ্ঞানৈক পৌত্র অনেক অল্পসঙ্খ্যানেব পব উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া মুনিব নিকট তাঁহার পিতা ও পিতৃবাগণের, উদ্ধাবের জন্য বিশেষ যাত্ৰা কবাত্রে তিনি বলিলেন যে যদ্যপি ঐ স্থানে স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীর পবিত্র সলিল আনয়ন করা হয়, তাতা হইলে উহাদের উদ্ধাব হইতে পারে।

সগব রাজার উক্ত পৌত্র গঙ্গাদেবীকে

আনিবাব জন্ত ব্রহ্মাব উপাসনা কবেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া পরলোক গমন কবেন। তৎপরে সগর রাজাব প্রপৌত্র ভগীবথ অনেক তপস্যা কবিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট কবিয়া গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে আনিবাব অহুমতি প্রাপ্ত হযেন। ভগীবথ চকিশপবগণাস্তার্গত হাতিয়াগড় পর্যন্ত গঙ্গাদেবীকে পথ প্রদর্শন কবিয়া আনয়ন কবেন, কিন্তু তৎপরে আর পথ প্রদর্শন কবিতে অসমর্থ হযেন। ইহাতে গঙ্গাদেবী ঠিক উক্ত পুত্রগণের ভ্রমাবশিষ্ট স্থানে যাহাতে উপস্থিত হইতে পাবেন এই আশয়ে উক্ত স্থান হইতে শত ধাবাব সাগবাভিমুখে প্রবাহিত হইলেন। উহাতেই গঙ্গাব “ব” দ্বীপের উৎপত্তি হইল। উক্ত ধাবাসমূহের মধ্যে একটা সগব রাজাব পুত্রদিগের ভ্রমাবশেষ ধৌত কবাতো তাহার। স্বর্গাবোহণ কবেন। কথিত আছে এই হইতেই সমুদ্রের নং সাগব হইয়াছে, এবং অদ্যাবধিও সাগব দ্বীপের নিকট ভাগীবথী ও সাগবের সম্মিলন স্থান পল্লিত ও মহাতীর্থ স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। সহস্র সহস্র যাত্রী প্রতি বৎসব এই পবিত্র সলিল গঙ্গা সাগরে স্নান কবিয়া পাপমুক্ত হইয়া থাকেন।

ভগীবথ স্বর্গ হইতে পবিত্র সলিল গঙ্গা দেবীকে আনয়ন কবিয়া ছিলেন, সেই জন্তই গঙ্গা নদী হিন্দুমাগেরই নিকট এত দূর ভক্তির আধার এবং উক্ত কাবণ বশতই গঙ্গানদীর শেষ ভাগ ভাগীবথী নামে অভিহিত। ভাগীবথীর প্রকৃত স্রোতের কিয়দংশের পরিবর্তন হইলেও অদ্যাবধি এতদ্বন্দ্বীয় লোকেরা উক্ত পবি-

বর্তিত স্রোতকেও ঐ নামেই অভিহিত কবিয়া থাকেন। ভাগীবথীকে যুবোপীষ গণ “হুগলী বিভাব” (ত) বলিয়া থাকেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং উহা পাঠকগণেরও অবিস্মৃত নহে। এষ্ট নামটি যে অতীত আধুনিক তদ্বিষয়ে কিছু যাত্রা সন্দেহ নাই। হুগলী “বিভাব” যে হুগলী নগর হইতে উৎপন্ন তাহা অনেকেই সহজেই অহুমান কবিতে সমর্থ। সপ্তগ্রাম (থ) (যাহাকে প্রাচীন কালে যুবোপীষগণ “গ্যাঙ্গস রেজিয়া” Ganges Regia বলিতেন এবং প্লিনি (Pliny) সময় হইতে বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্য স্থল (Royal emporium of Bengal) ছিল, পতনের পর যখন হুগলী নগরের নবঅভ্যুত্থানে উহার খ্যাতিবিস্তার হইল সেই সময় অবধি

(উ) ইংল্যান্ড মানচিত্রে নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা সাগর পর্যন্ত “হুগলী বিভাব” অঙ্কিত হইয়া থাকে।

(থ) Notes—“Ganges Regia” now Satgaon, near Hughli. It is a famous place of worship, and was formerly the residence of the kings of the country, and said to have been a city of an immense size so as to have swallowed up one hundred villages, as the name imports however though they write its name Satágaon (শত গাঁ বা গ্রাম), I believe it should be Satgaon (সাত গাঁ বা সপ্তগ্রাম) or the seven villages, because these were so many consecrated to the seven *Rishis* and each of them had one appropriated to his own use. Vide—“On the chronology of the Hindus” by Captain Francis Wilford Asiatic Researches Vol. V. Page 278.

ভাগীরথীর নাম “হুগলীরভারে” পরিণত হয়। হুগলী নগরকে পোর্তুগিজগণ “পোর্টো পিকুইনো” Porto Piquino (দ) কহিত। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ঐ নগর প্রধান বন্দরের

স্থলাভিষিক্ত হয়। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে হুগলী নদী নামে অভিহিত হইতে আবস্ত হইয়া থাকিবে।

শ্রীঅম্বোবনাথ দত্ত ।

(দ) Note—The Portuguese called Satgaon “Porto Grande” and Hughli “Porto Piqueno” that is the great haven

and the little haven (harbour বন্দর)—Vide Filch in Hakluyt Socie y’s Edition Vol. II. Pt. I. Page 257.

ভারত অনুষ্ঠান ।

স্বভাব-সৌন্দর্যের স্থায় আধ্যাত্মিক ভাবে ভারত ভূমি চিরগৌরবময়ী। নূতন নূতন বৈদেশিকগণের আক্রমণে ও অধিবাসে যখন ভারত-গগন ঘোর অন্ধকারময়, যখন পিশাচরূপী অত্যাচার সেই তিমিরাবরণে ভীষণকায় ধারণ করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়শোণিত শোষণ করিয়াছে,—মুখেব গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনাব রুহৎ উদর পূর্ণ করিয়াছে,—শোকনাদে খল খল হাসিয়া আপনাব দানবলালসা পরিভূণ্ড করিয়াছে—তখনও ধর্মভাব সুদূর পর্যন্তকন্মারে নিভৃত লীলায় বিবাজমান ছিল ও পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় বিমল স্রোতে শব্দপ্রায় ভারতহৃদয় সঞ্জীবিত করিয়াছে। ভারতের সকল গিয়াছে কিন্তু ধর্ম জীবন অটুট রহিয়াছে। বাহ্য ব্যভিচার দর্শনে একথা অমান্ত হইতে পারে ; তুষার পতনে সকলই

বিনষ্ট বলিয়া বাহ্যনেত্রে প্রতীত হয়, কিন্তু পর্যবেক্ষণে তাহার নিম্নে জীবনপোষক শস্যবীজ সকলের সংরক্ষণ উপলব্ধি হয়। ভারতেও তাহাই হইয়া আসিতেছে। ধর্মজীবনের সে বসন্তবিকাশ নাই সত্য, তবুও শীতের হিমায়ী আবরণে চতুর্দিক শিহরিত হইতেছে। ধীর মনে অস্থায়ন করিলে তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অবি-নাশী ধর্মবীজ সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ঝাঁঝা পূর্ব পুরুবগণের অমলচিন্তাসুধার এক কণামাত্র পান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এই সত্যভাস হৃদয়ে ফলিত হইয়াছে, এবং জাতীয় আকাশে উষার অরুণরাগদর্শনে অবশ্যই আপনাকে ধন্য ভাবিয়াছেন।

বাহ্যার সাম্প্রদায়িক নহেন, সত্য বাহ্যদিগের হৃদয়ভূষণ, ক্রমোন্নতির গুচমর্ম বাহ্যদিগের অন্তর প্রশস্ত করিয়াছে, বাহ্যার

সকল ধর্মের মূলমন্ত্রে চিন্তাহাব বচন করিয়াছেন, তাঁহারা ই বুঝিবেন কেন পব পর ভাবতে নানা ধর্মাবলম্বিগণের অভ্যুদয় হইয়াছে। কেন এই প্রাচীন আধ্যাত্মিক জাতি বৈদেশিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াছে, কেন তাহাদিগের প্রশান্ত হৃদয় অধর্মের অজ্ঞাঘাতে বাব বার ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, কেন তাহারা মর্মহীন যাতনায় ছটফট করিয়াছে, কেন তাহাদিগের অজ্ঞ-জল আজিও মেদিনীকে সিক্ত করিতেছে। জগতের যে অংশে যে চিন্তা যে ভাবে প্রসারিত হউক না কেন ভারত তাহাব মীমাংসাস্থল।

বিধি আদেশে মহাভার, ভাবতন্ত্রে স্থাপিত রহিয়াছে; কে ইহাব অপসারণ কবিতো গিয়া হাস্যাস্পদ হইবে। মানব-চিন্তাব গভীর সুবর্ণস্তর অগ্নিদহনে শোধিত হইবে। পুণ্যাশ্রম সকল সেই কর্ম সুসম্পাদনের জন্য সর্ব হইতে প্রীতি-দৃষ্টি প্রসারণ কবিতোছেন। ভাবতে যেই চুল্লি জলিয়াছে, তাহাত নিভিবাব নয়। পুণ্য ক্ষেত্রে প্রজ্জ্বলিত এই অগ্নিশিখা, পার্শ্বের মোহন উপবন আক্রমণ কবিতো। যাহা কিছু 'পাপমার্শে' সংক্রমিত—সকলই বিনাশ পাইবে। তাই আজি ভারতপুড়িতেছে,—তাই আজি ভারতবাসীর হৃদয়শোণিত এই ধর্মযজ্ঞে আহুতিরূপে প্রদত্ত হইতেছে। ইষোরোপবাসীর বৈজ্ঞানিক সমিধ সকল এই পুণ্য কর্মের প্রভূত সহায়তা করিতেছে। পাপদৈতোর মহা-যজ্ঞের বিনাশ জন্য বুধা উপদ্রপ কবিতো বেড়াইবে। এবং নানা মোহজাল বিস্তার করিয়া মামঘটককে এই পরীক্ষাস্থল হইতে

আকর্ষিত করিতে প্রয়াস পাইবে। অবি-শ্বাস ধাবা বর্ষণেও এই শোধান অগ্নি নির্বাণ কবিতো পাবিতো না। সকল বিদ্ব, সকল বাধা, অতিক্রম করিয়া ভাবত এই মহাত্তর উদ্যাপন কবিতো। কোন্ স্বদেশবাসী মাতৃ ভূমিকে এই অপকূপ যজ্ঞক্ষেত্র জানিয়া আজি নির্বাক রহিতো? ভাবত-প্রতিপাদ্য এই অতুল অমুঠানের আত্মকুল্যে যাহারা অগ্রসর হইয়াছেন কে তাহাদিগকে ভক্তিনম্র দৃষ্টিতে না দেখিয়া আপন বিকৃত বুদ্ধির পসিচর দিতো? আশু বিনাশী অসত্যছায়ায় হৃদয় ঘেরিয়া রাখিতো কে আপনাকে স্মৃণ্য বোধ না করিতো? আমরা আজি কোন উদ্গাদিনী চিন্তাব অমুঠামী হইয়া এই সকল কথার অবতারণা কবি নাই। ইতিহাসের অমুঠামুঠিত অনমান যে সকল তথ্য উপনীত করিয়াছে তাহাই আমাদের অবলম্বন। অতি প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস অমুঠান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে নানা শক্তি সংঘর্ষণে ধর্ম কল্কদ্রষ্ট হইলেও ভারত অন্তর্নিহিত শক্তিবলে পুনরায় সেই কল্যাণত হইয়াছে। শব্দব, কবীর, রামানুজ, নানক সকলেই এই ভাবত ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া ভাবতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতের জাতীয় একতা শিথিল ছিল,—ভারতের সামাজিক উন্নতি রুদ্ধ হইয়াছিল,—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাবত বারবার অপদস্থ হইয়াছিল,—সকলই স্বীকার করিতো আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু ধর্মজ্ঞান অমুঠান রাখিতো অস্তি হীন কালেও যে ভারত অগ্রসর হইয়াছে একথা আমরা

চিহ্নদিন বলিব। ভাবত ধর্মের জ্যোতিঃ
বিশৃঙ্খলার প্রতিবাবরণেও পোষণ করিয়া
বাধিয়াছে। নানা দেশে ধর্মের নানারূপ
ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ভাবত কখনও তাহাব
বিকল্পে দণ্ডাশ্রয় হয় নাই। অত্র ধর্ম
ভাবত ধর্মকে আক্রমণ করিতে, আসিয়া
বিকলমনোবধ হইয়াছে,—জ্ঞানের নবীন
উদ্ভাবনে অন্য ধর্ম কুণ্ঠিত হইয়াছে,
কিন্তু ভাবতধর্ম সেই আলোক মালায়
উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিতেছে। তাই
বলিতেছি আজ নানাদর্শ সমন্বয়ে
বিশ্রাণ-সম্মুখে ভাবতে এক অপকল্প ক্রিয়াব
প্রতিষ্ঠা হইবে। যিনি সবল মনে
স্থিতি-স্থল্যে এ বিষয় অনুসরণ করিবেন,
তাহাবই ইহার প্রকৃততায় আর কোন
সন্দেহ থাকিবে না। সামাজিক পার্থক্য
নীতির প্রচলনে ভাবত এই মহদম্মানের
পূর্ণ বিকাশ দেখাইতে পাবে নাই। যে
সকল মহাত্মার নাম আমবা স্মরণ করিয়াছি
তাহাবা সকলেই এই সত্যের ধর্ম অদ্বৈত
করিয়া সার্বজনীন ধর্মতাব প্রচাবে ব্রতী
হবেন। আজ সেই ভাবেই আমাদিগকে
কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যাহা কিছুতে
হৃদয় প্রশস্ত কবে, অপর কথিত সত্য গ্রহণে
মন উদ্বেল কবে, মানবের ঈশ্বর-সমাগমপথ
সুগম কবে তাহাই আমাদিগের কার্য্য।
সাংসারিকতায় ছিন্ন ভিন্ন থাকিয়া, প্রকৃতি-
ত্রোহী সামাজিক পার্থক্যের স্থাপনা করিয়া,
যে বিষ উৎখিত হইয়াছে তাহাতে জরাগ্রস্ত
বহিয়াছি, তবে নূতন উদ্যমে নূতন সম্প্রদা-
য়ের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইবা অপব কি
মহান অনর্থের সূত্রপাত করিতে হইবে?

আপনাদিগের দায়িত্ব বুঝিয়া দেখ বিজ্ঞপ
কি বঙ্গ কবিবাব সময় এখন নহে।
দেশ যখন পুড়িতেছে, তখন তোমবা
কেমন কবিবা হাসিতে? আজ এই অগ্নি
পবীক্ষায় আপনাদিগের পূর্ব্বগৌরব
যোগ্যতা প্রমাণীকৃত করিতে হইবে। কে
এই সঙ্কট কালে কার্য্যেব গুরুত্ব না বুঝিয়া
আপনাব প্রলাপবুদ্ধিব পবিচয় দিবে?
আপনাদিগকে নূতন শ্রেণীভুক্ত করিয়া
সহস্রাধিক শ্রেণীভুক্ত দেশকে উৎসেদ-
গ্রস্ত করিতে মানস করিবে? আপন ধর্মকে
হিন্দু ধর্ম বলিতে ক্ষুণ্ণ হইবে। স্বর্ণিত, অপহত-
প্রায় সমাজদোষ সকলের সমর্থন জন্ত
শাস্ত্রের অযথা ব্যবহার দেখিয়া আগ্রহভাবে
তাহাব নিবাকরণ না করিয়া বসিকতার
অনুসরণ করিবে? তাই বলিতেছি উদ্দেশ্য
ভুলিও না। আপনাকে অসত্যপ্রিয়ী করিও
না। অনেক সহিয়াছ আবও সহিতে
হইবে। বিদ্বেষের গবলপূর্ণ কটাক্ষে, কুৎ-
সিতাচারের ভীষণ ক্রোধে, পাপ মোহের
বিভীষিকাশ্রদর্শনে অটল থাকিয়া তোমা-
দিগের কার্য্য তোমাদিগকে করিতে হইবে।
দযাময় আপনি তোমাদিগের চক্ষুজল
মুছাইবেন। ঋষিমুখে তাহাব যে মহান
আদেশ সকল তোমাদিগের উপর ন্যস্ত
রহিয়াছে, তাহা যেন সময়েব কঠিনাঙ্কে মুচ্ছিত
না হয়। হৃদয়ান্বিতে লৌহ গলিত হইবে।
বক্তৃতাব খব শ্রোতে পাষণ্ড ভিন্ন হইবে।
জগৎ তাহাব বিপুলতা অস্বীকৃত
হইবে। কোন প্রাণে আজ স্থির
বহিয়াছ? আপনাদিগের বল একত্রিত
না করিয়া তাহাকে পরস্পরের হীনতার

প্রয়োগ করিতেছে? শাস্ত্রমৰ্ম্ম অহুসন্ধান
কবিলে দেখিবে, যে তাহাতে কিছুই অন্ত
নাই, প্রয়োগমাত্রে যে দোষ হইয়াছে, তাহা
শাস্ত্রের নহে, তাহা বিষয়ের শৃঙ্খলবদ্ধ
অভাবের,—সুযোগ সেই শৃঙ্খল তুলিয়া
লইয়াছে; শাস্ত্রবৰ্ণন এখন প্রত্যক্ষ দেখিতে
পাইবে। বিজ্ঞানের শিরোদেশে সেই সকল
অপূৰ্ণ সত্য মহাবক্তব্য ন্যায় অলিতেছে।
অন্ত জ্ঞাতি এই ভাব আজিও হৃদয়ে লইতে
পারে নাই। যতই অশাস্ত্র কচভাবে
সম্ভাবিত হওনা, যতই পীড়াকব নিষম্মে তোমা
দিগকে তাহাদিগের অস্থধ্যাবিত পথে লইয়া
যাইতে প্রয়াস পাক না, আপন উদ্দেশ্য
ভুলিও না। এসকল দৈহিক যাতনাকে
তোমরা কি যাতনা বলিবে? দেখিতেছ
না, অগ্নি ধূম্ব কবিয়া জলিয়া উঠিল, কোথায়
যাইবে। এই অকিকিৎকার ক্রেশ অবসান
করিতে যাইয়া কি প্রলয়ানিতে জীবন

বিসৰ্জন করিবে? ঈশ্বর বাহা বলিতেছেন
শুন—আজি ব্রাহ্মণ শূদ্রের, যবন হিন্দুর মিলন
আমাদিগের হস্তে, আজি নানাধে একত্ব
স্থাপন তোমাদিগের হস্তে। বিমল অদ্বৈত
বাদের অমৃত হৃদয় ভবিষ্য অগ্রসব হও—
কি কবিয়া স্থির বহিষাছ—শুন চতুর্দিকে
আজি কি স্বর উধলিয়া উঠিতেছে—কে যেন
বগিড়িতেছে, আৰ্য্য শাস্ত্রের তত্ত্ব সকল আজি
বনোজ্জ্বল, পর্বতে পর্বতে, নগরে নগরে,
সাগরে সাগরে, গ্রহে গ্রহে, গীত হইবে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, শান্তির পুণ্য-নিকেতন
হইবে। যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞের অগ্নি জলিয়াছে—
পবিত্র হৃদয়ে পুত্ৰস্বর্গের উদ্দেশে স্মীয়
স্মীয় হৃদয়ের পীযুষ ধাবা হবিঃ কপে অর্পণ
কর—বিধি আদেশ পালন কবিয়া আপনী-
দিগকে ধন্ত কর।

জীললিত।

প্রভাতে জলা ক্ষেত্র ।

বিপুল প্রান্তর যদি অতি দূর দূরান্তবে,
নীল আকাশের কোঁলে গিয়াছে মিশিয়া,
অকুল পবান ঝানি, নইখা গগন ঘেন,
প্রশান্ত বৃকতে তার পড়েছে চলিয়া।
ছোট ছোট মাথা তুলি, ছুটে ঘাসফুল গুলি,
হরিত গালিচা হতে উঠিল তপন।
নারিকেল কুঞ্জবাথে বসিয়া কুবকবধু,
সোনার মুখানি তাব কবে নিরীক্ষণ,
কেশে কবপড়ে ববে, কাছে ছেলে খেলা করে,
হল কাঁধে বার গেরে কুবক সাজন।

হাস ভাসে দলে দলে, তবী বেধে যায় জেলে,
তৃণের লহরী খেলে মোহিয়া নয়ন।
হল কাঁধে গোক গুলি সাবাদিন ক্ষেতে ফেবে,
সারাদিন বৃষ্টি পড়ে মাথে।
সাবাদিন পোলা নিখে জেলেদের ছেলে মেয়ে
কি আনন্দে ভ্রমে জলা-পথে।
এ শান্ত শ্যামল ক্ষেত্রে, সবল সম্ভোবু ছবি
হেরে প্রাণ পুলকে আকুল।
মনে হয় আমি যেন, এদেরি আপনা কেহ
কণেকতে হয়ে যায় ভুল!

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

রবি বাবু এবং বাল্য বিবাহ।

বাবু ববীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিজ্ঞান সভা-বাটীতে হিন্দুবিবাহশীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ কবিয়া হিন্দু-বিবাহেব বিরুদ্ধে তাঁর সাধ্যমত যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করছেন, বাবু চন্দ্রনাথ বসু তাহাব উত্তর দিমাছেন। লোকে ভাবিতে পাবেন যে, এসম্বন্ধে অপণ্ডেব আব কিছু বলিবাব অধিকাব নাই, কিন্তু আমি বলি—আছে। রবি বাবু চন্দ্রনাথ বাবুব পূর্বপাঠিত ছুইটি প্রবন্ধ ধবিয়া, নিজ মন্তব্য প্রকাশ কবেন বটে, কিন্তু তিনি যখন সম্ভাবণে হিন্দু-বিবাহেব বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ কবিয়াছেন, তখন একা চন্দ্রনাথ বাবু কেন—হিন্দু সাধারণে সে সম্বন্ধে সন্দেহ দিতে পাবেন—রবি বাবুব ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারেন।

রবি বাবুব প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ কবিলে জানা যায যে, রবি বাবুব মতে—(১) হিন্দু সমাজেব এখন জীর্ণ দশা উপস্থিত; (২) হিন্দু সমাজেব শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে মূর্থ পর্য্যন্ত সকলেই কপট, (৩) কোন কালেই হিন্দুরা জ্ঞাতিব্র প্রতি সম্মান-সূচক ব্যবহার কবিতেন না; (৪) হিন্দু বিবাহে একীকরণ নাই; (৫) হিন্দু বিবাহে আধ্যাত্মিকতা নাই; (৬) হিন্দু বিবাহেব উদ্দেশ্য—পুত্রোৎপাদন

এবং (৭) বাল্য-বিবাহ বিজ্ঞান-সঙ্গত নহে। আমি এই কয়েক বিষয়েব সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

রবি বাবুব মতে হিন্দু সমাজেব এখন জীর্ণ দশা। কথাটা কি ঠিক? তিনি ভাবিয়াছেন যে, কলিকাতাব বাবুদেব লইয়াই হিন্দু সমাজ, কলিকাতার মহাবাষ্ট্র খাতের বাহিবে যে হিন্দু সমাজ আছে, ইহা তিনি ভাবিতে পাবেন না। কলিকাতাব জনকতক ইংবাজী-শিক্ষিত আচার-ভ্রষ্ট হিন্দু যুবকের স্বভাবচবিত্র বা বিকৃত আচার ব্যবহার দেখিয়া, ববিবাবু স্থিব করিয়াছেন যে, হিন্দু সমাজেব এখন জীর্ণ দশা। কিন্তু কলিকাতাব সেই জনকতক বাবু ছাড়া যে কোটি কোটি হিন্দু সমগ্র বাঙ্গালাধ, —সমস্ত ভাবেত অবস্থান কবিয়া হিন্দু সমাজেব প্রত্যেক বিধি পালন কবিতেছে, এ জ্ঞানটি তাঁহার নাই। ববিবাবুব অতিজ্ঞতা, এই মহারাষ্ট্র খাতের মধ্যেই আবদ্ধ, ইহাব বাহিরে যে সহস্র সহস্র ক্রোশব্যাপী ভূখণ্ডে হিন্দু সমাজ পূর্বমত প্রবল প্রতাপ বিস্তাব কবিয়া রহিয়াছে, ইহা তিনি কল্পনাও কবিতে পাবেন না। হিন্দু সমাজ কিরূপ, তাহাব প্রাবল্য কিরূপ, তাহার শাসন কিরূপ,

* আমাদের মতের সহিত একা হউক বা না হউক “বিভা”তে স্বাধীনভাবে যুক্তি-সঙ্গত মতামত প্রকাশিত হইবার কোন বাধা নাই বলিয়াই এই প্রতিবাদ-প্রতাপ প্রকাশ করা গেল। এ প্রতাবের ও যুক্তি-সম্মত প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। বিঃ—প্রঃ।

রবিবাবু তাহা ধারণাও করিতে পাবেন না। কলিকাতার সহস্র সহস্র প্রকৃত হিন্দু আছেন, কিন্তু অনেক গুলি কাবণে সমাজ নাই,—সমাজের তত প্রাবল্য নাই। এখানে এক একটি পল্লীব, এক একটি লেনেব, কতক গুলি লোক লইয়া সমাজ। সে সমাজ অতি ক্ষুদ্র, সে সমাজ স্বীয় প্রভু চালনা করিলে, সমাজের বিধিভঙ্গকাবী ব্যক্তি অনেক বিষয়ে সেই প্রভুদের হাত হইতে এড়াইবাব উপায় পায়। সুতরাং কলিকাতাব সমাজ দেখিয়া, কোটি কোটি হিন্দু-পূর্ণ বিশাল হিন্দু সমাজেব, এখন জীর্ণাশা বলা, ভ্রান্তি বর্ধ্য। রবিবাবু কলিকাতার বাহিবে, যে কোন পল্লীগ্রামে বাস করিলেই জানিতে পাবেন, যে বাণ্ডবিক হিন্দু সমাজেব জীর্ণ দশা উপস্থিত, কি পূর্বদৃষ্টা অবিকৃতভাবে আছে। রবিবাবু বলিতে পারেন যে পল্লীগ্রামেব লোকেরা অশিক্ষিত সুতরাং তাহাদের কথা ধর্তব্য নহে। বাঙ্গালার লোক সংখ্যা ৪,১৬,৭৪,৩১৬ তর্কস্থলে মানিলাম, ইহাব মধ্যে ইংরাজী-শিক্ষিত লোক সংখ্যা এক কোটি! এখন জিজ্ঞাস্য যে প্রায় চারি কোটি-লোক সমাজেব যেদিকে রহিয়াছে, সেইটিকেই সমাজ বলিব, না এক কোটি লোক সমাজ ছাড়িয়া যে দিকে চলিয়া আসিয়াছে, সেই নূতনটিকে হিন্দু সমাজ বলিব? চারি কোটি লোক আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বিধি পালন করিয়া আসিতেছে দেখিয়া কেমন করিয়া বলিব যে, সমাজের জীর্ণ দশা উপস্থিত? আর একটা কথা—ইংরাজী-শিক্ষিত এক কোটি বাঙ্গালী নাই—তথাপি যদিও

থাকে, তাহা হইলেও যখন দেখা যাইতেছে যে, আজ কাল তাঁহাবা পর্য্যন্ত—বিশ্ব বিজ্ঞান-লব্ধের উচ্চ উপাধিধারী পর্য্যন্ত, যখন হিন্দু সমাজেব প্রাচীন বিধিগুলিব পক্ষসমর্থন করিতেছেন, শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তখন কিরূপে বলিব যে, সেই শিক্ষিতগণ হিন্দু সমাজের শত্রু?—কিরূপে বলিব যে, হিন্দু সমাজের জীর্ণ দশা? এইরূপ জীর্ণ দশা এক সময়ে বৌদ্ধেরা ভাবিয়া ছিল, মুসলমানেরাও ভাবিয়াছিল, খৃষ্টানেরাও ভাবিয়াছে এবং ব্রাহ্মেরাও ভাবিতেছেন। দুই হাজার বর্ষ ধরিয়া এই জীর্ণ দশা যাইতেছে! কিন্তু বাহাবা ইতিহাসেব প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাহারা জানেন যে, গত দুই সহস্র বর্ষের মধ্যে হিন্দু সমাজ বা হিন্দু ধর্ম্ম কিরূপ অবস্থায়—কিরূপ বিপদে পড়িয়া, আবার কিরূপ অভিনয় করিয়াছে। হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব—বাহাবা রাখেন, তাহারা বর্তমান লক্ষণ দেখিয়া কল্পনা করিতে পারেন, ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দু যুবকেরা ভবিষ্যতে হিন্দু সমাজে থাকিয়া, কিরূপ অভিনয় করিবে। অতদৃশ্য বালকের পক্ষে সে কল্পনা অসম্ভব।

‘রবিবাবুর মতে হিন্দু সমাজেব বর্তমান সকল লোকেই কপট। বিশেষতঃ যে সকল হিন্দু এখন প্রাচীন রীতিনীতি ও শাস্ত্রবিধির পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তাহারা আরও কপট! রাজেন্দ্রলাল, চন্দ্রনাথ, গুরুদাস, অক্ষয়চন্দ্রপ্রভৃতি সকলেই কপট! ইংরাজ সীলির একটা মত খাটাইতে গিয়া, রবিবাবু হিন্দুসমাজের নেতাদিগকে “কপট” বলি-

যাছেন, কিন্তু বাস্তবিকই কি তাঁহাব বিশ্বাস যে, ইহাবা সকলেই কপট ? না সিলিব কপটতা এখানে খাটাইবাব অন্য নিজে কপটতার হাত হইতে এড়াইতে পাবেন নাই ? যাহা হউক, রবি বাবু যাহা-দিগকে “কপট” উপাধি দিয়াছেন, তাঁহাবা কিন্তু বিন্দুমাত্র স্তম্ভিত নহেন, তাঁহাবা ভাবেন,—“অমৃতং বালভাষিতং ।”

চন্দ্রনাথ বাবু একদিন বলিয়াছিলেন, “হিন্দুধর্ম্ম জীকে পুরুষের সমান কবে নাই, পুরুষের দেবতা কল্পিয়াছিল । ‘যত্র নারীস্তু পূজ্যন্তে বমন্তে তত্র দেবতা’ যেখানে নারী পূজিত হন, সেখানে দেবতাবা সম্ভূত হন ।” রবিবাবু ইহা মানিতে চান না । তিনি বলেন—“চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহাব মত ভালরূপ প্রমাণ কবিতে পারেন নাই । তিনি যেমন হুই একটা শ্লোক আপন মতের সাক্ষ্যে উদ্ধৃত কবিয়াছেন, আমিও তেমনি এক শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারি ।” রবিবাবু ঐ শ্লোক উদ্ধৃতও করিয়াছেন । কিন্তু কোথা হইতে ?—মহু-সংহিতার দণ্ড-বিধি হইতে ।—যদি দণ্ডবিধি দেখিয়া, কোন জাতির চরিত্র সমালোচনা কবা যায়, তাহা হইলে, অগতে এমন কোন দভ্য জাতি নাই, যে জাতিকে সকলে জুষা-চোর, শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, পরজী হরণকারী প্রভৃতি সকল পাপে পাপী বলিতে না পারি । আমবা অনেক সমালোচক দেখিয়াছি, কিন্তু জাতিব পিনাল কোড দেখিয়া, সেই জাতির চবিত্র সমালোচনা করিতে প্রগাঢ় প্রতিভাশালী রবিবাবু ভিন্ন ঐ পর্য্যন্ত কাহাকেই দেখি নাই । রবিবাবু

অবশ্যই জানেন যে, তাঁহাব আদর্শ ইংবাজ জাতির মধ্যেও কোন জীলোক, কোন প্রকার ফৌজদারী অপবোধ কবিলে, ইংবাজেরাও তাহাব কাবাদও দিয়া থাকেন । বমণী বলিয়া সম্মানবন্ধাব জন্য তাহাকে কখনই দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দেন না । অতএব রবিবাবু কি বলিতে পাবেন যে, ইংবেজেবা জীজাতির সম্মান কবিতে জানেনা ? তাহা যদি বলিতে না পাবেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে মহুসংহিতার দণ্ড বিধি হইতে শ্লোক তুলিয়া বলিতে পাবেন যে, কোন জী অপাধিনী হইলে, তাহাব প্রতি যখন ‘শৃঙ্গলবন্ধু ও বেগুনল দ্বারা তাড়নাব’ ব্যবস্থা আছে, তখন হিন্দুবা জীজাতির সম্মান কবিতে জানিত না ? রবিবাবু বলিতে পাবেন যে, হিন্দুবা জীকে যদি দেবতা বলিয়া মান্ত করিত, তাহা হইলে এরূপ তাড়না কবিত না । কিন্তু রবিবাবুব জানা উচিত যে মহু-সংহিতার দণ্ডবিধিব মধ্যে যে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহা দেবতাব পূজার মত্ৰ নহে,—অপবাধিনীব দণ্ডের মত্ৰ । যে জী অপবা-ধিনী হয়, তাহাব আর দেবতাকে কোথা ? নরনারী দেবতাব মত ব্যবহার করিলেই দেব দেবী এবং তদ্বিপরীতাচরণ করিলেই পিশাচ পিশাচিনী । পিশাচিনীব প্রতি তাহাব স্বভাবোচিত ব্যবহারই ন্যায়ের বিধি । আদি ব্রাহ্ম সমাজে বেতনভোগী কথেকজন আচার্য্য আছেন ; তাঁহাবা সচ্চ-রিত্রতা, ধার্মিকতা, সাধুতা, অভিজ্ঞতা, প্রভৃ-তির কাবণ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের নিকট পূজা এবং মান্ত প্রাপ্ত হন । কিন্তু যদি কোন আচার্য্য সমাজবিধি গল্জন করিয়া

বিপরীত নিষিদ্ধ কার্য্য কবেন, তাহা হইলে কি তিনি আদি সমাজে আব পূৰ্ণমত পূজা ও মান্ত প্রাপ্ত হন ? সেই অপবাদী আচার্য্য অবশ্যই দণ্ডিত বা বিতাড়িত হন । কিন্তু সেরূপ কোন আচার্য্য বিতাড়িত হইলে কি আমবা বলিব যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ আচার্য্যদিগেব মানবন্ধা কবিতে জানেন না ?

চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন যে, হিন্দু বিবাহে যেকপ একীকরণ দেখা যায়, একইরূপ কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না । সুতরাং সে কথাটা আদৌ স্বীকার কবেন না । তিনি বলেন, তাহা হইলে এদেশে বহু বিবাহ চলিত হইত না । প্রমাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেব বোড়শ সহস্র মহিষীর উল্লেখ ক'নি, ছেন । ববিবাবু শ্রীকৃষ্ণকে যে াকে দেখুন, হিন্দুবা বলে শ্রীকৃষ্ণেব বোড়শ বলেন, মহিষী কেন—অঙ্ক শাজ্জে মনুষ্য বত দুই সংখ্যাগণনা কবিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণেব তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক মহিষী ছিলেন এবং এখনও আছেন । শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আদ্যসমর্পণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপতি জ্ঞান কবিয়া, শ্রীকৃষ্ণেব সেবাকরায় হিন্দু রমণীমাত্রেয় বত । যে হিন্দু রমণী সেই ব্রত পালন করিত পাবে সেই দেবী । ববিবাবু হিন্দু-দের এই বিশ্বাসকে ব্রাহ্ম বলিতে পারেন কিন্তু আমরা বলি যে সকল ধর্ম্মাবলম্বীই পর-স্পরের বিশ্বাসকে ব্রাহ্ম বলেন ।

ববিবাবু বলেন, “ তথাকার অন্যান্য রাজপরিবারেও বহু বিবাহ দৃষ্টান্তের অসম্ভাব ছিল না । ” কথাটা ঠিক । কিন্তু ববিবাবুর যদি হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বে বিন্দু

মাত্র অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে এ প্রশ্ন তুলিতেন না । কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না । পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজগণের মধ্যে কেন বহু বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল, এজ্ঞানটী থাকিলে, ববিবাবু একথা তুলিতেন না । ক্ষত্রিয় বংশ ভাবতের বাজ্র-বংশ, তাঁহাদিগেব মধ্যে সমান পদেব সমশ্রেণীস্থ পাতে কন্তাদান চির-প্রচলিত । কোন প্রজা, ক্ষত্রিয় হইলেও বাজ্র-বংশেব কোন কন্তাব সহিত তাহার বিবাহ হইত না । বাজ্রকন্তাব সহিত রাজার বা রাজপুত্রেব বিবাহ হইত । বাজ্ররক্ত বিশুদ্ধ রাখিবাব জন্তই, জাতীয় মঙ্গলেব নিমিত্তই, জাতীয় শাস্ত্রবিধিমত দান-বিবাহ মুখা অক্ষত রাখাই, ক্ষত্রিয় রাজগণ অবশ্য পোষ্য জ্ঞান কবিতেন । বাজ্ররক্তেব সহিত আশ্রয়ক সংমিলিত হইলে কুফল ফলিবে দেহ । এই সেকপ বিধি হয় । ক্রমে রাজসংখ্যা ক্রমে ক্রমে সংখ্যাগণনা বাজ্রকুমারীর সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে । যখন প্রত্যেক বিবাহ-যোগ্য রাজা ও রাজকুমারেব এক বিবাহ হইয়াও অনেকের বহু বিবাহ হইত, তখন একটু বিবেচনা শক্তি থাকিলেই অল্পমান করিতে পারা যায় যে, রাজকুমারীর সংখ্যা অবশ্যই অধিক হইয়া উঠে ; এবং সেই জন্তই পূর্বোক্ত বিধিমত পাত্রাভাবে বহু বিবাহ অনিবার্য্য হইয়া উঠে । যদি অসংখ্য বিবাহ এবং রাজবংশের সহিত প্রজারক্তের সংমিলন প্রথা চলিত থাকিত, তাহা হইলে বহু বিবাহের প্রয়োজন ঘটিত না । শাস্ত্র বিধিতে ক্ষত্রিয় বাজ্রগণের পক্ষে সর্ব-বিবাহ নিষিদ্ধ থাকিতেই, সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রের সেই বিধিপালন জন্তই, ক্ষত্রিয় রাজগণ বহু-বিবাহ

কবিত্তে অগত্যা বাধ্য হন । যদি বহুবিবাহ না কবিতেন, তাহা হইলে, পাত্র অভাবে অপাত্রে কন্যাদান কবিয়া পাপী হইতে হইত, শাস্ত্রবিধিলঙ্ঘন-সূত্রে দণ্ডিত হইতে হইত । ধর্মশাস্ত্রের সম্মান বক্ষার জন্তই কত্রিয় বাজ-গণ বহু-বিবাহ কবিতেন ।

হিন্দু মাত্রেই যে, একাধিক বিবাহ করে, প্রত্যেক হিন্দুরই যে এক একটা হারেম বা বেগমমহল আছে, রবিবাবু বোধ হয়, তাহা বলিবেন না । যদিও একাধিক বিবাহকারী হিন্দু থাকে, যদিও একজন হিন্দুর দুই বা চারিটা স্ত্রী থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে একীকরণ হইবার হিন্দু মতে অসম্ভাবনা নাই । প্রেমিক কবি রবিবাবু, যে পাশব প্রেমকে একীকরণের মূল্যে বলিতেছেন, পাশ্চাত্য জগৎ সাক্ষ্য দিতেছে যে সে পাশব প্রেম একীকরণ কামে পাবেনা । হিন্দুবিবাহের মূল উদ্দেশ্য ঐক্য, সেই জন্যই ইয়ুরোপীয় যুবক যুবতীর স্ত্রী-প্রেম পরীক্ষার পর—যদি দেখি, লেখালিখি, শেষ মাথা-মাথির পর হিন্দু বব কস্তাব বিবাহ হয় না । যুবক যুবতীর প্রেমের মূখ্য উদ্দেশ্য—পাশব-বৃত্তি চবিতার্থ করণ—একীকরণ উদ্দেশ্য নহে—আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নহে । হিন্দুব শাস্ত্রে হিন্দু স্বামী এবং হিন্দু স্ত্রী বিবাহ কালে যে সকল মঙ্গলদি পাঠিত হয়, যে সকল ক্রিয়া করিতে হয়, যে সকল কর্তব্য ভার লইতে হয়, পর ঘরের উপর যে সকল দায়িত্ব অর্পিত হয়, হৃদয়ে হৃদয়ে, মনে মনে, প্রাণে প্রাণে আত্মা আত্মা সংমিলিত হইয়া, ধর্মবিধিপূর্ণ সংসারপ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়,

দম্পতির চরম লক্ষ্য বাহা নির্দিষ্ট হয়, সে সমস্তই আধ্যাত্মিক । তাহাব মধ্যে রূপ যৌবন এবং কামপ্রাবল্য-সূত্রে যৌবন-স্বভাবমূলত পাশবপ্রেমের নাম গন্ধও নাই । হিন্দুব বিবাহ যদি পাশবপ্রেম লইয়াই হইত, তাহা হইলে একজন পুরুষের প্রেম, পাঁচটা স্ত্রীতে ভাগ কবিয়া লইবার জন্ত গোল বাধাইতে পারিত, স্ত্রীবাং সে স্থলে একীকরণ হইতে পারিত না । কিন্তু হিন্দুব সংসার ধর্মমৎ সংসার ; হিন্দুব সংসার মের প্রত্যেক বিধি ধর্ম-বিজড়িত, হিন্দু আত্মা পাশবপ্রেম পিপাসু নহে,—ধর্ম পিপাসু—পারমার্থিক প্রেমপিপাসু । জ্ঞানী হিন্দুর সংসারে ধর্মেরই রাজত্ব ; জ্ঞানিন এবং কামসম্মত প্রেমের রাজত্ব হিন্দুর সংসারে নাই । হিন্দুব সংসারে কাম প্রেমের কেনা বেচা চলে না, সে প্রেমের স্থান পরিবর্তন চলে না, এক পতিকে প্রেম দিয়া, কিছুদিন পরে আপনার ধর্ম পূরণ হইল না বলিয়া, অন্য পুরুষকে প্রেম দিয়া তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করা, হিন্দু সমাজের বিধি নহে । সেরূপে পতিপত্নীর ইচ্ছামত প্রেম-পরিবর্তন—ইচ্ছামত পত্নী-পতি সঙ্ক বা রবিবাবুর একীকরণ ছেদন করা, বা সেরূপে একীকরণের মন্তকে পদাঘাত করিয়া অন্য স্ত্রী বা অন্য পুরুষকে বিবাহ কবা হিন্দু শাস্ত্রের হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য নহে । হিন্দুবিবাহের মূখ্য উদ্দেশ্য যখন আধ্যাত্মিক, “সংসার ধর্ম” পালন করাই যখন হিন্দু দম্পতির কর্তব্য, একমাত্র ধর্মই যখন প্রধান লক্ষ্য, তখন নানা কারণে এক পতিকে একাধিক বিবাহ করিতে হইলেও

একীকরণের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। একাধিক জী পতিব সঙ্গে আত্মায় আত্মায় এক হইয়া সহজেই হিন্দুশাস্ত্রমত দম্পতিব কর্তব্য পালন করিতে পাবেন। পাবেন কিনা, তাহা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন, এবং স্বীকারও করেন; তবে বাঁহারা কেবল রূপ ঘোষন এবং কাম সন্তুত প্রেমকেই একীকরণের মূলমন্ত্র বলেন, কোন রমণী একজন্মের সহিত প্রেম করিয়া, কিছুদিন পরে প্রেম ফুরাইয়া, তাহাকে ছাড়িয়া ক্রমাগত এইরূপে সুখের পতিকে ত্যাগ করিয়া, আট ছেলের মা হইয়াও আবার অষ্টম পতি গ্রহণ সমাজে সে রমণীকে বাঁহারা সতী বলেন, এবং এই অষ্টমীকরণকেও বাঁহারা একীকরণ বান, কেবল পাশবপ্রেম লাগবে কাঁপাই কোঁকে বাঁহারা বিবাহেব মুখ্য উদ্দেশ্য বলেন, তাঁহারা হিন্দু দম্পতীর মধ্যে একীকরণ দেখিতে পান না, আধ্যাত্মিকতাও দেখিতে পান না।

বহু বিবাহ ছাড়িয়া দিয়া, রবিবাবু বিধবার প্রতি দৃষ্টি দান করিয়াছেন। বাবু অক্ষয়চন্দ্র সবকার, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, হিন্দু বিধবা রমণীর কর্তব্য কৰ্ম ব্রহ্মচর্যা-বলম্বন। রবিবাবু বলেন, জীর বেলায় এই ব্রহ্মচর্যা ধাৰ্য্য করিয়াছ। কিন্তু ব্রতপন্থীকেই বেলা তাহা করনাই কেন? তাঁহার মতে ব্রত-পন্থীক বধন আবাব দার-পরিগ্রহ করিতে পারে, এবং হিন্দু বিধবা বধন আবাব পতি গ্রহণ করিতে পারে না, তখন হিন্দু বিবাহে আধ্যাত্মিকতা কোথায়?

হিন্দু সখবার দেহ অহিন্দুসখবাদিগেব দেহরূপ ভাড়াটিয়া বাটীর মত নহে। আজ অহিন্দুরমণীর দেহরূপবাটী প্রেমরূপ ভাড়াটিয়া, মিঃ হগ অধিকার কবিলেন। বাটীর দ্বাবে যেমন সাহেবদেব নাম খোঁদা থাকে, বাটীখানা ভাড়াটিয়া হইলেও যেমন সাহেবের নামেই তাহা বিদিত হয়, রমণীও সেই মত সাহেবের নামে বিদিত হইতে লাগিলেন। সম্বন্ধীয় কৌপবে সাহেবেব পোষাইল না, তিনি রমণীবা অকুঠা দিয়া উঠিতে পারিলেন না, বোকা বাব্বীর দেহরূপ ভাড়াটিয়া বাটীর বোগাড় কবিয়া, সাবেক বাটী ছাড়িয়া দিলেন, নাম খোঁদা পাথবখানাও ভাঙ্গিয়া আনিয়া নূতন বাটীতে বসাইলেন। প্রথম বাটীখানা পোড়ো হইয়া রহিল। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলিত আবাব, এক নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়া সেই দেহরূপ বাটীখানা অধিকার করিয়া আবাব আপনার খোদানাম দ্বারে বসাইয়া দিলেন, বাড়ী আবাব তাঁহার নামে বিদিত হইল। আর যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন না হইল, বাড়ী খানা পোড়ো বাড়ী,—ভূতেব বাড়ী বলিয়া সকলের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল, বার ভূতে বাড়ীতে রাতিতে অত্যাচার উপদ্রব করিয়া প্রতিবাসীদের ভয়ের কারণ করিয়া দিল। হিন্দু কুলকল্লার সহিত হিন্দু পুরুষের বিবাহ হইলে, সেই রমণী পতির হৃদয়ে হৃদয়ে, মনে মনে, আত্মায় আত্মায় এক হইয়া বসিয়া, পিতৃকুল হইতে পতিকূলে আসিয়া পতির গোত্রজ লাভ কবিয়া পতির সংখ্যঙ্গিনী এবং অর্দ্ধভাগিনী হইয়া যান। পতি ছাড়া তাঁহার নিজের একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব কিছু থাকে না। পিতা তাঁহাকে দান করায়

তিনি পতির অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া যান। পতি ভিন্ন তাহাব গতিমুক্তি নাই। পতি ভিন্ন তাহাব দেহেব উপব তাহাব কোন অধিকাব নাই, অপব কাহাবও নাই। পতিব মৃত্যুব পর্ব, তিনি পতিব অর্দ্ধাঙ্গরূপেই জীবিত থাকেন। তাহাব নিজের দেহের উপর যখন তাহাব স্বতন্ত্র অধিকাব নাই, তখন তিনি বিধবা হইয়া, অল্প পুরুষকে সেই দেহ দান করিবেনকিরূপে? দান দ্বারা বিবাহ হয় না। যে পিতা একবা দাম করিয়াছেন, তিনি সেই দত্তা পুনবায় অল্প পুরুষকে দান করিতে পাবেন না, কবিলে শাস্ত্রমত পাগভাগী হন। আত্মীয় কুটুম্বগণ ও দান কবিতে পারেন না এবং কোন পক্ষ ও দান কবিতে চাহিলেও কোন হিন্দুই সেই পবকীয় বিধবাকে জীকে গ্রহণ কবিতে পাবেন না। এমত অবস্থে সে রমণী ব্রহ্মচর্যা ব্যতীত আব কি কবিতে পাবে?

মৃতপত্নীক (পুরুষ আবার বিবাহ করে কেন, তাহাবও কাবণ আছে। বৃদ্ধ মৃতপত্নীক বিবাহ করেন না। যে সকল যুবক বা প্রৌঢ়ের পত্নী-বিয়োগ হয়, তাহাদিগেব সম্ভান না জন্মিলে, তাহাবা শাস্ত্রমত বিবাহ করিতে বাধ্য, শাস্ত্র-সম্মত ধর্ম কার্যা সাধিত না হইলে বিবাহ কবিতে বাধ্য। 'সদ্বীকো ধর্ম আচবেৎ।' জীবাতীত ধর্ম কার্যা সাধিত হয় না বলিয়া হিন্দু যুবক বা প্রৌঢ় মৃতপত্নীক বিবাহ কবিতে বাধ্য।

বহু বিবাহ এবং মৃত পত্নীকেব বিবাহ হয় বলিয়া, রবিবাবু আপন বুদ্ধিমত, হিন্দু বিবাহে একীকবণ হয় না, ইহা স্থির করিয়া শেষ

বলিতেছেন যে, "সংসার যাত্রা নির্বাহই হিন্দু বিবাহেব মূল উদ্দেশ্য,—অপত্য উৎপাদন, হিন্দু বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। মনুবা আধ্যাত্মিক নিয়মেব প্রতি অল্পবয়স্ক ততটা প্রকাশ পাইতেছে না।" এবং তাহাব মতে হিন্দু-বিবাহে আধ্যাত্মিকতার নাম গন্ধ কিছুই নাই, কেবল বংশবৃদ্ধিই প্রধান উদ্দেশ্য; "পুত্রার্থে ত্রি তেভার্যা" এইকটি কথা ববি বাবুব সম্মল এবং এইকটি কথা লইয়াই তিনি ধার্য্য করিয়া তছেন যে, হিন্দু বিবাহেব মূখ্য উদ্দেশ্য

উৎপাদন। "yes, no, very well"

তিন কথা শিখিয়া লেকশনিয়াবেব কোন পুস্ত ব্যাখ্যা কবাও যেমন, আব "পুত্রার্থে ত্রি তেভার্যা" কেবল এই কটি কথা লে মুখে শুনিয়া, হিন্দু বিবাহে আধ্যাত্মিকতা আ কিনা, তাহাব ব্যাখ্যা কবিতে যাওয়াও সেই মত। হিন্দু সংসাবেব ধর্ম্মে কি কি বিধি আছে, কি কি অনুষ্ঠান আছে, কি কি ন্যায় আছে, কি কি কর্তব্য আছে, এগুলি যদি ববি বাবু কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কবিতেন, কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিব নিকট শাস্ত্র শিক্ষা কবিতেন, ব্যাখ্যা শুনিতেন, তাহা হইলে তিনি বলিতে সাহস কবিতেন না যে কেবল পুত্রোৎপাদনই হিন্দু বিবাহেব মূখ্য উদ্দেশ্য। ববিবাবু নিজেই বলিয়াছেন, যে আধ্যাত্মিক শব্দেব শাস্ত্র-সম্মত ঠিক অর্থটি কি তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পাবিনা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীব নিকট তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করি। যিনি নিজমুখে বলিতেছেন যে আধ্যাত্মিক শব্দেব ঠিক অর্থ কি তাহা জানি না তিনিই আবার কোন্ সাহসে হিন্দু বিবাহে আধ্যাত্মিকতা নাই বলিতে যান তাহা বুঝা গেল না।

এইবার রবিবাবু ডাইভোসের কথা। তিনি বলেন যে, ‘ডাইভোস’ প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়াই, ইহা বলা যায় না যে, আমাদের দেশে বিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক একীকরণতারক্ষার প্রতি সমাজের বিশেষ মনোযোগ আছে।” সকলেই জানেন, কাবণ ব্যতীত কার্য হয় না। ডাইভোস ব্যতীত প্রযোজন হয় না, এবং অল্প দিন হইলে আবিস্কার হয় না। যে দেশে কোন দেশে যে কোন বিধি হয়, প্রযোজন ব্যতীত তাহা হয় না। যাহার প্রযোজন নাই তাহার আবিস্কার হইবে কেন? সমাজের পক্ষে কোন বিধি প্রযোজন হইলে, সমাজ-

বিদগ্ধ সে বিধি সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারেন না। হিন্দু বিবাহে পূর্ণ পূর্ণ একীকরণ, আধ্যাত্মিক সংমিলন, বলিয়াই স্বীকরণ, ত্রীকরণ, চতুষ্করণ, পঞ্চীকরণ কবিবার জন্য ডাইভোস বিধির দরকার হয় নাই—সৃষ্টি ও হয় নাই। রবিবাবুর যুক্তিমত আমবা বলিতে পারি যে, ইংল্যান্ডের সমাজবিধিপুস্তকে অন্তঃপুর্বাবরোধ প্রথা সম্বন্ধীয় কোন বিধি নাই বলিয়া যে, ইংল্যান্ডের রমনীর অন্তঃপুর্বে আবদ্ধ থাকেন না, এমত বোকা যায় না;—যুক্তি স্রেমন, তাহার দৌড়ও সেই মত।

ক্রমশঃ

ভারদ্বাজ।

“কারে দিব বঁধু এ ভালবাসা” ?

১
মিটল না সাধ ভালবেসে হেথা,
ভাল বাসা বুঝি হ’লনা মোর !
পদে পদে বুকে বেজে ওঠে ব্যথা,
প্রাণেব প্রবাহে বহেনা জোর।

২

কিবা নর নারী কিবা সে প্রকৃতি,
আধ আধ হেরি সকলি তার,
বুকভরা মোর প্রেমের মুরতি
ধরীর বুকে হেরিনে তার !

৩
গঠিতে পাবিনে চাহে যারে প্রাণ,
কেমনে সে ছবি গঠিব হাস !
আকৃতি ভাবিলে তার সব খান,
সে যে বড় ছোট হইবে যায় !

৪

প্রথম ঘোঁষনে প্রেম-পিপাসায়,
হেরিয়া প্রিয়র নয়ন দুটি
ভরিয়া উঠিল অদয় তাহার,
প্রাণের প্রবাহ বহিল ছুটি ;—

৫

কিবা মাতোয়ারা সিদ্ধু ঝটিকার ।
কোথা কি প্রপাত ধরণী বৃকে,
উঠিত আকাশে, ছুটিত কোঁথায !
সদা মনপ্রাণ স্বপন-স্বথে ,—

৬

দ্বিতীয় ঘোঁবনে সপ্নভাঙি তাব,
মিলিল প্রিয়াব নয়নে কুল—
আঁখি ত্যজি হৃদে পড়িল তাহাব,
ভাবিলু এবার মিটিল ভুল ।

৭

মান হল যেন শান্তির সাগরে
মিশাইয়া গেল আকুল প্রাণ
শারদ পূর্ণিমা-কোঁমুদি-কিরণে যেন না
হেবিতাম ভবা জগত খান । গহিলেও

৮

তৃতীয় ঘোঁবনে সে অকুল বৃকে
কে দিল বাঁধিয়া বিপুল বাঁধ,
হেরিলে হৃদয় ভরে যেত চুখে,
উথলি পড়িতে হইত সাধ ।

৯

চতুর্থ ঘোঁবনে উদাসী হইলু
আকুল অন্তবে ভ্রমিণু দেশ,
গিবি নদী হৃদ বন নিরখিলু,
পাবাবাব ফুলে দাঁড়াই শেষ ।

১০

কি মহান দৃশ্য হেরিলু নয়নে
অনন্ত আবেগে হায়েছে ভোর ।
আশ্রান্ত অটুট অভেদ মিলন
বুচিল নারীর নেশাব ঘোব ।

১১

কার প্রেমে মত্ত তুমি পাবাবাব
আমি যে দেখিতে পাইনে কায ।
এত প্রেম সাধ হাযবে আমার,
বুধা কি হৃদয়ে বহিল তায ।

১২

শুনছি গোকুলে যমুনাব কূলে,
তভাম নাকি দেখা পাইত তার,
যং এইকক্ষহলে বাঁশী 'বাধা বাধা' বলে,
তছেলটয়া আসিত নিকটে তাব ।

১৩

সেই বৃন্দাবনে সে নদী পুলিনে,
রাধা রাধা বলে কাঁদিবু কত,
কদম্বের মূলে নিকুঞ্জে বিজনে,
বেড়ায়েছি কাঁদি পাগল মত—

১৪

শুনছি চৈতন্য নবদ্বীপে নাকি,
পেয়েছিল দেখা কিকূপে তাব,—
সেও নবদ্বীপে প্রাণ ভবে ডাকি,
মেলেনি ত দেখা বারেক তাব,—

১৫

দেখিনি নয়নে তবু হৃদ মনে,
সে যেন আমাবে ঘেরিয়ে আছে;
ফুলে ফলে ডালে, শূন্য ধবাতলে,
আধআধরূপে বেড়াই কাছে ।—

১৬

দেখা কি দিবেনা প্রাণ বঁধুছে ।
তবে কেন দিলে এ প্রেম আশা ?
শূন্যময় হেরি এ জগত যে হে—
কারে দিব বঁধু এ ভাল বাসা ?

ঈশান ।

লক্ষ্মী ও ইহার ভগ্নাবশেষ ।

প্রায় সার্ব্ব শতবর্ষ অতীত হইল, মুসল-
মানের গোববাবি অন্তর্মিত হইয়াছে, কিন্তু
ভাবতবর্ষের অনেক স্থান সেই রবির প্রভাষ
এপর্যন্ত আলোকিত বহিয়াছে। দিক
খবের অতুল সমৃদ্ধির ভূরি ভূবি প্রমাণ
এখনও নানাস্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।
এপর্যন্ত কোন ভ্রমণকারী ভগ্নাবশেষ দিল্লী
ও আগ্রাব প্রতি সাক্ষ্যানেজে নিবীক্ষণ না
করিয়া থাকেন? কত শত বৎসব হইল
যবনের যশঃসৌভ তিরোহিত হইয়াছে,
কিন্তু তথাপি তাজমহল ও কুতুবমিনার
এখনও সেই বিলুপ্ত গোববের কথা কোন
দর্শককে অবগণ করাইয়া না দেয়? যবন
বাদশাহ যত দূর নিরুহ বা প্রজাপীড়ক
বলিয়া বর্ণিত হউন না কেন, তিনি যে
ভাবতের ধন ভাবতেই রাখিয়া গিয়াছেন,
একথা কোনও সন্দেহ ও সমদর্শী ঐতিহাসিক
বোধ হইব অস্বীকার করিবেন না।

এই রূপ ভারতবর্ষের অনেক স্থানে
মুসলমানের লুপ্ত কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পতিত
আছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত লক্ষ্মী
নগর ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।
ঐ যে গোমতীর দক্ষিণতীরে দেড়কোশ
ব্যাপিয়া মনোহর অট্টালিকারাজি দৃষ্ট হয়,
ঐ সকল কাহার দ্বারা বা কোন সময়ে নির্মিত
হইয়াছিল? একবার উহাদের প্রতি নেত্র-
পাত করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে উহার
ইংরাজের প্রস্তুত নহে। যাহারা এজগতে

পার্শ্বিক স্থানের পবাকার্য্য দেখাইয়া ছিলেন,
ঐহাদিগের ধনাগার কুবেবভাণ্ডার বলিলেও
অত্যাশ্চর্য্য হইতনা, ঐহাবা খানিক আমোদের
জন্ত অকাতবে অসংখ্য ধনবাশিব্যয়ে কিছু
মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, এই স্মন্দব নগর,
সেই যবন রাজগণের নিশ্চিত। শত শত
মিনার, স্তূপের ম্যায় উজ্জল ধাতু নির্মিত
উচ্চ চূড়ার শোভামান প্রাসাদবাজি, গগন-
স্পর্শী শিবোশোভিত মসজিদসমূহ এখনও
বাবদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান
হইছে।

লক্ষ্মী, মুসলমানদিগের পুর্বাতন সহব
স্থল। একশতাব্দী পূর্বে তথায় সুরম্য
হর্ম্যরাজির চিহ্ন মাত্রও ছিল না। ১৭৭৫
খৃষ্টাব্দে নবাব আসাফুদৌলা এইস্থানে প্রথম
অযোধ্যার রাজধানী স্থাপিত করেন।
ইহার পূর্বে ফয়জাবাদেই প্রায় সুবাদার-
গণের রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত। যদিও লক্ষ্মী
তখন সহর বলিয়া পবিগণিত ছিল, তথাপি
দৈর্ঘ্যেও প্রস্থে এখনকার দশাংশের একাংশও
ছিল না। এমন কি যে সকল স্থান আজি
কেনবাবাণ ও হোসেনাবাদ বলিয়া বিখ্যাত,
সেই সকল স্থান তখন গভীর অরণ্যে আব্রু
ছিল। আধুনিক লক্ষ্মী নগর চতুঃবর্তী
গ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরের
মহলাসমূহে এখনও অনেক প্রাচীন গ্রামের
নাম পাওয়া যায়। ওরাজিদ আলি সার
পদচ্যুতির সময়ে এই স্মরণস্ত রাজধানী

নয়লক্ষ লোকের আবাসভূমি ছিল। বাণিজ্যে, ঐশ্বর্য্যে ও আকারে ইহা এতদ্দেশে একটি প্রধান নগর বলিয়া খ্যাত হইত। কিন্তু আজি আর সে লক্ষ্য নাই। সিপাহী-বিশ্রোহেব প্রচণ্ড বাত্যাঘ সহরের তৃতীয়াংশের অধিক ভূমিসাৎ হইয়াছে। সুনিপুণ বৈবসাদক ইংরাজের তরবারে শত সহস্র নগরবাসী জীবন-বিসর্জন দিয়াছে ও বহুসংখ্যক নিরাশ্রয় নাগরিক পথের পথিক হইয়া জন্মের মত লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া দূর দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অধুনা এই নগরে পাঁচ লক্ষের অধিক নিবাসী নাই।

গোমতীর প্রান্তরসেতুর নিকট যে উচ্চ ভূমি ষণ্ড দৃষ্ট হয়, উহাকে এখনও লক্ষ্মণ-ভলা বলে। পূর্বে এই স্থানেই লক্ষ্মণ গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামের নাম হইতেই লক্ষ্মণ-নামের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রবাদ আছে,— লক্ষ্মণ-পুত্র স্বর্ঘ্যবংশীয় রাম চন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের স্থাপিত। রঘুবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে অযোধ্যা এত বিস্তৃত ছিল, যে এই লক্ষ্মণ-পুত্র পর্য্যন্ত উক্ত নগরীর সীমা ছিল। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজধানীর পার্শ্বেই স্বীয় পুর নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। যখনদিগের ভারত আক্রমণকালে, লক্ষ্মণপুর গ্রামে ব্রাহ্মণদিগের বসতি ছিল। ১৬০ খৃঃ অব্দে মামুদপজানীর ভ্রাতৃপুত্র গাজিমিহানের সৈন্যের সহিত কতিপয় সেখ সপরিবারে এদেশে আগমন করে। তাহারাই প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্মণপুত্র গ্রাম হইতে বহির্ভূত করিয়া, এই স্থানে মুসলমানের আধিপত্য স্থাপন করে; তাহাদেরই ছাড়া এই স্থলে

এমন একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ও দুর্গ নির্মিত হয়। ‘লিখনা’ নামক জনৈক গোপ উক্ত দুর্গের নক্সা প্রস্তুত করান, তাহার নাম হইতে ‘কিল্লা লিখনা’ নামকরণ হয়। কিল্লা লিখনা-নাই পরে ‘মজিহাবন’ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন ‘লক্ষ্মী’ নাম ‘লিখনা’ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

১৫৯০ খৃঃ অব্দে—আকবর সাহ হিন্দু-স্বর্ঘ্যবংশীয় দ্বাদশ সুবায় বিভক্ত করেন। অযোধ্যা তন্মধ্যে একটি সুবায় বলিয়া গণ্য হইত। প্রত্যেক সুবায় স্বতন্ত্র শাসনকর্তা ছিল। তাহাদের সুবাদার বলি যাইত। আকবরের রাজত্বের পূর্বেও অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্তা ইতিহাসে সুবাদার নামে বর্ণিত হইয়াছেন। অযোধ্যার তদানীন্তন সুবাদারগণ—সকলেই প্রায় স্বল্প-কালের জন্য নিযুক্ত হইতেন। তিন চারি বৎসরের অধিক কেহই বাজত্ব করেন নাই। কিন্তু কালক্রমে দিল্লীখবের প্রতাপ হান হইয়া পড়ায়, ১৭০২ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার শাসনের নূতন প্রণালী আবির্ভূত হইল।

ঐ বৎসর সাদত ঝাঁ অযোধ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। শুনা যায়, পারস্ত হইতে বাণিজ্যার্থ ইনি এতদ্দেশে আগমন করেন, ও উত্তরোত্তর বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া, অযোধ্যার সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। পূর্বে সুবাদারগণ দিল্লীতেই বাস করিতেন, কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করিবার সময় অযোধ্যায় আসিতেন। কিন্তু সাদত ঝাঁ সেকপ করিলেন না। তিনি কখনও বা অযোধ্যায়, কখনও বা লক্ষ্মীয়ে এইরূপে তাঁহার সুবামধ্যেই প্রায় বাস করিতে লাগি-

লেন। তাঁহাৰ আদেশে অঘোধ্যা নগৰীতে একটা দুৰ্গ নিৰ্মিত হইল। তিনিই প্ৰথমে 'কিল্লা লিখনাব', 'মচ্ছিভবন' নাম দেন। কিয়ৎকাল পরে দুৰ্গদত্ত নাদিব সা ভাৰত আক্ৰমণ করিলে, সাদত খাঁ সৈন্যে বাদ-সাহেব সাহায্যে গিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে ফিৰিয়া আসিবার কিছু দিন পবেই ইনি বিষ্ণুপানে প্ৰাণত্যাগ করেন। এই সম্বন্ধে লক্ষ্মীয়ে একটা মনোহৰ গল্প বহুদিন হইতে প্ৰচলিত হইয়া আসিতেছে। তথ্য শুনা যায় যে সাদত খাঁর জ্ঞাতপুত্ৰ ও জামাতা মনসুৰআলি খাঁই তাঁহাকে বিষ্ণুপ্ৰাণে করেন। নবাব যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহাব মৃত্যু সন্নিকট, তখন স্বীয় বেগমকে ডাকাইয়া ঐ ঘটনা জ্ঞাত করিলেন। সাদী স্ববনরমণী হিন্দুললনার ন্যায় সহমবণে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। কিন্তু হিন্দুললনার অসীম সহিষ্ণুতা স্ববনের স্বভাব-শুলভ নহে। মৃত্যুযজ্ঞা স্ববণ কবিয়া বেগম ভীত হইলেন; ও অবশেষে প্ৰাণত্যাগের এক অলৌকিক উপায় উদ্ভাবন করিয়া কহিলেন, "সহবের যদি কোন মন্ত্যগুয়ালী আমার নিকট দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তাহার গাত্ৰের দুৰ্গন্ধ আমার জীবন শেষ হইবে।" নবাব সম্মত হইলেন ও এই উপায়েই রমণীর কোমল প্ৰাণ দেহ হইতে ভ্ৰষ্ট হইল। স্ববনললনা এই অমাহুতিকরূপে দেহ বিসৰ্জন করিয়া যে কেবল পাতিব্ৰত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন এমন নহে, তিনি স্বজাতির অপরিমিত বিলাসপ্ৰিয়তারও পরিচয় দিয়া থাকিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মনসুৰআলি খাঁ অঘো-

ধ্যাব সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনিই প্ৰথমে বাদশাহেব উজীর পদে নিযুক্ত হন। এই কাৰণবশতঃই তিনিও তাঁহাব বংশধরগণ ইতিহাসে নবাব উজীর নামে প্ৰসিদ্ধ। ইনিই ফকজাবাদ নগর নিৰ্মাণ করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপিত কবেন। তিনি গত হইলে মুজাউদৌলা পিতৃসিংহাসনে অধিকৃত হন। ভারতবৰ্ষের ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন কিরূপে ইনি ইংরাজদিগের বিপক্ষে মীরকাশিমের সহায়তা কবেন ও বজ্রাবেব যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্ৰভূত অর্থ ও স্রাজ্যের কিয়দংশ দান করিয়া উহাদের সহিত সন্ধি-সন্ধন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তথাপি জাউদৌলার রাজত্ব কালই অঘোধ্যার প্ৰাপেক্ষা গৌৰৱের দিন বলিয়া গণ্য হইত।

তাঁহাৰ মৃত্যুর পর ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাব পুত্ৰ জাউদৌলা অঘোধ্যার নবাব উজীর হইলেন। তিনিই লক্ষ্মীনগরের প্ৰকৃত স্থাপন-কৰ্ত্তা। তাঁহাব সময় হইতেই লক্ষ্মী-অঘোধ্যা রাজধানী বলিয়া গণ্য হয়। আসাফুদৌলা আধুনিক সহবের পশ্চিমদিক সমুদয় নিৰ্মাণ করেন। লক্ষ্মীয়ে যে সকল অট্টালিকা এখনও মুসলমানের গৌৰৱের পরিচয় দিতেছে, তাহাদের বহুসংখ্যক ইহাৰই প্ৰস্তুত।

ইমামবাড়া ইহাদের মধ্যে সৰ্ব্ব প্ৰধান। ইহা এখনও লক্ষ্মীয়ের এমন কি ভারত-বৰ্ষের মধ্যে একটা প্ৰধান দৰ্শনীয় বস্তু। এই অট্টালিকা পুৰাতন মচ্ছিভবন-দুৰ্গের পাৰ্শ্বে উচ্চ ভূমির উপর নিৰ্মিত। উত্তরদিকে ইহাৰ প্ৰবেশ দ্বার—একটা প্ৰকাণ্ড অট্টা-লিকা বিশেষ ফটক। সম্মুখেই রাজপথ।

পথের অপব পার্শ্বে ঠিক এই ফটকের ন্যায় আর একটি অটালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল 'সওয়ালজবাব' নিমিত্তই ইহাতে অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। আমাদের অপভাষায় যাহাকে 'মানানসই' হওয়া বলে, তাহাবই নাম 'সওয়াল জবাব'। পাঠক! মনে করুন, একটি বৃহৎ বাটীর এক পার্শ্বে একটী মন্দির প্রস্তুত হইল; অপর পার্শ্বে ঠিক ঐরূপ যদি আর একটি না হয়, তাহা হইলে আমবা বলিব ভাল মানাইল না। কিন্তু মুসলমান নবাব বলিবেন সওয়ালের জবাব হইল না,—প্রশ্নের উত্তর হইল না। উক্ত কৃত্রিম ফটকটি 'সওয়ালের' 'জবাব' দিবার নিমিত্তই প্রস্তুত। সকলই ফটকে ন্যায় কেবল প্রবেশ করিবার পথ না—যথার্থ ফটকে দুইটি প্রবেশ দ্বার। ঐ পথে অভ্যন্তরে গমন করিলে একটি স্তম্ভমণ্ডিত স্প্রশস্ত ভূগাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হওয়া যায়। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া কয়েক পংক্তিতে প্রস্তুতনির্মিত সোপানসহকায়ে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। আবার পূর্বের স্থায় এক স্তম্ভহীন ফটক। তাহাতে তিনটি প্রবেশ পথ। ইহা পার হইলে আবার পূর্বমত চতুর্দিকে প্রস্তুতের সোপান-রাজিবেষ্টিত মনোহর প্রাঙ্গণ। দক্ষিণ পার্শ্বে চতুর্দিকে মিনার শোভিত একটি স্তম্ভহীন মসজিদ। সম্মুখে প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া। নবাবদিগের সময়ে ইহা ও হোসেনাবাদ ইমামবাড়া এতদ্দেশে মহরমের প্রধান দৃষ্ট স্থান বলিয়া গণ্য হইত। এখন ও লক্ষ্য্যে মহরমের ধ্বংস ধুম হয়, তাবতে বোধ হয় আর কোথাও সেরূপ হয় না। ইহার

কারণ এই যে উক্ত উৎসব সিংহা মুসলমান-দিগের মধ্যেই অধিক প্রচলিত; ও এদেশে সিংহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। দিল্লীর বাদসাহেরা সকলেই স্তম্ভ ছিলেন এবং প্রায় স্তম্ভ মতাবলম্বী লোক হইতেই অধীনস্থ প্রদেশেশ্বর, শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু সিংহামতাবলম্বী সাদত খাঁর সহিত লক্ষ্য্যে সিংহাদিগের প্রভুত্ব বন্ধমূল হইল, ও সেই সময় হইতে মহরমেব উজ্জ্বল দৃষ্ট শত শত ভাবতবাসীকে প্রতি বৎসব লক্ষ্য্যে আহ্বান কবিতো লাগিল।

উক্ত প্রকাণ্ড অটালিকা মধ্যে কেবল মাত্র তিনটি দ্বার এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি দালান। মধ্যস্থলের দ্বারটি,—বলিলে বিশ্বাস হইবে না,—দীর্ঘে ১৬৭ ফিট ও প্রস্থে ৫২ ফিট। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ বাটীর কোন স্থানেও একখণ্ড কাঠ ব্যবহৃত হয় নাই। সমুদয় ক্ষুদ্র ইষ্টক ও চূর্ণে নির্মিত। উক্ত ঘবের ছাদ একটিমাত্র খিলানের উপর বহিয়াছে। অভ্যন্তরের দেয়াল, সাধারণ দ্বিতল বাটীর ন্যায় উচ্চ। ঘবের ভিতরেই উর্দ্ধদেশে ছাদের খিলানের কিঞ্চিৎ নিম্নে চতুর্দিকে বারেণ্ডা। এইস্থানে পরদানবিশ বেগমগণ বসিয়া মহরমেব উৎসবাদি অবলোকন করিতেন। গৃহের মধ্যস্থলে উহাব চিবস্বরগীর নিম্নাতা নবাব আসাফুজ্জোলার কবর। দুই পার্শ্বে দুইটি অষ্টকোণবিশিষ্ট কক্ষ। ইহাদের আকৃতি পূর্বকটির ন্যায়, কেবল দৈর্ঘ্যে উহা অপেক্ষা ন্যূন। দুইটিতেও উর্দ্ধে বেগমদিগের প্রবেশ করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার ও বারেণ্ডা আছে। এক্ষণে সকলেই স্তম্ভময়, পূর্বে

যে সকল বহুমূল্য গৃহসজ্জা ছিল, সিপাহি-
যুদ্ধের সময় কতক বা বিস্তোহিগণ আত্মসাৎ
কবিয়াছে ও অবশিষ্টাংশ ইংবাজ সৈনিকের
প্রতিহিংসা স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে ।

ইমামবাড়ার দ্বিতলেব উপর আশ্চর্য্য
'ভুল ভুলাইয়া' অর্থাৎ 'গোলক ধাঁধা'—
অসংখ্য অঙ্ককাবময় সংকীর্ণ পথ । তন্মধ্যে
প্রবেশ কবিয়া শীঘ্র বহির্গমন করা অতীব
দুস্কর । গল্প শুনা গিয়াছে, কিছু দিন পূর্বে
২১৩ জন ইংবাজ সৈনিক পুরুষ মজাপান
কবতঃ উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ কবিয়া পথ
হারািয়াছিল । কয়েক দিবস পথ
তাহাদের মৃতদেহ বাহির হইল ।

ইমামবাড়ার স্বর্কাজ চূড়া হইতে লক্ষ্মী
সহবের দৃশ্য অতি সূক্ষ্মকার ।

আসাকুন্দোলা স্রীষ বাজধানী নির্মাণের
নিমিত্ত অতি দূবদেশ হইতেও কর্মকার
আনিতে ক্রটি কবিতেন না । যাহাব আদর্শ
জগতেব কোথাও পাওয়া যায় না, এমন
একটি কীর্তিস্তম্ভ রাখিয়া যাইতে তাঁহার
একান্ত ইচ্ছা ছিল । এই কাবণবশতঃ
ইমামবাড়া স্থাপনের পূর্বে কারিকরগণকে
ডাকাইয়া ভাবী হুম্মার চিত্র অগ্রে প্রস্তুত
কবিতে কহেন । কক্ষিকর উল্লা নামক
একব্যক্তি উক্ত অটালিকাবচিত্র প্রস্তুত করে।
উহা মনোনিীত হওয়াব ঐ কর্মকারের উপ-
রেই ইমামবাড়ানির্মাণেরভার অর্পিত হয় ।

ইমামবাড়া হইতে বহির্গত হইয়া দুই
চারি পদ পশ্চিমমুখে গমন করিলে এখনও
একটি অতুল ভোরণ দেখা যায় । ইহা
আসাকুন্দোলার দ্বিতীয় কীর্তিস্তম্ভ বলিতে
হইবে । ইহার নাম 'কুমিদরোজা' । কথিত

আছে—এই প্রকাণ্ড ফটক 'কুম' অর্থাৎ
কন্ঠাটিনোপলেব কোন দ্বারের অলুকবণ ।
কিন্তু যাহাবা উভয় স্থানই দর্শন কবিয়াছেন ।
তাঁহার ব বলেন যে ইউরোপীয় ভুবঙ্কের
বাজধানীতে কুমিদরোজাব ন্যায় কোন ফটক
দেখিতে পাওয়া যায় না । যাহা হউক এই
সুবিশাল সিংহদ্বার এখন ও একটি দর্শনীয়
বস্তু । ইহাও কেবল ইষ্টক নির্মিত থিলানেব
উপব গঠিত । দ্বারটি এত উচ্চ যে বোধ
হয়, একটি হস্তী পৃষ্ঠে অপব একটি হস্তীকে
দণ্ডায়মান অবস্থায় লইয়া অনায়াসে উহার
মধ্য দিয়া গমন কবিতে পারে । দুই পার্শ্বে
উপবে উঠিবার সোপানশ্রেণী আছে । শিখর
দেশে এখনও নানাবিধ স্তম্ভ কারুকার্য্য দৃষ্ট
হয় ।

ইমামবাড়া ও কুমিদরোজা কেবল
কীর্তিস্তম্ভ স্থাপনেব অভিপ্রায়ে নির্মিত হয়
নাই । নবাব আসাকুন্দোলার উহাদিগের
নির্মাণ করিবার একটি মহত্তব উদ্দেশ্য ছিল ।
একদা তাঁহার রাজতকালে অযোধ্যা প্রদেশ
দুর্ভিক্ষে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল ।
সেই সময়ে নবাব এই দুই হুম্মার পত্তন
করেন । উহাদের নির্মাণ কার্য্যে বহুসংখ্যক
দরিদ্র প্রজা নিযুক্ত হয় । বহুদিন অবধি
এই কর্মই তাহাদের জীবিকানির্ভাহের উপায়
ছিল । এবং এইরূপে অযোধ্যার অনেক
দীন ও দুঃখিগণ অনাহারে অকাল মৃত্যু
হইতে বক্ষা পাইবা ছিল ।

কুমিদরোজাব পশ্চিমে হোসেনাবাদ
যাইবারপথ । ঐ পথের দক্ষিণধারে কয়েকটী
অটালিকার তদ্বাবশেষ দৃষ্ট হয় । 'করহদবজ'
প্রাসাদ নির্মিত হইবার পূর্বে ইহারাই

দৌলতখানা নামে লক্ষ্মীর রাজপুত্রী বলিষা প্রসিদ্ধ ছিল। এগুলিও আসাফুদ্দৌলার নিশ্চিত। নির্মাতার নামানুসারে ইহাদের মধ্যে প্রধান বাটীটির নাম 'আসফিকুঠা' দেওয়া হয়। এখন এ সকল স্থান জনশ্রুত হইয়া পশুপক্ষীর আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

'জুমা মসজিদ' ও আসাফুদ্দৌলার শাসন সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা উক্ত নামধারী দিল্লীর সুবিখ্যাত মসজিদের আদর্শ মাত্র। জুমা, হোসেনবাদের অনতিদূরে উত্তর পশ্চিম কোণে স্থাপিত। ইহাও সামান্য অট্টালিকা নহে। মসজিদটি তিন অংশে বিভক্ত। উপরে তিনটি স্তম্ভবৎ গম্বুজ। জুমার মিনারগণের ন্যায় উচ্চ-মিনার লক্ষ্যে প্রায় আর দুই নম্বর। জুমা মসজিদ এখন ভগ্নোদ্ধ। চতুর্দিক হত ফল ফুলের সুবম্য উদ্যান এক্ষণে বর্জনে পরিণত।

হোসেনবাদের পশ্চিমে প্রায় এককোশ দূরে মুসাবাগ নামে একটি পুরাতন উদ্যান দৃষ্ট হয়। উদ্যানটি আসাফুদ্দৌলার প্রস্তুত বটে, কিন্তু উহার অন্তর্গত অট্টালিকা সাদত আলিখান আদেশে নিশ্চিত হইয়াছিল। সাদত আলি এই স্থান হইতে বন্য পশুর যুদ্ধ অবলোকন করিতেন। এই উদ্যানের নাম দৃষ্টে লক্ষ্যে নিরলিখিত গল্পটি শুনিতে পাওয়া যায়। একদা আসাফুদ্দৌলার অধারোহণে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। যে স্থানে এক্ষণে মুসাবাগ স্থাপিত, ঠিক তথায় তাঁহার অশ্বের পদতলে হঠাৎ একটি ইন্দুরের মৃত্যু হয়। নবাব এই ঘটনার

স্মৃতিশয় জুগুপ্সিত হইয়া ঐ ক্ষুর প্রাণীর সম্বলিত তাহার কবরের উপর উক্ত উদ্যান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 'মুসা' অর্থাৎ ইন্দুর শব্দ হইতেই উদ্যানের নাম মুসাবাগ হইল। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে উদ্যানের মধ্যস্থিত অট্টালিকা সাদত আলি বা আফজা একজন ফরাসীর নিশ্চিত। ফরাসীদিগকে 'মুসিয়র' নামে সম্বোধন করা হয় বলিয়া লোকে নির্মাতার প্রকৃত নাম বিস্মৃত হইয়া ঐ নামানুসারে উদ্যানের নাম দিয়াছে।

আসাফুদ্দৌলার লক্ষ্যে 'চক' অর্থাৎ বড়বাজার নির্মাণ করেন। কলিকাতার বড় বাজারের সহিত উহার ভিতরের আপন শ্রেণীর অনেক সাদৃশ্য আছে। এই স্থান এখনও সমস্ত দিবস এত জনাকীর্ণ থাকে, যে ভিতরে শকটাদি যাওয়া একেবারেই নিষেধ। মধ্যে একটি প্রাণ এক মাইল দীর্ঘ সংকীর্ণ পথ ও তাহার দুই পার্শ্বে দোকান; মধ্যে ২ স্তম্ভবৎ শাখাপথও আছে। দুই প্রান্তে দুইটি উচ্চ ফটক। তন্মধ্যে দক্ষিণ-মিকেরটির নাম 'আকবরির দরোজা।' লক্ষ্যে বাসিগণ কহে যে এই তোরণ দিল্লীস্থব আকবরের নিশ্চিত। নেপাল জয় করতঃ এই নগর দিয়া গমন কালে তান উক্ত দ্বার নির্মাণ করাইয়া যান।

গোমতীর উপর পুৰাতন প্রস্তর-সেতু আসাফুদ্দৌলার নিশ্চিত।

দিলখুসার নিকটবর্তী বিরিষাপুর প্রাসাদ ও উক্ত নবাবের রাজত্বকালে নিশ্চিত হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিযুক্ত রেসিডেন্ট গণ প্রথমে লক্ষ্মীর সীমানা পদার্পণ

করিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ কবিবার জন্ত এই স্থানে অপেক্ষা করিতেন। নবাব উজ্জীর স্বয়ং সসৈন্তে বিবিয়াপুর্বে আসিতেন ও বেসিডেন্টের সহিত এক হস্তীতে আবোহণ করিয়া তাঁহাকে সহবে ভিতর লইয়া যাইতেন। এই স্থানেই ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল লড টেনমাউথ মহাসমাবাহে সহকায়ে দরবার করিয়া আসাফুদ্দৌলার পুত্র উজ্জীর আলিকে পদচ্যুত করেন।

আসাফুদ্দৌলার শাসন সময়েই সুবিখ্যাত 'মার্টিনিয়ার' বা 'কন্‌ষ্ট্যান্‌শিয়া' নির্মিত হইয়াছিল। জেনারেল মার্টিন নামক একজন করাসী ইহার নির্মাতা। ইনি এতদ্দেশে প্রথমে সামান্য লোকেব স্থায় আইসেন। শৈল্প দলে ভুক্ত হইয়া স্বীয় কার্যদক্ষতাবলে জেনারেলের পদে উন্নত হন ও প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পবলোক গমন করেন। নবাব আসাফুদ্দৌলার সহিত ইহার অতিশয় প্রণয় ছিল। উভয়ে একত্র উপবেশন করিয়া স্ব স্ব কুক্কুটের যুদ্ধ অবলোকন করিতেন। 'শা নুজফে' একটি পুরাতন চিত্রে এখনও এইকুক্কুটযুদ্ধ অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। জেনারেল মার্টিন ভাবী 'কন্‌ষ্ট্যান্‌শিয়া'র চিত্র করিয়া প্রথমে নবাবকে দেখান। উহা আসাফুদ্দৌলার মনোনীত হয়; ও বাটী প্রস্তুত হইলে তিনি এক কোটি মুদ্রায় ক্রয় করিতে স্বীকার করেন। মার্টিন সাহেবের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ অট্টালিকা নির্মিত হইবার পূর্বেই নবাবের মৃত্যু হইল। মার্টিন ও অগ্নদিন মধ্যেই তাঁহাকে অহুসরণ করিলেন। তখনও মার্টিনিয়ার সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। ভবিষ্যতে কোন নবাব

ঐ বাটী স্বাধ্ব আনয়ন না করেন, এই ছেতু মাটিনের আজ্ঞা উহার নিয়তলেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। সিপাহী যুদ্ধ কালে বিদ্রোহিগণ কবর খনন কবতঃ তাঁহার অস্থি সমূহ বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়া ছিল। এই স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্ত মার্টিন কিছু সম্পত্তি ও বাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই অর্থবলে এখনও এখানে বহুসংখ্যক দরিদ্র ইউরোপীয় বালকের ভরণ পোষণ ও বিদ্যাভ্যাস হইতেছে।

মার্টিনিয়ার প্রকৃত লক্ষ্মী সত্ত্বের প্রায় এক ক্রোশ পূর্বে। এই বৃহৎ অট্টালিকা সমুদ্রতল উচ্চ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সকল তলের ছাদ গুলিই খিলানে নির্মিত। কড়ি কাঠের সম্পর্ক ও নাই। অনেক ভুলি সুপ্রস্তুত রক্ষ আছে। ঘরের ভিতর দিকেব ছাদ সরুল সুন্দর চিত্রে অঙ্কিত। শিখর দেশে নানাবিধ জন্ত ও পরী ইত্যাদির প্রতিমূর্ত্তি। সম্মুখে একটি সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণী স্থাপিত, পুষ্কিনী ও ঠিক তাহার মধ্যস্থলে একটি উচ্চ স্মরণার্থ স্তম্ভ। পূর্বে মার্টিনিয়ার দেখিতে আরও মনোরম ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ইহা বিদ্রোহীদের আবাস হওয়ায় অনেক সুন্দর কারুকার্য্য নষ্ট হইয়া যায়।

আসাফুদ্দৌলা ওয়ারেন হেস্টিংসের সম-সাময়িক ছিলেন। ইতিহাসজ্ঞ সকলেই অব-গত আছেন। কিরূপে অযোধ্যার বেগমগণ উক্ত অর্থলোলুপ গভর্নরজেনারেলের অত্যাচারে প্রাণীড়িত হইয়াছিলেন; কিরূপে ইহারই মরণাবলে ভ্রমভুলে অপরিমোদনীয় মাহুদ বিদ্বত হইয়া আসাফুদ্দৌলা বৃটিশ-

গভমেণ্টের 'ঋণ' পৰিশোধ করিয়াছিলেন ;
কিন্নপে অৰ্ণ সংগ্রহাৰ্থ বুটাস রেসিডেন্টের
সহিত ফাৰ্মাৰাবাদ নগরে গিয়া নবাব স্বীয়

মাতা ও ব্রুছা পিতামহীকে কঠোর যত্নণা
শাংগরে নিমগ্ন করিয়া ছিলেন ।

ক্রমশঃ ।

বিদুযী-বৰ্ণন ।

বি, এ দিয়া বিদ্যাবান বহু-বরে লবে,
বিবাহের কথা কয়, বয়ে,—বয়ে,—বয়ে, ।
বহু ভাব সংসাবেব বড় সমজ্জদার
'বিদ্যানে বিদুযী মিলে'— কয়ে দিল সার ॥
ব্যাচেলর ব্যাচেলর জিজ্ঞাসিল তাই,
কিকপ তাহার রূপ কহিবে আমায় ।
বহু কহে বি, এ বিদ্য শুন দিয়া মনঃ
প্রবীণ নবীন চ্ছন্দে বিদুযী বৰ্ণন ।

বেণা-বেণা বিনদিয়া বনেট ৫ ভাষ,
চুপড়ি হড়পি ফেলি, সাপুড়ে পলার ;
তাই অৰ্দ্ধ আবিষ্কৃত বিনোদ কববী,
থস্ থস্ নজ গজ হবি হরি, হরি !
যুচিল পুরাণ পাঠ 'সাপিনী তাপিনী,'
সাপুড়ে চুপড়ি ঢাকা চুল-কুণ্ডলিনী ।
জামন-কাটা মুখে সাবানের গন্ধ,
বোলতা ভিমকল উড়ে, মধু লোভে অন্ধ ;
চন্দ্রসূৰ্য্য সমভূলা সে মুখে কে করে ?
চন্দ্রসূৰ্য্য উদযাস্ত বিদুযীর করে ।

অনজ অনজ যদি অনঙ্গের বহু,
অবশ্য হইবে সেই অণু হতে অণু ;

দি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাহে বিদুযীর ভুক,
আছে কিছা নাই, এই সন্দেহত গুরু ;
অনঙ্গের তুলিকাব বেমানুম লেখা,
আছে বটে নাই যেন গণিতের রেখা

কোটবে কোটর চক্ষু পাড়িল প্রমাদ
পেচকে লইয়া কোলে কবে আৰ্ত্তনাদ ,
কাড়ি নিল পেচা গৰ্জ নখন হিলোলে
কাঁদে বে কোটর, লবে পেচকে কোলে ;
কঠোর কটাক্ষ হয় কোটব নখনে,
ঘেঁটু ফুল নড়ে যেন সাক্ষাসমীরণে ।

নাসিকার বর্ণনায় বর্ণমালা ডবে,
পঞ্চাশৎ—বর্ণ নাসা ;—শত ব্রণ ধরে ;
অচলা সচলা হলো বিজ্ঞানের দুখে,
সচলা অচলা নাসা—বিদুযীর মুখে ;
চোক ঘুরে, নাক ঘুরে, ঘুরে মুখখানি,
ঘুরে বাবুদের গুণ সে রূপ বাখানি ।

কাজ কি আছে বে হস্তীর অস্ত্রির বোতাম!
শাদা শাদা চক্ চকে হের দস্ত-দাম ;
সেই দস্ত বিকাশিরা হাসিলে রূপশী,
কুন্দ-কুন্দ-কলি পড়ে যেন খসি ।

ওঠাধবে পক্ষ বিশ্ব তুলনা কে করে ?
কত সে যে পক্ষ বিশ্ব, পাখীর ঠোকরে ;
অর্ধপক্ষ অবিকৃত বিশ্ব সে অধব,
কাবুলী আঙ্গুর যেন নখর নখব ।

গোলস্থল ফুলো ফুলো বঙ্কিত কপোল,
চালতা তুলনা তাব, ইথে নাড়ি গোল ;
কাণেব তুলনা ছিল নূতন নূতন,
কি বলিব দেখা যায় তাহা কদাচম ;
চুলে ঢাকা আছে কাণ, এই অসুমান, —
কাণ মলা না থাইয়া কে কোথা সিধান ?

তারপর দীর্ঘ গ্রীবা রাজহংসী গ্রীবা, —
সবোবর গর্ভ হ'তে তীরেতে ডাকায় ।
কি ভাবে বর্ণিব সেই বন্ধের তরঙ্গ,
'অশ্লীলতা নিবাবনী' করে রস ভঙ্গ ;
দাড়িষ, কদম্ব, কুম্ভ, ভাঙ্গু বা গম্ভুজ,
গুণ্ডী মুগ, শৈল-তুঙ্গ, কোরক, অম্বুজ ; —
উপমা নূতন কোথা ? সেও ত বিপাক,
আছে মাত্র বাকি এক ভিন্নরূপ চাক ;
বস্ত্রে আচ্ছাদিত বক্ষ—সামাল সামাল—
ভিতবেতে হলস্থল ভিন্নরূপ পাল ।

বাহতার ঢাকিয়াছে ফুল-ধবী আমা,
জানি না ক ভিতরেতে বামা কিমা আমা ;
চিকণ অঙ্গুলি তাহে কিলিবিলা করে,
সুতাহীন নলি যেন উত্তীর্ণীর ঘরে ;
হীরার অঙ্গুরী তাহে কিলিমিলি করে,
গণিতের বিন্দু সেই বৃন্তের উপরে ।

একোষ্ঠে রূপার চুড়ি বিকুর বিকুর,
দিবারাত মিটি মিটি হানিছে চিকুর ;
তার পর কণ্ঠাটা সোণার বোতামে,
ষোড়া ষোড়া যোগ করা, গড়ন বাদামে ।

পূর্ণাপর স্তম্ভচলিত ভূগোল প্রবন্ধ,
মেদিনীব মধ্যস্থলে গ্রীষ্ম কটি-বন্ধ ;
যুচেছে পুবাণ পাঠ বিদ্যবী-সদ্বন্ধে
এখানে মেদিনী ঝুলে কীর্ণ কটি-বন্ধে ।
মেদিনী জানিহু কিসে, বসনের ভার—
অশন বসন ছাড়া মেদিনী কি আর ?

চৌড়া কালাপেড়ে সাজী গুটাবে গুটারে
চূড়ান্ত বাগুরা হয় ঘাঘরা বানায়ে ;
কাঁচ-কড়া কাঁচ মালা চৌদিকে তাহার,
হালি সভ্যতার সেই চাকচক্যহার ;
সেই ফাঁদ, সেই বাঁধ, সেই কাঁটি ঘিরে,
যখন বিদ্যবী বার জলাশয় তীরে,
মনে হয় আলিযানী যায় কুতূহলে,
কপলা ফেলিবে যুষ্টি সোধাগের জলে ।
ইথে বন্ধ না ভাবিবে কিছু ভাল মন্দ,
বিদ্যবী বর্ণনে ভাই না কবিহ সন্দ ;
সুদীর্ঘ চলন তার, সুরুচি আদৃত,
সুচক্র চরণ তাব পাত্ৰকা আবৃত ।
পথ হুলা পরিকায়ে ঘাঘরা অঞ্চলে,
পাত্ৰকা দ্রবিত পাবে বড় পুণ্য ফলে ;
বিলাতী বারিগ জুতা বগলসে আঁটা,
তেল কুচ-কুচে গাটা(তাব)নীচে আছে কাঁটা ।

বিজ্ঞান শিখেছ ভাই ! বিজ্ঞা আছে ঘটে,
সে জুতা খুলাতে পার তবে জানি বটে ;
শ্বেত মোজা সমাবৃত সেই কুঙ্গর পায় ।
ধরিলে, বিজ্ঞানে বিজ্ঞা বড় শোভা পায় ।
বোধ-হীনা, 'বোধোদয়'-পাঠিকা বলিকা
বিজ্ঞানে বিবাহ করা—কঠোর তালিকা ;
বিদ্যবী সঙ্গিনী হলে যুচিবেক ব্যাধা,
পুংবিধান, শ্রী বিদ্যবী—ব্যাকরণ কথা ।

রঙ্গপুর । শ্রীবিদ্যবীলাস সমুদ্রস্রাব ।

শৈলজা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সরোবরে ।

“কাল আর আসে না” “পোড়া কাল সকাল আর হয় না” । সুবাবা একবার বিছানায় শুইতেছে আবার কিৎক্ষণ পরেই বিছানা হইতে উঠিয়া ছাদে গিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কতক্ষণে তাবা ওলা সব ডুইয়া যাইবে ও এক একবার বলিতেছে— “কাল আর আসে না—কাল সকাল আর হয় না” । সুবাবা বড় ব্যস্ত হইল আবার বিছানা হইতে উঠিয়া ছাদে আসিল । সুবাবা দিগেব বাড়ীর উপরে তিনটা ঘর, পূর্ব পশ্চিমে দরজা জানলা পূর্বদিকে ছাদ । সেই ছাদে উঠিয়া সুবাবা দেখিল যেন একটু অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে কিন্তু তাবা ওলা এখনও আকাশে বহিয়াছে । সুবাবা ভাবিল তাবা ওলা আর নিভিবে না—ভোর হইয়াছে কাকগুলো কিছু বেগী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে । সুবাবা গৃহ হইতে বাহির হইল ক্রমে সদর দরজায় আসিয়া দরজা খুলিল, কুকুরগুলো ছুটা ছুট করিতেছে, পথে জন মানব কেহ নাই । বাড়ীর নিকটে একটা বড় জঙ্গল ছিল; জঙ্গলের ভিতর সুবাবা যেন দেখিল লম্বা লম্বা কাল কাল গোটাকতক মাছ যেন কি করিতেছে । সুবাবা আর অধিক দাঁড়িতে

পাবিল না । এক দৌড়ে আবার শয়ন গৃহে উপর আবার বিছানায় গিয়া শয়ন করিল । “নি” সুবাবা প্রতিজ্ঞা করিল কাক না ডাকিলে সে উঠিবে না—আবার ভাবিল কাক যদি না ডাকে । কোকিল ডাকিবে—বসন্ত কালে কোকিল অবশ্যই ডাকিবে । কোকিল ডাকিলে সে উঠিবে । কই কোকিল ত ডাকিল না—কাক ত ডাকিল না । সুবাবা রাগ করিয়া চক্ষু বুজাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল । কতক্ষণ পবে কোকিল ডাকিল । কাক ডাকিল; সুবাবা বলিল এতক্ষণে বাব হল—ভোর কোথায়—ডাকিবার পূর্বেই সকাল ত হইয়া পড়িয়াছে । আবার দেখি গে নৌবি উঠেছে কিনা ?—এই বলিয়া সুবাবা বাটা হইতে বাহির হইল, সে এবার আর বনেব দিকে চাহিল না । কুকুরগুলো ও আর পথে নাই । একেবারে নীরবালাদের বাড়ী দরজাব উপস্থিত ।

নীরবালাও পা টিপিয়া টিপিয়া চুপি চুপি বাটার বাহির হইয়া সদর দরজা খুলিল, খুলিয়া দেখিল সুবাবা, নীরবালা সুবাবা লাকে জিজ্ঞাসা করিল কাল বাত্রে কি ঘুমাও নাই ।

সু । “ভাল ঘুম হয় নাই বটে” ।

“তোদের বাড়ীর কি সকলে উঠেছে” ।

নী । “উঠলে কি অন্তরে আমাকে

বাইতে দিত। “আমি চুপি চুপি কাহাকে ও না বলিয়া আসিযাছি”।

সু। “আব যদি তোব মা সকালে উঠিয়া খুঁজে” ?

নী। “না তা বোধ হয় খুঁজিবেন না মনে কবিবেন ‘আমি তোমাদের বাড়ী গিয়াছি’”।

সু। “আমার ভাই মনটা আজ কেমন কচে, মনে হচ্ছে যেন কি একটা বিপদ ঘটিয়াছে—আর জানিস্ আসিবার সময় ও অনেকে রাধা পড়েছিল। কেন যে এরূপ হচ্ছে কি যে ঘটবে তা হবিই জানেন”।

নী। কি আর হবে ভাই?—ভাবনা হইবাবত কিছু কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

এইরূপ দুইজনে কথোপকথন করিতে করিতে যোগেশদেব বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। যোগেশদেব বাড়ী ভবেন ও জুটিয়াছিল। যোগেশ তাহার গুরু মহাশয়কে বলিতে ছিল সে আজ পড়িবে না। কেন পড়িবে না এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন এমন সময় সুবালা নীরবালকে দেখিতে পাইলেন। সুবালার হাতে একটা মস্ত পোটলা; পোটলাটা দেখিয়া গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসা করিল “উহাতে মা কি আছে”? সুবালা বলিল “চাল ডাল লবণ ইত্যাদি।”

সু। “চাল ডাল আবার লইয়া কি হইবে”?

সুবালাকে আর এ প্রশ্নের উত্তর করিতে হইল না। যোগেশ আহ্লাদে বলিয়া উঠিল “আজ আমাদের চড়ুই ভাতি” তাই আজ পড়িবে না। গুরুমহাশয় আর কোন কথা বলিলেন না—তিনি বুখ হাত পা

ধুইতে চলিয়া গেলেন। উহার। সকলেও বাড়ীর বাহির হইলেন। সুবালা যোগেশকে শৈলজাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। যোগেশ শৈলজার উদ্দেশে চলিল। সুবালা নীরবালা ও ভবেন, পদ্মপুকুরে বা মাজের গাঁর বনে চলিল।

সকাল হইয়াছে। পাখীর কুঞ্জে মাজের গাঁব বন কুজিত। বন ফুলের সৌবভে বন আমোদিত। ক্রমে একটু একটু করিয়া বেলা হইতে লাগিল পুষ্করীর পদ্ম ফুলগুলি একটু একটু করিয়া ফুটিতে লাগিল। পাখী-গুলিও এক এক করিয়া কুলার বাহির হইল। পল্লীর কুলবধূরাও এক এক করিয়া সেই সবোবরে আসিতে লাগিল—চলিয়া বাঁাব সময় সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া ফানি লাগিল “হাঁ গা! আজ তোমাদের কি? যোগেশ, কখন ভবেন, কখন শৈলজা উত্তর দিতে লাগিল “আজ আমাদের চড়ুই ভাতি”।

পাখীর কলবব ধামিযাছে। মাছুবেব কলরব বাড়িয়াছে। কুমারপাড়ার কুমারেরা হাঁড়ি গড়িতেছে—কেহ কলসী গড়িতেছে—কেহ কেহ কাদা চটকাইতেছে; তাহাদিগেব এপাশ ওপাশে কুমারের ছেলে মেয়েরা ধামি করিয়া জলপান খাইতেছে—কেহ “আমি অতকটি লইব না” বলিয়া কাঁদিতেছে—কেহ এখন জলপান পায় নাই বলিয়া কাঁদিতেছে। কেবল একটা বোড়শী রূপসী বালা একজন কুমারের উঠানে দাঁড়াইয়া একজন কুমারের নিকট কি চাহিতেছে—বলিতেছে—“ওরে! তোরা কেউ আমার হুটা হাঁড়ি দিতে পারিস্” কুমার বলিল “হাঁড়ি

লইয়া কি হইবে মা" ? ছেলেরা সকলে আত্মদে বলিয়া উঠিল "ওরে, সুরী দিদি এসেছে রে"। এ ঘরের সে ঘরের ছেলেবা সব আসিয়া বলিতে লাগিল "সুরী দিদি এসেছে রে" ; ক্রমে ক্রমে সুরবালার চারিদিকে ছেলে মেয়ে ছাঁকিয়া গেল। সুরবালা কুমারকে বলিল আজ "আমাদের চড়ুই ভাতি"—ছেলারা সব বলিয়া উঠিল "ওরে চড়ুই ভাতি" তাহার মধ্যে একজন ছেলে বলিয়া উঠিল "সুরী দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাব?" অমনি একে একে সব ছেলে বলিয়া উঠিল "আমিও তোমার সঙ্গে যাব"। সুরবালা হাঁড়ি দুইটা লইয়া চলিয়া আসিল। ছেলেবা ও তার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। কেহ মুড়ি খাইতে খাইতে—কেহ সুধামি লইয়া—কেহ ফল খাইয়া—সুরবালার সহিত চলিল। কেবল সুরবালা বলিল "দৌড়ে দৌড়ে আসিস্ না পড়ে যাবি। সব আস্তে আস্তে চল।"

বন কলরব শুন্য। পাখীগুলি সব আশ্রয় অন্বেষণে উড়িয়া গিয়াছে। আর কে কলরব করিবে—সুরবালা আসিয়া সে টুকু পুখাইয়া দিল। নীরবালা ইটের উত্তন করিতেছিল। যোগেশ ও ভবেন কাঠের জন্য গিয়াছিল—বনে আর কে গোলমাল করিবে—সুরবালার সঙ্গিরা সে টুকু পুখাইয়া দিল। সে বনে মহাধুম পড়িয়া গেল। সুরবালার লোকের ভাবনা নাই। তাহার লোক বল যথেষ্ট। অল্পকণ মধ্যেই সমস্ত জিনিষই আহরণ হইল। দাল চড়িল—দাল সিক হইতে লাগিল। ভাত চড়িল—ভাত ফুটিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দাল

খোল চড়চড়ি ভাত প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তুত। পাত নাই। সুরবালা নীরবালাকে বলিল "নীর পোড়ারমুখি পাত আনিতে তুলিয়া গিয়াচিস্"। নীরবালা বলিল "তুমি ত ভাই আমাৰ কিছু বল নাই। সুরবালা—
"তা বেশ! এখন উপায়।"

নী—"পুকুরে ঢেঁপ পাতা আছে"।

নী—"ঠিক বলেছিস্—ঠিক বলেছিস্।"

এই কথা সুরবালা না বলিতে না পারিতে বালকেবা সকলে ছুটিল। যোগেশ ভবেন ও শৈলজা ও ছুটিল। নীরবালা মনে মনে ভাবিল 'ছেলেগুলো কি ডুবিয়া মরিবে না কি? সুরবালার একটু বুদ্ধি শ্রদ্ধি নাই এই ভাবিয়া সে ও তাহাদিগের পিছু পিছু হাইল।

পদ্মকুল ফুটিয়া পুকুর আলোকিত হইয়া বহিয়াছে। ফুলগুলি দেখিয়া শৈলজার হৃদয় আত্মদে নাচিতে লাগিল। যোগেশ ও ভবেন পাতার জন্য পুকুরে নামিল। শৈলজা একটু ফুল তুলিবে বলিয়া নামিল। ফুল ঘাট হইতে অনেক দূরে ফুটিয়া রহিয়াছে। শৈলজা গলা পর্যন্ত জলে নামিয়া তাহার অসাধ্য বিবেচনা হইল—সে কেবল ফুলের দিকে স্তব্ধ নয়নে চাহিয়া বহিল। যোগেশ তাহা দেখিল—দেখিয়া বলিল

"শৈলজা! তুমি ফুল নেবে?"

শৈলজা চুপ করিয়া রহিল। ভবেন বলিল "আমি দিতেছি"। যোগেশ ও বলিল "আমি দিতেছি"।

দুই জনে ফুলের জন্য স্তব্ধ দিতে লাগিল, ভবেন পেছিয়া পড়িল; যোগেশ আগে ফুলের নিকট পহঁছিল। ফুলের ডাটা

ধবিয়া টানিয়া লইয়া আসিতে লাগিল। অপব অপব ছেলেবা “আমি একটা নোবো”—“আমি একটা নোবো” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভবেন অপ্রতিভ হইয়া ঘাটের এ দিক ও দিক সঁতার কাটিতে লাগিল। ক্রমে ফুল গুলি ঘাটের নিকটে আসিয়া পড়িল। শৈলজা গলাজলে দাঁড়াইয়া ছিল—আত্মাকে ফুল ধরিতে গেল সেখানে জল অনেক শৈলজা হু এক চোক জল খাইয়া অবশেষে ভুবিয়া গেল।

নীরবালা আসিয়া দেখিল শৈলজা তাহার ডুব জলে গিয়া পড়িয়াছে, তবে চীৎকার কবিয়া বলিয়া উঠিল—“ভুবিল”—“ভুবিল” যোগেশ দেখিল—শৈলজা ভুবিতেছে সে অমনি তাহাকে ধবিত্তে যাইল—ধবিত্তে যাইতে যাইতে সে একেবারে ভুবিয়া গেল। যোগেশ ও ডুব মারিল, ভুবিয়া শৈলজার হাত ধবিয়া টানিয়া তুলিল। শৈলজা যোগেশকে জড়াইয়া ধরিল—এবার হুই জনেই ভুবিল, ভবেন আস্তে আস্তে উঠিয়া বাড়ী পলাইয়া গেল। অপর অপর ছেলে-রাও “ভুবে গেল”—“ভুবে গেল”—বলিয়া ভবেনেব পিছু পিছু ছুটিল। নীরবালা অতদূর দেখে নাই; সে শৈলজারে ভুবিতে দেখিয়াই লোকের জন্য দৌড়িল। লোক আর কোথাও পাইল না। সুরবালা “কি হয়েছে”—“কি হয়েছে”—করিয়া নীরবালার নিকট ছুটিয়া আসিল। নীরবালা বলিল “কি হইবে আর সর্বনাশ হইয়াছে—শৈলজা ভুবে গিয়েছে” সুরবালা “কি হবে এখন” বলিয়া চীৎকার করিয়া কাদিতে

লাগিল, শেষ মাথার হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। অন্য সময় পুকুরে কত লোক জল তুলিতে আসে—এ সময়ে আর কেহ আসিতেছে না। নীরবালা এ ধাব ও ধার কাবিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল—লোক আর পাইল না। শেষ আপনি কোমরে কাপড় বাঁধিল, বাঁধিয়া শৈলজাকে তুলিতে ছুটিল আর লোকের অপেক্ষা করিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বিপদ হইতে উদ্ধার ।

“যেমন বিছানা তেমনি বহিয়াছে—এখনও তোলা হয় নি। ঘর খাঁটও হয় নি বাসিপাট কিছুই সাবা হয় নাই—নীরী কোথায় গেল” ?—এই বলিতে বলিতে নীরবালার ‘ম’ নীরবালাকে এ ঘর সে ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। শেষ “ও নীবি। ও নীরি” বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। নীরবালা কোথায়? উহার কথার কে উত্তর দিবে?—শেষ ভাবিলেন “আর কিছুই নয়—সে নিশ্চয়ই সুরবালাদের বাড়ী গিয়াছে”। মনে মনে বড়ই চটিলেন ও বলিলেন—“অত বড় মাগীর কি এখনও ‘টো’ ‘টো’ করিয়া বেড়ান ভাল দেখায়?”—“হতভাগী আমুক আগে”—“তারপর যা করো তা আমার মনেই আছে”। ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল—নীরবালা তবুও ফিরিল না—রাগও বাড়িতে লাগিল। ক্রমে কৰ্ত্তা বাড়ী আসিলেন। কৰ্ত্তা ভত রাগ করিলেন না, কেবল ক্রিকে সুরবালার বাড়ী হইতে নীরবালাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বি আসিল। “নীর-

বালা ও সুরবালা দুইজনে কোথায় গিয়াছে” বলিল। “সুবাবালাব মা ও ঠাকুর মা কত রাগ করিতেছেন” তাহা ও বলিল। নীরবালার পিতা কি করিবেন শয়ংই নীরবাব উদ্দেশে চলিলেন। অধিকদূর আর বড় যাইতে হইল না। পথিমধ্যেই শুনিলেন “পদ্ম পুকুরে কাদের ছেলে ডুবিয়া গিয়াছে সেখানে নাকি নীববালা ও সুরবালা আছে। কুমার পাড়াব ছেলেরা ঢাক বাজাইয়াছে। কথা শীঘ্রই বাট্রে হইয়া পড়িল। তিনি ছুটিলেন।

মাঝেরগাঁব বনে শীঘ্রই পহুছিলেন। ক্রমে পুকুরে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দেখিলেন—সুবাবালা গালে হাত দিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। নীরবালা কোমরে কাপড় বাঁধিয়া জলে বস্মপ্রদান করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তিনি নীববালার তখনকার রূপ দেখিয়া চমকিত হইলেন। তাহার মনে হইল যেন বনদেবী ছেলেটিকে জল হইতে তুলিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। সেই আলুলাষিত কেশ—সেই মির্ভাকতা—বদনে সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্কেত সূচক বেথা—সেই রক্তিম রাগ তিনি পূর্বে কখনই দেখেন নাই—প্রাণ ভবিষ্য সেই ছবি দেখিতে লাগিলেন। নীরবালা জলে কাঁপ দিল। নীরবালার পিতার তখন জ্ঞান হইল—তিনি “নীরবালা” বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। নীববালা তাহা শুনিতে পাইল না—নীববালা তখন জলে কাঁপ দিয়াছে। তিনিও তাহার সহিত জলে পড়িলেন। নীরবালার জ্ঞান নাই—যেখানে শৈলজা ডুবিয়াছিল সেই খানে নীরবালা

ডুব দিল—কিন্তু শৈলজাকে খুঁজিয়া পাইল না—কাহাকেও পাইল না—উঠিল। আর একটু দূরে গিয়া খুঁজিবে মনে করিল—আর একটু দূরে যাইল। যাইতে যাইতে দেখিল যেন শৈলজা ও যোগেশ ভাসিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পিতাকে দখিল। যোগেশ ডুবিয়াছিল সে তাহা জানিত না। তাহাদিগকে তুলিতে দেখিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইল। নীববালার পিতা তাহাদিগকে ঘাটে তুলিল। সুবাবালা তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া তাড়া-তাড়ি দেখিতে আসিল—আসিয়া আবাব বিমর্ষ হইল। নীরবালার চক্ষু আবাব ছল ছল করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে দুই এক জন কবিয়া ঘাটে বহু জনতা হইয়া পড়িল। লোকের সাহা-য্যের আর ভাবনা বহিল না। নীববালার পিতা যোগেশকে ও যোগেশের গুরুমহাশয় শৈলজাকে মাথায় কবিয়া ঘুবাইতে লাগিল। শৈলজা যাহা জল খাইয়াছিল তাহা বাহিব হইয়া গেল। ক্রমে সে চক্ষু খুলিল—ক্রমে বসিল; কিন্তু যোগেশ সেইরূপ অজ্ঞান—সেইরূপ অচেতন এখনও রহিয়াছে—অনেকক্ষণ পরেই একটু নিশ্বাস পড়িতে লাগিল—অনেকক্ষণ পর একটু চক্ষু খুলিল—আবার চক্ষু মুদিল। এইরূপ অবস্থায় যোগেশকে বাড়ী লইয়া যাওয়া হইল। শৈলজার বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। সে ঠাট্টা বাড়ী যাইতে পাবিল। সকলেই চলিয়া গেল—কেবল যাইবার সময় বলিতে লাগিল “বোধহয় যোগেশ বাঁচিবে না”। অল্পক্ষণ মধ্যেই মাঝেরগাঁব বন জনশূন্য হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

পুলিস ।

একটি আশী বৎসরের বৃদ্ধা লাঠি ধরিয়া
ঠুক ঠুক কবিয়া উক্ত গ্রামের ভিতর দিয়া
যাইতেছে, গরিব ভাবিতেছে কিরূপ কবিয়া
সে অচকার দিন গুজবাণ করিবে । ঘরে
তাব কিছুই নাই । পরিবাবের মধ্যে তাব
তিনটি বিধবা কন্যা ও চাবি বৎসরের একটি
দৌহিত্র । এক সন্ধ্যা কেহই আহার করে
নাই—আজও ভাবিতেছে কিরূপ করিয়া
দিন কাটিয়া যাইবে । এই ভাবিতে
ভাবিতে তাহাব এক বন্ধুর নিকট কিছু
টাকা পাইত—তাহাব জন্ত যাইতে ছিল ।
পিছু হইতে কে তাহাকে ডাকিল “এই বৃদ্ধা
এই বৃদ্ধা”—বৃদ্ধা তাহা শুনিতে পাইল না
আপন “মনেই ঠুক ঠুক কবিয়া যাইতে
লাগিল । একজন কাল ষণ্ডা লাল পাগড়ি
ওয়ালা মাহুষ আসিয়া তাহাব লাঠি গাছটি
ধবিল । বৃদ্ধা অমনি পড়িয়া গেল । বৃদ্ধকে
জিজ্ঞাসা করিল, “পুকুবে আজ সকালে কজন
ডুবে মবেচে ?” বৃদ্ধা নিরুত্তর । সে পড়িয়া
গিয়াছে—তাহার হাঁটুতে যথেষ্ট আঘাত
লাগিয়াছে—হাঁটু দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল
সে নির্ভীক । আর একজন চৌকিদার
তাহাব পিছু ছিল । সে আসিয়া ক্রমে
পহুছিল । তাহাব জুড়িদারকে বলিল
“বামা ! শালাকে খবরদার ছাড়িস্ নে ।
এ শালা সব জানে—শালা ভারি বদমায়েস্”—
এই বলিয়া লাঠিব একটি গুঁতা দিল ।
বৃদ্ধ বলিল “দোহাই বাবা আমি কিছুই
জানি নে ।”

বামা—“শালা তুমি সব জান” এই
বলিয়া লাঠিব আব এক গুঁতা মাঝিল ।

বৃদ্ধ গোঁয়াইতে গোঁয়াইতে ভূমিতলে
শুইয়া পড়িল ।

অপর—“বদমায়েসি ছাড় বাবা—বৃদ্ধা
হইয়াত তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকি-
যাছে—এখনও বাবা ও বদমায়েসি ছাড়নি”
বলিয়া আব এক গুঁতা । বৃদ্ধ পঞ্চাশ
পাইল ।

রামা তাহার জুড়িদারকে সন্দোধান
করিয়া বলিল “খালার যে চোক বুজ্জো”

জুড়ি—“চোক বোজালে আর চোক
বুজ্জবে না”—বাবা ও হলো সে কালের
বদমায়েসের জাম্ব “এত দিন পুলিসে কাজ
কচো এটাও বুজ্জতে পারেনা” । এই
বলিয়া আর এক লাটির গুঁতা দিয়া বলিল
“শাচী গুট” । আর কে উঠিবে ? বৃদ্ধ চিব-
কালের জন্য চক্ষু মুদিয়াছে । রামার বড়
সন্দেহ হইল । বামা বৃদ্ধের নাকে হাত দিয়া
দেখিল—নিশ্বাস পড়িতেছে না । জুড়িদার
কে বলিল “ওরে লালু বোধ হয় শালা বা
অক্সা পেলো” । লালুর তাহা বিশ্বাস হইল
না । লালু একবার নাক টিপিয়া ধরে—
আবার ছাড়িয়া দেয় ; এইরূপ অনেক
পরীক্ষার পর স্থির হইল সত্যই মরিয়া
গিয়াছে । তখন লালু বলিল “বাহা হউক
শালা মধ্যে বড় সুখী ছিল—হু এক ঘা লাটির
গুঁতাব পটল ফুলিল—পূর্বজন্মে অনেক
পুণ্য করিয়াছিল—অধিক কষ্ট পাইয়া মরিতে
হইল না” রামা কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িল—
বলিল এখন উপায় ?

লালু—“উপায় পদ্মপুত্র—” আর—

উপায় হুই এক পয়সা হইতেছিল এখন কিছু টাকা হটল—সকলেবি পেট ভরিবে” ।

এই বলিয়া হুইজনে বৃদ্ধকে ধবা ধরি করিয়া লইয়া গিয়া পদ্মপুকুরে ভাসাইয়া দিয়া আসিল ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

যোগেশের পীড়া ।

যোগেশের গুরুমহাশয় যোগেশকে বাড়ী আনিল । যোগেশ তখনও অজ্ঞান । বাড়ীতে আনিবামাত্রই কান্না পড়িয়া গেল । কিবৎ-কণ পরে যোগেশ আবার চক্ষু চাহিল । গাত্র দিয়া কুল কুল করিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল । পাখা অনবরত চলিতে লাগিল । কান্না থামিল । ক্রমে ক্রমে ক্ষীণস্বরে শ্বাস ও কহিতে পারিল । বড় কাহিল—বিছানার উপরে উঠিয়া বসিতে পারিল না । ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল । যোগেশের ভ্রাতৃদ্বয় । আবার কথা কহিতে পারিল না । আবার চক্ষু মুদিল আবার কান্না পড়িয়া গেল ।

কবিরাজ আসিলেন । খানাকুল কৃষ্ণনগরে তখন অনেক ঘর কবিরাজের বাস ছিল । কবিরাজ হাত টিপিয়া অনেকক্ষণ পর বলিলেন “নাড়ী বড়ই প্রবলা” । ক্রমে পা হিম হইয়া আসিতে লাগিল । গাত্রও ভয়ানক ঠাণ্ডা হইয়া আসিল । কবিরাজ মহাশয় কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিতে বলিলেন । যোগেশের পিতা তখন কলিকাতায় ছিলেন । যথা সময়ে টেলিগ্রাফ পহঁছিল । যোগেশের পিতা শীঘ্রই গুড্ডি ডাক্তারের কাছে গিয়া টেলিগ্রাফ

দেখাইলেন । গুড্ডি ও যোগেশের পিতা শীঘ্রই খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া পহঁছিলেন ।

রাত্রি একটা । পরীতে মহা গোলযোগ পুলিশ চাবিদিকে তদন্ত করিয়া বেড়াইতেছে কে খুন করিল—খুন করিয়া ‘লাস’কে পুকুরে ভাসাইল । পুলিশ মাজিষ্ট্রেট ইহাই তদারক করিতেছেন । ইনস্পেক্টর লালু পরামর্শী-হুসারে বলিলেন “বেলা নয়টাব সময় গোটা হুই ছেলে ডুবিয়া ছিল—তল্লাসিতে জানিয়াছি তাহাদিগকে তোলা হইয়াছে ।

মাজি—“কাদের ছেলে” ?

ইন্—“বন্দুদেব” ।

মাজি—“বাঁচিয়াছে কি” ?

ইন্—“একজন বাঁচিয়াছে” আর একজনের খবর এপর্যন্ত কিছুই পাই নাই ।”

মাজি—“শীঘ্রই তাহার বিষয় আমায় বিপোর্ট দিবে” । “আব কে খুন করিল এ বিষয় তদারক কর” —“তদারকেব ফল আমাকে শীঘ্রই জানাইবে” ?—এই বলিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মহাশয় ঘোড়ার উপর লক্ষ প্রদান করিলেন । ঘোড়া তীরবৎ ছুটিল ।

ইনস্পেক্টর মহাশয় খুবগোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিলেন । একে ধবেন তাকে ধরেন পরিশেষে যোগেশের পিতাকে ধরিলেন । যোগেশের পিতা তখন গুড্ডিভের সহিত ব্যস্ত হইয়া আসিতে ছিলেন । ইনস্পেক্টর মহাশয় বাবুর সহিত সায়েব ডাক্তার আসিতে দেখিয়া তাহার বুক দশ হাত হইল । জলময় বালকাটির জন্য যে লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন ।]

শেষ দ্বিজ্ঞাসা কবিলেন “আপনাদের ছেলেটি কেমন আছে” ? এ কথার উত্তর তিনি ভাল দিতে পারিলেন না। তিনি টেলিগ্রাফ মাত্র পাইয়াছেন। পীড়া কঠিন এই মাত্র জানেন ইহাব অধিক আর কিছুই জানেন না।

ইনু—“আপনি কি জানেন না! আপনার বাড়ীর একটি ছেলে যে অলে ডুবে পিষে ছিল—ও বিষয়ে আমাদের মার্জিষ্ট্রেট মহাশয় এই কতক্ষণ রিপোর্ট করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

যো, পি,—” না তা আমি জানিনা— আমি এইমাত্র আসিতেছি—এই কথা বলিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া সাহেবকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

ইনস্পেক্টর মহাশয় লালুকে দ্বিজ্ঞাসা করিল “বোধ হয় কি?—কাংলা”?

লালু।—“এর আর সম্ভেদ নাই—সঙ্গে সাহেব ডাক্তার।

রাত্র তিনটা। সাহেব ডাক্তার যোগেশের হাট পরীক্ষা করিতেছেন। হাটে কিছু পাইলেন না। তার পর মাথাটা পরীক্ষা করিলেন তাহাতেও কোন আঘাতের চিহ্ন পাইলেন না। শেষে বলিলেন ক্ষয় নাই খালি অর হইয়াছে দিন কতক ভুগিবে। ডাক্তার প্রেসক্রিপ্শন করিতে লাগিলেন।

যোগেশের পিতাকে বাহিরে কে ডাকিতেছে। তিনি বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সেই মূর্তি সেই ইনস্পেক্টর আর লালু চৌকিদার। তিনি বলিলেন “আমাকে ডাকিতেছেন”।

ইনু।—“আজ্ঞা হ্যা! কি বলিয়া রিপোর্টটা করিব বলুন দেখি?” পুলিশ

ন্যাকড়ার আঙুন, তাত জানেন ?।

যো, পি—আজ্ঞা হ্যা! এই বলিয়া যোগেশের পিতা আর অধিক কথা কিছু না বলিয়া বাড়ীর ভিতর যাইলেন। ক্যাসবার খুলিলেন—কি লইলেন—লইয়া বাহিরে আসিলেন। ইনস্পেক্টর মহাশয়ের হাতের ভিতর চুপি চুপি কি দিলেন।

ইন—“রাধামাধব” “রাধা মাধব” ও সব নম ও সব নম”। জানেন পদ্ম পুত্রে একটা লাস ভাসিতেছে”।

যোগেশের পিতা এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি সবে মাত্র কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। তিনি বিস্মিত ভাবে দ্বিজ্ঞাসা করিলেন “কই তাত কিছু জানি না” কাদের লাস।

লালু।—“এখন ও রিপোর্ট করা কিছু হয় না, ই।

যো, পি। “তাহাতে হইয়াছে কি ?

লালু।—“না এমন কিছু নয়” এই বলিয়া দুইজনে হাসিয়া উঠিল। যোগেশের পিতা এইবার বুঝিতে পারিল। মনে মনে ভাবিল পুলিশ ন্যাকড়ার আঙুন আবার বাড়ীর ভিতর যাইলেন। আবার ফিরিয়া আসিয়া ইনস্পেক্টর মহাশয়ের হাত ধানি লইলেন। এবার সে সঙ্কট হইল। তাহারা দুই জনেই চলিয়া গেল। যাইবার সময় লালু ইনস্পেক্টর মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আর এক জায়গার চার করা হইয়াছে” দেখিলে হয় না ?

ইনু—“কতি কি ? “তুমি যাও আমি এখানে অপেক্ষা করিতেছি”।

লালু চলিয়া গেল। একেবারে শৈল-

আদেব বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। শৈল-জার পিতাকে সঙ্গেবে ডাকিতে লাগিল। শৈলজার পিতা আগিয়া ছিলেন। সে বাত্রে সকলকে প্রায় আগিয়া থাকিতে হইয়াছিল। শৈলজার পিতা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। পরিশেষে আর থাকিতে না করিয়া বিরক্ত ভাবে বলিলেন “কেন” “আমাকে আবার কেন”?

লালু—“একবার বেরিবে আসুন”।

শৈ, পি—‘যাইবার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না’ যাহা বলিবার ওই খান হইতেই বল।

লালু। “পুকুরে লাল ভাসাইল কে?”

শৈ, পি—‘তোমরা। শৈলজার পিতার পুলিশের উপর চিবকালই বড় বাগ ছিল।

লালু। “ভিন্নকলের চাকে বাসু করিয়া ভিন্নকল ঘাঁটান” “আচ্ছা থাক” এই বুলিয়া শাসাইয়া চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

তাহার পর চাবিদিন গত হইয়া গিয়াছে। সুরবালা আপন মনে বসিয়া কি ভাবিতেছে তাহার আর বাড়ী হইতে বাহির হইবার যোনাই। তাহার বোমা আর তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইতে দিখেন না—তাহাতে আবার পুলিশের ভয়। তাহার অন্যই এক প্রকার শৈলজা ও যোগেশ ভূবিয়া ছিল বলিতে হইবে। পুলিশ ত তাহাকে ধরিতেই। যদি যোগেশের কিছু ভাল মন্দ হয় তাহা হইলেই ত সর্বনাশ” এ কথা সুরবালাব

ঠাকুর মা প্রায়ই বলিত। যোগেশের পীড়া সেই কপটে বহিয়াছে। কখন জ্ঞান হইতেছে কখন অজ্ঞানে অঘোবে অচেতন্ত পড়িয়া আছে। কবিরাজেরা বড় সুবিধা ভাবিতেছে না। সাহেব ডাক্তারের ঔষধে কিছুই উপকার দর্শায় নাই।

“সুরবালা আপন শয়ন গৃহে বসিয়া কি ভাবিতেছে” কখন কখন চক্ষু দিয়া এক ফোঁটা জল ও পড়িতেছে আর বলিতেছে “হরি বন্ধা কর—হে মা কালি এ বিপদ হইতে বন্ধা কর তোমায় যোড়া পাঁটা দিব। হে মা সিদ্ধেশ্বরী যোগেশের পীড়া ভাল করিয়া দাও সন্দেশ চিনিব পূজা দিব। হে মা ষষ্টি যোগেশকে বাঁচাও মা তুমি না বাঁচাইলে তাহাকে আর কে বাঁচাইবে? আমি তোমার যথাসাধ্য পূজা দিব”। সুরবালা এবার কাঁদিয়া ফেলিল। সুরবালাব ঠাকুরমা আসিয়া সুরবালাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল কাঁদচিস্ কেন বোন্? ভয় কি কেন? গুরু তাকে বন্ধা কর্ছেন—এ সব তাঁব হাত। যাহা হউক এখন তুই বড় হয়েছিস্ এখন আর ও রকম কবিয়া টো টো কবিয়া বেড়াই নি। যোগেশের ভাল মন্দ—আহা হরি যেন না কবেন আমাদের ভাল মন্দ। এমন কান্ডও কবে বোন্। এখন সে সব কথা যাক্ যা হবার তাত হয়ে গেছে এখন যোগেশের আজকের খবর বলতে পারিস্।

সুর।—“না।”

ঠা, মা,। ‘তবে একবার দেখে আসি।’ এই বলিয়া বুড়ী রামতনু মিত্রের বাড়ী চলিলেন।

রামতনু মিত্রের বাড়ী ছই দিন হাঁড়ি

চড়ে নাই। আজিও সেইকপ। যোগেশ
‘এখন তখন ঘাঘ ঘাঘ’ হইয়া রহিয়াছে।
বুড়ী বাড়ীর ভিতর ঝাইবা মাত্রই কান্নাব
বোল উঠিল। বুড়ী বলিল ‘মা কাঁদিলে
আব কি হইবে হবি যা কবিবার তা তিনি
কবিবেন’। ‘তিনি ভালই কবিয়া থাকেন’।
‘তাঁর লীলা বুঝে কে মা’—এই বলিয়া বুড়ী
যে ঘবে যোগেশ আছে সেই ঘরে আর
অধিক কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।
তাঁহার পিছু পিছু যোগেশের ‘মা’ ও যোগে-
শের ভগ্ন ও আসিল। বুড়ী দেখিল যোগেশ
অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পায়ে
ভাত দিয়া দেখিলেন পা ঠাণ্ডা। হাঁটুর উপর
পর্য্যন্ত দেখিলেন তাহা ঠাণ্ডা। বুড়ী চক্ষু
হইতে এবার একফোঁটা জল পড়িল। যোগে-
শের মাতা ও ভগ্নী চীৎকার করিয়া উঠি-
লেন। বুড়ী আপনি একটু সামলাইয়া
“মা আমি বলিয়াছি এ সঙ্গ হবিব ইচ্ছা—
তবে মা আমবা কাঁদি কেন?”—“প্রাণ যে
বোকে না মা” এই কথা বলিয়া যোগেশের
মা আবো চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।
যোগেশের পিতা বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া
আসিলেন। ভাঁহর, বন্ধুবর্গ পাড়াব প্রতি-
বাসিবাও ছুটিয়া আসিল। কান্নার ভয়ানক
রোল উঠিল।

বুড়ীর চক্ষু হইতে হু এক ফোঁটা জল
পড়িতেছে। তিনি কিছুতেই চাপিতে পারিতে-
ছেন না। চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে;
আর হির হইয়া নাকে হাত দিয়া পরীক্ষা
করিয়া দেখিতেছেন খাস বহিতেছে কি না।
শেষ বুড়ী মহা আত্মদে চীৎকার করিয়া
বলিয়া উঠিলেন “ভয় নাই” ‘সকলে ‘হরি

বল’ সকলে “হবিবল” বলিয়া আরো চীৎকার
করিয়া উঠিল। সকলে মহা উৎসাহে
“হবি হরি” কবিয়া চীৎকার কবিয়া উঠিল।
বুড়ী তখন আত্মদে যোগেশের একটি পা
লইয়া পার তলা ঘসিতে লাগিল। যোগে-
শের “মা বলিল না মা তুমি বামুণ্য মেয়ে
তুমি উঠ আমি পা ঘসিতেছি।”

বুড়ী। ‘আমি বামুণের মেয়ে’ ‘আমি
বামুনের মেয়ে’ বলিয়া সজোরে হাসিয়া
বলিল “তুই পা ঘসি ত এই পা টা ঘস”।
আর একজনকে হরির তলার একটু মাটি
আজ্ঞে বল। ভাল কাজ কর্তে গেলে তাব
কি কখন আপদ্ বিপদ্ হয়—যোগেশের মত
কটা ছেলে—ছেলে কেন—বুড়ো কটা দেহে
পাওয়া যায়?

যোগেশ—“আর মা! এখন বাঁচিলে হয়?
এ কথার কোন উত্তর আব বুড়ী না দিয়া
বলিল “তুই হাত দুটা ঘসি ত আয়” যোগে-
শের পিতা রামভদ্র বাবু যোগেশের হাত
দুটি ধানিতে বসিল। হবিব তলার মাটি ও
আসিয়া পড়িল। বুড়ী সেই মাটি একটু
লইয়া যোগেশের মুখে দিল। যোগেশ
তখনও অজ্ঞান। বুড়ী “ও দাদা! ও দাদা!”
করিয়া ডাকিতে লাগিল। যোগেশ চক্ষু
মেলিল। বুড়ী বলিল আমি কে বল দেখি?
যোগেশ কেবল চাহিয়া বহিল। বুড়ী বলিল
“আর একটু হরির তলার মাটি দে”। আর
একটু মাটি দিল। বুড়ী বলিল “দাদা ভাই
হাঁ করত। যোগেশ হাঁ করিল।” সকলে
আশ্চর্য হইয়া বাইল। বুড়ী বলিল আর
তোরা ওষুধ টোষুধ খাওনে। ওষুধে
যা হয় তা আমি দেখিতে দেখিতে বুড়ী হইয়া

বাইলাম। কেবল হরিষা করিবেন তাই হইবে। তাঁব ইচ্ছাষ শব্দ হইবে এই বলিয়া বুড়ী চলিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া রহিল তাবপর আর যোগেশকে কেবল হবির তলাব মাটি খাওয়ান হইত।

সুরবালা ঠাকুরমার আনিতে দেরি দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইল। কখন শুভ কখন অশুভ ভাবনা হৃদয়ে উঠিতে লাগিল। যত বেলা অধিক হইতে লাগিল ভাবনা ততই তাহার বাড়িতে লাগিল। পরিশেষে ঠাকুরমার গলা শুনিতে পাইল। নীচে নামিয়া যাউল। সুরবালা ঠাকুরমার নিকট অদ্যোপান্ত সমস্ত শুনি। প্রাণে একটু ভবশা হইল। তুলসীতলাষ ঘাইয়া মাথা ঝুঁড়িতে লাগিল—আব বলিতে লাগিল “মধুসূদন এ বিপদ হইতে রক্ষা কর”।

নবম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার পত্র।

নীববালা সকাল বেলায় কাজ কর্তব্য কবিয়া একটবিশ্রাম কবিতোছে। সুরবালার সহিত অনেক দিন তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই হু একটা প্রাণেব কথা সে সুরবালার সহিত কহিত। প্রাণের কথা বলিবার আর তার লোক নাই। তারপর যোগেশের পীড়া। এইরূপ তাহার কত দুর্ভাবনা আসিয়া ক্রমে ক্রমে হৃদয় অধিকার করিল।

নীববালা এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় একজন ডাক ওলা আসিয়া তাহার পিতার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। বি জিলাসা করিল কোথা থেকে চিঠি এসেছে না?

ডাকঘওলা বলিল “আনি না”। বি চিঠিখানি লইয়া আসিল।

কর্তা যথাসময়ে বাড়ী আসিলেন। চিঠি আসিয়াছে শুনিলেন। চিঠি খানি খুলিলেন। নীরবালার মাতা ঠাকুরবান্নি জিজ্ঞাসা কবিলেন “কোথা হইতে আসিল”। নীরবালার পিতা বলিলেন “কলিকাতা হইতে”

নীব/মা—কি লিখেছেন? পড়না শুনি।
নীববালার পিতা পড়িতে আবস্ত করিলেন।

মনেক সদস্যবর জীযুক্ত বৈবহিক মহাশয় সঙ্কল্পেয়—
নিবেদন।

আপনার পত্র যথা সময়ে পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি দুঃখের বিষয় বটে। কলিকাতার ওরূপ ঘটনা হইলে বড় দোষেরই হইত তাহার সন্দেহ নাই।

ভক্তলোকের বাড়ীর মেয়ে ছেলের পুলিশে এজাহার দেওয়া অপেক্ষা লাহুনা—অপমান ও কর্ণভোগ আর অধিক কি হইতে পারে? যাহাই হউক আমার একান্ত ইচ্ছা যে বধুমাতাটাকুরানীকে এখানে লইয়া আসি। ইহাতে বোধ হয় আপনার কোন আপত্তি নাই।

এতদিন বধুমাতাকে আনি নাই কেন তাহা আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি। আমার মত অন্যরূপ। ছেলে লেখা পড়া শিখিয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারিলে পুত্রবধুকে আমা কর্তব্য। নরেন লেখা পড়া শিখিয়াছে। ‘পরীক্ষার’ উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি করিতেছে

এখন দুদশটাকা উপাধ করিতেছে। বধু-
মাতা ও বড় হইয়াছেন। এখন আনা
অতিশয় কর্তব্য। আপনার জামতা শওর
বাড়ী যায় নাই—আমি তাহাকে ঘাইতে
দিই নাই বলিয়া হুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।
হুঃখিত হইবার কোন কারণ দেখি না, কারণ
যদি নবেন শওর বাড়ীই যাইল তবে বধু-
মাতাকে এখানে আনিতে কি হইয়াছে? এখন
হইতে নরেন আপনাবি হইল—এখন
হইতে সে আপনার শ্রীচরণ দেখিতে প্রায়ই
যাইবে।

আপাততঃ ঠাী বৈশাখ দ্বিবাগমনের দিন
স্থির কবিয়াছি। বাবাজি গিয়া বধুমাতাকে
জইয়া আসিবেন। বাবাজি একবারও ঘান
নি বলিয়া হুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বধুমাতা ঘর করার কাজ বেশ করিতে
পারেন। বাড়ীর ঝিরা উৎকৃষ্ট রন্ধন করিতে
পারেন—তারা তাঁহার হাতের রন্ধন খাইয়া
আসিয়া এখনও কত প্রশংসা করে, আমি
বধুমাতার প্রশংসা তাহাদিগের নিকট যতই
শুনি ততই আমার আনন্দ হয়—কারণ উৎ-
কৃষ্ট রন্ধন কবিত্তে বড় যে সে পারেনা ইহা
অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট বিদ্যা কি আছে?—

তিনি নাকি বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছেন
শুখের বিষয়। আমি শেলাই টেলাই করিতে
পারেন কি? লেখা পড়া অপেক্ষা শেলাই
শিক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় আমার বোধ হয়।

আমার শেষ নিবেদন আপনি 'বেন'
ঠাকুরাণীকে বুঝাইয়া বলিবেন যে বধুমাতা
ঠাকুরাণী বনে বনভোজন করাইতে গিয়া
ছিলেন বলিয়া আমি ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে
আনিতেছি না। ওরূপ বিপদ না হইলেও

আমি তাঁহাকে লইয়া আসিতাম। বধুমাতা
যতই বড় হউন না কেন তবুও তিনি এখন
বালিকা—বালিকাবুদ্ধি যতঃ এক কাজ
করিতে আব এক কাজ করিয়া কেলিয়া-
ছেন। সে অপবাধ 'বেন' ঠাকুরাণীর নিকট
আপনার ও আমার নিকট মার্জনীয়।
আমার আশীর্বাদ 'বেন' ঠাকুরাণীকে জানাই-
বেন। আমবা সকলে ভাল আছি।
আপনারা সকলে কেমন আছেন লিখিবেন।
বধুমাতা ঠাকুরাণীকে ভাবিতে নিযেধ
কবিবেন। তাঁহাকে আমার আশীর্বাদ
জানাইবেন।

তদীয়

শ্রীধনেন্দ্রনাথ মিত্র।

নীরবালা আড়াল হইতে পিতার চিঠি
পড়া শুনি—শুনিয়া তৃপ্তি হইল না। চিঠি-
খানি সে নিজে একবার পড়িবে স্থির করিল।
চিঠিখানি ও সুবিধা মত পাইল। চিঠি
খানি সিন্ধুনে আপন শয়ন গৃহে ঘাটয়া
পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইল। শওর
মহাশয়ের একটি কথা তাহার প্রাণে বড়
আঘাত লাগিল “আমি ছেলে মানুষ ছেলে
মানুষ বলিয়া ছেলে মানুষী করিয়াছি”, এই
বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিল।

তাহার পর শওর বাড়ী ঘাইতে হইবে।
তাহাতে নীরবালা হুঃখিত নহে। নীরবালার
এখানে এখন প্রাণের কথা কহিবাব লোক
কেহই নাই। নীরবালা তাহাদিগের
বাড়ীতে আর আসিবে না। তাহার স্বা
তাহাকে আসিতে দিবেন না। নীরবালার
জন্মই এই সব হইয়াছে পাড়ার সকলে এই
রূপ বলিয়া থাকে। নীরবালাকে নীরবালার

বেশ চিনিত সে কখনই পাড়াষ আর মুখ দেখাইবে না। নীববালার শেষ স্থির করিল এখানে থাকা অপেক্ষা এখন কলিকাতায় যাওয়া ভাল। সুববালা ও কলিকাতায়

যাইতেছে। সেখানে তবুও দুইজনে কথাবার্তা কথা চলিবে।

ক্রমঃ—

সমালোচনা

পঞ্চমবেদ বা শ্রীমহাভাবত (নাট্যাকাব্য) মহাভারত নাটকাক্ষলে অল্পবাদ কবিত্তে শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রসর হইতেছেন। তিনি কতদূর কৃতকার্য হইবেন তাহার পবিচয় দিবার জন্য কিয়দংশ মহাভারতের এখান সেখানে হইতে নাট্যকাব্যে অল্পবাদ কবিয়া বিজ্ঞাপন হইতে একখানি পুস্তক বিনামূল্যে জনসাধারণকে

বিতরণ করিতেছেন। প্রফুল্লবাবু একজন শ্রুতিবি। তিনি যে ভাল কবিত্তা লিখিতে পাবেন তাহার পবিচয় তিনি অনেক দিন দিয়াছেন। তবে এখানি কিরূপ হইবে তাহা আমবা এখন বলিতে পাবিনা। নমুনা মন্দ নহে। এক্ষণে আমাদিগেব জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি এই কৃত্তর কার্যে কৃতকার্য লাভ করুন।

প্রাপ্তি স্বীকার—

The Amrita Bazar Patrika, Young Bengal, Behar Herald, তত্ত্ব-কৌমুদী, তত্ত্ব-বোধিনী, নববিভাকর সাধাবলী প্রতিকার, হারপত পত্র, রত্নপুরদিক্ প্রকাশ, হিন্দুজিকা, গরীব ও মহাবিদ্যা, আর্ঘ্যাবর্ত্ত, সঞ্জয়নী, সাম্যবেদী, শিল্পকৃষি পত্রিকা, শ্রীমন্ত-সওদাগর, প্রজাবন্ধু, অল্পসন্ধান ৮ সংখ্যা ও ১০ সংখ্যা, কর্ণধার ১ সংখ্যা হইতে ৭ম সংখ্যা, ধর্ম-প্রচার, নব্যভারত ডাক্তার মাস হইতে পৌষ, সারসংগ্রহ ১ হইতে

৩য় সংখ্যা, কলনা শ্রাবণ ও ভাত্র, বাক্তব নবমখণ্ড ষাদশখণ্ড, দীপিকা অগ্রহাষণ ও পৌষ, বিদ্যোদয় শ্রাবণ হইতে পৌষ, বামাবোধিনী পত্রিকা ২৭৫ সংখ্যা অগ্রহাষণ, সংসার দর্পণ ১ম ভাগ ১। ২। ৩ সংখ্যা, নবজীবন ৪ ভাগ ১। ২। ৩ সংখ্যা, ঢাকা গেজেট।

- (১) চিত্তাঞ্জবাহিনী প্রিয়নাথ দাস কর্তৃক
- (২) অন্ধবিলাপ প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত,
- (৩) অপূর্বমায়ার মিলন (৪) বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিবৃদ্ধ, প্রসন্নকুমার শর্মা প্রণীত।
- (৫) বুদ্ধদেব-চরিত, (৬) বৈশ্বাসিক দর্শন।

বিভা ।

[৫ম সংখ্যা]

সন ১২৯৪ সাল

১ম খণ্ড]

সনাতন ধর্ম ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

প্রণবের স্বরূপ ও প্রণব হইতে জগতের সৃষ্টি ।

কথিত আছে, প্রণবই বেদের বীজ এবং প্রণবই জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত কারণ। আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই প্রণবের সপ্ত অঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রণব ভিন্ন অপর কোন বস্তুই ব্রহ্মাণ্ডে লক্ষিত হইবে না। এই প্রণব হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিরূপণ কবিবার পূর্বে প্রণবের স্বরূপ কি, তাহা স্থূল রূপে এক প্রকার নিরূপণ করা বাইতেছে। প্রকৃত প্রণবের স্বরূপ জগৎ সৃষ্টি কখনানন্তর পশ্চাৎ যথাস্থানে স্বল্পরূপে প্রদর্শিত হইবে। কথিত আছে যে;—

“সপ্তাঙ্গং চতুশ্চাদঃ ত্রিহানং পঞ্চদেবতম্ ।

ওঁকারঃ যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো

ভবেৎ” ।

যিনি সপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট চতুশ্চাদ বিশিষ্ট ত্রিহান বিশিষ্ট ও পঞ্চদেবতা স্বরূপ প্রণব না জানে, তিনি কিরূপে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, বলত ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রণবের অন্তর্গত সপ্ত অঙ্গ, চতুশ্চাদ, ত্রিহান ও পঞ্চ দেবতা, সীমি ও ব্যাপ্তি রূপে পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার (শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন;—

“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদিজ উচ্যতে ।

বেদপাঠান্তবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ” ।

মানবগণ জন্মকালে শূদ্রজাতি থাকে, যখন উপনয়নাদি সংস্কার হয়, তখন তাহাকে দ্বিজ বলা যায়। পরে তিনি যখন বেদ পাঠ করেন, তখন বিপ্রপদ-বাচ্য হইবে। অনন্তর ব্রহ্ম (শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম) অর্থাৎ প্রণব পরিজ্ঞাত হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন।

মহাভারতে অজগরপ্রপঞ্চে আরও কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণতনয় যদি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হইলেন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম এবং চণ্ডাল যদি ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে।

ঐশ্বর্যের সপ্ত অঙ্গ যথা, (অ) অকার, (উ) উকার, (ম) মকার, (✓) নাদ, (০) বিন্দু, (—) কলা এবং (—) কলাতীত। চতুস্পাদ যথা, স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। ত্রিস্থান যথা, জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তাবস্থা। পঞ্চদেবতা যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর।

ঐশ্বর্য তিন প্রকার যথা, জাগ্রৎপ্রণব, পরমপ্রণব ও মহাপ্রণব। অপর ত্রিগুণও আবার তিন প্রকার, সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক। এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্যের বিন্দু পঞ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। শব্দত্রয়-বিন্দু অপরপ্রণবে অকার দ্বারা রজোগুণ, উকার দ্বারা সত্ত্বগুণ এবং মকার দ্বারা তমোগুণ লক্ষিত হইতেছে। নাদ শব্দের অর্থ বামা জ্যোষ্ঠা ও বৌদ্রী, এই তিন শক্তি। সাংখ্যিক শক্তিকে বামা, রাজসিক শক্তিকে জ্যোষ্ঠা ও তামসিক শক্তিকে বৌদ্রী বলা যায়। বিন্দুও তিন প্রকার, সাংখ্যিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু। সাংখ্যমতাবলম্বীরা এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাংখ্যিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐশ্বর্যের ষট্ অঙ্গ কলা শব্দের অর্থ মহেশ্বররূপ তামসিক ত্রিবিধ হইতে উৎপন্ন শব্দতন্ত্র, স্পর্শতন্ত্র, রূপতন্ত্র, বসতন্ত্র ও গন্ধতন্ত্র এবং আকাশ বায়ু তেজ জন ও পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূত এবং রাজসিক বিন্দুরূপ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ, এই পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এবং সাংখ্যিক বিন্দুরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন সজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান এবং শ্রবণেন্দ্রিয়, অগ্নিেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়, এই পাঞ্চভৌতিক জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিৎ, এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত অস্তঃকবণ, এতৎসমুদায়ই কলা শব্দে অভিহিত হইবাথাকে। কলাতীত শব্দের অর্থ এতৎসমুদায়ে অল্পপ্রবিষ্ট চৈতন্য।

অপর ঐশ্বর্যের সপ্ত অঙ্গের ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে এই ঐশ্বর্যের পাদচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছি। প্রত্যেক বস্ততেই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী, এই চারিটি অবস্থা আছে। স্থূল-ইন্দ্রিয়-গ্রাহকে স্থূল বলে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তাহা সূক্ষ্ম। ওণে স্থিত হইলে বীজ বলা যায়। নিশ্চয়-অবস্থাপন্নকে সাক্ষী বলে। এই চারিটি অবস্থাকেই ঐশ্বর্যের চতুস্পাদ বলা যায়। ত্রিস্থান শব্দের ব্যাখ্যা করা বাইতেছে, যথা, বিশ্ব অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং বিরাট্ অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাভিমাত্রী পুরুষ। ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি ঐশ্বর্যের প্রথম স্থান। হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৈজস অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাভিমাত্রী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, শব্দতন্ত্ররূপ ঐশ্বর্যের দ্বিতীয় স্থান। অব্যাকৃত অর্থাৎ

স্বপুণ্ড্রবাহার অমুদ্র্যমান অজ্ঞানাদিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ স্বপুণ্ড্রবাহাভিমাত্রী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রণবের তৃতীয় স্থান, সুতরাং জীবের সমষ্টির ও ব্যষ্টির এই তিন অবস্থাই শব্দব্রহ্মরূপ অপরপ্রণবের তিন স্থান । ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর ও মহেশ্বর, এই পঞ্চ দেবতাই শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের স্বরূপ ।

আমরা যেরূপ প্রণবের ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা সাধারণের জ্ঞদবজ্ঞম হয়, এরূপ বোধ হব না । অনেকে ইহাব মর্ম্ম ভেদ করিতে না পারিয়া উন্নতপ্রাণের ন্যায় মনে কবিতো পাবেন, এজন্ত প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । নিম্নে সদাশিবোক্ত তন্ত্র অনুসারে যে জগতেব উৎপত্তি বিবরণ লিখিতেছি, তাহা পাঠ করিলেই শব্দব্রহ্মরূপ অপর-প্রণবের স্বরূপ ও সপ্তাদ প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে । সারস্বতিলকে প্রথম পটলে কথিত আছে,—

“নিগুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ ।

নিগুণঃ প্রকৃতৈবন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ ।

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাত্ ।

আসীচ্ছক্তিস্ততো নানো মালাবিন্দুসমুত্তবঃ ।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নিগুণ এই পরমব্রহ্ম মায়াতে অল্পপহিত থাকিলে তাঁহাকে নিগুণ বলা যায়; তিনি মায়াতে উপহিত হইলে তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে । সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হইলেন অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে উপহিত থাকেন, তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবি-

ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহত্ত্ব) এবং নাদ হইতে বিষ্ণু (অহঙ্কারতত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি । ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অবিনাশাব সন্ধ্য । প্রকৃতি ব্যতিরেকে ব্রহ্ম থাকেন না এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকে-ও প্রকৃতি থাকেন না ; উভয়ে চণকাকারে একীভূত হইয়া আছেন । প্রকৃতির কর্তৃষ আছে, চৈতন্য নাই ; ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কর্তৃষ নাই ; উভয়ে একীভূত থাকিতে কর্তৃষ ও চৈতন্য অব্যাহত রহিয়াছে । ইহাকে কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য, কেহ বা চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন । এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে শিবস্বরূপ বা পুংদেবতা বলিয়া পূজা করেন, কেহ কেহ বা শক্তি-স্বরূপ ও স্ত্রীদেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা ইহাকে নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করেন । এইরূপে ইনি কাহারও নিকট পুরুষ, কাহারও নিকট স্ত্রী, কাহারও নিকট উভয়াঙ্গক, কাহারও নিকট স্ত্রীপুংভাবেব অতীত বলিয়া পরিকল্পিত হইতেছেন । এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য, বৈষ্ণবদিগের উপাস্য বিষ্ণু গোপাল কৃষ্ণ প্রভৃতি, শাক্তদিগের উপাস্য কালী তারা ত্রিপুরা প্রভৃতি শক্তি, সৌরদিগের উপাস্য সূর্য্য, শৈবদিগের উপাস্য শিব ও গাণপত্যদিগের উপাস্য গণপতি । বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুতে, শাক্তেরা শক্তিতে, সৌরেরা সূর্য্যেতে, শৈবেরা শিবমূর্ত্তিতে ও গাণপ-ত্যেরা গণেশমূর্ত্তিতে এই মূলপ্রকৃতিযুক্ত চৈতন্যের অধিষ্ঠান ও আবির্ভাব কল্পনা

কবিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাকার ধ্যান করেন। ফলত বাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, বাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, অথবা পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন দেবতার উপাসনা করেন, এই মূলপ্রকৃতিতে উপস্থিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেবই উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি, বাঁহারা গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপ ও মানবশরীরে তাঁহার অধিষ্ঠান করিয়া গুরুর আরাধনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও উক্ত মূলপ্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্যের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

এক্ষেণে প্রকৃত প্রস্তাবেব অল্পসরণে প্রকৃত হইলাম। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যে সময় লব্ধ বস্তু ও তমোগুণ সমভাগে মিলিত হইয়া পবম্পর পবম্পরকে পরাভব করে, কোন গুণেবই প্রাভুত্ব থাকে না, তখন সেই গুণত্রয়েব সাম্যাবস্থাকেই মূলপ্রকৃতি বলা যায়। এ অবস্থায় মূলপ্রকৃতিতে কোন গুণ প্রকাশ না থাকিতে সমুদায় গুণই পরস্পর অভিভূত ও লব্ধপ্রাপ্ত হওয়াতে ইহাকে নিগুণ অবস্থাও বলা হইয়া থাকে।

মহাপ্রলয়ের অবসানে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভাদ্রাশ্রয় সঙ্কে কালে অধিষ্ঠান করিলে বসন্তকালে বসন্তকালীন পুষ্পের ন্যায়, তিল হইতে তৈলেব ন্যায় এই চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তি আদ্যাশক্তি নামে কথিত হইয়া থাকেন। এক প্রদীপ হইতে প্রা-
লিত অন্য প্রদীপেব ন্যায় এই আদ্যাশক্তি-

ও মূলপ্রকৃতির রূপান্তর মাত্র। এই আত্মশক্তিও মূলপ্রকৃতিব ন্যায় গুণত্রয়েব সাম্যাবস্থা ও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত; পরন্তু মূলপ্রকৃতির সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি, ইহার বিকৃতি আছে। কালের সহকারিতায় অদৃষ্ট নিবন্ধন প্রথমত এই আদ্যাশক্তিতে গুণকোভ হইয়া থাকে। তন্মুখে কথিত আছে,—
“সৃষ্টিশ্চতুর্বিধা দেবি প্রকৃত্যামমুৎপত্তে।
অদৃষ্টাভাবতে সৃষ্টিঃ প্রথমে তু বরাননে।
বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসী সৃষ্টিক্র্যাতে।
তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাঙ্গিকা তথা।
আবস্ত্যসৃষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থো যোগিকী প্রিযে।
ইদানীং শূণ্ণ দেবেশি তত্তত্বঞ্চ বিশেষতঃ।
সৃষ্টিশ্চতুর্বিধা দেবি যথাপূর্ব্বং সমাসতঃ॥

দেবি! প্রকৃতি হইতে চারি প্রকার সৃষ্টি হয়। প্রথমত অদৃষ্ট বশত জীবসমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথম সৃষ্টি ও অদৃষ্টসৃষ্টি বলিয়া কথিত আছে। মূলপ্রকৃতি হইতে শক্তিব আবির্ভাব ও গুণকোভই এই প্রথম সৃষ্টি। বিবর্ত্তসৃষ্টিকে মানসী সৃষ্টি বলা। বেদান্তসারে কথিত আছে,—

“সতততোহন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অততততোহন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ” ॥

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব্ব বস্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপান্তর হয়, তাহার নাম বিকার, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি এবং শব্দতন্ত্রাদির বিকার আকাশাদি। যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ব্ববস্তুর অন্যথাভাব হয় না, তাহাকে

বিবর্তন-সৃষ্টি বলা যায়। যখন বজ্রুতে সর্পভ্রম হয় তৎকালে মিথ্যাভূত সর্পের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু বজ্রুব বজ্রুতা অব্যাহতই থাকে অর্থাৎ প্রকৃতপ্রকৃতিতে বজ্রুর অন্যথাভাব হয় না। এইরূপ প্রকৃতিতে উপস্থিত ব্রহ্ম হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে অস্থিতির ব্রহ্মেব ব্রহ্ম অব্যাহত বহিয়াছে, পবন অঘটন-ঘটন—পটীয়াসী মায়াধারা পরি-কল্পিত এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তনরূপ, ইহা দ্বিতীয় সৃষ্টি ও মানসী সৃষ্টি। লিখা অভিহিত হয়। এই সৃষ্টি পদার্থ যখন যিকৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ এক বস্তু রূপান্তর হইয়া সেই স্থানে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন তাহাকেই পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টি বলে।

মহত্ত্ব হইতে তাহার ভাব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়-পঞ্চিতমাত্র এবং পঞ্চ তমাত্র হইতে পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি এই পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টির অন্তর্গত। যখন পঞ্চীকৃত পবমাণু সমুদায়ের পরস্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতে থাকে, তখন তাহাকে আরম্ভ-সৃষ্টি বা যৌগিকী সৃষ্টি বলা যায়। ইহা চতুর্থ সৃষ্টি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে একমাত্র আরম্ভ সৃষ্টিরই উল্লেখ আছে, কারণ, তাঁহারা পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করেন। তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম পথে গমন করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে যৌগিকসৃষ্টি ও পরিণাম-সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকার। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার করিতে তাঁহাদের অধিকার নাই। বৈদ্য-

স্তিকগণ যৌগিকসৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি ও বিবর্তনসৃষ্টি বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যৌগিক-সৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি, বিবর্তনসৃষ্টি ও অদৃষ্টসৃষ্টি এই চতুর্বিধ সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, স্ততরাং তন্মধ্যে ন্যায় সূক্ষ্ম পথে অগ্রসর হইতে কেহই সাহসী হয়েন নাই। এক্ষণে এই চতুর্বিধ সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিতেছি।

অদৃষ্ট নিবন্ধন জীবসমষ্টির ভোগ কাল উপস্থিত হইলে যখন আদ্যাশক্তিতে (প্রকৃ-তিতে) গুণকোভ হয়, তৎকালে প্রথমত তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ চৈতন্যযুক্ত শক্তিও ঐ তমোগুণে অল্পপ্রবিষ্ট হয়েন। এই তমোগুণমহাকাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যৎকালে প্রলয়কাল উপ-স্থিত হয়, তৎকালে সবগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তমোগুণে প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে প্রথম কথিত আছে, আদ্যাকালী মহা-কালকে প্রসব করিয়া তাহাতে উপগতা হইবেন অথবা বল পূরক বিপবীত রতিতে প্রবৃত্তা হইবেন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আদ্যাশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আদ্যাশক্তি অল্পপ্রবিষ্টা হইতেছেন।

অনন্তরপ্রকৃতির (আদ্যাশক্তির) গুণকোভ হইলে তৎপ্রসূত মহাকাল সহকারে তাঁহা হইতে নাদের (মহত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। এই নাদ আবার সত্ত্ব রজ ও তম, এই তিন গুণ ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সাংকেয়ারা এই ত্রিবিধ নাদকে তামসিক মহত্ত্ব রজ-সিক মহত্ত্ব ও সাত্বিক মহত্ত্ব বলিয়া থাকেন। স্মৃতি আছে যে,—

“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাক্রে”।

অর্থাৎ প্রথমত হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। পশ্চাৎ তিনি গুণভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্তি হইয়াছেন, ইহার সহিত কোন বিবোধ হইতেছে না। প্রথমত গুণত্রয়ের সমষ্টিক্রপ মহত্বের উত্তর হইয়াছিল। পবে সেই মহত্ব সাধ্বিক রাজসিক ও তামসিক এইতিন ভাগে বিভক্ত হইয়া স্বক্ষত্রাকা, স্বক্ষত্রিষ্ণু ও স্বক্ষত্রমহেশ্বর অথবা ঐ মূর্তিত্রয়ের বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। এই মহত্ব বুদ্ধিত্ব শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে। অনন্তর ত্রিবিধ নাদ হইতে সাধ্বিক বিষ্ণু রাজসিক বিষ্ণু ও তামসিক বিষ্ণু, এই ত্রিবিধ বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছে। বিষ্ণু শব্দের অর্থ 'সাহার' দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই উচ্চতাও নাই, তাদৃশ বস্তু। সত্ত্বাধারা এই ত্রিবিধ বিষ্ণুকে সাধ্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। সারদাতিলকে কথিত আছে,—

"সক্তিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পর্বামশ্ববাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাধিগুণমুত্তরঃ।
পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিজতে পুনঃ।
বিষ্ণুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ।
বিষ্ণুঃ শিবাত্মকঃ বীজ শক্তির্নাদ স্তয়োর্মিথঃ।
সমবারঃ সমাখাতঃ সর্বাগমবিশারদৈঃ।
রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাৎ জ্যোষ্ঠা বীজাদ-
জায়ত।

বামা ভাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ।
তেজ্ঞানোচ্ছাক্রিয়াস্বানো বহুদীর্ঘকস্বরূপিণঃ।"

সক্তিদানন্দ-ব্রহ্মযুক্ত আদ্যাশক্তি হইতে যে নাদ (মহত্ব) উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে বিষ্ণুর (অহঙ্কারত্বের) উৎপত্তি হয়। পরশক্তিময় এই বিষ্ণু সাধ্বিক রাজসিক ও

তামসিক, এই তিন ভাগে বিভক্ত। সাধ্বিক বিষ্ণুর নাম বিষ্ণু, তামসিক বিষ্ণুর নাম বীজ এবং রাজসিক বিষ্ণুর নাম নাদ। এই তিনের যে সমষ্টি তিনি পরমবিষ্ণু শব্দে অভিহিত করেন। এই বিষ্ণু বীজ ও নাদের মধ্যে বিষ্ণু শিবস্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময়। বীজ শক্তিস্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃতিময় এবং নাদ শিব-শক্তির সৈমবার স্বরূপ। ফলত স্বক্ষত্রটিতে দেখিলে সত্ত্ব গুণ চিন্ময়, তমোগুণ প্রকৃতিময় এবং জ্যোত্ত্ব গুণ উভয়ায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

অনন্তর বিষ্ণু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যোষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি উৎপন্ন হইলেন। এই রৌদ্রী শক্তি হইতে রুদ্র, জ্যোষ্ঠা শক্তি হইতে ব্রহ্মা এবং বামা শক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্বে যে ত্রিবিধ মহত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এবং ত্রিবিধ বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বীজমাত্র। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিজ নিজ স্বরূপে পরিণত হইলেন।

এই রুদ্র জ্ঞান-শক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছা-শক্তি স্বরূপ ও বিষ্ণু ক্রিয়া-শক্তি স্বরূপ। রুদ্র বহু-স্বরূপ হইয়া সংহার করেন, ব্রহ্মা চন্দ্র স্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু সূর্য্য স্বরূপ হইয়া জগতের শোষণ করিয়া থাকেন। ক্রিয়াসারে কথিত আছে,—

বিষ্ণুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজ শক্ত্যাশ্রকং স্মৃতম্।
তথোর্বোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাশ্রিগুণঃ।

বিষ্ণু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাশ্রক ও নাদ শিবশক্ত্যাশ্রক। এই বিষ্ণু বীজ ও নাদ হইতে ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে রুদ্র

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ নাই কারণ, তাঁহারা ঐ তিন শক্তি হইতে অভিন্ন। মূলপ্রকৃতি সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেকোন রূপে ভেদ নাই এবং উভয়ে যেরূপে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া আছেন, সেই রূপে জ্ঞানশক্তির সহিত ক্রত, ইচ্ছাশক্তির সহিত ব্রহ্মা এবং ক্রিয়াশক্তির সহিত বিষ্ণু তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া বহিষাছেন। গোবন্ধসংহিতাতেও ক্রত ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ না করিয়া তিন শক্তিমাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে যথা,—

“ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানঃ গোবী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।

ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপবঃ শক্তি-
বোমিতি” ॥

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, গোবী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাত। ঐ তিন শক্তি হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। এই তিন শক্তি প্রণব দ্বারা প্রতীপাদ্য। কুজিকাতন্ত্রে কথিত আছে ;—

“ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে বন্ধাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥
ক্রত্যাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু ক্রতঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি ক্রতঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাত্মা জড়াক্ষৈব প্রাকীর্ষিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্বে কার্যাকমা
ক্ৰবন্ ॥

ব্রহ্মাণী জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, ব্রহ্মা কখনই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন না, অতএব মহেশ্বর! ব্রহ্মা শব্দ, সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবী

শক্তি রক্ষা করিতেছেন, বিষ্ণু কখনই বন্ধা করিতে সমর্থ নহেন, অতএব মহেশ্বর! বিষ্ণু প্রেত, সন্দেহ নাই। দেবি। ক্রত্যাণী সংহার করিতেছেন, ক্রত কখনই সংহার কার্যে সমর্থ হইবেন না, অতএব মহেশ্বর! ক্রতঃ শব্দ সন্দেহ নাই। ফলত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই জড়স্বরূপ কারণ, শক্তি ব্যতিরেকে কেহই কোন কার্য করিতে সমর্থ নহেন। বস্তুত শক্তিসমবেত ব্রহ্মা সৃষ্টি করবেন, শক্তি সমবেত বিষ্ণু পালন করেন, শক্তিসমবেত ক্রতঃ সংহার করিয়া থাকেন; শক্তিব্যতিরেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যেরূপে জড় বলা যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্যতিরেকে শক্তিকেও সেইরূপে জড়স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কারণ, শক্তিও শি. পেরদ্বার পৃথক্ হইবেন না, উভয়ের অবি-
নাত্ম্য সম্বন্ধ মূলপ্রকৃতি হইতে জগতের চরমস্থ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের দিব্য শরীর বা স্বরূপোৎপত্তি সংক্ষেপে কথিত হইল। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিবাত্ মূর্ত্তিব উৎপত্তি কথিত হইতেছে। পূর্বে যে গুণভেদে ত্রিবিধ বিন্দুর উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ এবং তামসিক বিন্দুর নাম বীজ। বীজ হইতে প্রথমত শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, তেজ হইতে রসতন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল, জল হইতে গন্ধতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের

গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণশব্দ স্পর্শ রূপ ও বস, পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ।

এই যে আকাশ বায়ু তেজ জল ও পৃথিবীর উল্লেখ কবিরাম, ইহাবা প্রত্যেকেই পব-স্পব বিশিষ্ট ও অপকীকৃত স্মৃতি ভূতমাত্র। পবে পকীকরণ হইলে ইহাদেব স্মৃতিশাশ পর-স্পব মিলিত হইয়া স্থূলভূত রূপে পরিণত হইবে। আপাতত বিন্দু, তন্মাত্র, অপকীকৃত ভূত ও পকীকৃত ভূতের পবস্পব বিভেদক একটা সামান্য লক্ষণ বলিতেছি। যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে বিন্দু বলে। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে তন্মাত্র বলা যায়। যাহাব দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে, অথচ বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে অপকীকৃত ভূত বলা যায়। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে ও বেধ আছে, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে পকীকৃত ভূত বলা যায়। ইহা পরে বিশেষরূপে ব্যক্ত করা যাইবে।

বীজ হইতে যেকোন আকাশের সৃষ্টি হইল, সেই সময় সেইরূপ নাদ হইতে শব্দশক্তির এবং বিন্দু হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে বায়ু সৃষ্টিব সমকালে নাদ হইতে স্পর্শশক্তি ও বিন্দু হইতে দৃষ্টিেন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং বীজ হইতে তেজের সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে তৈজস শক্তির সৃষ্টি ও বিন্দু হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞানের সৃষ্টি

হইয়াছে। এইরূপ বীজ অর্থাৎ তামসিক বিন্দু হইতে জলের সৃষ্টি সময়ে নাদ অর্থাৎ বাজসিক বিন্দু হইতে বসশক্তি এবং সাত্তিক বিন্দু হইতে রসেন্দ্রিয় ও রসজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে গন্ধশক্তির সৃষ্টি এবং বিন্দু হইতে স্রবণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, নাদ অর্থাৎ রাজসিক বিন্দু, হইতে শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, তৈজসশক্তি বসশক্তি ও গন্ধশক্তিব, সৃষ্টিকালে পঞ্চভূতের অংশ হইতে পৃথক পৃথক পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়েব সৃষ্টি হইয়াছে।

এক্ষণে স্মৃতি বিবেচনা করিয়া দেখুন, বীজ শব্দে অভিহিত তামসিক বিন্দু, শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রস-তন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র এবং অপকীকৃত স্মৃতি আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, এই স্মৃতি পঞ্চভূত এবং পকীকৃত স্মৃতি ও স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এতৎ সমুদায় বিরাট্ মূর্তি মহেশ্বরের শরীর। নাদ শব্দে অভিহিত বাজসিক বিন্দু, অপকীকৃত ও পকীকৃত স্মৃতি ও স্থূল শব্দশক্তি, স্পর্শ-শক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি, ও গন্ধশক্তি এবং বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উশ্ব, এতৎ-সমুদায় বিরাট্ মূর্তি ব্রহ্মার শরীর। এই-রূপ বিন্দু নামে অভিহিত সাত্তিকবিন্দু, অপকীকৃত ও পকীকৃত স্মৃতি ও স্থূল শব্দ-জ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনে-ন্দ্রিয়, রসেন্দ্রিয় ও স্রবণেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অংকার, চিত্ত ও চিৎ, এই চতুর্বিধাঙ্গক

অন্তঃকরণ, এতৎসমুদায় বিবাত্ মূৰ্ত্তি বিষ্ণুর
শরীর । এই ব্রহ্মা বিষ্ণু কৃত্তের সমষ্টিকে

অপবব্রহ্মণ ও শঙ্করব্রহ্ম বলা যায় ।

ক্রমশঃ—

মহাকাব্যের পরিচয় ।

মহাভাবত ও রামায়ণ আদর্শ ইতিহাসেব
জুগে বিরূপ ভূষিত, তাহা আমবা প্রদর্শন
কবিযাছি । এই দুই মহাগ্রন্থে আমবা
প্রাচীন ভাবতীয় আৰ্য্য সমাজের পূর্ণ বিবরণ
প্রাপ্ত হই । কিন্তু সেই বিবরণ তাহাদেব
বাহ্যাবয়ব মাত্র । প্রাচীন আচার ব্যবহাব,
বীতিনীতি, প্রভৃতি তাহাতে বর্ণিত আছে
বটে, কিন্তু তাহা কাব্য-লিখিত চবিত্র ও
ঘটনা বর্ণনহলেই বর্ণিত হইয়াছে । বর্ণনাব
প্রগাঢ়তা ও বর্ণগৌরবে কাব্যসৃষ্টি আব-
বিত হইয়া পড়িয়াছে । তজ্জন্য মহাভাবত
ও রামায়ণ সচরাচর ইতিহাস রূপেই গৃহীত
হইয়া থাকে ।* ইতিহাস রূপে গৃহীত
হইবাব দ্বিবিধ কাবণ দেখিতে পাওয়া যায় ।

১ । বাহাবা কাব্য ও ইতিহাসেব প্রভেদ
বুঝেন না, তাঁহাদেব নিকট ঐ গ্রন্থদ্বয় ইতি-
হাস বা পুৰাবৃত্ত ভিন্ন অন্যরূপে প্রতীয়মান
হইতে পাবে না । এই প্রকার লোক
সংখ্যাই অধিক, সুতরাং অধিকতর লোকের
কাছে মহাভাবত ও রামায়ণ ইতিহাস ।

২ । বাহারা কাব্য ও ইতিহাসের প্রভেদ
বুঝেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক ঐ গ্রন্থদ্বয়
পাঠ বা শ্রবণ করিয়া উহাদের বাহ্যাবয়ব

রূপ ঐতিহাসিক বিবরণে এত অভিভূত হন,
যে উহাদেব কাব্যসৃষ্টি দেখা বা বিচার কবা
তাঁহাদেব পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে ।
বর্ণিত পাত্র ও পাত্রীগণ জীবিত-চিত্র-প্রায়
এতদূর তাঁহাদেব চিত্ত অধিকার কবে যে,
তাঁহাবা উদ্দিগকে ঐতিহাসিক জীবিত
পাত্র ও পাত্রী ভিন্ন অন্যরূপে সহজে বিশ্বাস
কবি পাবেন না । ঐতিহাসিক মোতে চিত্ত
এত মুগ্ধ হয় যে, প্রকৃত তথ্য বিচার কবিয়া
মোহলব বিশ্বাস অপসারণ কবা তত প্রীতি-
কর বোধ হয় না ।

কিন্তু সাধারণ লোকে সচরাচর উহাদি-
গকে ইতিহাস বলিলেই কি বাস্তবিক ঐ
গ্রন্থদ্বয় ইতিহাস হইবা যাইবে । আমবা
পূর্বেই দেখাইয়াছি, সাধারণ লোকে উহাদি-
গকে যে ভাবে গ্রহণ কবিয়া থাকে সেই
ভাব ভাবিবা ব্রহ্মাও একদা সঙ্কুচিত হইবা
মহাভারতকে কাব্য বলিবা ছিলেন । যাহা
বাস্তবিক কাব্য রূপে কল্পিত হইয়াছে,
তাহাকে তিনি কাব্য না বলিবা আর কি
বলিবেন ? তিনি বলিবা গেলেন, মহাভারত
কাব্য বলিয়াই অগতে প্রচলিত হইবে ।
রামায়ণ সম্বন্ধে ও ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—

“ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদজ ভবিষ্যতি।”

হে বাগ্মীকি। তুমি নারদকথিত রাম চবিত্ত কথ্যে যেকপে বিস্তৃত করিয়া শ্লোকময় কাব্যে বর্ণন কবিবে, সেই কাব্যের কোন কথা মিথ্যা হইবে না।

ব্যাসের সহিত ব্রহ্মার কথোপকথন রূপ আখ্যায়িকা দিয়াই ব্যাস, মহাভাবত ইতিহাস কি কাব্য, এই কথার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। পাছে লোকে ভাবতকে প্রাকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ রূপে গ্রহণ কবে, সেই জন্য তিনি মহাভারতের আদিতেই সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি মহাভারতকে কাব্য রূপেই সৃষ্টি কবিয়াছি, সুতরাং তাহা কাব্য রূপে গৃহীত ও অধীত হইসেই লোকে তাহার রস-গ্রহণে সমর্থ হইবেন। নিজে কল্পিত ব্যাস যখন মহাভাবতকে কাব্য বলিয়া গিয়াছেন, তখন তাহাকে অন্যভাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার প্রকৃত কল্পনা কখনই অহত হইতে পাবে না। যাহা যেরূপে কল্পিত, তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করা উচিত। অন্যভাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার কল্পনা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে, এবং লোকে তাহার প্রকৃত রসান্বাদনে বঞ্চিত হইবেন।

একণে কথ্য এই, মহাভারত ও রামায়ণের কাব্যসৃষ্টিই বা কোন অংশে এবং উহাদের ইতিহাসই বা কোন অংশে? কাব্যসৃষ্টি উহাদের অভ্যন্তরে, ইতিহাস উহাদের বাহ্যিকভাবে। কাব্যসৃষ্টি উহাদের কল্পনায়, ইতিহাস সেই কল্পনার ভূষণ। কাব্য সৃষ্টি উহাদের মূলে ও স্বভাবে, ইতিহাস উহা-

দের পল্লবে। কাব্য সৃষ্টি উহাদের মূল আখ্যায়িকা বচনায়, ইতিহাস সেই আখ্যায়িকা বর্ণনায়। এই কাব্য-সৃষ্টিমূলক প্রধান আখ্যায়িকাকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য ব্যাস মহাভাবতের আদিতেই তাহা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। পাছে লোকে সেই আখ্যায়িকা ভাগ দেখিতে না পায়, পাছে তাঁহার কাব্যসৃষ্টি কোথায় আমবা দেখিতে না পাই, এমনকি ব্যাস তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দেশ কবিয়া দিয়াছেন। মহাভাবতের যে প্রধান আখ্যায়িকা ভাগে ব্যাস কাব্য সৃষ্টি সমাধিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, সেই আখ্যায়িকা ভাগ কি, আমরা তাহা ব্যাসেরই নির্দেশ মত দেখাইতেছি।

সেই আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রারম্ভেই এই মহামন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়—

“তুর্ধ্যোধনো মন্থ্যমযো মহাক্রমঃ

ক্লদ্বঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।

তুঃশাসনঃ পুন্স কলে সমুদ্রে

মূলং বাজা ব্রতবাণো মণীষী।

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মমযো মহাক্রমঃ

ক্লদ্বোহজুনো ভীমসেনোহিস্য শাখা।

মাস্ত্রীশ্বরৌ পুন্সকলে সমুদ্রে

মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।*

এই মূল মন্ত্র, মহাভারতের প্রধান আখ্যায়িকা সংগঠিত কবিয়াছে। এই মন্ত্র আমরা শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ডে উচ্চারিত হইতে দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ড বৈদিক

* মহাভারতের সূচনা যেমন এই কর ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, রামায়ণও তদ্রূপ নারদোক্ত আখ্যানের সূচিত হইয়াছে। গ্রীক মহাকাব্যের সূচনায়ও এই রূপ নিরূপণ।

কাল হইতে প্রচলিত আছে। সুতরাং প্রাচীন বৈদিক কাল হইতেই মহাভাবতীয় মূল ভিত্তি স্থাপিত আছে। ব্যাস সেই ভিত্তিব উপর যে মহাট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন তাহাবই নাম ভাবত-সংহিতা। সেই ভিত্তি মূলক অট্টালিকা নানা ভূষণে ভূষিত হইয়াছে। যেমন রাজপ্রাসাদ নানা পারিপার্শ্বিক ভূষণে সজ্জিত থাকে, তাহার নানা পার্শ্ব কুঞ্জবন, পুষ্পোদ্যান, উপবন, সবোবব, অঙ্গালয়, গজালয়, আয়ুধাগার, সৈন্তসমাবেশ, নর্ত্তকালয়, প্রাসাদ, রত্নভূমি, প্রভৃতি নানা সজ্জায় সজ্জিত থাকে, মহাভারতীয় প্রধান অট্টালিকা ভাগ ও তরুণ নানা উপত্যাস ও আখ্যানভূষণে সজ্জিত হইয়াছে। ব্যাস সেই অট্টালিকা ভাগকে স্তম্ভ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই অট্টালিকা প্রথমে নির্মিত হইয়াছিল। যে মূল আখ্যায়িকা বর্ষস সর্ব প্রথমে রচনা করেন, তাহা ভারতসংহিতা নামে স্তম্ভ সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। এই ভারতসংহিতারই ব্যাস বিস্তৃত বৈশম্পায়নোক্ত মহাভারত। বৈশম্পায়ন নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

চতুর্বিংশতি সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।

উপাখ্যানৈর্বিদ্যে তাবৎ ভারতঃ প্রোচ্যতে

বুধঃ।

স্ততোহধ্যাক্ষতঃ ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানুবিঃ।

অনুক্রমণিকাধারং বৃত্তান্তানাং সপর্কণাম্।

ইদং বৈশম্পায়নঃ পূর্কঃ পুস্ত্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্।

স্ততোহিন্যোভ্যোহনুগপেভ্যঃ শিষ্যোভ্যঃ

প্রদদৌবিশ্বঃ।

বহিঃশত সহস্রাণি চকারান্যাং স সংহিতাম্।

ত্রিংশজ্ঞত সহস্রাং দেবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্।

পিত্রো পঞ্চদশ প্রোক্তং গন্ধর্ব্বেষু চতুর্দশ।
একং শতসহস্রং তু মাধুসেবু প্রতিষ্ঠিতম্।
নারদোহশ্রাবয়ৎ দেবানু অসিতো দেবলঃ
পিতৃনু।

গন্ধর্ব্বগন্ধর্ব্বকাংসি শ্রাবয়ামাস বৈ শুকঃ।

অশ্বিনস্ত মাধুসে লোকে বৈশম্পায়ন উক্ত
বানু।

শিষ্যো ব্যাসস্য ধর্ম্মান্না সর্ব্ববেদবিদাং বরঃ।

বৈশম্পায়নবিশ্রুতিঃ শ্রাবয়ামাস পার্শ্ববম্।

পারিক্রিতং মহাত্মানং নান্না তং জনমেজয়ম্।

সংহিতান্তৈঃ পৃথজ্জেন ভারতস্য প্রকীর্তিতাঃ।

একং শতসহস্রং তু মযোক্তং বৈ নিবোধত।

মহাভারত আদিপর্ব্ব।

“মহর্ষি কৃষ্ণ বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ উপাখ্যান ব্যতিরেকে চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকে* ভারত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ ইহাকেই মূল মহাভারত বলিয়া থাকেন। অনন্তর তিনি সংক্ষেপে একশত পঞ্চাশৎ শ্লোক দ্বারা পর্ব্ব ও বৃত্তান্ত সমুদায়ের অল্প ক্রমণিকা দ্বারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গবান বৈশম্পায়ন এই মহাভারত প্রণয়ন করিয়া প্রথমতঃ পুত্র শুককে পড়াইলেন। অনন্তর তিনি অন্যান্য উপযুক্ত শিষ্যগণকেও এবিষয়ে শিক্ষা দিলেন।”

এই মূল মহাভারতের সমগ্র ভাগ কেবল ব্যাসের পুত্র শুকদেব এবং কতিপয় উপযুক্ত শিষ্যভিন্ন আর কেহ অধিকারী হন নাই। কারণ, আমরা দেখিতে পাই সেই মূল সংহিতা যখন অধিকারী ভেদে জানকর্ষণমুদ্রিত

* উক্ত কথ ব্যতিরেকে বাকীকিও প্রকৃষ্টে রাবণবধ পর্য্যন্ত যে রামায়ণ প্রণয়ন করেন কালিদাস ও শ্লোক সংখ্যা চতুর্বিংশতি সহস্র।

দেবলোক, পিতৃলোক ও গন্ধৰ্বলোকে অংশে অংশে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহা উপাখ্যান সহিত বৰ্দ্ধিত ও সমলভূত হইয়াছিল। নহিলে সকলে তাহাব বসন্ত হইতে পারিত না। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন :—

“দৈপায়ন যষ্টি লক্ষ শ্লোক দ্বাৰা উপাখ্যান সহিত আব এক খানি বিস্তীর্ণ মহাভাবত সংহিতা প্রণয়ন কবেন। তন্মধ্যে ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দশ লক্ষ গন্ধৰ্বলোকে এবং এই মনুষ্যলোকে এক লক্ষ শ্লোক প্রচারিত হইয়াছে। নারদ দেবগণকে, অসিতদেবল পিতৃগণকে, শুক গন্ধৰ্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে শ্রবণ করাইয়াছেন। বাসেব শিষ্য বেদবেত্তা ধৰ্ম্মধ্বা বৈশম্পায়ন এই মনুষ্যলোকে মহাভাবত কীর্তন কবেন। সেং বিপ্রর্ষি প্রথমতঃ পরীক্ষিত-তনয় মহাত্মা জনমেজয়কে শ্রবণ কবাইয়া দিয়া পূৰ্ব্বোক্ত মহর্ষিগণ শ্রোতভেদে মহাভাবতের পৃথক পৃথক সংহিতা কীর্তন করি, গিষা-ছিলেন, কিন্তু মনুষ্যলোকে এক লক্ষ শ্লোক বৈশম্পায়ন কীর্তন কবিয়াছেন”।

মূল সংহিতাকে উপাখ্যান দ্বাৰা বিস্তৃত কবিয়া যে মহাভারত মনুষ্যলোকে উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছিল, আমরা সেই মহাভাবত প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মূল মহাভারত মধ্যেই মূল চতুर्वিংশ সহস্র সমন্বিত সংহিতা বিদ্যমান আছে। সেই মূল সংহিতাক মহাভাবতের প্রধান আখ্যায়িকা স্বৰ্ণাঙ্কিত হইয়াছে। ব্যাস সেই সংহিতাকে কাশ্য মলিষা ব্রহ্মার নিকটে পবিত্র দিয়াছিলেন। স্মৃতবাং মূল মহাভারতী

আখ্যায়িকা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের কবি-কল্পনা সম্বৃত সামগ্রী বলিয়া গণ্য কবিত হইবে। এই মূল সংহিতাংশকে বিশ্লেষণ কবিবাব পছা মহাভাবত মধ্যেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই অংশ আমরা কি কপে বাহিব কবিয়া লইব? সেই সংহিতাব বিশেষ আলোচ্য বিষয় ও লক্ষণ মহাভাবত মধ্যে এই রূপ কীর্তিত হইয়াছে।

দ্বৈপায়নেন যৎ প্রাক্তং পূবাং পবমর্ষণা।

সুরৈব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব ব্রহ্মা যদভিপূজিতম্॥

তস্যাপাখ্যান ববিষ্ঠস্য বিচিত্র পদপৰ্কণঃ।

স্বস্মার্তন্যায়যুক্তস্য বেদার্থভূষিতস্য চ॥

ভাবতস্যোতিষ্ঠাসয়া পুণ্যং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।

সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানাশাস্ত্রোপ-

বৃংহিতাম্॥

জনমেজয়স্য বাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন

উক্তবান্।

যথাবৎ স ঋষিস্তুষ্ঠে সত্রে দ্বৈপায়নাপ্তবাম্॥

বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাস্তুতকর্ণণঃ।

সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যং পাপ

ভয়াপহাম্॥

“ঋষিগণ কহিলেন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন বে পূবাং প্রণয়ন করিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ শ্রবণ কবিয়া যাহার পূজা কবিয়া থাকেন, যাহাতে সর্বোৎকৃষ্ট পরম রমণীয় উপাখ্যান আছে, যাহা বিচিত্র (দ্বর্ষবাচক) পদ ও আদি সভাদি বিচিত্র পৰ্কষুক্ত, বাহা আশ্রতব্ধের স্বস্মতা, আশ্রতব্ধ প্রতীতির অল্পকূল যুক্তিমূলীয় ন্যায়, ও বেদার্থে সম-লভ্য, যাহা পরম পবিত্র, গ্রন্থার্থসংযুক্ত ও পদামিব্যুৎপত্তিমতী ভাষায় গ্রন্থিত, যাহার সহিত শাস্ত্রভবের বিরোধ নাই, বে ঋষি

ভারত ইতিহাস বৈশম্পায়ন ভগবান ষৈম্পায়নের সমক্ষে তদীয় আজ্ঞামুসাবে সম্বলৈদয়ে বাজা জনমেজয়েব নিকট যজ্ঞ-স্থলে কীর্তন কবিষাছিলেন, যাহাতে চতুর্বেদেব অর্থ গ্রথিত আছে, যাহা শ্রবণ করিলে চিত্ত শুদ্ধি ও শ্রেয়োবুদ্ধি হয়, অদ্ভুত-কীর্তি ব্যাসকৃত সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ কবিতে অভিলষ কবি ।”

ভাবতসংহিতার পবিচয় এই স্থলেই শেষ হয় নাই। এই সংহিতা-স্মিবিষ্ট আখ্যায়িকাব প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।

বিস্তবঃ কুরুবংশস্য গান্ধার্যা ধর্মশীলতাম্ ।

কন্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কৃত্যঃ সম্যক্

ষৈম্পায়নোহব্রবীৎ ।

বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাঞ্চ সত্যতাম্ ।

দ্রুবন্তঃ ধার্মরাত্রাণামুজ্জ্বলান্ ভগবান্ধিঃ ।

“কর্মফলভোগপ্রতীয়মানস্বরূপ কুরু-বংশের বিস্তাব গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিহুরেব প্রজ্ঞা, কৃত্যব ধৃতি, ভগবান বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যানিষ্ঠা, ও ধার্মরাত্রি-গণের দ্রুবন্তা, ভগবান মহর্ষি ষৈম্পায়ন এই সমুদায় মহাভারত মধ্যে কীর্তন করিয়াছেন ।”

এই প্রধান কাব্যকল্পনা ভারত-সংহিতায় প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল। পরে এই সংহিতাংশ নানাবিধ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সহিত বিস্তৃত হইয়া শত সহস্র শ্লোকে পূর্ণ হইয়াছে। এই কাব্য একরূপে রচিত ও বিন্যস্ত যে, ব্যাস তত্ত্বধ্যে পুরা-কল্পের কোন জ্ঞাতব্য বিবরণ সন্নিবেশ করিতে ক্ষমতা করেন নাই। তিনি সেই

সমস্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিবার ক্ষমতা স্থানে অবসর কবিয়া লইয়াছেন এবং পাত্র ও পাত্রীগণকে একপে সজ্জিত করিয়াছেন যে, তাহাদের কার্য ও সম্ভাষণ দ্বারা সমুদায় ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। কেবল সাজাইবার গুণে কাব্য এই রূপে ঐতিহাসিক গুণে ভূষিত হইয়াছে। সেই ঐতিহাসিক আব-বণে কাব্য ভাগ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণনাচাতুর্যে পাত্র ও পাত্রীগণ জীবন্তবর্ণে পবিদ্রষ্টমান হইয়াছে।

যে যে কথা ও প্রসঙ্গ মহাভারতকাব্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যাস ব্রহ্মাব সম-ক্ষেই পরিচয় দিয়াছেন। এই বিষয় সমুদায় অসংখ্য। “সমুদায় বেদেব ও অজ্ঞান নানা শাস্ত্রের রহস্ত; শিক্ষা, কল, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিকরু ও ছন্দ এই ছয় অঙ্গের সহিত যদ ও উপনিষদের বিস্তাব, ইতিহাস ও পুংগবের উৎসব ও সংগ্রহ, ত্রিবিধ কাল নিরূপণ, জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, আভাব প্রভৃতির নির্ণয়; বিবিধ ধর্মের লক্ষণ, বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, চাতু-র্ব্যবিধান, তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতিব স্থিতি ও পরিমাণ, যুগ-নিরূপণ, চতুর্বেদ, অধ্যাক্ষতত্ত্ব, জায়শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, দান-ধর্ম, পাণ্ডপত ধর্ম, দেবজন্ম ও মনুষ্য জন্মের বিবরণ, নদী, বন, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির নির্ণয়; প্রাচীন যুদ্ধ কৌশল, ধর্মবেদ, বাহ-রচনা, দুর্গ ও সেনারচনার বিধি, রাশি, অমাত্য, চোট প্রভৃতি বক্তৃত্তেদে বাক্যভেদ, লোকযাত্রাক্রম, নীতিশাস্ত্র”—প্রভৃতি বারো বাহা সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয়

বিষয় তৎসমুদায়ই মহাভাবত মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। নিখিল সংসার মহাভাবত মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনা বর্ণনায় বখন সমস্ত সংসার আনিয়া উপস্থিত হইতে পাবে না। প্রকৃত ও সামান্য ঘটনা ব্যাসের লেখনীর যোগাও নহে। তাঁহার লেখনীর যোগ্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড। সেই ব্রহ্মাণ্ডকে ও ব্রহ্মাণ্ডপতি নারায়ণকে সম্যকরূপে বিকাশ কবিয়া দেখাইবার জন্য মহাভাবতীয় বিবট কাব্যেব মঙ্গলকল্পনার সৃষ্টি। সেই বিবট মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য নিখিল সংসারের আয়োজন। আয়োজন, সব এক গ্রন্থ মধ্যেই। মহাভারতের বিশাল দেহে সেই দেদীপ্যমান বিবটমূর্ত্তি বিবাজিত আছে। যিনি সে মূর্ত্তি দেখিতে নাপান, তিনি মহাভারতের কিছুই দেখেন নাই।

যে মূর্ত্তি বিবচন করিবার জন্য মহাভাবতীয় কাব্যসৃষ্টিব কল্পনা, মহাভারত সেই মূর্ত্তিতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। প্রথমে তাহার ঈষদাভাস, পরে ক্রমশঃ সেই মূর্ত্তি অল্পে অল্পে আবির্ভূত হইয়া অবশেষে এত বিস্তারিত ও বিরাট বেশে প্রতীয়মান হইলেন যে, সমুদায় মানসপুংব একেবারে অধিকার করিয়া বসিলেন। চিত্ত তন্ময় হইয়া গেল, সমুদায় গ্রন্থ সেই মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইল।

বৈপাযন কৃষ্ণ এই বিশ্বরূপী ভগবান্ নারায়ণকে প্রতীয়মান করাইবার জন্য যে কাব্য-কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি মহাভাবত-কথা আরম্ভ করিবার প্রারম্ভেই সংকল্প করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহা-

ভারতীয় কাব্য-সৃষ্টিতে কিরূপে শুদ্ধ সমুদায় জ্ঞান বিগ্রহ-স্বরূপ পরমাত্মা প্রতীয়মান হইবেন তাহা কথিত হইতেছে—

“বক্ষ্যমান মহাভাবতের হৃদ্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্বরূপ, শকুনি তাহার শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন সমৃদ্ধ কলপুশ্প স্বরূপ এবং অমনীষী মহাবাজ ধৃতরাষ্ট্র এই ক্রোধময় মহাবৃক্ষের মূলস্বরূপ”।

এই গেল পাপ-পক্ষ। চীকাকার নীল-কণ্ঠ স্বামী এই পাপপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ঘেয, ঈর্ষা, অহুযাদি সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি হৃদ্যোধনের ভ্রাতৃগণ রূপে মহাভারতে কল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমরাও সংসার ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, এই পাপ প্রবৃত্তি সমুদায় শত আকারে যখন প্রধুনিত হইয়া উঠে তখনই তাহা ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া কার্যোন্মুখী হয়, এবং যখন তাহা কার্যোন্মুখী হয়, তখনই তাহা ক্রোধময় হৃদ্যোধন। সে ক্রোধের শাস্তি তুমুল সংগ্রাম ব্যতীত কিছুতেই সংঘটিত হয় না। পৃথিবীর কার্যক্ষেত্রে এই রূপই লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে যে সংগ্রাম অনিবার্যরূপে উদয় হয়, সেই সংগ্রামই কুরুক্ষেত্রের * যুদ্ধ। লোকে লোকে, জাতিতে জাতিতে, ব্যক্তিতে, ব্যক্তিকে রাজ্য রাজ্য, রাজ্য রাজ্য, প্রজাতি প্রজাতি, এই যুদ্ধ

* এই জন্য মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ বর্ধক্ষেত্র বলা হইয়াছে। যেমন উর্দ্ধের ক্ষেত্রে বীজ বপিত হইলে ক্রমে অঙ্কুরিত পরবর্ত্ত ও বদ্ধিত হইয়া কলপুশ্পালী রূপ রূপে পরিণত হয় সেই রূপ বর্ধক্ষেত্রে বর্ধবীজ বপিত হইয়া থাকে। এই জন্য প্রতি বলিয়াছেন কুরুক্ষেত্রের বর্ধক্ষেত্র।

নিয়ত ঘটতেছে। যেখানে পাপপক্ষ প্রবল হইয়া ক্রোধরূপে অলিয়া উঠিয়াছে, সেখানে বুদ্ধ ব্যাপার অনিবার্ধ্য। কিছুতেই তাহার শাস্তি নাই। বিনা কুলক্ষ্যে, বিনা রক্তপাতে, বিনা পাপের প্রশমনে ও ধ্বংশে তাহার শাস্তি চইবার কোন উপায় নাই। নিজে ব্রহ্ম ও সেযুদ্ধ নিবারণ কবিত্তে পাবেন না। এই প্রত্যক্ষ ব্যাপার মহাভারতীয় কল্পনা। মহাভারতীয় কল্পনায় পাপপক্ষ এই রূপ সাজাইয়া বেদব্যাস ধর্মপক্ষ কি রূপ সাজাইয়াছেন দেখুন—

“যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবুদ্ধ স্বরূপ, অর্জুন তাহার দ্বন্দ্ব স্বরূপ, ভীমসেন শাখা স্বরূপ, নকুল ও সহদেব শ্বশুরদ্বন্দ্ব পুংস ও ফল স্বরূপ; কৃষ্ণ (পবমান্বা) ব্রহ্ম (বেদ) ও ব্রাহ্মণগণ (বেদ উপদেষ্টা) এই ধর্মময় মহাবুদ্ধের মূল স্বরূপ।”

যিনি ধর্ম্মদ্বারা স্থির থাকিয়া জয়লাভ করেন তিনিই যুধিষ্ঠির। পরম ধৈর্য্যশীল প্রশান্ত ধর্ম্ম বিগ্রহেব কল্পনাই যুধিষ্ঠির। প্রশান্ত ভাবে ধর্ম্ম যুদ্ধে স্থিরাধিকার জয়লাভ করিতে গেলে সম, দম, সত্য, অহিংসাদির নিত্যান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই যুধিষ্ঠিরের সহায় স্বরূপ ভাতৃগণরূপে কল্পিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ স্বামী এই ধর্ম্মপক্ষের মর্ম্মব্যাক্য্য করিতে গিয়া সেই কথাই বলিয়াছেন। মানব-জন্মে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মপক্ষ উভয়ই বর্ত্তমান। সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে তাহার দেখা দেয়। এই প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে এক দিকে পাপের পক্ষ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, অন্য দিকে মানবের সজ্জিত সমুদায় স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উঠিতেছে।

যখন এই বিপবীত পক্ষদ্বয়ের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখনই মানব-জন্মে ধর্ম্মযুদ্ধের উপচয় হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মযুদ্ধের নাম কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধ। এই যুদ্ধেব এক পক্ষের নাথক ক্রোধময় হর্ষোদ্যন, অন্য পক্ষে সাহসিক জ্ঞান ও বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণরূপে সমুদায় সংগ্রামের নাথকর গ্রহণ করেন। এই অজ্ঞ বেদব্যাস ধর্ম্ম রূপী যুধিষ্ঠির রূপ মহাবুদ্ধের মূলে কি স্থাপন করিলেন? না—শুদ্ধ স্বময় জ্ঞান-বিগ্রহ-পবমান্বা রূপ শ্রীকৃষ্ণ, বেদ ও বেদান্ত রূপ ব্রহ্ম; এবং সেই বেদ উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ। আমরা মহাভারত মধ্যে কোন ব্যাপারে কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাই না। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণে পবিত্র হইয়া এবং বেদ ও শ্রীকৃষ্ণকে সমক্ষে রাখিয়া সকল কার্য্য সমাধা করিতেন। যে ধর্ম্ম-বিক্রমদ্বারা অর্জুন সাহসিক জ্ঞান রূপী কৃষ্ণেব সারথী হইয়া পরিচালিত না হয়, সে বিক্রম ধর্ম্মযুদ্ধে কখন বিজয়ী হইতে পারে না। ভগবান্ কর্ত্তক চালিত না হইলে ধর্ম্মবিক্রম কখনই ধর্ম্মকে সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। মানব-জন্মে ধর্ম্মযুদ্ধে যাহা সংঘটন হয় মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবিকল তাহাই ঘটয়াছে। ব্যাস মানব-জন্মে যাকে এই রূপ বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন যিনি এই যুদ্ধে জয়ী হইতে চাহেন, তিনি যেন সাহসিক বুদ্ধি দ্বারা বরাবর নিয়মান্বিত হন। সাহসিক জ্ঞানকে নারকত্ব না দিলে সংসার ক্ষেত্রে নিস্তার নাই। পাপ-পক্ষে অহর্নিশ বড়বড় করিয়া মানবকে মহা-কলুষ পক্ষে ডুবাইতে চাহে। সে বড়বড় ভেদ করিতে হইলে ভীক সাহসিকজ্ঞান

আবশ্যক। শুদ্ধ সাংখ্যজ্ঞান নহে, তাহা ধর্মবিক্রমে বলীযান হওয়া চাই। নর নারায়ণ একত্রে সংমিলিত হওয়া চাই। পুরুষ ও জ্ঞান একত্রে কার্য্য কবা চাই। তবে সংসার-ক্ষেত্রে জয়লাভের সম্ভাবনা। এই ব্যাপার লইয়া মহাভারতের সৃষ্টি। ব্যাস মহাভারতীয় ধর্মপক্ষেব কল্পনা এই রূপে সজ্জিত করিয়া ভগবান নারায়ণকে উজ্জলবর্ণে সর্বস্থলে পবিত্রশ্যমান করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি প্রথমে যে কৃষ্ণকে দেখাইয়াছেন, উত্তবোত্তর সেই কৃষ্ণের মূর্ত্তি চিত্রাকার ধারণ করিয়াছে। জগৎ সংসার যেমন নারায়ণের রূপ, মহাভাবতও তেমনি নারায়ণের রূপ। এই জন্ত ব্যাস গোড়াতেই বলিয়াছেন মহাভারতীয় মহা বৃষ্ণের

মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণশ্চ

মহাভাবতের প্রাবর্ত্তেই তাহার ঐকরূপ কাব্য পবিচয় আছে তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। ব্যাসের নিজ মুখের পবিচয় যাহা, তাহাই দিয়াছি। একথাব কাহার আপত্তি হইতে পারে না। এই কাব্য-নিষিষ্ট আখ্যায়িকার পাত্র ও পাত্রীগণ যে প্রকৃত ঐতিহাসিক লোক নহেন, তাহারা যে কেবল কাব্য-বচিত চরিত্র মাত্র, তাহাই যেন বিশেষ রূপে পবিচয় দিবার জন্ত, ব্যাস সেই পাত্র ও পাত্রীগণকে দেবসম্ভব করিয়া অদ্ভুত রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। কি পাণ্ডবগণ, কি কৌরবগণ, কি দ্রোণদী কাহারই জন্ম প্রাকৃত জন্ম নহে। তাঁহাদের উৎপত্তি ও জন্ম অদ্ভুত। তাঁহারা কেহই সাধারণ মনুষ্যের মত জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের

অলৌকিক জন্ম দিয়া ব্যাস তাঁহাদিগকে কাব্যের কল্পিত চরিত্র রূপে দেখাইয়াছেন। রামায়ণে যে রূপ দাশবর্ত্তিগণের জন্ম অদ্ভুত, মহাভাবতীয় কুরু পাণ্ডবগণের জন্মও তদ্রূপ অদ্ভুত। উহাও সকলেই কাব্যের চরিত্র ও কল্পনিক সৃষ্টি। ঐতিহাসিক-জনগণের সত্বিত উহাদের পার্থক্য এই রূপে প্রথমেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। পাছে-এসমক্ষে পাঠকের ভুল হয় এজন্ত আদিতেই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মহাভাবতীয় অনুরূপমণিকা ও আদিপর্বেব মাহাত্ম্য এই জন্ত এত অধিক। সে যাহা হউক, যিনি এই রূপ কাব্যনিদর্শন তুল্য করিয়া মহাভারতীয় প্রধান পাত্র ও পাত্রীগণকে প্রকৃত শরীরী ও ঐতিহাসিক চরিত্র রূপে গ্রহণ করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, সেই চরিত্রের সর্বাসঙ্গীন সম্ভতি সাধন কবা অতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেবল কাব্য-সৃষ্টি রূপেই তাহাদিগের সম্ভতি বক্ষা হয়, এবং আদর্শ চিত্র রূপেই তাহারা কাব্যে সম্ভাবিত হয়। নহিলে প্রকৃত মানব শরীরে একাধাবে এত গুণের একত্র সমাবেশ সম্ভবনীয় নহে। পাত্র সম্বন্ধে যাহা সত্য মহাভারতীয় ঘটনা সম্বন্ধে ও তাহাই সত্য। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। কৃষ্ণ যে বলিয়া ছিলেন—

“যদা যদাহি ধর্মন্ত প্রানির্ভবতি ভাবত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা আত্মং সৃজাম্যহং।

পবিত্রাণ্য সাধুনাং বিনাশাৎ চ দুষ্কৃতাং।

ধর্মসংস্থাপনার্থাৎ সম্ভবামি যুগে যুগে।”

একথা কি ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রমাণীকৃত হয়? পরিভ্রাণ্য সাধুনাং বিনাশাৎ চ দুষ্কৃতাং—একথা কি অসম্ভব অসম্ভব

মহাভাবত মধ্যে প্রমাণীকৃত হইয়াছে ? যখন তুমি একথা ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রমাণ কবিত্তে গেলে, তখন দেখিতে পাইলে মহাভাবতীয় ঘটনায় তাহাব কিছুই প্রমাণীকৃত হয় নাই । তন্ন তন্ন বিচাব কবিত্তে গেলে কেনা পাপী বলিয়া গণ্য হয় ? এমত কি যুধিষ্ঠিরকেও পাপ স্পর্শ কবিয়াছিল । তিনিও বিব্যাটগৃহে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মিথ্যা ব্যবহাব কবিয়াছিলেন । তাঁহাব অসত্য ব্যবহাব জন্ত নবক দর্শন হইয়াছিল । তবে কেন যুধিষ্ঠিরও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন না ? তত্রপ সকল পাপী কি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ? না সকল পুণ্যবানই মুক্তিরূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ? বাস্তবিক, বিচার্য কৃষ্ণোক্তি মহাভাবতে ঐতিহাসিক পবীক্ষায় তিষ্ঠিতে পারে না । কেবল কাব্য-কল্পনায় সে কথার যথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হয় । মহাভাবত একপে কল্পিত ও সজ্জিত, যে তাহাতে ধর্ম্মেরই উদ্ধাব সাধন হইয়াছে এবং অধর্ম্মের ধ্বংস হইয়াছে । প্রমাণে একথা খাটিবে না, কাবণ, কাব্য কোন কথা প্রমাণ কবিত্তে চাহে না । কাব্য ন্যায্যশাস্ত্র নহে, কাব্য বাস্তবিক ঘটনা ও ঐতিহাস নহে । কাব্যে প্রমাণ নাই, কিন্তু ভাবের সঞ্চাব আছে । কাব্যে এতদূব ভাবের প্রগাঢ়তা জন্মে যে হৃদয়ে সেই প্রগাঢ়তার বে সত্য সংস্কারবৎ বদ্ধমূল হইয়া বাধ, তাহা হৃদয় মধ্যে চিরকাল সঞ্চিত থাকে । মহাভারত পাঠে সেই কলের উদয় হয় । মহাভারতে কোন সত্য প্রমাণ করে নাই, কিন্তু ঘটনা-যোজন্য ও কল্পনার কৌশলে মনে একরূপ রসের সঞ্চাব

করিয়া দেয়, যদ্বারা মন আর্দ্র হইয়া যায় এবং সেই আর্দ্র চিত্তে সত্যসকল বদ্ধমূল ও জাজ্ঞ্যমান হইয়া থাকে । বিচক্ষণ পাঠকের মনে বিলক্ষণ প্রভীতি হইতে থাকে কৃষ্ণ যথার্থই বলিয়াছিলেন ;—

“পবিত্রাণ্য সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাঃ ।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥”

ব্যাস এত বিশদ রূপে গ্রহাব-স্তেই যে কাব্য-সৃষ্টির পবিচয় দিয়াছেন, বাঙ্গালীকিও গ্রহাব-স্তে তাহাব পবিচয় দিয়া গিয়াছেন । রামায়ণের আখ্যানভাগ দেবর্ষি নারদ গ্রহসূচনায় বলিয়া গেলেন । এই আখ্যানভাগ কবি কল্পনায় বিজ্ঞপ্তিত হইয়া কি আয়ত আকাব ধাবণ কবিয়াছে, তাহা আমরা বামাষণে দেখিতে পাই । ব্যাসের সৃষ্টি-রাজ্যে এইরূপ বেদমন্ত্রের একটা সামান্য বীজাকূব বর্জিত হইয়া কেমন শাল অশ্বথ বৃক্ষে পবিণত হইয়াছে, আমবা তাহারও পরিচয় দিয়াছি । বাস্তবিক কবির সৃষ্টি কল্পনার সামান্য বিষয় কত বৃহৎ আকাব ধাবণ করিতে পারে, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাই প্রমাণ করিতেছে । ঐক মহাকাব্যেও তাহা প্রভীত হয় । কিন্তু কবির অনুভব এত তন্ন তন্ন কবিয়া সকল বিষয় রচিত্তে পারে, যেন অনুমান হয় সে সমুদায় বাস্তবিকই ঘটনা যাইতেছে । কবির সৃষ্টি কাল্পনিক জগতে যেন বাস্তবিকতার মোহন ছড়াইয়া দিয়া সে জগৎকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান কবিয়া দেখায় । বাঙ্গালীর কল্পনায় এইরূপ কাব্য-সৃষ্টির শক্তি বিস্তমান দেখিয়া ব্রহ্মা বলিয়া গেলেন—

“হে কবিবর, তুমি নাবদেব মুখে ধীমান
রামের চরিত বিষয়ক যাহা শুনিয়াছ তাহা
বর্ণন কর। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও রাব্ধস-
গণের বিষয় যাহা তোমার অবিন্দিত আছে,
আমি বলিতেছি, সে সমুদায় তুমি জানিতে
পারিবে। রাম, প্রিয়তমা সীতা ও জনক
দশরথের সহিত কোন্ কোন্ সময়ে কি কি
কথা কহিয়াছিলেন, এবং প্রজাগণের
সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা
কিছুই তোমার অবিন্দিত থাকিবে না।”

বাল্মীকির কল্পনা সে সমুদায় দিব্য-
চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল। এই দিব্য চক্ষু
যাহার নাই তিনি কবি নহেন। বাল্মীকি
সেই দিব্যচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়া
গিয়াছেন, তাহা যেন সত্যসত্যই ঘটনা, ছে,
একরূপ প্রতীতি হয়। বাল্মীকি যেন সকল
বিষয় সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়া
গেলেন। তাঁহার তেজস্বী কল্পনা সমুদায়
প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। যাহা লিখিলেন
তাহা কাব্য লিখিলেন কি বাস্তবিক ঘটনার
বিবরণ দিলেন, তাহা ঠিক কবা দুষ্কর। এই
ঐতিহাসিক মোহ রামায়ণের কাব্যচরিত্র
চাকিয়া রাখিয়াছে। এই মোহাবরণ রামা-
য়ণে যেমন বিদ্যমান, মহাভারতে ও তেমনি
বিদ্যমান। সেই আখ্যান কাব্যই উৎকৃষ্ট
কাব্য, যাহা ইতিহাস রূপে প্রতীত হয়, এবং
সেই ইতিহাসই উৎকৃষ্ট ইতিহাস যাহা কাব্য-
রূপে প্রতীত হয়। অতি উৎকৃষ্ট আখ্যান
কাব্য বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারতে ঐতি-
হাসিক গুণ বর্জিত। এইজন্য ব্রহ্মা বাল্মী-
কিকে বলিয়া গিয়াছেন—

“তুমি কাব্যে রামবিষয়ক যাহা বর্ণন

করিবে, তাহাব কিছুই মিথ্যা হইবে না।”

“ম হে বাগনুতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।

বাস্তবিক রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা
বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে।
মানবের অন্তর্জগতে যাহা সত্য সত্যই
ঘটিয়া থাকে, মহাকাব্যে তাহাই বর্ণিত হয়।
অন্তর্জগতে যাহাব সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়
তাহাই প্রতীতি। রামায়ণ ও মহাভারতে
সেই প্রতীতি সমুদায় সাক্ষাৎ পবিদ্যমান
হইয়াছে। এজন্য রামায়ণ ও মহাভারতে
যাহা কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সমু-
দায়ই সত্য। মানবের জীবনক্ষেত্রে এই
ধর্মযুদ্ধের যথার্থ প্রতিদিন প্রতীক্ষমান হই-
তেছে। ইতিহাসই মিথ্যা না হইতে পারে,
কাব্য আবার মিথ্যা হইবে না, ব্রহ্মার এই
উক্তি আমবা এই রূপেই সত্য জ্ঞান করি।

মহাভারতকে কাব্য বলিয়া ব্যাসের পরি-
চয় দিবাব কাবণ আমবা পূর্বেই নির্দেশ
করিয়াছি। তিনি বোধ হয় দেখিয়া থাকি-
বেন, রামায়ণ কাব্য হইলেও সাধারণ লোকে
সচবাচর তাহা প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস
বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি
জানিতেন, রামায়ণ এক খানি মহাকাব্য।
পাছে মহাভারতও সেই রূপে সাধারণ-
গোচর হয়, তজ্জন্য তিনি তাহাব মূলেই
বলিয়া গেলেন, এমত কি ব্রহ্মাব সমক্ষে
বলিয়া গেলেন যে, মহাভারত একখানি মহা-
কাব্য। নিজ গ্রন্থের এই কপ স্পষ্ট পরিচয়
দিয়া তিনি রামায়ণের কলঙ্ক-মোচন জন্ত
জগতে অধ্যাত্ম রামায়ণের বচনা করিয়া
গিয়াছেন। মহাভারতীয় কাব্য পরিচয়ের
এই কাবণ নির্দেশ আমাদের অজ্ঞমান মাত্র।

আব একটি অল্পমান এই মহাভাবতীয় ঐতিহাসিক বিবরণ এত অধিক যে, পাছে তাহার সহিত তাহার কাব্যংশও ভেদিত্বা যায এজন্ত বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে মহাভাবতে প্রকৃত ও প্রাকৃত বিবরণ অধিক পরিমাণে থাকিলে ও মূলতাহা কাব্য মাত্র । তাহার কোন্ অংশ কাব্য এবং তাহাতে কি কি প্রকৃত ও প্রাকৃত বিবরণ আছে, গ্রন্থের অনুক্রমণিকা ভাগেই তাহা বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । বামাংশে এত বিশেষ কবিয়া পরিচয় দেওয়া নাই । কারণ প্রথমে বাঙ্গালীকি, তাব পব ব্যাস,—বাঙ্গালীকি সর্বাংশে ব্যাসের পথ-প্রদর্শক । বাঙ্গালীকি অগ্রে নিজ মহাকাব্যের বচনা করিয়া জগতে যে আদর্শ দিয়া গেলেন, ব্যাস তাহার অনুসরণ কবিয়া নিজ কাব্য বচনা করিলেন । সুতরাং বাঙ্গালীকির এই নূতন সৃষ্টি-শক্তি যশ ও গৌরব জগতে চিরদিন ঘোষিত হইবে । বাঙ্গালীকির মুখ হইতেই যাহা ? জগতে কাব্য-শ্লোক নিম্নত হইয়াছি রই কাব্য প্রথমে সংজ্ঞীত হইয়াছি তাহারই কল্পনা হইতে সর্বপ্রথমেই সম্পূর্ণ নিবন্ধ-নিবন্ধ-মহাকাব্য সমুদ্ভূত হইয়াছে । বাঙ্গালীকি শুদ্ধ যে জগতের আদিকবি ছিলেন

এমত নহে, তিনি আদিকবি হইয়া মহাকাব্যেও আদর্শ দিয়া গিয়াছেন । তাহার সৃষ্টি-শক্তি শুদ্ধ যে এক নূতন মহাকাব্য-কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছিল এমত নহে, সেই কল্পনায যে রূপ বিস্তারিত রচনার কাব্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সে রূপ রচনা প্রাচুর্য্য জগতে অল্পই লক্ষিত হয় । ব্যাস এই রচনাভাণ্ডার আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন । বাঙ্গালীকির গৌরব আবিষ্কারে, ব্যাসের গৌরব উন্নতি-সাধনে । ব্যাস মহাকাব্যের রচনা-বিশুদ্ধিতে এক মহা অন্তর্জগতের সৃষ্টি কবিয়া গিয়াছেন । তিনি বাঙ্গালীকির জগতকে আবও প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন । তিনি সৃষ্টির উপর সৃষ্টি কবিয়া জ্ঞানবান্ধ্য বাড়াইয়া গিয়াছেন । তিনি বাঙ্গালীকির মুখোজ্জল ককিহে, বাঙ্গালীকির কীর্ত্তিপতাকা গোবরের স্রবণে জগতে প্রসারিত কবিয়া গিয়াছে । জগতের কোন্ কবি এরূপ কে আর অনুসরণ করিয়া বরং তদপেক্ষা সে-প্রতিষ্ঠা রাখিয়া গিয়াছেন ? এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল । বাস্তবিক ব্যাস ও বাঙ্গালীকি জগতের সাহিত্য দেশে দুই অতুল-নীষ কীর্ত্তিস্তম্ভ ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্রবসু ।

রাধাসুন্দরী ।

(ব্রজভাব)

১

কে ওই কপেব বাশি, সংসার মাঝারে,
শতচন্দ্র পরকাশি,
মুখেতে মধুর হাসি,
উদাসী গোকুলবাসী, হেবিষে যাহারে,
যারে সদা ডাকে বাঁশী যমুনার ধারে ?

২

ভুবন ভুলায় ওই বাধিকা সুন্দরী !
যাহারে করিয়া বৃকে
যমুনা বহিছে স্নেহে,
মধুব মলয় মুখে, নাচায়ে লহরী
যথায় কদম্ব মূলে বাজিছে বাঁ

৩

কাবে তুমি ডাক পিক মঞ্জু কুঞ্জবনে ?
ডাক বৃক্ষি রাধিকায,
বসন্ত এলো ধবাস,
বহিছে মলয় বায়, সৌবভের সনে ;
ডাকে রাধানাথ ওই রাধিকা-রতনে ।

৪

কার পানে চেয়ে আছি কুসুম স্তম্ভব ?
দেখ বৃক্ষি কপ তাঁর,
যিনি সংসারের সার,
তুলনা নাহিক ঐশ্বর, ভুবন ভিতর ;
ঐশ্বর পানে চেয়ে সদা শ্যাম মনোহর ।

৫

কার রূপে বাঁধা তুমি মায়া'র সংসার ?
যাব পবমার্থ তবি,
সংসার-সাগরে ধবি,
অনায়াসে হতে পাবি, পাবাবাব পার ;
সে মায়া'র তরি স্নেহ, আছে রাধিকার ।

৬

কে পারে সে মায়া-ডোব কাটাতে সংসারে ?
শুনিয়া বাঁশীব গান,
আকুল যাহার প্রাণ,
যে ত্যজিতে কুলমান, অনায়াসে পারে ;
সেই কাটে মায়াডোর, সংসার মাঝারে ।

৭

কে পারে কলঙ্ক ডালি বহিতে মাধায় ?
যে এসেছে ব্রজপুর,
সংসার করিয়া দূর,
ত বাঁশরী শ্রব, বকুল তলায় ;
কলঙ্কে ডালি শোভে সেই বাধিকায় ।

*এই কবিতার, রাধা—মানবের সাত্ত্বিক প্রকৃতি;
যমুনা—সূর্য্য তনয়া অর্থাৎ দেবপ্রসূতা প্রকৃতি-
স্রোত, বাঁশীরব—শান্তিপ্রদ; কদম্ব প্রকৃতি
বৃক্ষ—সংসার, বসন্তাদি—বর্ষোৎসাহ কালীন
ভাব-বিকাশ; কুসুম—সৌন্দর্য্যবোধ; গোকুল ও
ব্রজপুর—অন্তর্বিরাগাধাম বা ভক্ত-সমাজ; কলঙ্ক
—সংসারীর কাছে বিহুতত্ত্ববৈরাগীর কলঙ্ক, মান—
দ্যানজ ইশ্বর-বিরহ-কাতরতা; বিদেশিনী, নাপিতানী,
যোদী—মান-পরিমাণ অনস্বল্প ইশ্বরবির্তাব;
সত্যভামা—সাত্ত্বিকী ঐশ্বর্য্য-স্বামিনী এবং কুঞ্জবন—
ঈশ্বর রবণ-পুর অন্তর্ধান ।

৮

কে পারে বাঁধিতে প্রেমে জগৎ, সংসার ?
যে জন করিলে মান,
সংসার আঁধার জ্ঞান,
জ্ঞানের প্রেমের মান, উথলে অপার ;
এ জগৎ বাঁধা প্রেমে সেই রাধিকার ।

৯

কার তরে বিদেশিনী, ফের এই ভবে,
হরে এত ব্যাকুলিত,
গাইছ কাহার গীত,
মোহিত ব্রজের চিত, শুনে গীত সবে ;
প্রেম গোকুল আজি রাধা রাধা রবে ?

১০

ফিরিছ অলঙ্ক হাতে কারে / ভূষিবারে ?
রঞ্জিতে রাধার পদ,
সাজাইয়া কোকনদ,
শ্রামনাম স্তম্ভপদ, শত শত বাবে ,
তাতে কি ভুলাতে পার মানিনী রাধারে ?

১১

কি ধন লাগিযে যোগি, ফের দেশে দেশে ?
সে ধন অমূল্য রাই,
ভিক্ষা বিনা গতি নাই,
মাগ ভিক্ষা তাঁর ঠাই, যোগীবর বেশে ।
ও মান-তরঙ্গে মান, সব যায় ভেসে ।

১২

হৃদয় রাধার মান, অসাধ্য সাধন,
দাসীরে আশীশ কর,
অর্থথালে ভিক্ষা ধর,
ছল কর যোগীবর—মান-ভিক্ষা-ধন ।
ভাঙ্গিল রাধার মান চল কুঞ্জবন ।

১৩

কে পারে কবিত্তে জয় এ বিশ্ব সংসার ?
বাড়াইতে যার মান
চূড়া ধড়া স্রিয়মান,
পদতলে কর-দান যে রাই রাধার,
এ বিশ্ব বুটায় পাব সেই রাধিকার ।

(প্রভাস মিলন ।)

১৪

আইল প্রভাসে রাই শ্যাম দরশনে,
মুখে মুছ মুছ হাসে,
উল্লাসে সখীরা ভাসে,
রূপে আলো কবি আসে, বাধা কুঞ্জবনে ।
সত্যভামা হ'ল হাবা আজি শ্যামধনে ।

১৫

কহে, বামা সত্যভামা গিয়া কুঞ্জবনে,
রাধানামা কে মুন্দরী,
প্রভাসেতে আলো কবি,
কে আজি লইল হরি, মোর কুঞ্জন ?
সে নামে পাগল হরি, রাজ-সিংহাসনে ।

১৬

গোকুল-মুন্দরী রাই হেবিব রাধার,
আজি আমাদের ভূপ,
সেজেছে কি অপরূপ,
শ্রামপাশে রাধারূপ, কিরূপ শোভায় ?
ছেড়ে দে রে দ্রুতি, দেখি সেই রাধিকায় ।

১৭

কুঞ্জ-আড়ে দেখা যায় কেশ রাশি কার ?
ওই কি রূপের রাই,
মাধার বসন নাই,
ভূতলে পোড়েছে ধাই, সরম লজ্জার !
কিবা আলু থালু বেশ, রূপসী রাধার !

সম্মিলিত স্থান সমূহের শীত গ্রীষ্মের যেরূপ তাবতম্য লক্ষিত হয়, উত্তরাধিকারস্থান সমূহে তদপেক্ষা অধিক নূন্যাদিকা লক্ষিত হয় না; সেই কারণে বশতঃ মাস্ত্রাজ প্রভৃতি অন্যান্য বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ স্থানগুলি অপেক্ষা কলিকাতার জল বায়ু অল্প এক-ভাবাপন্ন দেখা যায়। সমুদ্রের সান্নিধ্যবশতঃ কলিকাতাবাসিগণের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অথবা ভাবতীয় অপরাপর আভ্যন্তরীণ দেশবাসিগণের ন্যায় ঋতু সালের আতিশর্ঘ্য অনুভব কবিতো হয় না। এখানে তিনটি ঋতুর প্রভাব বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়, গ্রীষ্ম ঋতু, চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাসে বৃষ্টির আবন্ত পর্য্যন্ত, বর্ষা ঋতু, সচবাচর আষাঢ় মাসে আবন্ত হইয়া ভাদ্র-মাস পর্য্যন্ত ও কখন কখন আরও অধিক দিন স্থায়ী হইতে দেখা যায়, এবং শীতঋতু, অগ্রহায়ণ হইতে আবন্ত করিয়া মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ এবং মাঘ মাসের প্রথমাংশে সচবাচর শীতের প্রকোপ অধিক দৃষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই রৌদ্রের প্রখরতা সর্বাপেক্ষা অধিক। সমস্ত বৎসরের গড় উষ্ণতা ৭৯.৪° । গ্রীষ্ম (ক) ৮৪.৫° বর্ষা ৮৩.৩° এবং শীতঋতুর ৭১.৫° গড় উষ্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে ১৮৬৭ এবং ১৮৭৩ মে মাসে এই দুইবার ছায়া মধ্যে সর্বোচ্চ ১০৬° এবং ১৮৭৭ জ্যৈষ্ঠাব্দী মাসে খোলার চালের নিম্নে ৫১.৪° উষ্ণতা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যে সময়ে বাতাস প্রধামতঃ পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিম (নৈঋত

কোণ) দিক হইতে বহিতে থাকে, এবং সময়ে সময়ে উহার উত্তাপ ১০০° উপরে ও উত্তিত হয়; ঐ সময়ে কলিকাতাবাসিগণ শুমধুব সমুদ্র-বায়ু উপভোগ কবিতো পাবেন। আভ্যন্তরীণ দেশসমূহবাসিদিগের এ সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। উক্ত বায়ু প্রায়ই অপবাহে আবন্ত হইয়া সূর্যাস্তের পর কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। সচবাচর পশ্চিম দিক্ষা উত্তর পশ্চিম (বায়ুকোণ) হইতে জোব বায়ু (খ) আসিয়া এই সময়ের উত্তাপের আতিশর্ঘ্য উপশমিত কবিয়া থাকে। ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অত্যন্ত প্রবল বায়ুর হলুকা প্রবাহিত এবং ধূলা রাশি উত্তিত হইয়া বটিকার আগমন বার্তা বিজ্ঞাপিত কবে। এই বটিকার সময় প্রায়ই প্রচণ্ড বিদ্যুৎ ঘন ঘন চমকিত হইতে থাকে, এবং বৎসরের এই সময়ে প্রায়ই অনেক ক্ষণ ধরিয়া বজ্রপতন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতার বায়ুর আর্দ্রতা (humidity) পরিমাণ সচবাচর কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। বায়ুর আর্দ্রতা দ্বিবিধ নিরপেক্ষ (positive) এবং আপেক্ষিক (relative) এই উভয়বিধ আর্দ্রতার যে বিশেষ প্রভেদ আছে তাহা আমরা এস্থলে বুঝিবার চেষ্টা করিব। বায়ুতে ঠিক যে পরিমাণ (actual quantity) জলীয় বাষ্প বা জল কণা থাকে, এবং যাহা বায়ুর বিস্তৃতি অনুসারে পরিমিত হয় তাহাই নিরপেক্ষ

(ক) জ্যৈষ্ঠ মাসের গড় উষ্ণতা ৮৬.৯

(গ) ইহাকে (North-Western উত্তর পশ্চিমীর ঋতুক) (storm বলিয়া থাকে।

আর্দ্রতা। বায়ুতে কত অংশ শুষ্ক বায়ু এবং কত অংশ জলীয় বাষ্প বা জলীয় কণা আছে তাহারইপরিমাণেব নাম আপেক্ষিক আর্দ্রতা। ব্র্যানফোর্ড সাহেব নির্ণয় কবিযাছেন যে, সমস্ত বৎসব কলিকাতাব বায়ুব এক সহ-স্রাংশে গড় ৭৬২ পরিমাণ জলীয় বাষ্প বা জল কণা থাকে, অন্যত্র লণ্ডন নগরে কেবল ১৭৬ মাত্র। (গ) কলিকাতাব সঙ্গে তুলনা কবিলে লণ্ডন নগরের বায়ুব জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অর্ধেকের ও কম। কিন্তু যদ্যপি কলিকাতার সঙ্গে লণ্ডন নগরের বায়ুব আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity) তুলনা করা যায়, তাহা হইলে (বায়ুব আর্দ্রতাব পূর্ণমাত্রা (saturation) ১ সংখ্যা হইলে কলিকাতাব বাৎসরিক আপেক্ষিক আর্দ্রতা গড় ৭৬ হয় এবং লণ্ডন নগরে উহাব পরিমাণ ৮৯ হয়। ইহাতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে কলিকাতা অপেক্ষা লণ্ডন নগরের বায়ুব জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইবে পড়ে। অর্থাৎ বায়ুব আর্দ্রতাব পূর্ণমাত্রা (saturation) যদ্যপি এক ১ সংখ্যা হইল এবং কলিকাতার বায়ুতে ৭৬ অংশ জলীয় বাষ্প থাকিল তাহা হইলে উহার পূর্ণ মাত্রা প্রাপ্ত হইতে হইলে ২৪ অংশ পরিমাণ জলীয় বাষ্পের আবশ্যক। কিন্তু অন্যত্র লণ্ডন নগরে আর্দ্রতার পরিমাণ ৮৯ তাহা হইলে উহার পূর্ণমাত্রা পাইতে হইলে কেবল ১১ অংশ পরিমাণ জলীয় বাষ্পের আবশ্যক। এক্ষণে পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যদ্যপি

কলিকাতার সহিত লণ্ডন নগরের আপেক্ষিক আর্দ্রতার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে লণ্ডন নগরের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কলিকাতা অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে। তাহা হইলে প্রতীপন্ন হয় যে কলিকাতা অপেক্ষা লণ্ডনের বায়ুব আর্দ্রতা অধিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে এবং কেন নহে সে বিষয়ের বিচার আমরা এ স্থলে করিব না, কাবণ উহা আমাদের অন্তঃসন্ধানের সীমার বহির্ভূত। যদ্যপি কোন পাঠকের উহা জানিবার কৌতুহল আছে তাহা হইলে উক্ত বিষয় অন্যত্র পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

পরিশেষে পূর্বোক্ত নিবন্ধেপ আর্দ্রতা মতানুসারে লণ্ডন নগরের অপেক্ষা কলিকাতার বায়ুব আর্দ্রতা যে অধিক এই তথ্যটি সমর্থনের জন্য আমরা দুই একটা কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। অনেকেই অবগত আছেন যে আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য সর্বদা যে বায়ু গ্রহণ করি তাহাতে যদ্যপি জলীয় অংশের পরিমাণ অধিক থাকে, তাহা হইলে উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক হানিকর হয়, সেই জন্যই লণ্ডন নগর অপেক্ষা কলিকাতার স্বাস্থ্য অধিক মন্দ এবং সেই কারণে উভয় প্রদেশের মনুষ্যের গঠন ও আয়ু প্রভৃতির এত দূর প্রভেদ। ইহাতে আমরা এরূপ বলিতেছি না যে এই একটা কারণ বশতঃই উক্ত প্রভেদ ঘটয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক কারণ ও আছে বটে, কিন্তু ইহাকে একটা প্রধান কাবণ বলা যাইতে পারে। ব্র্যানফোর্ড সাহেব বলেন যে “তাপমাত্রা (temperature) ব্যতীত

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের তাবতম্যই স্থান বিশেষের স্বাস্থ্যভেদের প্রধান কারণ ” ।

কলিকাতার বাৎসরিক গড় ৬৬°০৪ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়িয়া থাকে (ঘ) অন্তর কলিকাতার ৫০ ফ্রোশ নিয়ে সাগর দ্বীপে উহার অপেক্ষা অনেক অধিক বৃষ্টি হয়। উহার পরিমাণ ৮২°২৯ ইঞ্চি। বাৎসরিক বৃষ্টি পতনের বিষয় বত দূর লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়; উহার পরিমাণ ৯২°৩১ ইঞ্চি (ঙ) এবং বিগত ৪৭ বৎসরের মধ্যে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৪৩°৬১ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টি পড়িয়া ছিল। এই পরিমাণ বাৎসরিক গড় বৃষ্টি-পতনের অর্ধেক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে কলিকাতায় যে বৎসর বৃষ্টির পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয় সে বৎসর উত্তর ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে জুর্ভিক্ষের নিশ্চয় লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহার কারণ এই যে মেঘ সকল সমুদ্রের দিক হইতে আসিয়া বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া তৎপরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলভিত্তিকে গমন করিয়া থাকে। যে বৎসর বঙ্গদেশে মেঘ অল্প আইসে ও বৃষ্টির পরিমাণ অল্প হয়, সে বৎসর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অত্যন্ত অল্প মেঘ ঘাইয়া থাকে সুতরাং উক্ত স্থানে বৃষ্টির

পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে ঐ বৃষ্টির পরিমাণ এত অল্প হয় যে উহাকে এক প্রকার আনাবৃষ্টি বলিলেও অত্যাুক্তি হয়না। ফলতঃ আনাবৃষ্টি বশতঃ শস্যের অভাবে কখন কখন জুর্ভিক্ষ পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এবং উহার পূর্বের বৎসর কলিকাতার বাৎসরিক গড় ৫২°৯৯ এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫২°৬১ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হওয়া প্রযুক্ত উক্ত বৎসর শস্যের অভাব হয়। শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে অর্থাৎ গড় ৪১°১৮ ইঞ্চি এবং পৌষ মাসের শেষে সর্বাপেক্ষা অল্প হয় উহার পরিমাণ গড় ০°২৪ ইঞ্চি মাত্র।

কলিকাতার গড় বায়ু ভার (atmospheric pressure) সমুদ্র সমতল হইতে ১৮ ফিট এবং বায়ুমাণ যন্ত্রে ২৯°৭৯২ ইঞ্চি উচ্চে যেখানে পাওয়া যায়। ডিসেম্বর মাসে ইহার উচ্চতা সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। ঐ সময়ে ৩০°০৪১ ইঞ্চি উর্ধ্বে উথিত হয়, এবং জুন ও জুলাই মাসে সর্বাপেক্ষা নিম্নে অববোহণ করে; এই সময়ে ইহার নিম্নতা ২৯°৫৫১ ইঞ্চি হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে বায়ুমাণ যন্ত্র দ্বাবাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই বার আরোহণ ও অববোহণ করিয়া থাকে এবং এই বায়ুমাণ যন্ত্রের জোয়ার ভাঁটা ঘড়ীর কাঁটায় কাঁটায় ঠিক নিযমিত রূপে ঘটিতে দেখা যায়। ফাদার ল্যাফোঁ (Father Lafont) বলেন যে “প্রথম রাজি, চাব ঘটিকার সময় হইতে বায়ুমাণ যন্ত্রের পারদ ধীরে ধীরে ও স্থির ভাবে আরোহণ করিতে থাকে। এই রূপে ক্রমশঃ দিবা

(ঘ) Vide Table of Average monthly and Annual Rainfall in Northern India. By Mr. Blanford

(ঙ) ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১১মে তারিখে ৩ ঘণ্টার ১২ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়িয়া ছিল। বতদূর লিপিবদ্ধ আছে, এই পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক।

সাড়ে নয় ঘটিকা পর্যন্ত উঠিয়া পুনর্কীব
ক্রমশঃ অবরোহণ কবিতো থাকে। এই
রূপে অপবাহ চার পাঁচ ঘটিকার সময় বায়ু-
মাণ যন্ত্রের নল মধ্যে ক্রমশঃ নামিতে থাকে।
উক্ত প্রকারে আমবা দিবা রাত্রেব প্রায় ঠিক
একই সময়ে উক্ত জোয়ারেব দুই বার হ্রাস
ও বৃদ্ধি দেখিতে পাই”।

কলিকাতাব জল বায়ু ও ঋতু প্রভৃতি
স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহেব শেষ কবিবাব
পূর্বে চক্র-গতি-শীল (rotary) বড়ের
বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করানিতান্ত আবশ্যক।
এতদেশবাসিগণ বিশেষ রূপে অবগত
আছেন যে সময়ে সময়ে ভীষণ ঝটিকা ও
বাত্যা দ্বাবায় সমুদ্র নিকটস্থ বঙ্গদেশান্তর্গত
স্থান সমূহেব কত দূর অনিষ্টাপাত হইয়া
থাকে। এই মহতী ঝটিকা প্রভাতে বন্দবস্থ
বাণিজ্য পোত দূবে নিক্ষিপ্ত, বৃক্ষা উৎপা-
টিত, অটালিকা সমূহ ভূমিসাৎ এবং বশেষতঃ
সহস্র সহস্র মনুষ্য জীবনেব হারি কবিয়া
সময়ে সময়ে এতদেশেব যে কি ভয়ানক
অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে তাহা বঙ্গবাসী
অবিদিত নাই। ইদানীন্তন কালে যে
কয়েকটি ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে এবং
তদ্বাবা এদেশেব যে কি পবিণাম অমঙ্গল
সাধিত হইয়াছে তাহা এখন ও স্মৃতি পটে
উদিত হইলে হৃদকম্প উপস্থিত হয়। ঐ
সকলের বিষয় আমবা পশ্চাতে উল্লেখ করিব।
এক্ষণে কেবল মাত্র আমবা যে সকল বাৎস-
রিক ঝটিকা প্রভৃতি নিয়মিত রূপে ঘটিয়া
থাকে সেই বিষয়েব উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত
হইব। ইহা প্রতি বৎসর দুইটি নির্দিষ্ট
সময়ে ঘটিয়া থাকে। প্রথম নৈশকী মৌসুমী

বায়ু আরম্ভ হইবাব সময় এবং উহার শেষ
হইবাব সময় (চ) পূর্বোক্ত সময়ে যে ঝটিকা
আবস্ত হয উহা প্রায় সচরাচর আশ্রামন
দ্বীপ পুঞ্জেব কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে উদ্ভিত
হয এবং ইহা আরম্ভ হইবাব কিছুদিন পূর্ব
হইতে বায়ুমাণ যন্ত্রেব স্থির ভাবে অধিক
পরিমাণে অবরোহণ হইতে দেখা যায়, ইহাই
উক্ত ঝটিকারস্তেব সঙ্গাপক। শেফাল সময়ে
যে ঝটিকাবস্ত হয উহা বঙ্গোপসাগরেব
কিছু দূর হইতে উদ্ভিত হয়, কিন্তু উহার
আগমনেব পূর্বে বায়ুমাণ যন্ত্রেব দ্বারায়
কিছু অবগত হওয়া যায় না। এই ধ্বংস-
কারী ঝটিকা সমূহ প্রথমে পূর্বোক্ত স্থান-
দ্বয়েব যে স্থান হইতে উদ্ভিত হয় সেই স্থানেই
দুই তিন দিবস অবস্থিতি পূর্বক ইহাব
সম্পূর্ণ বল সংগ্রহ কবিতো থাকে, তৎপরে
বায়ুকোণাভিমুখে উহাব গতি আবস্ত হয
এবং ক্রমশঃ যেমন উহা অগ্রসব হইতে থাকে
উহাব বল ও ভীষণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে
থাকে। এই ঝটিকাব মধ্যবর্তী প্রদেশ (ছ)
অত্যন্ত প্রবল বায়ু সমষ্টিব দ্বাবাববেষ্টিত
থাকে এবং ঐ বায়ু সমূহ উক্ত প্রদেশের
চতুর্দিকে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হয এবং সজোরে
মধ্যবর্তী প্রদেশে প্রবেশ কবিতো থাকে।
যখন এই রূপ ঝটিকার মধ্যবর্তী প্রদেশ যে
কোন নির্দিষ্ট স্থানেব (জ) উপব দিয়া গমন

(চ) চৈত্র বা বৈশাখ মাস অবধি তাম্র বা
অশ্বিন মাস পর্য্যন্ত।

(ছ) এই স্থানে সম্পূর্ণ স্থিরতা বিরাজ করে।
ইহাকে “ঝটিকান্দ” (Eye of the Storm) বলিয়া
থাকে।

(জ) কলিকাতার বৎসর ঝড় হয় তখন উহা
পূর্বে কিবা পূর্ব ও ঈশান কোণের (E. N. E.)
বা ঈশক হইতে আসিয়া থাকে।

কবিবে তাহার পূর্বে বায়ু একটি নির্দিষ্ট দিক হইতে বহিতে থাকে এবং উহাৰ বেগ ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । পবে ঐ মধ্য প্রদেশ (central calm) ঐ স্থানের উপর আসিয়া পৌঁছে । যখন আসিয়া পৌঁছে তখন সেই স্থানের বায়ু কোন গতি থাকে না । উহা স্থিরভাবে গ্রহণ কবে । তৎপবে আবার যে দিক হইতে বায়ু বহিতে ছিল তাহার বিপরীত দিক হইতে ভয়ানক বেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে থাকে এবং ইহার বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে ।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৪ই অক্টোবরের পবে আব একপ ঝটিকার মধ্যপ্রদেশ কলিকাতা অতিক্রম কবে নাই (ক) কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের

(ক) Se'nth memoir on the Law of storm "by Mr. H. Peddington—Vide Journal As Soc Bengal Vol. XI.

ষে ঝড় হয় ঐ সময়ে উহার মধ্য প্রদেশ কলিকাতার কয়েক মাইল পশ্চিম দিয়া অতিক্রম কবিয়া ছিল ; উহাতে ও কলিকাতা নগরের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটনা ছিল । কলিকাতার নিম্নে ভাগীরথীতে যে সমস্ত জাহাজ নঙ্গব কবা ছিল ঐ সকলকে নঙ্গব হইতে বহুদূরে তাড়িত কবিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং উহাৰ মধ্যে অনেকগুলি ভগ্ন হইয়াছিল । উক্ত ঘটনার পব হইতে বাণিজ্য তরী সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞাপিত কবিবার জন্ত এক প্রকার ঝটিকা-সঙ্কেত (storm signal) স্থাপিত হইয়াছে । এক্ষণে ঝটিকা হইবার পূর্ব-লক্ষণ হইলেই কলিকাতার ভাগীরথীর নিম্নস্থ আব তিনটা নির্দ্ধারিত স্থানে উক্ত প্রকার ঝটিকা-সঙ্কেত প্রদর্শিত হইয়া থাকে ।

শ্রীঅম্বোবনাথ দত্ত ।

রাখাল বালকের গান ।

(মূল্যতানী-বাহার) ।

(১)

বন-ফুলের হার পরিয়ে গলে এমনি ক'বে
মদন মোহন,
বৃন্দাবনে রাখাল সনে ফুল মনে খেলত
কেমন ॥
শ্রীদাম সুদাম মনের সাথে,
খেলত কত ভাবের ছাঁদে,
ভক্তি-কুসুম ঢেলে দিত কাহ্নর পদ-
কোকনদে ;
আড়াল থেকে বলাই দাদা কর্তো লে
ভাব দরশন ॥

(২)

এমনি ষত ধবল শ্যামল—বাঁশীর রবে
আকুল হ'য়ে,
হাষা রবে ধেষে যেত—কি জানি কি
আদর পেয়ে ।
কহু কহু কহু ছপূর বোলে,
গোপিনী কুল যেত গ'লে,
প্রাণের কাহ্ন বাজিয়ে বেণু আনত দেখু
দলে দলে ;
কাল-স্রোতে সব ভেসেছে শুধুই আছি
নিম্নে স্মরণ ॥
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

বাল্য-বিবাহ।

(প্রথম প্রস্তাব)

স্বতম পঁচা বলিয়া গিয়াছেন “আজব সহব কলিকাতা” — হজুক কলিকাতাব প্রাণ। এত বড় সহব একটা হজুক না লইয়া কি থাকিতে পারে? একগক সাহিত্য-জগতের হজুক বাল্যবিবাহ। হজুক বলিবাব কামণ এই, বাল্যবিবাহের আন্দোলন যেকপ আকার ধারণ করিয়াছিল, সেকপ আন্দোলনের কোন আবশ্যকতা ছিল না, অথচ তাহাই লইয়া একটা হৈ চৈ হইয়াছে। এ আন্দোলনের স্ত্র যাহা তাহাব উদ্দেশ্য প্রকাশ্য সভাব আন্দোলন করিয়া সুসিদ্ধ হইতৈ পারে না, ববং তজ্জপ আন্দোলনে সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত ঘটে। সে উদ্দেশ্য শোভা বাজাবেব রাজবাটীতে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যে দ্বিতীয় সভা হয় তদ্বাব অনেক পবিমাণে সুসিদ্ধ হইয়াছে। বাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে ঐকপ স্থিবভাবে নিদ্ধন্দ্ব হিন্দু শাস্ত্রীয় মতামত গ্রহণ করিয়া রাজসমীপে তাহা প্রেবণ কবাই যথেষ্ট। সে বিষয় লইয়া প্রকাশ্য সভায় আপনাপনি একটা ঘবওষা বিবাদ করিলে ববং আপনাদিগেবই পায়ে কুড়ুল মাবা হয়। সেকপ আন্দোলনের হজুক না তুলিয়া নিবস্ত

হওয়াই আমাদের উচিত ছিল। আন্দোলন কবিবাব সময় আছে। এক্ষণে আব বাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য নাই স্ত্রতবা: আন্দোলনের অসমর্থ নহে।

আব এক কাবণে বাল্যবিবাহের আন্দোলন অনাবশ্যক। এক্ষণে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইতেছে, তাহা শুদ্ধমেয়েদের বিবাহ লইয়া আন্দোলন। কিন্তু পূর্বে যে কপ বালিকা-বিবাহের বীতি ছিল, এক্ষণে তাহাব অনেক শিথিলতা আপনাপনি ঘটিয়া আসিয়াছে। এখন অনেক কাবণে তন্ত্র-সমাজে বালিকা-বিবাহ ১০। ১২ বৎসরের নীচে হয় না ববং তদুর্ক্বে কোন কোন স্থলে ঘটিয়া থাকে। নিতান্ত উপযুক্ত পাতাভাবে দুই একটা বালিকাব বিবাহ কাল ঐ সময় অতীত হইয়া যায়। কিন্তু তাহা নিয়ম নহে নিয়মের নিপাতন। অনেক কাবণে আমরাদিককে অত্যন্ত বাধাবাধি ছাড়িয়া দিয়া বর্তমান উদার নীতি অবলম্বন কবিতে হইয়াছে। যেকপ সমাজের গতি, তাহাতে অনুমান হয় সেই উদারতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সে গতি কেহ বোধ

* আমরা এই প্রস্তাব-লেখক হইতে যে পত্রখানি পাইবাহি, তাহা উদ্ধৃত করিলাম। বি: প্র:

“মহাশয়, সামাজিক প্রস্তাব এক্ষণে আমাদের সমাজে প্রধান বিচার্য বিষয় হইয়াছে। কিন্তু এমনতর কাগজ প্রায় দেশে যাব না যাচাতে পক্ষাপক্ষ সমভাবে আন্দোলিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার উদারতা দেখিয়া এই প্রস্তাবটি পাঠাইলাম। বিভাতে ইহাকে স্থান দান করিয়া বাখিত করিবেন। প্রস্তাবটি স্বত্যন্ত দীর্ঘ হওয়াতে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিতে বাধ্য হইলাম।”

কবিত্তে পাবে না। যেহেতু পবিত্রতাই সমাজের নিয়ম। পবিত্রতাই সমাজের স্বাভাবিক গতি। গতিই স্থিতির নিদান। সমাজ কখন একভাবে ছিল না, কখন থাকিবেও না। পরিবর্তনতাহার অখণ্ডনীয় নিয়ম ও প্রাণ। যে নিয়মে সমাজ দেশ কাল পাত্রের উপযোগী হইয়া গড়িয়া আইসে, সে নিয়ম ধীবে ধীবে নীচবে নীচবে অসংখ্য কাবণ-বলে হ্রস্বাববেগে সমাজের গতি ফিরাইয়া দেয়। সমাজের অন্তর্ভুক্ত যে নানা স্রোত চলিতেছে, এই সমস্ত কাবণ সেই স্রোতে উপস্থিত হয়। এই আভ্যন্তরীণ স্রোত কাল-প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে। সে স্রোত হ্রস্বাববেগে ও কালেব অনন্তদেশে মিলিয়া গিয়াছে। উহার আদি ও অন্ত কোথায়, কেহ বলিতে পাবে না। সুতরাং এই স্রোতে যে পবিত্রতাই ঘটিতেছে তাহা সামাজিক আভ্যন্তরিক পবিত্রতাই। সে পবিত্রতাই কাহাব হাত-ধরা নহে। কাহাব কথার উপর সে পবিত্রতাই নির্ভর করে না। সেই আভ্যন্তরিক পবিত্রতাই নিয়মানুসারে বালিকা-বিবাহের এক্ষণে অনেক শিথিলতা ঘটিয়াছে। যাহাবা বালিকা-বিবাহের ওকালতি কবিত্তেছেন তাঁহারা ও সেই শিথিল নিয়মেরই পোষকতা করিত্তেছেন মাত্র। অন্যরূপ বলিবার যো নাই। কাবণ, সমাজের আভ্যন্তরিক বেগ প্রতিকূল করা অসম্ভব। অতএব, বাংলা-বিবাহ যখন আপনাপনি উঠিয়া যাইতেছে, যখন বাংলাবিবাহের উকিলগণ সেই শিথিল নিয়মের - পোষকতা ভিন্ন আর কিছু করিত্তে পারেন না, তখন আব তদ্বিষয়ে আন্দোলনের কি ফল ? মিছা মিছা,

আপনাপনি বিবাদ করা মাত্র।

বাংলাবিবাহ পক্ষে এ পর্য্যন্ত যত আন্দোলন ও চীৎকার করা হইয়াছে, তাহাতে বালিকা-বিবাহ সম্বন্ধীয় বর্তমান নিয়মেরই পোষকতা হইয়াছে। উকিলগণের জ্ঞান উচিত ছিল যে, বর্তমান নিয়ম পূর্বকালের নিয়মের পরিবর্তন মাত্র। অতএব তাহাবা পাকতঃ সেই পবিত্রতাই পোষকতা কবিয়াছেন। সুতরাং পবিত্রতাই নিয়মের পোষকতা কবিয়া তাঁহারা আত্মপক্ষই হীনবল করিয়াছেন। বর্তমান যখন অতীতের ফল, তখন বর্তমানকে সমর্থন কবিত্তে গেলে ভবিষ্যৎকেও সমর্থন করিত্তে হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে যে অনেক পবিত্রতাই হইবে, বর্তমানই তাহাব প্রমাণ। যখন পরিবর্তিত বর্তমান সমর্থিত হইল, তখন পবিত্রতাই ভবিষ্যৎও যে সমর্থিত হইবে তাহাব দৃঢ়তা বিচিত্রতা কি !

যাহাবা বাংলাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিত্তেছেন, তাহাদিগকে তৎপক্ষীয় উকিল বলিবার একটু কাবণ আছে। উকিলেরা যেমন পক্ষপক্ষে যত কথা বলা যাইতে পাবে তাহা বলেন, বিপরীত পক্ষের কোন কথা উল্লেখ করেন না, যদি করেন, সুবিধামত করেন, অর্থাৎ যাহা খণ্ডন কবিত্তে পারিবেন এমন কথাই গ্রহণ করেন, অন্য কোন কথা গ্রহণ করেন না, কেবল আপনাব কথাই পাঁচকান করিয়া যান, বাংলাবিবাহ পক্ষীয় আন্দোলনকারিগণ তাহাই করিয়াছেন। বিগত কার্তিক মাসের “নবজীবনে” “হিন্দু-বিবাহ” * শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, যাহা প্রকাশ সভায় পূর্বে পাঠিত হইয়াছিল,

* “হিন্দু বিবাহ” নাম না দিয়া “বর্তমান কালের বালিকা-বিবাহ” নাম দেওয়াই উচিত ছিল।

সেই প্রবন্ধ এই ওকালতিব প্রধান দৃষ্টান্ত। প্রবন্ধ-লেখকের প্রধান বল যুক্তি, কিন্তু তিনি শাস্ত্রবিধি উল্লেখ করিতেও ক্রটি করেন নাই। শাস্ত্রবিধি বিধি মাত্র। হয় সেই বিধি লও, নহিলে যুক্তি লও। শাস্ত্র লইতে গেলে যুক্তি ছাড়িয়া দাও। যুক্তি লইতে যাও, শাস্ত্র ছাড়িয়া দাও। যুক্তির উপর শাস্ত্রকে স্থাপন করিতে গেলে শাস্ত্র মহা বিবাদ-ভূমি হইয়া পড়ে। তাহা হইলে শাস্ত্র আর বিধি থাকে না। লেখক আপনাব যুক্তি মার্গেব স্ত্রবিধা অল্পযাধী শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্ত্রকে তিনি নিজ মতেব পরিপোষক করিয়াছেন মাত্র। যেখানে নিজ মত শাস্ত্রের সঙ্গে না মিলিয়াছে সেখানে আব শাস্ত্রকে গ্রহণ করেন নাই। পাত্র ও কন্যা নির্বাচন, প্রণালী সম্বন্ধে এই কথা বলা হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্র কথা যদি একবার অগ্রাহ্য হয়, তবে সে শাস্ত্র সকলই অগ্রাহ্য। তিনি বর্তমান কালের বালিকা-বিবাহ-প্রণালীকে সমর্থন করিবার জন্য শাস্ত্র বিশেষেব অভিপ্রায় দেখিতে গিয়াছেন। শাস্ত্রের সমুদায় দেশ খুঁজিলে কি দাঁড়ায় তাহা দেখেন নাই। একপ কবা কি ওকলাতি নয়? শাস্ত্রকে মতেব পরিপোষক করিতে গেলে শাস্ত্রের মর্যাদা যায়। শাস্ত্রের ভাণ করিয়া নিজ মতেব পোষকতা করিতে গেলে যে লাভ আছে, সে লাভ সেই কৌশল প্রকাশ হইয়া গেলেই বিনষ্ট হয়। একদেশদর্শী হইলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য বাহিব হয় না। শাস্ত্রের তাৎপর্য বাহিব করিতে চাও, সমুদায় শাস্ত্র গ্রহণ কর।

মহুকে লও এবং তৎসঙ্গে সকল স্মৃতিকাব-কেও গ্রহণ কর। আবাব যদি মহুকে লও, মন্থর সকল বিধান আলোচনা করিয়া তবে তাৎপর্য বাহিব কব। নহিলে শাস্ত্রের তাৎপর্য বাহিব কবা বিড়ম্বনা মাত্র। এই কপ অনেক দোষ যে প্রস্তাব-লেখকের ঘটিয়াছে তাহা আমবা ক্রমশঃ প্রদর্শন করিতেছি, এবং তৎসঙ্গেই তাহাব প্রস্তাবকে ওকলাতি বলিয়াছি। তিনি এক্ষণকাব বালিকা-বিবাহ সমর্থন করিবার জন্য এই মতেব স্বজন করিলেন যে প্রাচীন হিন্দুদেব বিবাহ আধ্যাত্মিক ছিল। এই আধ্যাত্মিকতা অনেক টানাটানি করিয়া এখন বজায় বাধিতে হইতেছে। এই আধ্যাত্মিকতা বজায় বাধিবার জন্য তিনি অনেক কথায় একদেশদর্শিতাব বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছেন। যে আধ্যাত্মিকতা লইয়া এত হৈ চৈ পড়ি-বাছে, দেখা যাউক, তাহা প্রস্তাব-লেখক কিরূপে সমর্থন করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা করিবার পূর্বে একটি কথা বলিয়া বাধা উচিত, আমবা লেখকের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতেছি বলিয়া কেহ যেন না মনে কবেন, আমবা বর্তমান বালিকা-বিবাহেব বিবোধী; আমরা বর্তমান বিবাহেব বিবোধী নহি, কিন্তু লেখক গেক্ষণে সেই বিবাহকে সমর্থন করিয়াছেন তাহাব বিবোধী। আমবা কেবল লেখকের যুক্তি-পথেব বিবোধী।

লেখক বলেন, প্রাচীন হিন্দু বিবাহ করিয়া মুক্তি পথের পথিক হইতেন বলিয়া তাহার বিবাহ আধ্যাত্মিক। লেখক মন্থর সময়েব বিবাহ বিধি ধরিয়া হিন্দু বিবাহকে

আধ্যাত্মিক বলিবাছেন, স্মৃতরাং সেই মন্থ লইয়াই আমাদের গেরও কথা কহা উচিত । যখন মন্থর বিধি সকল অপ্রচলিত হইয়াছে, বলিতে গেলে, বিবাহ সম্বন্ধে তখন মন্থ পরিবর্তিত হইয়াছেন । যখন মন্থ পরিবর্তিত হইয়াছেন, তখনকার রীতিকে মন্থর বিধি দিয়া বিচার কবা যুক্তিযুক্ত নহে । অতএব, আমবা দেখিব মন্থর বিবাহ বিধি সকল আধ্যাত্মিক ছিল কি না । মন্থকে লইতে গেলে মন্থর সকল বিধান দেখা উচিত । যখন মন্থ অপ্রচলিত হইয়াছেন, যখন সমাজ বিভিন্ন কপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তথাকার কালের বিবাহ রীতিকে মন্থর কোন বিধি-দিয়া বিচার কবা কি অন্যায় নহে ? মন্থকে লও, তাঁহার সমুদায় সংহিতা লও, না লও তাঁহাকে একেবারে ছাড়িয়া দেও । যুক্তি এই কথা বলে ।

আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে বিবাহরীতি প্রচলিত হইলে যে কপ হওয়া উচিত, আমবা প্রাচীন মন্থর কালে তাহার পবিচয় পাই না । মন্থর সময়ে আমবা দেখিতে পাই অষ্টবিধ বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল । সমাজে যত প্রকার বিবাহরীতি সম্ভবিত পাবে, প্রায় সকল প্রকারই এই অষ্ট বিধ প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে । অথচ এই অষ্টবিধ প্রণালীই হিন্দু বিবাহ । এত প্রকার হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য কি একই হইতে পারে ? ছুই একটি বিবাহ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রীতিতে দেখা যায় লোকে বরং ইতর কামনা পবতন্ত্র হইয়া বিবাহ করিত । মন্থর সময়ে পাত্র নিজে বিবাহ করিত । তখন দ্বিজ গুরু

আজ্ঞালাভ কবিয়া যথাবিধি স্নান ও সমাবর্তন পূর্বক সমাজীয়া ও স্নলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিতেন ।

গুরুণামৃতঃ স্নানং সমাবর্ত্তো যথাবিধি ।
উদ্বাহতঃ দ্বিজো ভার্য্যাংসবর্ণাং লক্ষণাধিতাং ।

৩অ, ৪ শ্লোক ।

কাহাকে স্নলক্ষণা কহা বলা যাইত । যদ্বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ভাল কপে সিদ্ধ হইতে পাবে তাহাকে কি স্নলক্ষণা বলা যাইত ? তা হলে ত বিবাহ আধ্যাত্মিক হইত । কিন্তু হা অদৃষ্ট ! সেদপ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না । সেই স্নলক্ষণা ও দ্বাদ্যা কন্যাকে মন্থ এইরূপ বর্ণন কবিয়াছেন ।

অব্যাক্ষীঃ সৌম্যনীকীঃ হংসবাবণ-গামিনীঃ ।
তনুলোমকেশ দশনাঃ মুদঙ্গী মুদহেৎ দ্বিধাং ।

৩অ, ১০ শ্লোক ।

যেই অঙ্গহীন নয়, যাহার নাম অতি মৃণে উচ্চারণ কবা যায়, হংস মাতঙ্গের ন্যায় যাহার মন্থনহার গতি, যাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক ।

কই, সে কন্যা ধর্ম্মসাধনোপযোগিনী হইবে এমত লক্ষণ ত দেওয়া হইল না । সকল লক্ষণই শারীরিক । মানসিক গুণ-ভাবিতা কন্যা যে স্থলে প্রশস্ত, সে স্থলে শারীরিক গুণের কথা কেন ? মন্থর স্নলক্ষণা এবং “দ্বাদ্যাঃ দ্বাদশবার্হিকীঃ” কন্যা শারীরিক গুণেই দ্বাদ্যতোষিনী হইতেন । মন্থর সময়ে কন্যা যদি দেখিত তাহার ক্ষু-কাল অতিক্রম হইয়া গেল, তথাপি কর্তৃ-পক্ষগণ তাহার বিবাহ দিলেন না তখন কন্যা

নিজেই স্বয়ংস্বরা হইতেন। একপ বিধানসংহিতায় দৃষ্ট হয়। মন্মথ কালে অনেক কারণে কন্যাব শীঘ্র বিবাহ ঘটত না। যে জীব কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যাহাব কথা অতি কর্কশ, যাহাব নয়ন পিঙ্গল বর্ণ, যাহার নামটা ভাল নয় এরূপ কন্যার বিবাহ হওয়া দুঃখ হইত। কাবণ, এ সকল কন্যা মন্মথ মতে পবিত্রাজ্য। এ সকল কন্যাকে অনেকস্থলেই বোধ হয় যৌবনে বিবাহ করিতে হইত। অথবা তাহাবা বয়স্ক হইলে মন্মথ অষ্টবিধ বিবাহ বীতির মধ্যে কোন অপকৃষ্ট রীত্যনুসারে পাণ্ড-ন্যস্ত হইয়া পড়িত। সে রূপ ঘটিলে ৩০। ৩৫ বৎসরের পুরুষ যে যুবতী কন্যাকেই বিবাহ করিত, এই রূপই সম্ভাবনা দেখা যায়। এ সকল বিবাহ যে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে ঘটিত হইত, এমত প্রতীতি হয় না। যাহা হিন্দু-বিবাহ আধ্যাত্মিক হইত তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী সমুদায় ব্যবস্থাও হইত, এবং সকল ব্যবস্থাব উদ্দেশ্য একই হইত। কিন্তু মন্মথ সময়ে যে সকল বিবাহ বীতি প্রচলিত ছিল দেখা যায়, তাহাতে যে সেই একই উদ্দেশ্যানুযায়ী বিবাহ কার্য সমাধা হইত, সকল ব্যবস্থা পরীক্ষা করিলে এমত অনুমান হয় না। দুই একটি ব্যবস্থা দেখিয়া তত প্রাচীন কালের নীতি উল্লম্বন করা এবদেশদর্শিতাব কার্য। অতএব, মন্মথসংহিতাব সকল দেশ দেখিলে হিন্দু বিবাহকে আধ্যাত্মিক বলা যায় না।

লেখক বলেন সঙ্গীক না হইলে হিন্দুর ধর্মচর্যা হয় না বলিয়া হিন্দুর বিবাহ আধ্য-

ত্মিক। প্রথমতঃ স্বীকার কবিয়া লও যে হিন্দু সঙ্গীক ধর্মচর্যা কবিত। তাহা হইলে বলিতে হইবে সঙ্গীক হইয়া ধর্মকার্য্যানুষ্ঠান হিন্দু জাতিতে যেমন ছিল অপবাপব জাতিতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানেরা চর্কে পুরুষ ও স্ত্রী একত্রে বসিয়া উপাসনা করে। আগ্রা প্রভৃতি স্থলে যে বড় বড় মসজিদ আজিও বিদ্যমান আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় বেগমদিগের জন্ত স্বতন্ত্র স্থান নিরূপিত ছিল। বাস্তবিক অধীন স্ত্রী জাতিকে যদি ধর্ম কর্মে একত্রে না লওয়া যায়, তবে তাহাদের আব ধর্ম কর্ম হইতে পারে না। স্ত্রীজাতিব ধর্ম-প্রবৃতি অতি তেজস্বিনী হওয়াতে তাহারা স্বতঃই ধর্ম্মানুষ্ঠানে অগ্রে অগ্রসারিণী হয়, এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত বাধ্যত্রে পুরুষজাতিব স্বার্থসিদ্ধি ও সুস্থায় হয়। এমত স্থলে কোন জাতি এমত নিবোধ হইবে যে তাহাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত হইতে না দিবে? তাহাদিগকে পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত বাধ্য পুরুষজাতিব একটি মহা কৌশল। তাহারা নিজেও তাহাতে ব্যাপৃত হইতে অত্যন্ত ব্যগ্র। সে স্থলে তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান না কবাই মূঢ়তা। অতএব হিন্দুজাতিতে যে বিধান কবিবেন, যে পবিত্রীতা স্ত্রী পতির সহধর্ম্মিণী হইবেন, একথা বড় বিচিত্র নহে। কিন্তু বিচিত্র এই আজিকার দিনে সেই বিধান দেখিয়া একজন বলিয়া উঠিলেন হিন্দুবিবাহ সেই জন্ত আধ্যাত্মিক। হিন্দু বিবাহ কেন, সকল জাতিবই বিবাহ তজ্জন্ত আধ্যাত্মিক। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাউক হিন্দু পত্নী কত দূর

পতিব সঙ্গে ধর্মচর্যা কবিতেন। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে হিন্দু পত্নী যোগ না দিলে যে তাহা ব্যর্থ হয় এমন নহে। ব্রহ্ম-চর্য্যে হিন্দুব ধর্ম্মানুষ্ঠানে জীব সংস্পর্শ নাই। জ্ঞী মৃত হইলে গৃহ-শূন্য পুরুষেব ধর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞী ব্যতীতও সম্পন্ন হয়। জ্ঞী বিবাহে যদি নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মচর্যা বাধ্যতাই হইত, তবে বামচন্দ্র সীতাকে মিথ্যাপবাদে বনবাস দিতেন না। অনেক মুনি ঋষিবা জ্ঞী ব্যতীত প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান সকল করিয়া গিয়াছেন। তবে হিন্দু বিধানের মর্ম্ম এই যে, যখন পত্নী বিদ্যমান আছেন, তখন তাহাকে বাস দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত নহে। উচিত নহে কে না বলিবে? সীতা বর্তমান থাকিতে এই জন্য বামচন্দ্রেব অশ্বমেধ যজ্ঞে সহধর্ম্মিণীবি বিদ্যমানতা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও আবার সোণার সীতাব প্রতিনিধি দ্বারা চলিয়াছিল। বড় বড় যাগ যজ্ঞে পত্নীকে সঙ্গে করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইলে জ্ঞীলোকের আর সে কার্য্যে ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইত। আরও দেখিতে পাওয়া যায় জ্ঞী ব্যতীত যেমন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বাধা নাই, তদ্রূপ বিধবা জ্ঞীব ধর্ম্মানুষ্ঠান পতি ব্যতিবেকেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আর যাগ যজ্ঞ কিছু লোকে সচরাচর করিতে পারিত না। বড় বড় বাজাদেব ঘরেই প্রায় যাগ যজ্ঞ হইয়া থাকে। তাহাও আবার কদাচিৎ। রামচন্দ্র যখন সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন তখন তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিপ্রায় ছিল না বলিয়াই সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

নহিলে সে যজ্ঞানুষ্ঠানের পবও তাঁহাকে বনবাস দিলে চলিতে পারিত। হিন্দু পত্নী পতিব ধর্ম্মচর্যায কিকপ যোগ দিতে পারিতেন দেখুন মনু স্পষ্ট বলিতেছেন:—

নাস্তি জীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈবিত ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ।
নিবিক্রিয়া হ্যমজ্ঞাশ্চ ত্রিগোহ নৃতমিত্তিস্থিতিঃ।

৯ অ ১৮।

“যে হেতু জ্ঞীলোকদিগেব মন্ত্র দ্বারা জাতকর্মাদি সংস্কার হয় না এজন্ত উহাদিগেব নির্ম্মল অন্তকবণ হয় না এবং বেদ স্মৃতিতে অধিকার নাই এজন্ত উহার ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না এবং উহাদিগেব কোন মন্ত্রে অধিকার নাই, এজন্ত পাপ হইলে মন্ত্র দ্বারা তাহা ক্ষালন করিতে পারে না। অতএব উহারা কেবল মিথ্যা পদার্থ।”

এতদ্বারা হিন্দু-পত্নী কতদূর পতিব ধর্ম্মচর্যায যোগ দিতেন তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব তিনি যাগ যজ্ঞেব সকল গোচ গাচ ক্রিয়া দিতেন, এই রূপই অনুমান হয়। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মক্রিয়াও হিন্দু-পত্নীব কোন হাত ছিল না। হিন্দুপত্নী ওবে কি করিতেন? মনু কহেন:—

অপত্যং ধর্ম্মকার্যাণি শুশ্রূষা বতীকৃতমা।

দাবাদীনন্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামান্মনশ্চ।

৯ অ ২৮।

“অপত্যের উৎপাদন অগ্নিহোত্রাদি যাগ যজ্ঞ এবং আত্ম শুশ্রূষা উত্তম রতি এবং পিতৃগণের ও আত্মার সন্তান দ্বারা স্বর্গলাভ এসকল কার্য্য পত্নী দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়।”

যাহার মন্ত্রাদিতে অধিকার ছিল না তিনি যাগ যজ্ঞে বাধা করিতেন তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। আর যাগ যজ্ঞ কাহারো

জীবনে ঘটত কাহারো জীবনে ঘটত না। তদ্ব্যতীত হিন্দুপত্নী যাহা যাহা করিতেন তাহা উক্ত ন্নোকেই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অপত্য উৎপাদন করিতেন। পতিব রক্ষনশালা ও ভাণ্ডার তাহার জিন্মা ছিল এবং পতিব শুশ্রূষা কার্য্যটা তাহার একচেটিয়া ছিল। তিনি পতিব পূজারও গোচগাচ করিয়া দিতেন। অতএব বিলক্ষণ সঙ্গমাণ হইল হিন্দু পতি সঙ্গীক হইয়া কতদূর ধর্ম্মচর্যা কবিতেন। স্মৃতবাং হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক!

হিন্দু কিজন্ত দাবপবিগ্রহ করিতেন? না “পুত্রার্থেক্রিয়তেভার্যা”। পুত্র কিজন্ত? “পুত্র পিও প্রয়োজন” লেখকের এ যুক্তি অবলম্বন কবিলে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে তৎক্ষণ পর্য্যন্ত না পুত্র জন্মে ততক্ষণ পর্য্যন্ত হিন্দুব বিবাহ করা উচিত। তাহাতে যদি ১০টা মেয়ে বিবাহ কবিত হই তাও কবা উচিত। তিনি নিজেও বলিয়াছেন “এ সন্তান প্রসব না কবিলে পতি দাবাস্তব পবিগ্রহ করিতে পাবে”। অথচ তিনি বলিতে চান “কিন্তু পুরুষের বহু বিবাহ বে শাস্ত্র-সম্মত নয় পুত্র্যপাদি বিজ্ঞাসাগব মহাশয় তাঁহার বহু বিবাহ বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রমাণ কবিয়াছেন”। তবেই তিনি আবার বলিতে চান বহু বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। সে যাহা হউক লেখক কি বলিতে চান মন্তব্যমতে সন্তানোৎপাদন কবা একান্ত আবশ্যক? কই, মন্তব্য সে কথা বলেন কই? সন্তান থাকিলে যেমন পিতাব স্বর্গপ্রাপ্তি হয় তত্রূপ মাতাবও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এজন্ত মন্তব্য বলেন যখন বহু সপত্নীর মধ্যে এক জনের পুত্র হয়, সেই পুত্রকে সকলের পুত্র জ্ঞান কবিত হইবে।

অতএব, পুত্র থাকিলে মাতাব স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু নং থাকিলেও যে স্বর্গলাভ হইতে পারে না এমত নহে। সাক্ষী জীব সন্তান না থাকিলেও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।

“অনেকানি সহস্রাণি কুমার ব্রহ্মচারিণাঃ।

দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্য কুলসন্ততিং ॥

মৃত্যে ভর্তৃবি সাক্ষী জীব ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।

স্বর্গং গচ্ছত্য পুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ।

এম ১৫৯। ১৬০।

সন্তান না থাকিলেই যে স্বর্গে যায় না এমত নহে, অনেক, ব্রহ্মচারিণ্য সন্তানোৎপাদন না করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা স্বর্গগত হইয়াছেন, তেমনি সাক্ষী জীব সন্তান না থাকিলেও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। সদাচার-শালিনী জীব স্বামীব মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন কবিবেন, তাহাতে তিনি অপুত্র হইলেও বালখিলাদি ব্রহ্মচারিদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন কবিবেন। তবেই দাঁড়াইতেছে সংসাবাশ্রমে সাক্ষী জীব পুত্রোৎপাদন না হইলেও স্বর্গলাভের অন্য উপায় আছে। স্বর্গলাভের পক্ষে পুত্রোৎপাদন একান্ত আবশ্যক নহে।

লেখক নিম্ন মত বজায় রাখিবাব জন্ত হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিকতা কিরূপ যুক্তিতে সমর্থন কবিতেন দেখুন। তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ জাতির জীবনোদ্দেশ্য যে আধ্যাত্মিক ছিল তাহা এই কথায় প্রমাণ কবিতেন, “ফল কথা, হিন্দু শাস্ত্রোক্তসারে হিন্দুব “জীবন” যে চাৰিটি আশ্রমে বিভক্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থশ্রম, বানপ্রস্থ এবং সম্মাস, সেই চারিটি আশ্রমই যুক্তির পথের চাৰিটি অঙ্গ পঞ্চাৎ সোপান মাত্র। সেই

চারিটি সোপান পবম্পৰ সংলগ্ন, তন্মধ্যে কোন একটিকে অপবঙলি হইতে পৃথক করিয়া লইলে মুক্তির পথে বাধা পড়িয়া যায়। জন্মগ্রহণ কবিবার পৰ হইতেই হিন্দুকে মুক্তির পথে প্রবেশ করিতে হয়। সেই জন্ম হিন্দু পঠদশায় ব্রহ্মচাৰী, গৃহস্থা-শ্রমেণ্ড ব্রহ্মচাৰী। অতএব হিন্দুব গৃহস্থা-শ্রমকে হিন্দুব বানপ্রস্থ হইতে পৃথক কবিবার যো নাই। এবং হিন্দুব বানপ্রস্থকে যদি আধ্যাত্মিক কহা যাইতে পারে, তবে হিন্দুব গৃহস্থাশ্রমকেও আধ্যাত্মিক না বলিলে চলে না।” প্রাচীন দ্বিজাতির “জীবনোদ্দেশ্য” কিরূপ আধ্যাত্মিক ছিল তাহা এইরূপ কথায় ব্যক্ত কবিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিলেন “তাই বলিতেছি হিন্দু “বিবাহেব” উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক” অর্থাৎ হিন্দুর জীবনের উদ্দেশ্য যখন আধ্যাত্মিক, তখন সেই জীবনের প্রতি ক্রিয়াও আধ্যাত্মিক। এইকপ সিদ্ধান্ত করিয়া আবার সেই একই নিখাসে বলিতেছেন “মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যালোচনা আপন জীবনের উদ্দেশ্য কবিয়াছিলেন এ কথা বলিলে এমন বুঝা য় না যে তিনি বিদ্যালোচনা ভিন্ন আব কোন কাজই করেন নাই। আহাৰও করেন নাই, নিদ্রা যান নাই, সংসার ধর্মও করেন নাই। অথচ বিদ্যালোচনা ছাড়া তিনি আহাৰ বিহার ও সংসার ধর্ম করিয়াছিলেন বলিয়া এমন কণা বলা যায় না যে বিদ্যালোচনা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না।” এ কথা শুলির অভিপ্রায় এই অক্ষয়কুমারের জীবনোদ্দেশ্য বিদ্যালোচনা থাকিলেও তাহাব জীবনের সকল ক্রিয়াকে কখনই বিদ্যালোচনা বলা

যায় না, অথবা সকল ক্রিয়াই যে বিদ্যালোচনার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয় এমত নহে। প্রাচীন ব্রাহ্মণের জীবনোদ্দেশ্য মুক্তি হইলেও তাঁহার বাল্যলীলা ও যৌবনের ব্যসন ও ক্রীড়াদিব উদ্দেশ্যও যে মুক্তি, এমত কথা বলা যায় না। এ মুক্তি অল্পসারে কি দাঁড়ায় “হিন্দু বিবাহেব উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক”? লেখকের প্রধান মুক্তি এই, যাহাব উদ্দেশ্য মুক্তি তাহাকে আধ্যাত্মিক বলা যায়। হিন্দু বিবাহ কবে সংসার ধর্ম করিবার জন্য, সংসার ধর্মে কর্ম সম্পন্ন হয়, কর্ম নহিলে তত্তজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায় না, তত্তজ্ঞান নহিলে মুক্তি হয় না, অতএব হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক। তাহা হইলে বল না কেন আহাৰ বিহার নহিলে শরীর ধারণ কবা যায় না, বাল্য ও যৌবনের ক্রীড়া দি না হইলে শরীরেব ক্ষুর্তি হয় না, শরীরের ক্ষুর্তি না হইলে জীবন বক্ষা হয় না। জীবন রক্ষা না হইলে মুক্তি পথের আশা করা যায় না, অতএব মানুষের বাল্য লীলাদি এবং যৌবনের ব্যাসনাদি সকলই আধ্যাত্মিক। মানুষের আহাৰ বিহার ও মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি সকলই যখন আধ্যাত্মিক, তখন আব কি প্রমাণ হইতে বাকি থাকে বিবাহটা আধ্যাত্মিক।

বিবাহকে আধ্যাত্মিক প্রমাণ করিবার জন্য লেখক অনেক স্থলে অনেক কথা জোর করিয়াও বলিয়াছেন। তিনি বলেন “একথা ও বলিতে পারা যায় যে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক অন্য কাহাব বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক নবা” নয কেন? অন্য জাতীয় লোকের জীবনের উদ্দেশ্য কি মুক্তিলভ নয? না

অন্য জাতি সংসার ধর্মও দার পবিগ্রহ করে না? যে মুক্তি অল্পসারে লেখক হিন্দু বিবাহকে আধ্যাত্মিক বলিযাছেন, আমবা দেখিতেছি, সেইমুক্তি অল্পসারে অন্য জাতির বিবাহকে আধ্যাত্মিক বলিবাব বাধা কিছুই নাই। মুক্তিলাভ কবিত্তে হইলে যেমন হিন্দুব ইন্দ্রিয় সংযমাদি কবিত্তে হয় অপব জাতিব পক্ষে ও সেই বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু-বাই একা ইন্দ্রিয় সংযম কবেন আব কোন জাতি কবেন না, লেখক কি এমত কথা বলিতে পাবেন? খ্রীষ্টান মুসলমান সকল জাতিবই জীবনোদ্দেশ্য মুক্তিলাভ এবং সকল জাতি-পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযমাদিব বিধি আছে। তবে এত গর্ব কেন? লেখকের কথা শুনিলে কি অপব জাতিব লোক হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পাবিবেন?

আম একটি কথাও জোব কহিয়া বলা হইয়াছে। তিনি বলেন “গৃহস্থশাস্ত্র” থাকিয়া হিন্দুকে প্রতিদিন সংযত হইয়া দেবপূজা, পিতৃশ্রদ্ধা, অতিথিসেবা, ভূতপালন (পশু, পক্ষী, কুমিকীটাদি পালন) প্রভৃতি পাঁচটি মহাযজ্ঞ করিতে হয় এবং সর্বদাই যাগ, যজ্ঞ ত্রত প্রভৃতি কৰ্ম সম্পাদান কবিত্তে হয়। এই সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্মে সংযম আবশ্যক, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আবশ্যক, স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, ভোগ স্পৃহা পবিহাব আবশ্যক। সংযমাদি ব্যতীত এ সকল কৰ্ম কবা যায় না। “সে কি কথা। আমবাত প্রতিদিন দেখিতেছি অনেকেই এ সকল দৈনিক কার্য নিত্য সম্পন্ন কবিত্তেছেন, অথচ তাঁহারা বিলক্ষণ স্বার্থপব, ভোগ স্পৃহা, ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। এক্ষণে এমত অনেক ব্রাহ্মণ দেখা যায় যাহাবা

দেবপূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিতেছেন, অতিথি-সেবা ও পশু পক্ষী পালন কবিত্তেছেন এবং সন্ন্যাসীক তীর্থধর্ম সম্পন্ন কবিত্তেছেন অথচ দিব্য গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া, পেটপূরে মদ খাইয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাব চূড়ান্ত কবিয়া বেড়াইতেছেন।

লেখক আবও বলিযাছেন “মহু প্রভৃতি শাস্ত্রলেখকেরা বলেন যে গৃহস্থ পক্ষ মহাযজ্ঞ বা বলিকৰ্ম শেষ করিয়া যজ্ঞেব যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সন্ন্যাসীক ভোজন কবিবে। * * *। না কবিলে সন্ন্যাসীক মহাপাবে লিপ্ত হইবে। হিন্দুব নিত্য-কৰ্মে স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ভোগ স্পৃহা, পবিহাব এবং সংযম কত আবশ্যক, তাহা এই একটিমাত্র বিধান দৃষ্টেই বুঝিতে পাবা যায়।” কই? আমবা ত পাবিলাম না। আমবা নিত্য দেখিতেছি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থালয়ে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নিত্য নিত্য লেখক যাহাকে “মহা যজ্ঞ” বলিযাছেন, তাহা অনায়াসে নিম্পন্ন করিয়া সর্বশেষে অন্ন আহাবাদি কবিয়া স্নান স্বচ্ছন্দে পাবের উপব পা দিয়া, ভোগেব উপব ভোগ কবিয়া, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাব চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জীবন যাপন কবিত্তে ছেন। লেখক একথা বলিতে পারেন, কবিত্তেছেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রেব “বিধি ইন্দ্রিয়-সংযম। সে কথা ঠিক, সেকরূপ বিধি শুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রেব কেন, সকল জাতিব ধর্মশাস্ত্রেবও সেই বিধি। মুক্তিপথেব তাহা সাধাবণ বিধি। কিন্তু সেকরূপ বিধি অন্য জাতিব ধর্মশাস্ত্রে থাকাতোও যখন অন্য জাতীয বিবাহকে আধ্যাত্মিক বলা হইল না, তখন হিন্দু জাতিব বিবাহকে বলা হয় কেন? হিন্দু জাতিব বিবাহকে যদি আধ্যাত্মিক বল, তবে

বল সকল জাতিব বিবাহই আধ্যাত্মিক । বিবাহ মাত্রই আধ্যাত্মিক । বিবাহ কেন, সম্ভব্য জীবনের সকল কার্যই আধ্যাত্মিক ।

এই ওকালতির আর এক কৌশল দেখিলাম । “হিন্দু বিবাহ” শীর্ষক প্রবন্ধ-লেখক নিজ মতের পারিপুষ্টিব জন্য বলিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রকাব গণের অভিত্রাষ এই (হিন্দু-শাস্ত্রকাবগণের ভাগ করিবাব প্রয়োজন কি ?) হিন্দু নারী পরিণীতা হইয়াই পতিব সঙ্গে এক হইয়া যায় । এই একত্ব খণ্ডনার্থ বিপক্ষবাদিগণ হিন্দু শাস্ত্রের অধিবেদনের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া দিলেন । অমনি উকিল মহাশয় একটি আশ্চর্য্য কৌশল বাহিব করিলেন । “তিনি নিজ মতের সমর্থনার্থ একটি গল্প ফাঁদিলেন । এক মতের পোষনার্থ আব এক মতের সৃষ্টি কবিলেন । সে মতটি আমরা লেখকেবই কথায় বলিব । লেখক একটি উপকথাব উদ্ভাবন কবিয়া শেষে সিদ্ধান্ত কবিলেন । “মোট কথা, বৃহৎ ও বহু প্রাচীন সমাজে অনেক রকম লোকাচার থাকে । সে সকল লোকাচারের মধ্যে সকল গুলিই যে শাস্ত্রানুমোদিত হয় তা নয় কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও সে গুলি শীঘ্র লোপ হয় না । এবং হিন্দু শাস্ত্রকারেরাও বিশিষ্ট কাবণে লোকাচারের প্রতি ক্ষিপ্ত আস্থাবান বলিয়া শীঘ্র বহিত করিতে ইচ্ছুক নছেন ।” দেখুন একবার কল্পনাব দোঁড় দেখুন । লেখক এই বর্তমান কালে হজুকে কলিকাতা সহরে বসিয়া হাজার হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন আদ্য-বর্ষে কিরূপ ঘটনা ছিল, তাহাব একবার ঠিক ইতিহাস দিলেন । একটি মতের Hypo-

thesis সৃষ্টি কবিয়া আর একটি মত hypothesis বজাষ কবিলেন । এই সৃষ্টি অনুসাবেই কি বলা যায় না, বাংলা-বিবাহটা তজ্জন্য রহিত হয় নাই ?

ওকলাতি কবাব দোষ এই যখন যে কথাব পোষকতা কবিতেছি, তখন তাহাই মাত্র ভাবিতেছি, অন্য সকল কথায় অঙ্গ হইতে হয় । এক কথা বলিতে গিয়া অন্য-দিকে যে গলদ হয়, সেই সকল ছিদ্র দেখিয়া বিচার কার্য নিষ্পন্ন হয় । নহিলে দুই পক্ষেব ওকলাতি যদি অখণ্ডনীয় হইত, তাহা হইলে বিচাবক আর মীমাংসা কবিতে পারিতেন না । “হিন্দু বিবাহের” প্রস্তাব যে কেবল ওকলাতি মাত্র তাহাব আব একটি প্রমাণ এই, তাহাতে এক কথা প্রমাণ করিতে গিয়া লেখক অন্য কথাব ছিদ্র দিয়া গিয়াছেন । তিনি বহুবিবাহেব পূর্বোক্ত নবীনমত বাহির কবিতে কবিতে বলিলেন “শাস্ত্রানুসাবে কেবল কণ্ডলি নির্দিষ্ট কারণে পুরুষ ভার্গ্য-স্তব গ্রহণ করিতে সমর্থ । অর্থাৎ স্ত্রী চিবরণা হইলে এবং পুত্র সন্তান প্রসব না করিলে পতি দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে ।” কতকগুলি কারণেব মধ্যে লেখক কেবল দুইটি কারণ দিয়াছেন । অপর গুলি চাপা রহিল । মনু অন্যান্য যে যে কারণেও অধিবেদনের বিধি দিয়াছেন আমরা তাহা বলিয়া দিতেছিঃ—

স্ত্রী অগ্রিয় ভাবিণী হইলে তৎক্ষণাৎ অধিবেদন করিবে । পতি-পুত্র-তাড়ন-কারিণী, হিংস্রক অর্থের নাশকারিণী এই রূপ স্ত্রী থাকিতে ভর্তা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবেক ।”

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, চিবরুণা বলিয়া পত্নী ত্যাগ করিলে বিবাহেব আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হয় কই? অন্যান্য কাবণ গুলি ধরিয়াও যদি পত্নীত্যাগ করা যায়, তবে আব বিবাহের আধ্যাত্মিকতা বহিল কই? যদি পুত্রোৎপাদন করিতে পারিলেই আধ্যাত্মিকতা বজায় থাকে তবে কি দোষে কান্না খোঁড়া, চিবরুণা এবং যে জীব মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহাব ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যাহাব গাত্রে অতিশয় লোম, যে নির্ভূত ভায়বী, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, স্নেহ পর্বত, পক্ষী, সর্প ও দাস ইহাদিগেব নামে যে জীব নাম, তাহাদিগকে বাদ দিয়া বিবাহ করা উচিত হয়?

নোদ্বাহেৎ কাপিলাং কতঃ নাধিকান্ধীঃ ন
বাগিনীঃ।

নালোমিকং নাতি লোমাং ন ইন্দ্ৰিয়াণাং
দৃষ্টিলাং।
মহু ৩য়, ৮শ্লোক।

ইহারা কি পুত্রোৎপাদন করিতে পারে না? না ইহাদেব দ্বাবা সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না? ইহাদিগকে গ্রহণ করিলে কি মোক্ষ হয় না? যিনি ধর্ম্মেব প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তিনি পত্নীর কায়িক অবস্থার দিকে দেখিবেন কেন? বহু দিন সংসার ধর্ম্মে থাকি যায ততদিনই ত পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক। বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে ত আর পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। তবে এত বাছিয়া বাছিয়া বিবাহ করার দরকার কি? আবার দেখুন যিনি পতির সহিত এক-শরীর হইয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় বার দাব-পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে

পৃথক করিয়া দেওয়া হয় কেন? দশজনকে বিবাহ করিলে যদি দশ জনই পতিব সঙ্গে এক-শরীর হইয়া যান, তবে আব একীকরণেব মর্যাদা থাকে কি? যখন পক্ষীকরণ, বড়ীকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের অহুমোদিত, অহুমোদিত কেন, মোক্ষের জন্ত আবশ্যক, তখন আর একীকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয় কই? বহু বিবাহ শুধু শাস্ত্রানুমোদিত নহে, পুত্রোৎপাদন আবশ্যক। যখন বহু বিবাহ শাস্ত্রে বহিষ্যছে তখন আব কি রূপে বলিব, একীকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য? শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একীকরণ হইয়া আবার পক্ষীকরণ, বড়ীকরণ ও হইতে পারে না।

/ বহু বিবাহ শাস্ত্র মধ্যে বিদ্যমান থাকা-তেই লেখকেব একীকরণের মত (Hypothesis) বিনষ্ট হইতেছে। তদ্বাবা আর একটি মত (Hypothesis) বিনষ্ট হয়। লেখক বলেন হিন্দু বিবাহ চুক্তি নহে। হিন্দু বিবাহ যাবৎ জীবনেব জন্য। যাবৎ জীবন কেবল জীবী বাঁধা থাকেন, পতি বাঁধা থাকেন কই। পতি পঞ্চাশটা বিবাহ করিয়া প্রথম পত্নীতে আর এক-শরীর হইয়া রহিলেন না। পত্নীই এক শরীর হইবে, পতি এক শরীর হইবে না, এ কিরূপ এক-শরীর হওয়া হইল। হিন্দু বিবাহ ও কি চুক্তি নহে? যদি পতিব ঠিক মনোমত না হইল, তবে পত্নী পরিত্যক্তা হইয়া চিবকাল থাকিলেন। পরিত্যক্তা পত্নী জীবিত থাকেন মাত্র, তাহার পত্নীত্ব সব যায়। পতির ইচ্ছাকাল পর্যন্ত কি দাম্পত্য সহবাস নির্দিষ্ট নহে? পরিত্যক্তা পত্নীর ধোর-পোষ বন্দোবস্ত আছে বটে, কিন্তু ধোর-পোষাই কি পত্নীত্ব। জীবিকা

বিধান হইলেই কি পত্নী হইবে? জীবিকা-বিধান হইলেই কি পতিতে বাঁধা থাকা হইল! ইউরোপীয়গণের “Divorce” ডাইভোর্সের পৰ আবার বিবাহ হইতে পাবে, ইহা সামাজিক ব্যবস্থা। কিন্তু হিন্দু পত্নীর মধ্য অবস্থা আর বিবাহ হইবার ব্যবস্থা নাই বলিয়া তাহার খোর-পোষের বিধান আছে। উহা কেবল জীবিকার ব্যবস্থা মাত্র। নহিলে হিন্দুবিবাহে ও কি এক রকমে Divorce নাই। যদি তাই হয়, তবে হিন্দু বিবাহ কি চুক্তির বিবাহ নহে? যতদিন পতি পত্নীর বনিবনাও হয়, ততদিনই একশরীর হইবার চুক্তি থাকে।

আর এক স্থলে ওকলাতিব ছটা দেখুন। লেখক নিজ মত বজায় কবিরার জন্ত এক স্থানে শারীরবিজ্ঞানকে জাহাৰ্গবে দিতেছেন। তিনি বলেন “এইকপ ছোট কথা বল, বড় কথা বল, বিজ্ঞানে কোন কথাবইতে একটা মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না, * তল কথাতেই ত theory, hypothesis, * মতেশ মারামারি ঠেঙ্গা ঠেঙ্গি দেখিতে পাই।” এইরূপে শারীর বিজ্ঞানকে একে-বারে অপদস্থ করিয়া দিয়া লেখক আর এক স্থলে বলিতেছেন—“শারীর বিজ্ঞান জী-গমন সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিবে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়েই তাহা পালন করা সম্ভব ও কর্তব্য।

* যেন লেখক theory ছাড়া, আর তিনি যাহাকে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলেন তাহা ও theory ছাড়া। theoryর percentage শারীর বিজ্ঞানে বেশী, না অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে বেশী?

শারীর বিজ্ঞান মানিতেই হইবে। কিন্তু শারীর বিজ্ঞানকে সমাজ, নীতি ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অধীন না করিলে শারীর বিজ্ঞান একেবারে নিবর্থক হইবে।” এ কথা আবার কেন, এই হল, শারীর বিজ্ঞানের কোন কথাবই ঠিক নাট; তাহাতে কোন মীমাংসা নাট; আবার শারীর বিজ্ঞানকে মানিতে হইবে। শারীর বিজ্ঞানের মীমাংসা সমুদায় জী গমন ও সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্বন্ধে গ্রাহ্য করিতে হইবে। যাহার মীমাংসাই নাই, তাহার আবার মীমাংসা লইতে হইবে কিরূপে? শারীর বিজ্ঞানের মীমাংসা নাই বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম শাস্ত্র আবার মীমাংসায় পরিপূর্ণ। মনু যে উক্ত দ্বিবিধ বিষয়ক বিধিতে পরিপূর্ণ। যে অধ্যাত্ম শাস্ত্র সম্বল মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছে, সে আবার অজ্ঞেব নিকট মীমাংসা ধাব করিতে যাইবে? লেখকের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে এত স্বল্প-দৃষ্টি যে, পত্নীকে পরকালে কোণায় গমন করিতে হইবে তাহাও পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তখন আর সে অধ্যাত্ম শাস্ত্র মীমাংসার কি বাকি রাখিয়াছে? তাহার অধ্যাত্ম শাস্ত্র পবকাল দেখে, বিপক্ষ গণের শারীর বিজ্ঞান কেবল ইহকাল দেখে। তবে আর শারীর বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মিলন হয় কই? বিপক্ষগণের শারীর বিজ্ঞানকে যদি লেখকের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অধীন হইতে হয়, তবে ত সে শারীর বিজ্ঞানকে একে বারে দেশ ছাড়া হইতে হয়।

লেখকের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখুন। “মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকাণ্ডেরা বলিয়া

থাকেন যে, যে জী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অল্পগামিনী হন, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া সেই স্বামী লোকেই গমন করেন। কর্মফল-বাদ বিবাহের পারলৌকিকত্ব নাশ করে না, দৃঢ় কবে। বিবাহের পারলৌকিকত্ব কর্মফল বাদের অবশ্যস্বাবী ফল।”

এই কথ ছত্রে লেখক বোধ হয় বলিতে চান যে পত্নী যে শুদ্ধ ইহলোকে পতির সহিত এক হইয়া গিয়াছেন এমত নহে, তিনি সেই একই পরলোকে গিয়াও রক্ষা কবেন। পরলোকেও তিনি পতির সঙ্গে এক হইয়া থাকেন। তিনি বলিতেছেন “বিবাহের যে একীকরণ উদ্দেশ্য, পতি পত্নীর যদি যথার্থই সেই একীকরণ হয়, অর্থাৎ পতি পত্নীর যদি এক ধ্যান, এক জ্ঞান, একরুচি, এক প্রবৃত্তি, এক কর্ম, এক ধর্ম হয়, তবে ত কর্মফল-বাদানুসারেই তাহারা পরলোকে এক ফল প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ পতি পত্নী রূপেই থাকিবে।” একথা বড় সহজ কথা নয়। লেখকের অধ্যাত্ম শাস্ত্র পরকাল ভেদ করিয়া কোথায় কে যাইবে তাহা ঠিক করিয়া দিয়াছে। যত দোষ শারীর বিজ্ঞানের বেলা।

লেখক বলেন, হিন্দু বিবাহ এই জন্ত আধ্যাত্মিক, যে মোক্ষ ইহার দ্বন্দ্ব লক্ষ্য। ব্রহ্মচর্যের পর সংসার ধর্ম, কিন্তু সংসার যখন অন্ত দ্বিবিধ আশ্রমের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য বাধিয়া চালিত হয় এবং সেই উদ্দেশ্য যখন মোক্ষ তখন কেন না বলিব দারপরিগ্রহের উদ্দেশ্য মোক্ষ। বেশ কথা, কিন্তু সংসার ধর্ম কত দিন? বানপ্রস্থে প্রবেশ করিবার পূর্বে কি সংসার ত্যাগ করিতে হয়

না? যদি হয়, পত্নী কি বিরাগী বনবাসী অল্পগামিনী হইয়া সঙ্গে থাকেন? না, পত্নী সেই বানপ্রস্থাবলয়ী পতিব সহিত এক ধ্যান এক জ্ঞান এক ধর্ম ও এক কর্ম হইয়া থাকেন? যাহাব মতে অধিকার নাই, যাহাব বেদে অধিকার নাই, তিনি কিরূপে বেদজ্ঞ ও তপ-জপ-পবায়ণ ব্যক্তির সহিত এক ধ্যান এক জ্ঞান হইবেন? তাহাদের পবম্পর্বে মধ্য কি অনেক পার্থক্য থাকিবে না। পতিব উদ্দেশ্য মোক্ষ। মোক্ষ লাভ হইলে তাহাব আত্মা পবমান্নায় লয় হইবে। তখন পত্নী কোথায়? পত্নীও কি পতির সহিত লয় প্রাপ্ত হইবেন? তবে ত তিনি তত্ত্বজ্ঞানলাভ না করিয়া এবং দন্ন্যাস প্রবেশ না করিয়াও মোক্ষ লাভ করিলেন? পত্নীর মোক্ষ কি এত সস্তা? কিন্তু মনে করুন পতিব নির্বাণ মুক্তি হইল না। তাহা হইলেও কি পত্নীর ধর্ম ঠিক পতির ধর্মের সহিত একই প্রকার হয়? কিছু ইতর বিশেষ নাই? যদি ইতর বিশেষ থাকে তবে ত এক লোকেই গমন হইল না। যখন এক লোকে গমন হইল না তখন উভয়েই যে আবার এক হইয়া থাকিবে এমত সম্ভাবনা কি? তা যদি না হয়, তবে আর পতি পত্নীর একত্ব রহিল কই? তাহা তো ইহলোকেই পর্যাবসিত হইতেছে। ইহলোকেও আবার কত দিন? যত দিন পতি সংসার আশ্রমে অবস্থান করেন। যে স্থলে পঞ্চপত্নীই সাক্ষী ও পতি অল্পগামিনী সেস্থলে সেই পাঁচ জন জীই কি পতির অন্ত জন্মান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবে? যদি মা বেড়ায় তবে তাহাদের একীকরণ

হয় কই ? আর যাহাব এক বার পাঁচটা বিবাহ হইল, তাহাব ত বরাবর পাঁচটা থাকিষা যাইবে ; কারণ পাঁচটাই একীকৃত হইয়া গিয়াছে । যদি না হয়, তবে বল একীকরণ হয় না । একেব একীকরণ না হইলে কাহাবও একীকরণ সম্ভাবিত নহে । কাবণ যে জন্ম একজন পৃথক্ হইতে পাবে সেই কাবণে সকলেই পৃথক্ হইতে পারে । আবাব দেখুন পত্নী যদি পতিব অল্পগামিনী হইয়া পরলোকে জন্ম লাভ কবিষা থাকে, তবে ত তাহাদেব বিবাহ ও মিলন অনিবার্ধ্য ! তাহাদেব বিবাহ হইলে পত্নীর আব শিক্ষাব কি প্রয়োজন ? সে পত্নী ঠিক পতিব অল্পকপ হইয়া জন্ম লাভ কবিষাছে । কাবণ, পূর্বজন্মে তাহাদেব এক ধ্যান, এক-জ্ঞান হইয়াছিল । যদি শিক্ষাব প্রয়োজন না হয়, তবে বালিকা-বিবাহেব প্রয়োজন কোথায় ? লেখকেব মতামুসাৰে যখন সকল বালিকাকে পতিব মত গড়িয়া লইতে হইবে, তখন তাহাদেব মধ্যে কাহাবই পূর্ব জন্মেব একত ছিল না, এই কথাই প্রমাণিত হয় । ইহজন্ম যদি পূর্ব জন্মেব পরলোক হয়, এবং পরলোকে একত্ৰ সহবাস ও এক-শব্দী হইয়া গেলে যদি পূর্ব জন্মেব ধ্যান, জ্ঞান, ধৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মকল এক হয়, তবে আব ইহলোকে শিক্ষাব প্রয়োজন আদৌ দেখা যায় না । শিক্ষাব প্রয়োজন না হইলে লেখকেব যুক্তি অল্পসাবে বালিকা-বিবাহেবও প্রয়োজন নাই ।

আমবা ওকালতিব আর একটি দৃষ্টান্ত দিব । “হিন্দু বিবাহ” নামক প্রস্তাবে লেখক সুবিধামত এত শাস্ত্র প্রয়োগ কবিষাছেন,

যে তাহাকে ওকালতি বলিব না ত কি ? তিনি কেবল বালিকা-বিবাহেব বেলা শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত কবিষাছেন । দেখাইবাছেন কন্যাবিবাহ অল্প বয়সে হওয়া উচিত এবং পাত্র-নির্বাচনেব ভাব কর্তৃপক্ষেব হাতে থাকা উচিত । বেশ কথা, কিন্তু কন্যানির্বাচন কার্য্যও যে কর্তৃপক্ষীয়গণেব হাতে থাকিবে এবং পাত্রেব বিবাহ যে অল্প বয়সে হইবে, একথাব শাস্ত্রীয় পোষকতা কই ? কেবল অবলাকন্যা-বিবাহ কালীন শাস্ত্র কথা ; আর ছেলেব বিবাহ-বেলায় চূপ । ছেলেব বিবাহ-বেলায় যুক্তি আসিল, তখন আব শাস্ত্রে হালে পানি পায়না । তাব বেলা লেখক ইউরোপীয় নির্বাচন প্রথা লইয়া পড়িলেন । অথবাটি Authority এবং পোষকতাও মাতবব— অমৃত বাবুত পত্ৰ । আমাদেব খুঁটান ভাষা দয়া কৰি যা যে ইংবাজী সাক্ষী দিষাছেন, তাহাতে ঐশ্বর্যদর্শিতাই প্রকাশ পাইয়াছে । তিনি দুই এক জনেব কথা তুলিয়া দেখাইলেন ইউরোপে নির্বাচন-প্রণালীৰ জন্য অনেক বিবাহেব ফল অসন্তোষকর হয় । কিন্তু হিন্দু মণ্ডলীব বিবাহেব ফল যে কতদূৰ অসুখজনক, এবং সেই অসুখকর বিবাহেব সংখ্যা যে কত অধিক, তাহাব কি তিনি বিবরণ সংগ্রহ কবিষাছেন, না দিতে পারিষাছেন ? হিন্দু সমাজ মধ্যে যে কত পত্নী ভ্যজ্য হইয়া ঠেলা আছে তাহাব কি ইয়ত্তা হয় ? যদি হিন্দু সমাজেব ঠেলা দাসীদিগেব গণনা করা তাহাব পক্ষে সম্ভব হইত এবং যদি তিনি তাহা কবিষা তুলনায দেখাইতে পারিতেন যে ‘হিন্দুবিবাহেব ফল অধিকতর সন্তোষকর তবে না তাহাব কথা প্রাচ হইতে পারিত ।

নহিলে শুধু ইংবাজী সমাজের শাস্ত্র দিলে কি হইবে? সে যাহা হউক, এখন শাস্ত্রীয় কথা গ্রহণ কবা যাউক। “হিন্দুবিবাহ” প্রস্তাব-লেখক কি সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া দেখাইতে পারেন যে হিন্দু পাত্রের বিবাহ তাঁহার কর্তৃপক্ষীয়গণ দিবেন? আমরা ত জানি হিন্দু শাস্ত্রের কোন খানে এ কথা নাই। তবে কেন, কন্যা-নির্বাচনের ভাবকর্তৃপক্ষীয়গণের হাতে থাকা তিনি বিধেয় বলিয়াছেন। শাস্ত্র চাও, কন্যা-নির্বাচন কার্য কর্তৃপক্ষীয়গণের হাতে দিতে মান্য কর। সে কথা বলিলেই ত প্রতুল; তাহা হইলে ত আব বর্তমান বিবাহ-প্রণালী সমর্থিত হয় না। ছেলের বিবাহ দেওয়া যদি কর্তৃপক্ষগণের হাত থেকে যায় তবে বর্তমান হিন্দু সমাজে মেয়ের বিবাহ দেওয়া আবও কঠিন হইয়া পড়ে। যাহার ছেলেমেয়ে পাঁচটি, তিনি ঢাল-ধোঁমির কবিতা ছেলেব বিবাহের পাওযানায় মেয়ের বিবাহ-ব্যয় সংকুলান কবিতেন। কিন্তু ছেলের বিবাহটা হাত থেকে গেলে, সে রূপে মেয়ের বিবাহের ব্যয় নির্বাহ কবা আব ঘটনা উঠিবে না। অথচ শাস্ত্রানুসারে আমাকে মেয়ের বিবাহটা তাড়াতাড়ি দিতেই হইবে। তবে সমাজ চলে কই? এই জন্ত লেখক কন্যা-নির্বাচনের বেলা কোন শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ কবেন নাই, তাব বেলা একদেশদর্শীর মত যুক্তি আনিলেন। তবেই তো হচ্ছে, শাস্ত্রের কথা আমরা সমুদয় লইতে পারি কই? এখন সে দেশ কাল পাত্র নাই। আমরা এখন শাস্ত্র ধরিয়া চলি না। দেশাচার আমাদের সর্বস্ব।

দেশাচার আমাদের গুরু ও সমাজেব হর্তা কর্তা বিধাতা। যে শাস্ত্র-বিধিদেশাচার-বিরুদ্ধ হয়, সে শাস্ত্র-বিধি কি আমরা মানিতে পারি? তবে এত শাস্ত্র নইয়া ছলছল পড়িয়াছে কেন? যিনি অপ্রচলিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কথা কহিবেন, তাঁহার উপর কটুক্তি বর্ষণ কেন? আমরা কি শাস্ত্র মানি, না দেশাচার মানি? আমাদের কাছে মজুই বা কি, যাঁতবন্ধই বা কি, আর অপরাপব স্মৃতিকারই বা কি? মজুব পর যে এত জন স্মৃতিকার হইয়াছেন, ইহারা কি পববর্তী কালের সমাজনীতির পবিবর্তনকে বিধিবদ্ধ করিয়া যান নাই? বিবাহ সম্বন্ধে মজুর নীতি যে গ্রহণীয় নহে, এই স্মৃতিকারেরা কি তাহাই প্রমাণ করেন না? মজুর ক্রমে যদি হইয়া বয়ুনন্দনের স্মৃতিবিধানে সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন কেন? তাই জন্ত বলি শাস্ত্রের সঙ্গে আমাদের তত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। দেশাচারের সমর্থনার্থ শাস্ত্র। শাস্ত্র সমর্থনার্থ দেশাচার নহে। শাস্ত্রকাবেবা সবই সমান, সবাই ভক্তিভাজন, কিন্তু দেশাচার শাস্ত্র অপেক্ষা গবীযান্। দেশাচারই যে ধর্মনীতি, একথাও শাস্ত্রীয় কথা।

মেয়ের বিবাহ বেলাই বিবাহ আধ্যাত্মিক। সেই আধ্যাত্মিক বিবাহের নিয়মানুসারে ছেলের বিবাহও হওয়াত উচিত। তাহা হইলে ছেলেকে এখনকাব ব্রহ্মচর্য শেষ করিয়া, অর্থাৎ বি,এ, এম, এ পাশ কবিতা আপনার মনোমত কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হয়। এরূপ না করিলে আধ্যাত্মিক বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের ধর্মসাধনোদ্দেশ্যে যে

কার্য্য করিতে হইবে, সে কার্য্যের ভাব অন্যের হাতে কেন ? অন্যে আমার ধর্ম্মোপযোগিতা কি বুঝিবে ? অস্ত্রধারাই বা আমার ধর্ম্মকার্য্য ভালরূপে অনুসম্পন্ন হইবে কিরূপে ? আমার ধর্ম্মকর্ম্ম আমি যেমন বুঝি, অন্যে কি তেমন বুঝিতে পারেন ? লেখকের মতে বিবাহ যদি আধ্যাত্মিক হয় তবে ত পতিব হাতেই কস্তা-নির্বাচন-ভাব থাকা উচিত হইয়া পড়ে । কিন্তু লেখক বিবাহকে ও আধ্যাত্মিক বলিবেন, অথচ বর্ত্তমান প্রথাব মত কর্ত্তৃপক্ষগণের হাতে কস্তা-নির্বাচনের ভাবও দিবেন ; এ কেমন কথা । আমার দেখুন আমাকে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে যদি পত্নীকে শিক্ষা দিতে হয়, তবে যত শৈশবাবস্থায় সেই শিক্ষা আবদ্ধ করা যায় ততই ভাল । তাহা হইলে ত আমাকে দুঃসপোষ্য কস্তাকে গৃহে আনিতে হয় । তিন চারি বৎসরের কস্তাকে গৃহে রাখিয়া আমার নিজ হাতে তাহার তরিবদ হইলে তবে তাহার তরিবদ ও শিক্ষা ঠিক আমার উদ্দেশ্যানুযায়ী হইতে পাবে । তবে কেন প্রস্তাব-লেখক কন্যা কালের বয়স বৃদ্ধি কবিয়া দিয়া বর্ত্তমান কালীন কস্তা কালের সমান করিয়া দিয়াছেন । শাস্ত্রে বলে ৮।৯ বৎসরের কন্যাই বিবাহের পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য হইলে তদপেক্ষা বয়স কমাই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় । ঋতুবালায় যদি কস্তাব পাঠশালা হইত, আর পতিকে যদি গুরুমহাশয়গিরি কবিতো হইবে, এইরূপ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে যে তরুণ বয়সে ছেলেরা পাঠশালায় প্রবেশ করে, সেই বয়সই কস্তাব বিবাহ কাল বলিয়া

শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইত । বেকী বয়সে শিক্ষাবস্ত কবিলে শিক্ষা ভাল হয় না এ কথা সকলেই স্বীকার কবিবেন । ১২।১৩ বৎসর পিত্রালয়ে থাকিলে কি তারপর কস্তাব মেজাজ ও স্বভাব চরিত্র আর পরিবর্ত্তিত কবা যায় ? সে মেয়ে যে বিগড়াইয়া যায় । শাস্ত্রে যখন ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত কস্তা-কাল নির্দিষ্ট আছে, যখন ঋতুকালের পূর্বে বিবাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কস্তাব শিক্ষা-বিধান নহে, কিন্তু অস্ত্র কিছু আছে, যাহা লেখক গ্রহণ কবিতো পাবেন নাই । লেখক হিন্দু বিবাহকে যত আধ্যাত্মিক ভাবিয়াছেন শাস্ত্র যদি তত ভাবিত, তাহা হইলে শাস্ত্রে বোধ হয় কন্যাকাল ৩।৪ বৎসরের অধিক নিরূপিত হইত না । কিন্তু যখন তাহা হয় নাই, তখন শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য যে লেখক সম্যকরূপে গ্রহণ কবিতো পাবিয়াছেন এমত অনুমান হয় না ।

কিন্তু মনে করুন, সে কালে বিবাহ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে, যেরূপ উদ্দেশ্যে লেখক অনুমান কবেন, সেইরূপ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে সে কথা আজিকার দিনে কেন ? সে ত্রেতাযুগের কথা কলিযুগে কেন ? কলিযুগের জন্য যে শাস্ত্রকারেরাও বিভিন্ন বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং আজি যদি হিন্দু রাজ্য থাকিত ও হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে যে সমাজের অভ্যাস নিয়মানুসারে এক্ষণে নতুন নতুন কালোপযোগী বিধান-শাস্ত্রের ব্যবস্থা হইত তাহার আব সন্দেহ নাই । যে নিয়মে বিভিন্ন কালধর্ম্মে বিভিন্ন স্মৃতিকার অন্ত্রিয়াছিলেন,

আজি সেই নিয়মে বর্তমান কালোপযোগী আর একজন রঘুনন্দন দেখা দিতেন। তবে এখন সে চারি হাজার বৎসরের পূর্বের কথা আনা কেন? চারি হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দুসমাজ যেকপে পাতা ছিল, হিন্দুসমাজের যেকপে গঠন ছিল আজি কি সেরূপ আছে? না আর সেরূপ হইতে পারে? তখন যেকপে সমাজ পাতা গিল, তাহাতে মোক্ষলাভের পন্থা অতি সুসাহ্য হইয়াছিল। তখনকার আশ্রমিক নিয়ম অনুবর্তন করিলে লোকে সহজে মোক্ষলাভে সমর্থ হইতেন। এখন কিছুতেই সে সমাজ-সংস্থান ঘটিতে পারে না। হিন্দু রাজত্ব থাকিলেও তাহা ঘটিত না। কারণ হিন্দু রাজত্ব কালেই সে সমাজের ক্রমশঃ পবিত্রবর্ধন ঘটিয়া আসিয়াছে। যে কালে চারি আশ্রমের নিয়ম ছিল, সেই কালে যদি বিবাহ আধ্যাত্মিক হইয়া থাকে, তবে যখন সেই আশ্রম চতুর্থ লব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আর বিবাহ আধ্যাত্মিক হইতে পারে না। অতএব বিবাহের আধ্যাত্মিকতা লেখকের যুক্তি অনুসারেই অনেক কাল পূর্বে উড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুসমাজে বিবাহের উদ্দেশ্য অন্তবিধ হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী এক্ষণকার বিবাহরীতি প্রচলিত আছে। সুতরাং পূর্বকাল উদ্দেশ্য ধরিয়া এক্ষণকার হিন্দু বিবাহ সমর্থিত হইতে পারে না। যে আধ্যাত্মিকতা পূর্বের উপযোগী ছিল, এক্ষণে তাহার সে উপযোগিতাও নাই। এক্ষণে সে মৃত আত্মার প্রেতকে আশ্বাস করা নিম্প্রয়োজন। যাহা মৃত হইয়াছে, তাহা প্রেত ভূমিতে মিশাইয়া রাখ।

যে মোক্ষ ধরিয়া হিন্দুবিবাহকে আধ্যাত্মিক বলা হইয়াছে, সেই মোক্ষ কিরূপ লেখক তাহা ভাল রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন “মুক্তিলাভের অর্থ আনন্দময় আত্মার স্বরূপ দর্শন”। আত্মার স্বরূপ-দর্শন মোক্ষের সাধন মাত্র তাহা মোক্ষ নহে। আমরা জানি কর্তব্যকলহেতু স্বরূপ সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কনাই মোক্ষ। সে মোক্ষ কিরূপে লাভ হইতে পারে? না আত্মজ্ঞানে, বা আত্মদর্শনে অথবা পরমা-ত্মাতে আত্মা লয় হইলে জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করেন। মনুর দ্বাদশ অধ্যায়ে ৮৪ হইতে ৯০ শ্লোকের তাৎপর্য বুঝিলে মুক্তির অর্থ এইরূপই দাঁড়াইবে। সে যাহা হউক, লেখক যে মোক্ষ ধরিয়া আধ্যাত্মিকতাব মত ২৫ টি তুলিয়াছেন, লোকে আগে সেই মোক্ষের প্রার্থী হউক, তখন তাহাকে সে দিকে যাইতে বলিবে। যদি এক্ষণকার লোকে সে মোক্ষই না চায়, তবে আব তাহার কাছে আধ্যাত্মিকতাব জাবি করা কেন? নিবৃত্তি-মূলক মোক্ষ প্রবৃত্তিপথানুগামী সংসারী পক্ষে উপযোগী নয়। যাহাবা চিবকাল সংসারে আছে ও সংসারে থাকিবে যাহাবা কথম প্রবৃত্তি-পথ পবিত্যাগ করিবে না, এক্ষণে কেমন একটা ধূষা উঠিয়াছে, তাহাদেব নিকট কেবল নিবৃত্তি পথের কথা। যে পথে তাহাবা আছে ও থাকিবে সে পথের শ্রেয়লাভের কথা কেহ কহে না। এক্ষণে করিয়া মূর্খ লোকদিগকে কেবল ধাঁধা দেওয়া হয়। এইরূপ ধূষা ধরিয়া আজি আধ্যাত্মিক বিবাহের কথা উপাশিত

হইয়াছে। প্রাচীনকালে প্রবৃত্তি-পথ নিবৃত্তি পথের অমুগামী ছিল। তখন নিবৃত্তিই প্রধান, প্রবৃত্তি তাহার অমুগামিনী ছিল। ক্রমশঃ এই নিবৃত্তিপথ অপ্রবল হইয়া এক্ষণে একমাত্র প্রবৃত্তি পথই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সে কালের প্রবৃত্তি-পথের মোক্ষ এক্ষণকার প্রবৃত্তি-পথেব অভিলষিত হইতে পারে না।

ছোট ছোট বউ ঘরে আনিলেই পরি-বাব মণ্ডল আধ্যাত্মিক হইয়া যায় না। সে কালের সমাজ-গঠন চাই, সে কালের শিক্ষা চাই। যখন সেকালের সমাজ-গঠন নাই, আর সেকালের শিক্ষাও ভবিষ্যৎ হওয়া যখন অসম্ভব, তখন বর্তমান সমাজে আধ্যাত্মিকতার দাঁড়াইবাব স্থল কই? যদি এক্ষণকার শিক্ষাত্রোত ও ভবিষ্যৎ ফিরাইতে পার,

যদি বর্তমান সমাজকে চারি হাজার বৎসর পূর্বে লইয়া যাইতে পার, তবে ত আবার আধ্যাত্মিক পরিবার গঠনের কাল উপস্থিত হইতে পারে, নহিলে নহে। ন মন তেল ও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না। রসো, আগে যবন বাজর যাক্, যাবনিক শিক্ষা উঠিয়া যাক্, মোকে ব্রহ্মচর্য্য, সংসার ধর্ম্ম, ও বানপ্রস্থাবলম্বী হউক, আগে ইংবাজী বুটপায়ে দিয়া সাহেব সাজা, বেধুন ইস্কুলের গাড়ী চড়া, ইংবাজী থানা থাওয়া, বাধাবাজাবে যাওয়া, ইংরাজের পদলেহন করা, হ্যাট্‌কোট পবা, টেলার শাপ করা, হোটেল করা, বি এ, এম, এ পাশ করা এবং বিলাত যাওয়া উঠিয়া যাউক, তবে ত আধ্যাত্মিক কাল উপস্থিত হইবে। হা অদৃষ্ট! সে কাল কি আর কখন আসিবে!

শ্রীঅমৃতলাল বসু ।

প্রভাত সঙ্গীত ।

১

জাগ যা জননি, ভারতের লক্ষী
মিল আঁখি একবার !

প্রভাত হরেছে মেগেছে নগোর
নাহি আর অন্ধকার ।
জাগ যা জননি, আর্য্যকুল-লক্ষী
হের পোহাইল নিশি ।

গগনে জাগিল গগনের রবি
আলোকে পুরিল দিশি ।
জগৎ হেরিল, জগতেব দিবা,
ভারতেব দিবা তুমি,
তুমি না জাগিলে জাগিবেনা এবি
নিদ্রিত ভারত ভূমি ।

২

কি কহিব হায আজি এ ভারত
পড়িয়া মহীব কোলে ।
কত শত বর্ষ রিপু পদাঘাতে
যাই নি মা রসাতলে ।
জীবিতে যা ছিল, এবি তাই আছে,
মেঘেব আড়ালে শশী ।
একটি আলোক, যাইনি কো নিবে,
একটি পড়ে নি খসিটি
সৌন্দর্য্যেব রেখা যেখানে যা ছিল,
স্মৃতি আছে পবশিমা ।
যে শোভা যেথায়, করিত স্মৃতি
আছে যেন বুমাইয়া ।
কেবল অশান্তি ঘিবিয়া চৌদিক,
ধর ধব তারে কবে ।
রূপের সজ্জমে পাবে না ছুঁইতে,
মেঘ যথা শশধবে ।

৩

কত অলঙ্কার, স্বর্ণ অঙ্গে ছিল,
কিছু নাই আর তাব ।
যে এল নিকটে, সেই নিল কেড়ে
দেহ মাত্র এবি সার ।
মিত্র বশে আসি, দম্ভ্যবেশ ধরি,
নিল সব অপহরি ।
নীববে কাদিল, কেহ না জানিল,
কি যাতনা মরি মবি ।

মন্তকের মবি, কাণের কুণ্ডল
হাতেতে নাহি বলব ।
হায রে বিধাতা এত মিঠুরতা
তোমার এ রাজ্যে নব ।

৪

কত কাল গেল, হায এই দশা,
তবু ও ভুলেনা লোক !
দলে দলে যাত্রী, শত্রু মিত্র বেশে
জাগাইছে মহাশোক ।
এনেছে আঁধার আলোক ভাবিয়া
দেখিতে সৌন্দর্য্য তার ।
আপন আলোকে অন্ধ আপনারা
কি দেখিবে বল আর !
আসিযাছে ঐ ধর্ম্ম, সত্য, নামে
ফিবিতেছে স্বাব স্বাব ।
বরিষাব কালে নিশাব আকাশে,
নিকি মিকি অন্ধকার ।
এসেছে সভ্যতা, এসেছে বিজ্ঞান,
কথকতা করে তাবা ।
হায বে অদৃষ্ট ! জ্ঞানের জননী
রহিয়াছে জ্ঞান-হাবা ।
যাহার শিক্ষায় দীক্ষিত জগৎ,
এতুংখ বলিব কারে ।
তাহার সন্তান পূর্ণ-শিক্ষা তরে
যায গো সমুদ্র পাবে ।

৫

জাগ মা, জননি ভাবতেব লক্ষ্মী
মিল আঁখি একবার ।
প্রভাত হযেছে জেগেছে সংসার
নাহি আর অন্ধকার ।
চারিদিকে শুন, জর-ধ্বনি হয়,
পূর্ণ মহী কোলাহলে ।

উন্নতির পথে চলেছে জগৎ
আনন্দ-সঙ্গীত তুলে ।
ভারত-সম্ভান দীন দুঃখী হ'য়ে
কাদিবে কতই আব !
উন্নতির পথে, তারা কি জননি
হবে না কো অগ্রসব ?
দেখ তারা ঐ মিলে ভাই ভাই
হইতেছে এক ঠাঁই ।
হিন্দু মুসলমান পঞ্জাবী পাঠান,
কোন ভেদাভেদ নাই ।

তোমার মহিমা, করিছে কীর্তন
অয়ের নিশান তুলে ।
উল্লাসে উৎসাহে আনন্দে মেতেছে
আপনা আপনা তুলে ।
উঁ মা জননি লও মা তাদের
স্নেহের সন্ধান বোলে ।
তোমার পবশে হাসিবে হরষে
সবাই জননী-কোলে ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ ।

সমালোচনা ।

বিদ্যোদয় ।—পণ্ডিত জীৱন্ত হৃষীকেশ
শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত । মূল্য বাৎসরিক
২২ দুইটাকা, ছাত্র পক্ষে একটাকা । এখানি
সংস্কৃত মাসিক পত্র । পূর্বে শাহাব হইতে
বাহিব হইত । এখন ভাটপাড়া হইতে
প্রকাশিত হইতেছে । একপ বর্ণের সংস্কৃত
পত্র আব নাই । এখানি যে সকলের আদ-
বনীয় হওয়া আবশ্যক তাহাব আব সন্দেহ
নাই । বাঙ্গালির সাময়িক পত্রিকাব দুর্দশা
দেখিয়া বেশ বোধ হইতেছে শাস্ত্রী মহাশয়কে
ইহার প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিতে হয় ।
একপ পত্রিকার ভার আমাদিগের বহন
করা কর্তব্য । বিদ্যোদয় যে একখানি সর্বোৎকৃষ্ট
মাসিক পত্র তাহার আর সন্দেহ নাই ।

চিত্তপ্রবাহিনী; প্রথম ভাগ । জীৱন্তনাথ
দাস কর্তৃক প্রকাশিত । তিনখানি পত্রেই
প্রথম ভাগ সমাপ্ত । প্রথম পত্রখানি “প্রেম

বিষয়” প্রথম পত্র । সর্বোজকুমার প্রমদা
চরণাক্ষর লিখিয়া শেষ পত্রে জিজ্ঞাসা
করিতেছে, ভাগবাস কি প্রকার । “সহ-
জাত কি পুষ্প নিকট শিক্ষণীয় ? উহা কিকি
প্রকাবে উদ্ভিক্ত হয় ইত্যাদি বিষয়” প্রমদা
চরণ তদন্তবে তাঁহাকে অনেক লিখিয়া পবি-
শেষে লিখিলেন “যে কারণে দেবাদিদেব
মহাদেব ও দেবী ভগবতী দাম্পত্যাদি
প্রেমাস্বাদন করিয়া বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্ব-
প্রেমিকা হইয়াছেন, সেই কারণে জন্ম
ষ্টয়ার্ট মিল টেলর পত্নী সহ ও টেলর
পত্নী মিলের সহ এবং অন্যান্য ব্যক্তি
দাম্পত্য স্নানাদন করিয়াও বিশ্বপ্রেমিক
হইয়াছেন । আমি এই প্রকার সকল
লোককে বিশ্বপ্রেমিক হইয়া বিশ্বপ্রেমিকা
স্ত্রীর সহিত ও বিশ্বপ্রেমিকা বিশ্বপ্রেমিকের
সহ দাম্পত্যপ্রেমসমুদয় লাভ করিতে অহ
রোধ করি ।”

লেখক জনষ্ট্রাট মিলকে শিবভূলা বিশ্বপ্রেমিক বলেন ও টেলরপত্নীকে ভগবতী সদৃশা বিশ্বপ্রেমিকা বলেন। অন্যান্য ব্যাক্তিরাও বিশ্বপ্রেমিক এবং বিশ্বপ্রেমিকা হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে জগতে বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিকা ছড়া-ছড়ি। আমবা বলি মিলের মত বা টেলর পত্নীর মত বিশ্বপ্রেমিক বা প্রেমিকা অনেক কলিকাতার গলি ঘুঁজিতে আছে কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব কিম্বা দেবী ভগবতীর ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক বা প্রেমিকা জগতে অতি বিবল। প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক এ জগতে নাই।

তারপর “স্বাধীন চিন্তা বিষয়ক দ্বিতীয় পত্র।” এ পত্রখানি সর্বোজ্জ্বল প্রমদাচরণকে লিখিতেছেন। পত্রখানি মন্দ নয়।

“তৃতীয় পত্র (পৌড়িতা লিখিত) এই খানিতেই পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। এ পত্র খানি পড়িলে হবিভক্তি উড়িয়া যায়। কল্প বাইবেল কথা মনে পড়ে। লিখিতেছেন;— “আমার জানে যে কার্যে আত্ম স্তুতি লাভ হয় তাহাই মানবের কার্য, তাহাই মানবের করণীয় এবং যে কার্যে আত্মস্তুতি লাভ না হয়, তাহাই মূল্যহীন, তাহা মানবের অকার্য্য তাহাই মানবের বর্জ্য।” ভিন্ন লোকের ভিন্নরূপে আত্মস্তুতি লাভ হয়। যাহা ইচ্ছা তাহা কবিলেই-যথেষ্ট হইল। ইহার জন্যই সমাজ—ইহার জন্যই পেনাল কোডের সৃষ্টি। এ পত্র খানি প্রকাশ না কবিলেই ভাল ছিল। একপ কথা কেন বলিতেছি তাহাব নমুনা স্বরূপ আর এক স্থল উদ্ধৃত করিলাম।

“ভাই! বিবাহের বহুদিন পবে যে দিন তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া খণ্ডর-বাড়ী আসিলাম, সেই দিনই আমার স্মৃতির দিন গত হইয়া দুঃখের রাত্রি উপস্থিত হইল। বিবাহকালে আমি স্বামীকে বুদ্ধ দেখিয়া ছিলাম বটে, কিন্তু তখন জানি না যে ঐ বুদ্ধই

আমার জীবনের সহচর হইবেন। যিনি পিতার ভূলা, তাঁহাকে স্বামী বলিয়া ভাবিতে হইবে ইহা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। জানিলে এইরূপ আকস্মিক দুঃখে আক্রান্ত হইব কেন?

সপ্তদশ-বর্ষব্যক্তি যুবতীষ ষাট-বর্ষব্যক্তি বৃদ্ধ স্বামী দেখিয়া আমি কাঁদিলাম; অবশেষে কপালের বিধি খণ্ডাইবার নয় ভাবিয়া বৃদ্ধ স্বামীর সহিত মন মিলাইতে বহু চেষ্টা কবিলাম, কিন্তু হায় কিছুতেই মন মিলিল না।”

তাবপর পত্রে লিখিতেছেন। “আমি একটি যুবককে বেড়াইতে দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল তাঁহার মনটি যেন আমার মনের মত। বোধ হয় যুবকও আমাকে দেখিয়া ভাবিতেছিলেন তাঁহার মনের মত আমার মন, কারণ তিনি আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আমার দিকে বারংবার হাসিমাখান দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিত্তে ছিলেন। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঘোমটাব ভিতর হইতে হাসি লজ্জা মাখান দৃষ্টি ঘন ঘন নিক্ষেপ কবিত্তে লাগলাম।” ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন শিক্ষিতা মহিলা পূর্বে পবিচিত বালা সহচর নিকট এইরূপ ভাবে পত্র লিখিয়া আত্ম পবিচয় দিতেছেন। জ্ঞী শিক্ষার যদি এইরূপ ফল হয় তাহা হইলে জ্ঞী শিক্ষা একেবারে উঠিয়া যাউক। বালা সহচর বা কিরূপ তাহা আমরা বলিতে পারি না; কারণ একপ গুপ্ত চিঠি তিনি জনসাধারণে প্রচার করেন। চিন্তা প্রবাহিনীর এই শেষ প্রবাহিনী।

চিন্তা প্রবাহিনীর লেখক যে ভাবুক তাহার কোন সন্দেহ নাই। চিন্তাশক্তিৰও পবিচয় স্থানে স্থানে দিয়াছেন। ভবিষ্যতে আমবা ইহা অপেক্ষা যে অনেক পবিমার্জিত ও উৎকৃষ্ট উপহার তাহাব নিকট হইতে প্রাপ্ত হইব—এরূপ আমরা আশা করি।

বিভা ।

[৬ষ্ঠ সংখ্যা]

সন ১২৯৪ সাল

১ম খণ্ড]

অবরোধ প্রথা ।

শিক্ষিত ব্রাহ্ম ।—আমি অবরোধ প্রথা
সম্বন্ধে আপনাকে হুই একটা কথা বলিতে
ইচ্ছা করি। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য—এ
কলঙ্ক আমাদের দেশে ইদানীন্তন উদ্ভূত হই-
যাচ্ছে, না প্রাচীন হইতে চলিয়া আসিতেছে।
এ সম্বন্ধে আপনাদের পূর্বাণু বার্মাণ মহা-
ভাবতে কি দেখিতে পান?

শিক্ষিত হিন্দু ।—আজকাল ইউরোপে
ষতটা স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়,
পূর্বকালে ভাবতবর্ষে ততটা ছিল কি না,
আমি নিশ্চয় কিছু বলিতে পারি না। ভাব
গতিক দেখিয়া বোধ হয়, অপেক্ষাকৃত কম
মাত্রায় ছিল। কিন্তু শুধু বার্মাণ মহাভারত
কেন আমাদের পেরেকের পুঁথি মাত্রই
ফুরি ফুরি প্রমাণ পাওয়া যায়, যে তখন স্বা-
ধীনতার বিশেষ অভাব ছিল না।

ব্রা। তবে কোন্ সময়ে এবং কি কি
কারণে এ প্রথা প্রথম উৎপত্তি?

হি। মুসলমান শাসনের সময়ে যে ইহা
প্রথম দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই। যে সময়ে তাহারা প্রথম ভারতবর্ষ
আক্রমণ করে, অবরোধ প্রথাও গোড়াপত্তন
সেই সময়ে। মুসলমানদের জারিজুরির
সময়ে খ্রীলোকদের সাবখানে বাধিবাব জন্য
আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এই প্রথাও সৃষ্টি
করেন। মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব হইতেই
পর্দার প্রচলন ছিল; অতএব ইহাও বড়
অসম্ভব নহে যে তাহাদের দেখাদেখি আমরা
তাহাদের ব্যবহার অনুকরণ করিয়াছি।
আমার বোধ হয় এই হুই কারণের যোগে
এই ব্যাপারটা ছটিয়াছে। যে সকল
দেশে মুসলমানেরা ভাল রূপ দখল করে
নাই, সে সকল দেশে আজিও দেখিতে
পাওয়া যায়, খ্রীলোকদের সম্বন্ধে অতটা
আদব কার্যদা নাই।

ব্রা। মুসলমানদের শাসন কালে অশেষ

প্রকার উপদ্রব ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কারণে খ্রীলোকদের আড়ালে বাখিবার খানিকটা প্রয়োজন ছিল তাহাও আমি স্বীকার করি। প্রবল ও নিষ্ঠুর মুসলমানদের হস্তে হিন্দুদের ন্যায় দুর্বল জাতিব একপ ভিন্ন আব কি উপায় আছে? এখনত মুসলমানের রাজত্ব নাই, এখন ত কোন রূপ দৌবায়ের সম্ভাবনা নাই, এখন তবে আপনারা এ প্রকার একটা কুপদ্ধতিক সমাজে স্থান দিতেছেন কেন? উহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়াইত সর্বতোভাবে কর্তব্য।

হি। আপনি যাহাকে কর্তব্য মনে করেন, তাহা বাস্তবিক কর্তব্য হইতেও পাবে, না ও হইতে পাবে। দেশশুদ্ধ লোকে অববোধ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত মনে কবে না, সেই জন্য আজিও উহা প্রচলিত। আসল কথা একটা পূর্বনিয়ম সমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়া বিধি একটা নূতন নিয়ম সমাজে স্থাপন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আপনারা বোধ হয় এ কথাব যথেষ্ট সার্থকতা দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের সমাজে আব কিছু থাক্ আব না থাক্, একটা ভাল জিনিস আছে। লোকে সমাজে একটা বাঁধুনি (ভালই হউক আব মন্দই হউক) হঠাৎ ছিড়িয়া ফেলিতে চাহে না। আজ এক বকম, কাল আর এক বকম—আমাদের কদাচ একপ পদ্ধতি নহে। আমি ইহাকে একটা বিশেষ শুলক্ষণ বলিয়া মনে করি। এ ঝোঁকটা আমাদের দেশে কিছু বাড়াবাড়ির দিকে যায়—এই টুকুই ছুংখের বিষয়। আসলে জিনিসটা ভাল। আব একটা কথা। মুসলমান রাজত্ব গিয়াছে

সত্য, কিন্তু তাহাব পবিবর্তে কি রাম-রাজ্য উপস্থিত হইয়াছে? আমবা এখনও পবেব হাতে আছি—একথা সর্বদা মনে রাখা উচিত। আমাদের কর্তব্য ধার্মিক ন্যায়পন্থা, একথা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের ধর্মপথে, ন্যায় পথে বাধিতে পারি আমাদের কি এতটা ক্ষমতা জন্মিয়াছে? আমবা তাহাদের হাতে, না তাহাবা আমাদের হাতে? আমবা যতটুকু নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পাই, সবই তাঁহাদের কল্যাণে—নিজের জোবে কি? এইত সভ্য ইঙ্গবেজ রাজত্ব,—কত উন্নতি, কত আইন, কত পুলিশ কত কি,—আজিও দিনেব বেলায় বাঙ্গালী ভাষাদের মাঠে, ঘাটে, বেলে, জাহাজে সর্বত্রই কত লাথি ঘুসি খাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আমাদের মতে খ্রীলোকেরা ত আছে ভাল, আব বং একটা নিয়ম করা উচিত, যে পিলেবোগী বা ক্ষীণজীবী বাঙ্গালি পুরুষবাও যেন পদ্ধাব ভিতবে থাকেন—ভুলিয়াও যেন সাহেবেবা তাহাদের মুখ দেখিতে না পায়। আজ যেন আমি স্বচ্ছন্দে আমার জীব হাত ধরিয়া সন্ধ্যাব সময় একবার ইডেন গার্ডেনে পদ-সঞ্চারণ করিয়া আসিলাম। কাল যেন—কুসমস ইভেব দিন—গ্রেটইষ্টারনে ভাড়া চেলিয়া ভগ্নগণকে লইয়া কেক কিনিতে যাইলাম। চিবকাল কি আমার এইরূপ চলিবে? এই কি আমাদের চিবস্থায়ী কায়েমী অবস্থা? কাল যদি এখানে চীনের রাজত্ব হয় কিংবা ইংবাজবাই যদি হঠাৎ বিগড়াইয়া দাঁড়ায় ও মুসলমানদের মত উৎপাত আরম্ভ করে, তাহা হইলে পরশু কি আমাদের মপরিবারে

ব্যারাকপুৰ পার্কে পিকনিক কবিতো যাওয়া পোষাইবে? আমবা ইংবেজ রাজত্বে কেমন একটা স্মৃতিৰ সপ্নে ভোব হইয়া আছি। যেন আমাদেরই বাজত, ইংবেজবা আমাদের আপনাব, ও আমাদের হইয়া বাজত চালাইতেছে। পৰশাসনে এত মুগ্ধ পৃথিবীতে আব কুত্ৰাপি কোন জাতিকে দেখা যায় নাই। জাতীয় নীচত্ব পৰিচয়, ইহাব অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পারে? এ জাতিব কি কখন উন্নতি আছে? ফৰাসীবা যখন বলপূৰ্ব্বক ইতালী অধিকাৰ কবে, তখন শত শত ইতালীয় পৰিবার অবনতমন্তকে স্বদেশ ত্যাগ কৰিয়া দেশদেশান্তৰে চলিয়া যায়। গাবিবল্লীৰ বাজবলে যখন ইতালী পুনৰায় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাবা প্রকৃত বদনে প্রবাস হইতে স্বদেশে ফিৰিয়া আইসে— ইহাবাই প্রকৃত মাজুয। এদিকে আমবা ইংবাজ শাসনে কেবল আহোদ প্রামাদ ভোগবিলাস ছাড়া আব কিছু জানি না। খববেৰ কাগজে ইংবাজদেব তুটা গালি দিয়া আমাদের বুৰাইয়া যায়। বাজপুত বমণীবা পাছে মুসলমানদেব স্পর্শে কলুষিত হয়, এটো আশঙ্কায় জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ কৰিয়া ছিল। আজিও স ভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। আমাদের বাঙ্গালায় পূৰ্বে কি ছিল জানি না, আজকাল দেখিতে পাই যদি একজন লেডি প্রাড়ুঘেটেব পিট চাপুড়াইয়া ভাইস্ চ্যান্সেলোব সাহেব বলেন—“you have my best congratulations, Mrs. so and so,” তাহা হইলে তিনি যেন হাতে স্বৰ্গ পান।

একটা জাতীয় নিয়ম হঠাৎ বদলাইয়া

ফেলা কিছু বুদ্ধিব কাজ নহে। প্রথমে দেখা উচিত, বর্তমান প্রথাটা কতদূর দুষণীয়। দোষটা কি এতই ভয়ানক যে আজই তাহাব একটা প্রতিকাব না কবিলেই নহে?— ইহাও একটা মীমাংসনীয় বিষয়। আব এই একটা মন্ত কথ্য, যে পৰিবৰ্ত্তন কাষ ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিয়া স্মৃতিয়া কবাই ভাল, তাডাতাড়িটা কিছু নহে।

ত্ৰা। আপনি অনেক কথ্য বলিয়া ফেলিলেন, আমি তাহাব মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পাবিলাম না। আপনি কি বলিতে চাহেন যে আমাদের জাতীয় অবস্থাৰ কোন পৰিবৰ্ত্তন হয় নাই? আলাউদ্দিনেব সময়ে যেখানে ছিলাম আজিও সেই ধানে আছি? উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালীতে বিদ্যাশিক্ষাব প্রভাবে এদেশেব কি কিছুই পৰিবৰ্ত্তন হয় নাই, কিছুই উন্নতি হয় নাই? যদি হইয়া থাকে (এ কথ্য কে অস্বীকাৰ কৰিবে?) তবে এই উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ উন্নতিব চেষ্টা কবা কি উচিত নহে? অববোধ প্রথা উঠাইয়া দিবাব কি আজিও সমব হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছে। ভবিষ্যতে কি হইবে, না হইবে সে কথ্য আমাদের প্রযোজন কি? যাহা ভাল তাহা আজিই কবা উচিত। আপনি বলি- যাছেন একটা কিছু পৰিবৰ্ত্তন কৰিবাব পূৰ্বে সে কাৰ্য্যেব প্রযোজনীয়তা দেখা উচিত। ঠিক কথ্য। দেখুন বাঙ্গালী জীৱ অবস্থা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীৰ অপেক্ষাও শোচনীয়। তাহাবা যেন কেবল সংসারেব যত নিকুট কাষ কৰিতে জন্মিযাছে। তুদণ্ডেব তরে তাহাদেব জীৱনে স্থখ নাই। তাহারা

পৃথিবীর কিছুই দেখিতে পাষ না। বন্ধন-শালা হইতে খিড়কি ব দরজা পর্যন্ত তাহাদের জুনিবার সীমানা।

ইহাব বাহিবে সমস্ত পৃথিবী তাহাদের পক্ষে মধ্য আফ্রিকার অনাবিস্কৃত অবণ্য। অহোবাত্র ঘোরতর পরিশ্রম করিয়া পবিবারস্থ সকলের মন যোগাইয়া চলিতে হয়, ইহাতেও পবিত্রাণ নাই। সংসারের সমস্ত বুঁকি তাহাদের উপর। পুরুষদের নিকট কোন বকম সাহায্য পাওয়া ত দেবের কথা, বাবুবা বাড়ী ফিবিয়া সময়ে অসময়ে আহা-বাদি প্রস্তুত না পাইলে তাহাদের বাগের আব সীমা থাকে না। সে দিন আব বাড়ী ব মেঘেদের বন্ধা নাই। এইরূপ কদাকাব পদ্ধতিকে সমূলে ধ্বংস করা উচিত নচেৎ সময়ে উহাই সমাজকে ধ্বংস করিবে সন্দেহ নাই। গৃহমধ্যে বন্ধ থাকাতে স্ত্রীলোক দেব মন কি প্রকাব সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এক-বার ভাবিয়া দেখুন। ইহাতে সমস্ত সন্ত-তিব স্মৃষ্টিকাব পক্ষে কতদূর ব্যাঘাত ঘটে তাহাও একবার ঠাওরাইয়া দেখুন। এ প্রকাব একটা কু প্রথাকে আপনি কি বলিয়া পোষ-কতা কবিতেন?

হি। প্রথটা “কু” বলিতে পাবেন কিন্তু আপনি যতটা “কু” মনে কবিতেন, ততটা নহে। আপনিত বলিলেন, স্ত্রীলোকদের অবস্থা পিঞ্জবাবন্ধ পাখী অপেক্ষাও শোচনীয়—অনেকে মনে কবিয়া থাকেন যে তাহা বা জেলখানার কয়েদীদের অপেক্ষা কষ্ট ভোগ কবে। ইহা সমস্তই বাড়ান কথা। গৃহ-কর্ম বিষয়েত সকল হিন্দুর ঘবেই স্ত্রীলো-কেয়া সর্বসর্বা। এ কথা যিনি না ঝানেন,

তিনি কিছুই জানেন না। বাড়ীর গৃহিণী এক প্রকাব Secretary of State for Home Affairs, এ ছাড়া যে সকল কুলরম-নীবা অল্পবিস্তর লেখা পড়া জানেন (হিন্দুব ঘবে অনেক বুদ্ধিমতী স্ত্রী আছেন, ষাহাবা একজামিনও দেন নাই এবং পাশও কবেন নাই আব নাম দিয়া সংবাদ পত্রে আটিকেলও লিখেন না) তাহাদের কথা সতন্ত্র, তাহা বাও প্রকৃতপক্ষে স্বামীব সহধর্মিণী। উন্নত ইউ-বোপীয় সমাজে যাহাকে সহধর্মিণী বলে, তাহা-বাও সেই হিসাবে স্বামীব সহধর্মিণী, শুধু এই-টুকু তফাৎ, যে তাহা বা নিতান্ত খোলা হিসাবে বেড়াইতে পান না, অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে বাহিব হন না, বিদ্যাবুদ্ধিব পবিচয় দিবার অবকাশ পান না। আব বাড়ার ভাগ দেখিতে পাই যে হিন্দু কুলবর্মণীদের একটা অতি সুন্দর কোমল লজ্জাব ভাব আছে, গাফা আব কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধাবণতঃ হিন্দুব স্ত্রীবা ঘবকন্নার কাজ কবিয়া, পবিবারস্থ সকলের আহাব পবিধানের ব্যবস্থা কবিয়া, সন্ধ্যা আত্মিক কবিয়া, পাড়ার বৌকিব সহিত ছুটা গল্পগুজন কবিয়া, তাস খেলিয়া বা একটু আদটু বামাষণ মহাভারত পড়িয়া মনের সুখে কাল কাটায়। আপ-না বা তাহাদের দুর্দশাব কথা শুনিয়া কান্দি-তেছেন, তাহা বা আপনাদের কান্না শুনিতে ও পাষ না। শুনিলেও তাহাব মর্দ বৃক্ষে না, দিব্য হাসিয়া খেলিয়া সংসার চালাই-তেছে। অনেকে যে হিন্দুবর্মণী ব্রুববস্থাব কথা অত্যন্ত বাড়াইয়া, বংচঃ দিয়া বলিয়া থাকেন, Colonel Todd সাহেব তাহা স্পষ্ট বৃথিা ছিলেন, তিনি তাঁহার Rajasthan

গ্রহে বলেন—

“The superficial observer who applies his own standard to the customs of all nations, laments with an affected philanthropy the degraded condition of the Hindu female, in which sentiment he would find her little disposed to join. He particularly laments her want of liberty and calls her seclusion imprisonment” হিন্দু বঙ্গীরা একেবারে জেলখানার কয়েদী একথা আমরা শুনিতে চাহি না। আমরা জানি, তাহাদের অল্পবিস্তর স্বাধীনতা না আছে এমত নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে সেই স্বাধীনতার সীমা কতকটা বাড়ান উচিত। বুঝিয়া স্মৃতিয়া ধীবে ধীবে এ কার্যে অগ্রসর হইলেই, উহা সুসিদ্ধ হইতে পাবে। আপনি যে মনের সঙ্কীর্ণতার কথা বলিয়াছেন, তাহাব একমাত্র ঔষধ স্মৃশিক্ষা। জীলোকদিগকে বাড়ীর বাহিবে আনিলেই যে বিশেষ উপকার হইবে এমত নহে। স্মৃশিক্ষা আবশ্যিক। আমরা কেহ জীশিক্ষার বিরোধী নহি। অন্তরমহল বজায় রাখিয়া জীলোকদিগকে স্মৃশিক্ষিত করা দুঃসাধ্য নহে। আমরা বলি এখনকার পক্ষে ইহাই সমুপায়।

ত্ৰা। হিন্দু রমণীদের অবস্থা কি নিতান্ত শোচনীয় নহে? আপনি দেখিয়া শুনিয়া কিরূপে এমন কথা বলিলেন? হিন্দু রমণীদের আত্মনাশ শুনিয়া আমাদের জন্ম বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর আপনি বলিতে

ছেন যে তাহাদের কোন কষ্টই নাই, তাহাবা মনের স্মৃথে আছে? সে যাহা হউক আপনাকে একটা মোটামুটি কথা বলি। সকল বিষয়েই ভাল মন্দ ওণ, তাহাব ফলাফল দেখিয়া নির্ণয় করিতে হয়। ইউরোপে দেখুন স্ত্রীস্বাধীনতা থাকিয়া কতদূর উন্নতি হইয়াছে, আব এদেশে তাহা না থাকিতে আমাদের কতদূর দুর্গতি হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আব কি প্রমাণ থাকিতে পারে?

হি। ইউরোপে যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, আমাদের দেশে কোন কালে সে বকম উন্নতির চেষ্টা ছিল না এবং তাহার অন্য যোগাড় ও হয় নাই। আপনি যদি রেল-গাড়ি, জাহাজ, কামান, বন্দুক, দেখিয়া জাতির উন্নতি হিব করিতে চাহেন, তাহা হইলে জানিব যে আপনি হিন্দু জাতির সভ্যতালক্ষ্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতার গতি সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐহিক সুখসচ্ছন্দতাবুদ্ধি ইউরোপীয় সভ্যতার মূল মন্ত্র। হিন্দুদের এই পৃথিবীর উপরে আদৌ নজরই ছিল না। তাহাদের উদ্দেশ্য—ধর্মজ্ঞান, নৈবচর্যা। তাহাদের সকল কাজে তাহারা এই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেন। এখন অবশ্য আমাদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন কাজেকাজেই ইউরোপীয় সভ্যতার পথ আমাদের অগ্রসরণ করিতে হইতেছে। এখন আর কেহ মোক্ষ, নির্ঝাণ লইয়া পাগল নহে। কাল যদি সমগ্র বঙ্গালাদেশ হঠাৎ ইংলণ্ড বা ফ্রান্স হইয়া উঠে—সকলেই হ্যাট-কোটধারী, মটরভোজী,—জাতিভেদ নাই,—বান্ধালি বিবিয়া গাড়ি করিয়া হগ সাহেবের

বাজ্জাবে মুবগি কিনিতে যাইতেছে, গবর্ণমেন্ট
হাউস বাঙ্গালীর Congress (গব্বজের
উপব “স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রি” খচিত নিশান)
বাঙ্গালীর Army, বাঙ্গালীর Navy, বাঙ্গা-
লীর Commerce চাবিদিকে বিবাজমান—
তাহা হইলেকি আনন্দ!—এখন ইহা অপেক্ষা
স্বখেব অবস্থা কল্পনা কবিতে পারি না। সে
কালের মোক্ষ, আব একালের এই। কোন্
উদ্দেশ্যটা বড় আপনি স্থির করুন।

আমাব বক্তব্য, যখন আমবা আমাদেব
পুৰাতন জাতীয়তাব সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সকল
বিষয়ে ইউরোপীয় হিসাবে উন্নতি লাভ
কবির, তখন না হয় পাশ্চাত্য আচার ব্যব-
হার অনুকরণ কবা যাইবে। আব একটা
কথা। ইউরোপীয়দেব স্বাধীনতা ছিল
বলিয়াই যে তাহাবা এত উন্নতি কবিয়াছে,
আব আমাদেব তাহা নাই বলি*ই যে
আমাদেব দুর্দশা হইয়াছে, এমন মনে
কবিবেন না। দুদিকেই অনেক কাবণ
আছে।

অববোধ প্রথা যদি উঠাইয়া দেওয়াই
উচিত হয়, তাহা হইলে কাজটা অতি সাব-
ধানে অতি ধীবে সম্পন্ন কবিলেই ভাল হয়।
হঠাৎ একটা কিছু কবা বড় বিপদজনক।
হবি বাবুর মাতাঠাকুরাণী কোন কালে নিজ
বাড়ীর বৈঠকখানায় পদার্পণ কবেন নাই, আর
আজ তাঁহার কন্যাবড় মিস্ যাছুমণি ঘোষ
অন্দর মহল Abolish কবিয়া তাঁহার
Dear betrothed বামু সাহেব বাবিষ্ঠাবেব
সহিত ষ্ট্রাণ্ডে হাওয়া খাইতে যাইতেছেন,
গজাবধাবেব বাগানবাড়ীতে যাইয়া, তাঁহার
সহিত নৌকাব দাঁড় টানিতেছেন, সামুবাবুর

(Evning) পাটিতে ছুটা গান গাইবা আসি-
তেছেন, ইহা যে শুধু দেখিতে ভয়ানক, তাহা
নহে, ইহাব ফল ও অতি বিষময়। একটা
শিকলে বাঁধা কুকুর হঠাৎ যদি একবার ছাড়া
পায়, তাহা হইলে কি তাহার লাফালাফির
সীমাপবিসীমা থাকে? স্থানে স্থানে ঠিক এই
প্রকাব ঘটিয়াছে। বিলাতি চাল, নকল
কবিতে গিয়া অনেকে আসলকে ছাড়াইবা
উঠিয়াছেন। সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ ত সে দিন
কাব জিনিস? ইহাব মধ্যেই সেখানে
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কি ফল ফলিতেছে
দেখুন। “নবা ভাবত” ঐ সমাজের মুখ
পত্র, এ সম্বন্ধে উচ্চঃস্ববে সাক্ষ্য প্রদান করি-
তেছে যে,—“এইকপে দিন দিন নানা প্রকাব
কদর্যা আচার ব্যবহার এই পবিত্র ধর্মসমাজ
মধ্যে প্রবেশ কবিতেছে। বিলাতি চাল
চলন কি এক ভয়ানক আধিপত্য বিস্তার
কবিতেছে। চতুর্দিক হইতে গালিগালাজ
বর্ধিত হইতেছে, তবুও চেতনা নাই * *
লোকে দেখিবা শুনিবা শিক্ষা পায় লোকে
বলে। কিন্তু এ সমাজেব লোকেবা দেখিবা
ঠেকিবা তবু এ সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন।” * এ
প্রকাব ফল যে ফলিবে তাহাতে আব বিচিত্র
কি? হঠাৎ একটা সামাজিক নিয়মেব সম্পূর্ণ
পবিবর্তন কবিবা কবে কোথায় ভাল হই-
য়াছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ৩০ বৎসব পূর্বে
যাহা কল্পনা কবিয়াছিলেন, আজ আমবা
তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।—

“এবা গাউন প’বে টাউন মাঝে, বিলাতি
মেম হবেই হবে।

* গত কাক্সন মাসের নবা ভাগতে বোঁদন
বিবাহ ও ব্রাহ্ম সমাজ নীধক প্রবন্ধ দেখুন।

এবা এ'বি প'ড়ে বিবি সেজে, বিলাতি বোল
কবেই কবে ॥

আব কি এবা আদব কবে, পিড়ি পেড়ে
অন্ন দেবে ।

আব কি এবা এমনি কবে, সাঁজ সঁজুতির
ব্রত নেবে ॥

আব কিছু দিন থাকলে বেঁচে, সবাই দেখতে
পাবেই পাবে ।

এবা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি, গড়েব
মাঠে হাওয়া খাবে ॥”

ত্রা । আপনার কথাব ত আমি কোন
মানেনি দেখি না । আপনি বলেন যখন
আমরা ইউরোপীয়দের মত উন্নতি লাভ
করিব, তখন তাহাদিগের আচাব ব্যবহার
অনুকরণ করা যাইবে । ইহা যে আপনার
ভয়ানক একটা উল্টা কথা । গাছে ফল
হইবার পূর্বে কি কবিয়া ফল হইতে পাবে ?
উন্নতির উপায় অবলম্বন না করিলে কি
করিয়া উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে ? খ্রীলো-
কদের দাসত্বস্থল উন্মোচন উন্নতির একটি
প্রধান উপায় । অতএব যদি উন্নতি চাহেন
তবে এই মহৎ কার্যটি অগ্রে করা উচিত ।
এবিষয়ে আব কি কোন সন্দেহ আছে ?

আপনি আমাদের সমাজের সম্বন্ধে
জুএকটি কথা বলিয়াছেন, আমি স্বীকার
করি যে আমাদের সমাজে জুএকটা
কুপদ্ধতি প্রবেশ করিয়াছে । অনেকখানি
গুণেব সঙ্গে যদি অন্ন দোষ থাকিয়া যায়,
তাহাতে বিশেষ আপত্তি কি ? উহাত এক
প্রকার অনিবার্য বলিলেই হয় । পৃথিবীতে
এমন কোন্ লোক-সমাজ আছে, যাহা একে
বারে বোল আনা খাটী ? “নব্য ভারতের”

লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোন কাজের
কথাই নহে, আমি তাহা বিশ্বাস করি না ।
আপনারা খ্রীজাতিকে কি এতলৈ অপদার্প
মনে করেন যে তাহাদের চাৰি তালাব
ভিতর বাখা ভিন্ন আব কোন উপায় নাই ।
খ্রীজাতীকে কি আপনারা এতদূর অপমান
করিতে প্রস্তুত ? আপনারা তবে জোব
কবিয়া তাহাদিগকে সৎপথে রাখিতে প্রয়াস
পান ? ইহাও কি একটা বড় গৌরবেব কথা না
কি ? মহাকবি মিল্টন্ “Cloistered virtue
সম্বন্ধে কি বকম তেজের সহিত লিখিয়াছেন,
আপনি কি তাহা জানেন না ? Cloistered
virtue কে কি আদবে virtue বলা যায় ?
আমি বলি সে বকম virtue থাকায় না
থাকায় সমান ।

হি । মিল্টন্ সাহেব যাহাই বলুন না কেন
আমাদের মোটা বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি যে
আমাদিগের খ্রী কন্যা বা পদ্মাব ভিতরে
থেকে আছে ভাল । Cloistered virtue
কে virtue বলুন আব নাই বলুন, একথা
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে খ্রীচরিত্র
আমাদের দেশে যে বকম পবিত্র, ইউরোপে
কোন কালে সে বকম ছিল না, আর হবেও
না । এইজন্ত পারিবারিক স্মৃতিস্মৃতি
আমাদের দেশে যতটা আছে, ইউরোপে তার
বাবো আনা ভাগও নাই । এ হিসাবে হিন্দু
সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আপনারা ইউ-
রোপেব অনুকরণ করিতে গিয়া যে ভাল
করেন নাই, আমরা তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি ।
দেখুন আর নাই দেখুন, খ্রীপুরুষেব বেশি
রকম বেশামিষিটা বড় ভাল জিনিস নহে ,

আমাদের চক্ষে উহা অতি জঘন্য ঠেকে । আপনাদের সমাজেব ভালটা আপনি যত বড় দেখিতেছেন, বাস্তবিক তাহা তত বড় কিনা জানি না ।--হইলেও হইতে পাবে । কিন্তু মন্দটা আপনাব চক্ষে আপনি যত ছোট দেখিতেছেন, তাহাব অপেক্ষা দশ গুণ বড় ।

সে যাহা হউক এ বিষয়ের আপনাব সঙ্গে তর্ক করিবা ফল নাই । এ বকম বিষয়ের ভাল মন্দ নিজিতে ওজন করিবা দেখান যায় না, অতএব আপনাদের মত লোকদের বুঝাইয়া উঠা মুসকিল ।

আপনাকে আর একটি কথা বলি । সমাজেব ভয় সর্বত্রেই মানুষকে ধর্মপথে রাখে, ইহাত পীকার করেন ? ইউরোপীয় philosopher মাত্রেই সমাজভয়ে একটা প্রধান Moral restraint বলিয়া গণ্য করেন । এ জিনিষটা কি একে বুঝি উঠাইয়া দেওয়া বুদ্ধির কাজ ? কিন্তু আপনাবাত তাহাই কবিতেন । আপনাদের ভাব গতিক চালচলন দেখিয়া আমাদের দেশে সকলেই আশ্চর্য্য হয় । সকলেই বিবস্ত্র হয়, সকলেই বাগ প্রকাশ কবে । “বঙ্গবাসী” কাগজ ও বিবাহ-বিব্রাট নাটক ইহাব প্রমাণ । আপনাদের পুশিকিত কন্যারা যে রকম বিবিধান আবস্ত করিয়াছেন, আমরা তাহা দেখিয়া সত্যতাই লজ্জিত হই । আপনাবা খুবই জানেন যে আপনাদের বীতিনীতি দেশেব লোকেব পছন্দসই নহে, জানিয়াও আপনাবা গ্রাহ্য করেন না । সমাজভয়টা আপনাবা সমূলে উড়াইয়া ফেলিয়াছেন ।

ত্ৰা । আপনি কি বলেন যে, সকল

বিষয়েই সাধারণ লোকের মত লইয়া কাজ কবিতে হইবে ? তাহা হইলে সমাজের সকল সদভুগ্ঠানই সাধনাতীত হইবা দাঁড়ায় । তাহা হইলে সমাজেব যত কুসংস্কার, যত কুপদ্ধতি, সকলই বজায় রাখিতে হয় ।

হি । সকল কাজেই সাধারণ লোকের মতামত লইবা চলিতে হইবে এমন নহে, তবে সেই মত অনুসারে চলাই নিয়ম করা উচিত । নিয়মেব ছুই একটা ব্যতিক্রম হইলেও হইতে পাবে । অববোধ প্রথার মত একটা বিষয়ে সকল লোকের অভিপ্রায় জানা এবং সেই অনুসারে কাজ করা নিতান্ত কর্তব্য । সমাজভয় বলিয়া একটা জিনিষ দেশে থাকিলেই ভাল হয় । উহা উঠিয়া গেলে উহাব পবির্ত্তে নিশ্চয় যথেষ্টাচার আসিয়া উপস্থিত হইবে । আপনি একজন ভাল লোক, যাহা কবিবেন তাহা পবিত্র ভাবে কবিবেন । আপনি সমাজনীতি বিধবীত একটা কোন কাজ কবিলেও সমাজেব কোন অনিষ্ট না হইতে পাবে । কিন্তু একজন কুপ্রবৃত্তির লোক কোনমন্ত কাজ কবিতে গেলে কি বাধা বা প্রতিবন্ধক পাইবে ? সে ত যাহাই ইচ্ছা, তাহা কবিতে পারে । এ জগতে এইবকম লোকেরই প্রাচুর্য্য । আর ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে, পবিত্রতাব ভেদে লোকে যত কুকাঙ্গ করিয়া থাকে, তত আর কিছুতেই নহে ।

সমাজ ভয় বজায় রাখিয়া কি দেশের কোন উন্নতি সাধন কবা অসম্ভব ? আমার মতে তাহা অসম্ভব নহে । আপনাবা যেকূপ উপায়ে সমাজ-সংস্কার কবিতে বসিয়া ছেন, তাহা আদৌ সহপাল নহে । একটা

কুপ্রথা সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে গেলে, তাহার প্রকৃত উপায় এই। প্রথাটা যে ভয়লীল, সকলে যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পাবে, সংস্কারকেব প্রথমতঃ এই একমাত্র চেষ্টা থাকা উচিত। সকলকে বুকান উচিত যে প্রথাটা উঠাইয়া দিলেই সমাজের মঙ্গল হইবে। একবার সাধারণ লোকের মনে এ প্রকার বিশ্বাস জন্মিলে প্রথাটা আপনা আপনিই লোপ পাইবে, আর অধিক কাট খড়ের প্রয়োজন হইবে না। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ Sir Arthur Helps ঠিক এই কথা বলেন। তাঁহার মতে —

“The first thing is to get people to be of the same mind as regards

social evils. When once they are of this mind the evils will soon disappear”* ইহাই একমাত্র সত্বপায়। এখনও সাধারণ লোকে অববোধ প্রথাকে একটা ভয়ানক evil বলিয়া মনে কবে না। যে পর্যন্ত না তাহাদের ভাবের পরিবর্তন হইতেছে, সে পর্যন্ত কেহ কিছুই কবিশ্য উঠিতে পারিবে না। কবিলেও তাহা আপনাদের সমাজের ন্যায় অকালপক্ক দোষে ভুবিত হইবে। আমাদের বিশ্বাস আপনাদের ভাল পথ ছাড়িয়া, বড় কাঁটাপথে অগ্রসর হইতেছেন।

শ্রীসত্যানন্দ শর্মা ।

* Companions of my Solitude.

বসন্তে ।

মুঞ্জরি মুকুল রাজি, শোভিল গোকুলে আজি
দেখ লো স্বজনি ।
মাতিয়া সুবভি-ফুলে, গুঞ্জরিল অলি ফুলে,
বহিল মলয় তুলে, মৃদু মন্দ ধ্বনি ।
সাজিল স্নানবী আজি কুসুমের ধবলী ।

২

কি শোভা গোকুলে নই, বয়না পুলিনে, ওই,
নয়ন-রঞ্জন ।
নুতন লাবণ্য রাশি, পরিষা পুলকে ভাসি,

৩২

বনে বনে হাসাহাসি, করিছে কেমন ।
লতায় পাতায় পবে কুসুম-ভূষণ ।
৩
তোল লো স্বজনি তোল, কুসুমের ভার আজি
গাঁথিব মালায় ।
অপকুপ রূপ কঁাদে, সাজাইব শ্যামচাঁদে,
দিব গাঁথি নানা ছাঁদে, শ্যামের গলায় ।
শোভিবে নিকুঞ্জে শ্যাম সূচাক শোভায় ।
৪
দেখ ওই ঋতুরাজে, মদন মোহন সাজে
দেখা দিল আসি ।

কানন বল্লরী মাঝে, কি সুন্দর সুবিরাজে,
বনদেবী বাণী তার—মাধুরীর বাশি।
হাসিছে কানন আজি প্রেমানন্দে ভাসি।

শুনলো বিহঙ্গববে, বসন্ত-উৎসবে, সবে,
মেতেছে গোকুলে ।

স্বন স্বনে বহে বায়, মব মবে পাতা তায়,
ভ্রমরা গুঞ্জে, গায় কোকিল আকুলে ।
কল কলে কল্লোলিনী কালিন্দীব কুলে ।

আহা মরি কি মাধুরী নব কিসলয়ে, ওই
নবীন লতায় ।

থেকে থেকে লতিকায়, নাচায় মলয় বায়,
জিনিয়া অলকা তায়, রাধার মাথায় ।
শিখিপুচ্ছ নাচে যথা শ্যামেব চূড়ায় ।

ডাকে ধীরে ধীরে কিবা মাধবী লুপায়, ওই
সহকারে শিবে ।
পরিমল দ্বীপী তার, আসিতেছে বাব বাব,
নীরবে বাধাবে কি সে কহে ফিবে ফিবে ।
লতিকাব মান বাধি চল কুঞ্জে ধীবে ।

যমুনা পুলিনে আজ, বহে সমীরণ কত
সুধাব লহবী ।
পরশি কুসুম-কার, সে লহবী নেচে যায়,
নাচিয়া তরঙ্গে ধায়—যমুনা সুন্দরী ।
যথার নিকুঞ্জে মাঝে নাচেন জীহরি ।

৯

সুখের সুধিনী তুমি, যমুনা সুন্দরি, ভাল-
বাসি লো তোমায ।

বহিলে তোমাব ভীবে, মধুর মলয় ধীরে,
দেখা দেন প্রাণ হবি বকুল তলায় ।

নাচ তুমি সুবঙ্গিনি, তবঙ্গ-মালায় ।

১০

তবে তুমি তবঙ্গিনি, একাকিনী কেন, আজ
বহ ধীবে ধীরে ?

চললো নিকুঞ্জে চল, নাচায়ে তবঙ্গ দল,
নাচে যথা কুঞ্জমণি নিকুঞ্জ-সমীবে ।

শোভিয়াছে বনফুল বনমালী-শিবে ।

১১

ওই শুন পুন পুন ডাকিছে কোকিল, বনে
মধুর বসন্তাবে ।

মরি কি সুধাব বব । কেমনে পাসবি বব,
শ্যামেব বাঁশবী যথা, ডাকে গো বাধাবে ।

চল তবে যাই নই নিকুঞ্জ-মাঝাবে ।

১২

আইল নিকুঞ্জে বাই, সখীগণ সনে, আজ
শ্যামেব মিলনে ।

রুণু রুণু নাচি গায়, বাজিছে বাঁশবী ভাষ,
গুঞ্জবি ভ্রমরা গায়, তবঙ্গিনী সনে ।

কুসুম কুসুম গায় ববে কুঞ্জ বনে ।

জীর্ণচন্দ্র বসু ।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি।

কলিকাতা মহানগরীর ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু লিখিবাব উত্তম কবিতে হইলে, পূর্বে “কলিকাতা” এই নামটি কিরূপে এবং কোন মূল হইতে উৎপন্ন হইল, সে বিষয়ে আমাদিগের অনুসন্ধিৎসু হওয়া প্রয়োজনীয়। যে হেতু ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই মনে পড়িত যে বাব জন্ম ঔৎসুক্য জন্মিতে উক্ত বিষয় একপ গভীর তম আবরণ উদঘাটিত কবা আমাদিগের দেশে ইতিহাসিক গবেষণা যে কতদূর স্বকণ্ঠিত তাহা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই অবদিত নাই। এই সকল বিষয়ে লিখিবাব চেষ্টা কবিতে হইলে অনেক সময়ে ইঙ্গবাজি পুস্তকের আশ্রয় ব্যতীত অন্য উপায় বিল। ফলতঃ আমাদিগের পক্ষে ও অন্য পথ বিশেষ বিমুক্ত নহে। আমাদিগের অনুসন্ধানেব পথে এইরূপ বাধা ও বিপত্তি বর্তমান বহিষ্কাছে বটে, কিন্তু প্রমাণেব সহায়তা গ্রহণ পূর্বক ঐ সকল বাধা অতিক্রম কবিয়া, সাধ্যমত যতদূর সম্ভব, সত্যে উপনীত হইবাব চেষ্টা বরং যাইবে।

১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সাহের প্রধান সচিব পণ্ডিত প্রবর সুবিখ্যাত জাব-উল-ফজল কর্তৃক প্রণীত আইন-ই-আকবরী নামক গ্রন্থে কলিকাতা নামের প্রথম

ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাব পূর্বে আব অন্য কোন ইতিহাসে কলিকাতাব নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সন্নিবেশিত তোদর মলের বাজসেব তালিকায (Rent Roll of Todur Mull) বঙ্গদেশ যে কয়েকটি বিভাগে বা সবকাবে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাব মধ্যে কলিকাতা সাত-গাঁও (সপ্তগ্রাম) সবকাব (ক) বিভক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে, যে মহাল কলিকাতা (খ) বাববাকুব এবং বাবুর মৌজাব সম

(ক) Sirkar Satgaon—A small portion only, the land between the Hugli and the Saraswati lay west of the Hugli, whilst the bulk of the Sirkar comprised the modern District of the 24 Parganahs to the Kabadak, western Nadiya; South-western Murshidabad and extended in the South to Hathnagarh below Diamond Harbour—*vide Journal of the Asiatic Society of Bengal Contributions to the Geography and History of Bengal—by H. Bulchman.—P 217*

(খ) আইন-ই-আকবরী পুস্তকে “কলিকাতা” কে “কলবস্তা বলিয়া লিখিত আছে। বেহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি দেশের লোকেরা কলিকাতা শব্দ সেইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

একত্রে বাৎসরিক ২৬,৪০৫ টাকা বাজস্বরূপ সাম্রাজ্যিক কোষে সবববাহ করিত। (গ) কোন কোন লেখক বলেন উপবোক্ত মোজাদ্বয় সম্ভবতঃ শুতানটী গোবিন্দপুর হইবে।

আইন-ই-আকবরী বচিত হইবার পূর্বে এবং বঙ্গদেশের সহিত যুগোপীয়দিগের সংশ্রব হবার পূর্বে মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের বিবচিত কোন ঐতিহাসিক পুস্তকে “কলিকাতা” নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ব্যতীত ঐ সময়েরও এরূপ কোন বাঙ্গালী পুস্তক আমবা দেখিতে পাই নাই যাহতে উক্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে, ফলতঃ উপবোক্ত মধ্যবর্তী সময়ে এবং আইন-ই-আকবরীর পূর্বে কলিকাতার বিষয় যোব অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তৎপরে ভাগীবখী ভাবে শুতানটী গ্রামে ইঙ্গবেজ বাজি কুঠি সংস্থাপনের কিছুদিনপরে ইংরাজী ইতিহাসে

পুনর্বার কলিকাতা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমবা স্পষ্ট দেখিতে পাই- কেছি যে উপবোক্ত বিষয় বাতিবেকে কলিকাতা সম্বন্ধে আমবা আব কিছু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাটহেছি না। যদ্যপি আমবা উক্ত সামান্য ঐতিহাসিক সত্যকে আমাদিগের অল্পসঙ্কানের ভিত্তিমূল করিয়া অগ্রসব হইতে ইচ্ছা কবি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই স্থানে ঐ আশাকে জলাঞ্জলি দিও’ সন্ধিকাতা নামের উৎপত্তির বিষয়ে ত নেবচেট। ইতে অবসর গ্রহণ করিতে হ সট ৭ বশতঃ আমবা উক্ত সা সক সত্যকে আশ্রয় করিয়া উহা পবাক্রত কথা এবং যতদূর সাধ্য পে প্রমাণ লইয়া এই বিষয়ের অল্পসঙ্কানে হইব। যে সকল পুস্তকে কলিকাতা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে যে মত দৃষ্ট হয় তাহা অপেক্ষা আমবা যে কিছু নূতন মতের আবিষ্কার করিব তাহা নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উক্ত লেখকগণ তাঁহাদের মতের পোষকতার জন্য প্রমাণ সমূহ সন্নিবেশিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হয়েন নাই। এবং কেহ কেহ তাহা দিয়াছেন তাহা অভ্যস্ত অপ্রচুর বলিয়া বোধ হয়। যাহাতে আমাদিগের পচান্নি- স্থিত বিষয় সমূহের প্রমাণ ও সাক্ষ্য যথায় সম্মিলিত হইবার ক্রটি না হয় তাহাব সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে। কলিকাতা নাম যে মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া আপাততঃ গ্রাণ উক্ত বিষয় বলিবার অগ্রে আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয়

(গ) 1. To this Sirkar (Satgaon) belonged mahall kalkatta (Calcutta) which together with two other Mouzahs, paid in 1582 a land revenue of Rs 23,905—53 Mahals revenue Rs 418,118—Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal—Contributions to the Geography and History of Bengal—by H Blochman.—P 217.

2 Sirkar Satgaon contg 53 Mehals revenue, 16,724,720 Dams Calcutta Bakoowa and Barbakpur 3 Mehals revenue 936,215 Dams. Vide Ayeen Akbery or the Institute of the Emperor Akbar. Translated from the original Persian by Francis Gladwin vol. II P. 191.

কয়েকটি কোঁতুকাবহ গল্প ও ভ্রম মূলক মত সন্নিবেশিত করিব ।

১। কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে একটুকু প্রবাদ আছে, (যাহা সম্ভবতঃ বাঙ্গালী আবাল বৃদ্ধ কাহাবও অবিদিত নাহি) যে, সর্বপ্রথম একজন ইঙ্গবেজ কলিকাতায় আসিয়া আব অল্প কাহাকেও দেখিতে না পাইবা একজন ভূগর্ভদলককে উক্ত স্থানের নাম জিজ্ঞাসা কবেন। তাহাতে উক্ত ভূগর্ভদলনকারী ইঙ্গবেজি ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা নিবন্ধন বৃত্তিতে না পারিয়া বিবেচনা কবিল বোধ হয় সাহেব তাহাকে ঘাস কবে কাটা হইয়াছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। ইহাতে সে উত্তর কবিল “কাল কাটা” (অর্থাৎ কাল কাটা হইয়াছে।) সাহেব মনে কবিল এই স্থানের নাম “কাল-ক্যাটা”। (ঘ) এই কোঁতুকাবহ গল্পটী যে বহুশতাব্দে কোন উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য ।

২। কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে

(ঘ) কলিকাতার নাম ঐরামপুরের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ও ঐরূপ কাল্পনিক মত প্রচলিত আছে—

ঐরামপুর সম্ভবতঃ ঐরাম নামক কোন ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন হইবা থাকিবে। কিন্তু এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে সময়ে উক্ত স্থান দিনেমার-দিগের উপনিবেশ ছিল, সেই সময়ে তিন্মুকগণ ত্রিচ্ছা আটিকা করিলেই লোকের কহিত “Sir I am poor তাহাতেই ঐরামপুরের নাম হইয়াছে। ঐরূপ হাৰড়া সম্বন্ধে ও প্রবাদ প্রচলিত আছে। উক্ত বিবরণ বোধ হয় কোন পাঠকের আবিদিত নাই। অতএব এ স্থানে উহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র ।

আমরা এখানে আব একটি কোঁতুকাবহ ভ্রমমূলক মতের বিষয় উল্লেখ করিব। কোন একটি পুৰাতন বঙ্গীয় চিহ্নিত কর্ণচাবী সম্প্রদায় ভুক্ত পণ্ডিতাভিমানী ইঙ্গবেজ (ঙ) জনৈক গবেষণা শ্রিয় বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বলিয়াছিলেন যে কলিকাতা নাম “কলি চূর্ণ” হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি বলেন যে কলিকাতার সীমার মধ্যে অথবা উহার পার্শ্বে কোন স্থানে পূর্বে অপখ্যাপ্ত পৰিমাণে কলিচূর্ণ প্রস্তুত হইত সেই হইতেই কলিকাতা নাম হইয়াছে। সম্ভবতঃ উক্ত ইঙ্গবেজ মহোদয় তাঁহার মাঠজমি শ্বেতদ্বীপ অর্থাৎ আলবিয়ান (Albion) নাম যে খটিকা পর্বত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে; তাহাই তাঁহার চিন্তাব বলবৎ থাকা প্রযুক্ত উক্ত মত প্রকাশ কবিয়া থাকিবেন। এই রূপ মত ইংরেজী উপন্যাস লেখক চুড়ামণি চার্লস ডিকেন্সের মস্তিষ্ক প্রসূত প্রভুতবাহু সঙ্ঘাবী পিকুইক সাহেবের গবেষণা সম্বৃত্ত হওয়াই সম্ভব। ইহা ব্যতীত উক্ত বিষয়ে আমবা আর অধিক কিছু বলিবনা।

৩। লং সাহেব বলেন কলিকাতার নাম সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র খাত (Meharatta ditch) অর্থাৎ খাল কাটা হইতে উদ্ভূত হইবা থাকিবে। (ঢ) মহারাষ্ট্র খাত ১৭৪২

(ঙ) কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আমরা উক্ত সাহেবের নাম এখানে উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম।

(চ) Vide “Selection from the Calcutta Review”—article Calcutta in the olden times—its localities—vol. V. P. 169.

ঐষ্টাঙ্গে খাত হয়। লং সাহেব বলেন উক্ত সময়ে পূর্বে কলিকাতা নামের উল্লেখ কোন স্থানে নাই। এই মতটি তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। যে হেতু ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফরোকসাহার ঠেই-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে কারমান (চ) দেন তাহার মধ্য পর্বগণা আমিনাবাদের অন্তর্গত কলিকাতা, শুভাছুটি এবং গোবিন্দপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ খালকাটা হইতে যে কলিকাতা নামকরণ হয় নাই তাহা সম্পূর্ণ রূপে প্রতীপন্ন হইয়াছে।

৪। পর্বলোকগত রাজা সাব বাধাকান্ত দেব বাহাদুর যৎকালে তাঁহার শেষ অবস্থায় ব্রন্দাবন ধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি এক খানি স্তবের পুস্তক (জ) কলিকাতায় মুদ্রাস্থিত করান। উক্ত পুস্তকের অভিধান পত্রিকায় কলিকাতার পর্ববর্ত্তে কিলকিলা নগর দিয়াছেন। কিলকিলা শব্দার্থে হর্ষধ্বনি বা কোলাহল বুঝায়। কলিকাতাকে কিলকিলা নামে অভিহিত হইতে কোন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং এই শব্দ কোথা হইতে কিক্রমে আসিল তাহারও প্রমাণ আমবা কিছু দিতে পারি না কেবল মাত্র এই পর্য্যন্ত আমবা অবগত আছি যে, সাব উষ্টলিয়ম জোনস্

(ছ) Vide Translation of the *Firman* obtained from Emperor Ferokshere 1717 A. D. History of the rise and progress of the Bengal Army by Capt. Arthur Broome—Appendix. c. P. VII L. 29 to 31.

(জ) পদাবলী নামক লেখক পুস্তক ১২২৩ সন ১৭৮৮ শকাব্দা, ১২৭৩ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত।

তাঁহার জনৈক বন্ধুকে যে এক পত্র লিখেন উক্ত পত্রে (খ) তিনি কলিকাতাকে যে নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতার নাম কিল কিলা শব্দের অনেকটা নৈকট্য বলিয়া বোধ হয়। এই শব্দের বিষয় আমবা আর অধিক কিছু অবগত নহি। সম্ভবতঃ এই শব্দটি তন্ত্র মৌলিক হইবে।

৫। জনৈক ওলন্দাজ ভ্রমণকারী কলিকাতা নগরকে গলগোথা Golgotha (ঞ) অর্থাৎ

(ক) Vide letter of Sir Wm. Jones to the late Samuel Davis Dated 20 October 1792—“We are just arrived my dear sir, at the town of *Cal* (কলি=বিবাদ) or contention (which is the proper name, and a *very proper one*, of Calcutta)—Transaction of the Royal Asiatic Society vol III P. 23.

(ঞ) Calvary—skull—(La XXIII. 33 called Galgotha John XIX 17) was the name given to a slight elevation north of the ancient city of Jerusalem, perhaps half a mile distant from the temple. The spot now so called is within the walls of the modern city. It was called *Golgotha* or *the place of Skull*, either from its shape or from the circumstance that it was the usual place of executing criminals. The first of these opinions is the more likely. The name is explained in “Mathew, nor as a place of skull or as having any reference to a scene of ordinary public execution, but as “a place of skulls” as if the locality had borne some resemblance in its elevation to this portion of the human body.—Vide *Etudes Biblical Cyclopadia* P. 83.

“নর কপাল সমাকীর্ণ স্থান” নামে অভিহিত করিয়াছেন। কথিত আছে যে কলিকাতার শব্দে যুরোপীয়দিগের সংশ্রব হইবার আবস্ত কালে, কোন সময়ে, কলিকাতাবাসী যুরোপীয়দিগের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে এক বৎসরের মধ্যে উহাদিগের চতুর্থাংশ লোকের মৃত্যু হয়, এবং কলিকাতা অপর অপর জাতিগণেও সংখ্যা অল্পমাত্র কাল কবলিত হইয়াছিল। এবং ক্রমান্বয়ে সপ্ততি বৎসর কাল মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হওয়া প্রযুক্ত ভাগীরথী তীর নর কপালে স্তম্ভোদ্ভিত হইয়া থাকিত। সেই কারণে বশতঃ যে সকল যুরোপীয়নাবিকগণ (বিশেষতঃ ওলন্দাজগণ) উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া যাইত তাহারা উক্ত দৃশ্য দর্শন করিয়া স্তম্ভাবতঃ বিবেচনা করিত যে কলিকাতা নাম গলগোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। (৫)

কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে যে কয়েকটি মত পূর্বে সন্নিবেশিত হইল, তাহাব মধ্যে কোনটিও যুক্তি সঙ্গত নহে। ঐ সকল মত সমর্থনের পক্ষে যে প্রমাণের সম্পূর্ণ অভাব এবং ঐ সকলের যুক্তিগুলি ও যে গ্রাহ্য নহে তাহা আমবা সাধ্যমত দেখাইবার চেষ্টা করিতে ক্রটি করি নাই। এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে কলি

কাতা নাম কোন মূল হইতে উৎপন্ন হইল। পূর্বেই আমবা বলিয়াছি যে উক্ত বিষয়ে কলিকাতা সম্বন্ধীয় লেখকদিগের সাধারণ প্রচলিত মত হইতে আমাদের মত বিশেষ বিভিন্ন হইবে না। কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে যদিও আমবা কতকগুলি প্রমাণের সহায়তায় উক্ত মতের পোষকতা করিতে অনেকটা কৃতকার্য হইতে পারি তথাচ আমাদের এইরূপ আশঙ্কা রহিল যে কতক ভবিষ্যতে কোন গবেষণা প্রিয় মহোদয় কতক উক্ত মত খণ্ডিত হইয়া কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে কোন একটি নূতন মতের প্রচার হইতে পারে। সে যাহাই হউক যখন এ বিষয়ে অন্য কেহ নূতন মত প্রমাণ করিতে অসমর্থ এবং যাবৎ অন্য কেহ অখণ্ডনীয় প্রমাণ ও যুক্তি সহ কোন নূতন মতের প্রচার না করেন তাবৎকাল আমাদের দিগকে এই মত গ্রাহ্য করিয়া লইতে হইবে।

ইতিহাস পাঠক মনেই বিদিত আছেন যে হয় কোন্ স্থিতিস্থাপক বাস্তব কিম্বা কোন কীর্তিস্তম্ভ অথবা কোন যুদ্ধাদি ও অপরাধের ঘটনা মূলক স্থান, না হয় নিকটবর্তী দেবতা দিগের স্থান প্রভৃতি হইতেই সচরাচর নগরাদি নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। যুরোপ খণ্ডে ও এইরূপ স্থান সমূহ হইতে নগরাদির নামোৎপত্তি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় (৬) এক্ষণে আমাদের দেখা আবশ্যক

(৫) Vide (1) Imperial Gazetteer of India Vol. II. P. 317 by W. W. Hunter.

(২) Vide Selections from the Calcutta Review Article—Calcutta in the olden times—its localities Vol. V P. 168. by Rev. J. Long.

(৬) We find that in Europe various cities receive their names from the circumstance of monasteries and castles having been first erected on a spot which formed the nucleus of a town, as English

যে (১) উপবোক্ত কথেক প্রকার স্থানের মধ্যে কোন শ্রেণীর স্থান কলিকাতার সন্নিকটে আছে কিনা এবং (২) যতপি থাকে তাহা হইলে কলিকাতা নামোৎপত্তির পূর্বে উক্ত স্থানের অস্তিত্ব ছিল কিনা এবং যতপি থাকে তাহা হইলে উহা কি ? প্রথম প্রশ্নেব প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে কলিকাতা সন্নিকটে তিনটি সুবিখ্যাত দেবতা স্থান বর্তমান রহিয়াছে। প্রথমটি কালীঘাটের কালী দ্বিতীয়টি বাগবাজারেব সিদ্ধেশ্বরী কালী এবং তৃতীয়টি চিৎপুবেব চিত্ৰেশ্বরী কালী। তিনই কালী তিনই সুবিখ্যাত এবং তিন স্থানেই নব বলী হইত এবং ডাকাইতগণ ডাকাতি কবিত্তে যাইবার পূর্বে তিন স্থানেই কুতাজলি পুটে কালীর পূজা অর্পণ কবিত। আমাদিগেব দ্বিতীয় প্রশ্নেব উত্তর স্থির কবিত্তে হইলে দেখিত্তে হইবে এই তিনটি দেবালয় হইতে কোনটি সর্ব্বা পেক্ষা প্রাচীন ও সুবিখ্যাত ও তাহা হইতে কলিকাতার নাম উৎপন্ন হইতে পারে কিনা? এই দুই পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত হইলে ত্রীটিশ বাজধানী কলিকাতা নাম গ্রহণ নির্বিবাদে স্থিবীকৃত হইতে পারে। চিত্ৰেশ্বরী কালী নিতান্ত আধুনিক সময়ের না হইলে ও দুইতিন শতাব্দীর পূর্বে উহার বিষয় কোন পুস্তক লিখিত হইয়াছে কিনা জানা যায় না, অথবা উহার নাম কোন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতার অথবা আইন-ই-আকবরীর

পূর্বে উহার অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। উহা কালী মূর্ত্তী বটে কিন্তু চিত্ৰেশ্বরী বলিয়াই বিখ্যাত। অতএব উহা হইতে যে কলিকাতা নাম গ্রহণ করিয়াছে ইহা সম্ভব নহে। বাগবাজারস্থ কালী চিত্ৰেশ্বরী হইতে আবও আধুনিক এবং ইহা সিদ্ধেশ্বরী নামেই বিখ্যাত ফলতঃ ইহা হইতে ও কলিকাতা নাম প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না। এক্ষণে নির্বিদে বলা যাইতে পারে যে কলিকাতা নাম কালীঘাটের কালী হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। ইহার সমর্থনের জন্য অত্যন্ত কাবণ পশ্চাতে দেখান হইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে নিকটবর্ত্তী অল্প বিখ্যাত স্থান হইতে না হইয়া দূরবর্ত্তী অধিকতর সুবিখ্যাত স্থান হইতে ও নগরাদি অনেক সময়ে নাম গ্রহণ কবিয়া থাকে (ড)।

উক্ত মতেব পোষকতার জন্য কালীঘাটের প্রাচীনত্ব সাব্যস্ত এবং অত্যন্ত প্রমাণ সমূহ সন্নিবেশিত কবিবার পূর্বে কালীঘাট এবং উহার পীঠস্থ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ইতিহাস এস্থলে বিবৃত কবা আমাদিগেব নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কালীঘাট এক্ষণে যে স্থানে অবস্থিত, কোন প্রত্নতত্ত্বাঙ্কসঙ্গায়ী পণ্ডিত বলেন যে পুরাণাদিতে এই স্থানের নাম উল্লেখ আছে এবং অতীত প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানটি লোকে অবগত আছেন। উক্ত স্থানকে তৎকালে হিন্দুগণ কালীক্ষেত্র বলিতেন।

(ড) "The field of Waterloo is named from the *largest* village near it and not St. Jean, which is still nearer. *Vide Selections from the Calcutta Review Vol. V. P. 160.*

words ending in *chester* (castra) show In the middle ages this occurred very frequently. *Vide Selection from the Calcutta Review Vol. V.—P. 160.*

ইহা বেহলা হহতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আধুনিক কলিকাতাও উক্ত সীমার মধ্যে ছিল। এবং উক্ত স্থান একটি বিখ্যাত পীঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পুৰাণাদিতে এই রূপ কথিত আছে যে কালী ক্ষেত্রের সীমার মধ্যে কোন স্থানে সতীৰ মৃত দেহের অংশ পতিত হয় (৫)। এতদ্বশে সাধারণতঃ একান এবং কেহ কেহ বাহান পীঠের উল্লেখ করিয়া থাকেন। পুৰাণাদিতে বাহান পীঠেবই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পীঠ সম্বন্ধে পুৰাণাদিতে সময়ে সময়ে মতভেদও লক্ষিত হয়। দেবী-ভাগবতে (৭) পীঠের সংখ্যা অনেক গুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার যদ্যপি আমরা কালিকাপুৰাণের কথা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে পীঠের সংখ্যা সংকুচিত হইয়া পড়ে। উক্ত পুস্তকে পীঠের

(৫) Calcutta is a place known from remote antiquity. The ancient Hindus called it by the name of kalikshetra—It extended from *Bakula* to *Dakhneshar*. Behula is modern Behala and the site of Dakhneshar still exists. According to the Purans, a portion of the mangled corpse of *Sati* or *Kali* fell some where within that boundary; whence the place was called *Kalikhetra*. Calcutta (*Kalikatra*) is a corruption of *Kalikhetra*. In the time of Balal Sen it was assigned to the descendants of *Sera*. *Vide Indian Antiquary* Pandit Padmanav Ghoshal's letter, dated Calcutta July. 1873.

(৭) দেবীভাগবত ৭ম স্কন্ধ বাহা পীঠকথা দেখ।

তালিকা মধ্যে কালীঘাটের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই, ইহা নিম্নে টিকায় সন্নিবেশিত হইল (ভ)। ইহা বাতীত অগ্ন্যাত তন্ত্রে (থ) ইহার বিষয় উল্লেখ আছে। ভাবতচন্দ্র বায় গুণাকরোক্ত অন্নদামঙ্গলে পীঠমালা-দীর্ঘক পদ্যে কালীঘাট একটি পীঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বুঝা যায় যে এক্ষণে যে স্থানে নকুলেশ্বরবো মন্দির অবস্থিত, উক্ত স্থানেই সতীর দেহের অংশ পতিত হয় (দ)। এক্ষণে বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে পুৰাণাদিতেও পীঠ-সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ। এইরূপ স্থলে আমরা কোনটিকে পবিত্রাঙ্গ

ত। কালিকা-পুৰাণ দেখ ১৮ অধ্যায়।

১। দেবীকূট—পাদপুর্ণ।

২। ওড়্রব—উৎকৃষ্ট।

৩। কাম—যৌন।

৪। ঐ—বাঁচ।

৫। জালক—দেবগণ স্বর্গহার গতিত।

৬। পূর্ণগিবি—শির।

৮। মন্দাকিনী (স্বর্গঙ্গা) অবশিষ্টাঙ্গ।

৯ অধ্যায়।

১। ওড়্র— { ১ পশ্চিমাংশে উদ্ভেদনী।
২ অগ্ন্যাত্রে ওড়্রকাত্যাবনী।

(২)। জালশেখ—জালেশ্বরী।

৩। পূর্ণপীঠ—পূর্ণেশ্বরী।

৪। কামরূপ—কামেশ্বরী।

(গ)। উত্তর তন্ত্র, বৈকবী তন্ত্র, ত্রিপুরা তন্ত্র

উক্ত—

(দ)। কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলী ডালিপার।

নকুলেশ্বর ভৈরব কালিকা দেবী তাঁর ॥

তরিত চন্দ্র বার গুণাকর কৃত

অন্নদামঙ্গল।

পীঠমালা-দীর্ঘক পদ্য দেখ।

করিয়া কৌণ্টিকে বিশ্বাস করিব, তাহা স্থির করা মুকঠিন। একটিকে বিশ্বাস করিলে কালীঘাট পীঠের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, আবার অল্প আর একটির লেখার উপর আস্থা করিলে, উক্ত স্থানকে পীঠেব সংখ্যার বহির্ভূত বিবেচনা করিতে হয়। ঠেহাব্যতীত আমাদিগেব দেশে পুবাণের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে উহাব মধ্যে কৌণ্টি আধুনিক এবং কৌণ্টি প্রাচীন, ঠেহা নির্কাচন কবা অতীব দুকহ ব্যাপাব স্মৃতবাং আমবা এস্থলে কালীঘাট একটি পীঠ কিনা সে বিষয়েব মীমাংসা হইতে আপাততঃ বিবত হইলাম। সমযাস্তবে এবিষয়ের অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবাব ইচ্ছা বহিল। মূল প্রস্তাবের কতকটা সহায়তা হয় বলিয়াই আমবা এবিষয়েব কথাক্ষে উল্লেখ কবিলাম, নচেৎ এস্থলে এবিষয়ের অবতাবণা করিবাব বিশেষ আবশ্যকতা ছিলনা। ফলে কালীঘাট একটি মহাপীঠ বলিয়া আমাদিগের দেশের লোকের মনে বন্ধমূল থাকা প্রযুক্ত আমবা ও আপাততঃ উক্ত স্থানকে একটি পীঠ বলিয়া গ্রাহ্য কবিয়া লইলাম।

এক্ষণে দেখা যাউক কালীঘাট প্রাচীন কি আধুনিক স্থান। আমাদিগেব দেশে প্রত্নতত্ত্বসংক্ষে অহুসন্ধানের বিশেষ উদাসীনতা বজ্র জ্ঞান্য স্থানের ন্যায এই স্থানের বিশেষ প্রাচীন বিবরণ অবগত হইবাব উপায় নাই। বঙ্গাল সেনের সমযে এ স্থানের উল্লেখ কোন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় (খ)। এই সময় হইতে সত্রাট আকবরের রাজত্ব আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত আমবা এই স্থানের বিষয় আব

কিছু অবগত নহি। সম্ভবতঃ আকবরের রাজত্ব কালেই কালীঘাট ও কলিকাতা অঞ্চলের অবস্থা ক্রমশঃ অবনত হইতে আরম্ভ হয়। গোড়ীষ ভাষা ভাষে উল্লিখিত আছে যে ১৫৮৫ অব্দে বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় ভগানক বড় ও উৎকলিত সমুদ্রেব আক্রমণে দক্ষিণ প্রদেশ নষ্ট হইয়া যায়। প্রায় দুইলক্ষ প্রাণীব প্রাণ বিনষ্ট হয়। একটি মন্দির অবলপন কবিয়া কতকগুলি লোক বক্ষা পায়। তৎপবে ঘোব ভূমিকম্প হইয়া ছিল। গঙ্গাব অসংখ্য শাখাব বেগে পরিবর্তিত হইয়া অনেক স্থান নষ্ট হইয়া যায়। তদবধি দক্ষিণ দেশ ক্রমশঃ অসংখ্যকব হইয়া উঠিল। যে দুই একজন অধিবাসী ছিল, তাহারিও মগদিগেব(ন) উৎপাতে বাসস্থান পবিত্যাগ কবে। প্রায় দুই শতাব্দী হইল স্মন্দবন পূর্ণ অবণ্যে পবিণত হইয়াছে (প)।

অনেকে বিদিত আছেন যে স্মন্দবন যে আংশিক আবাদ হইয়াছে, ঐ স্থানেব মধ্যে অনেক স্থলে হুন্ধ্যা মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এবং ইষ্টকাদিপ্রতিষ্ঠিত সোপান-পবিশোভিত পুষ্কবিণী সমূহ বাহিব হইয়াছে। ঐ সকল বর্তমানথাকা প্রযুক্ত বিবেচনা হয়, যে ঐ স্থানে এক সমযে সমৃদ্ধিশালীনগবাদি ছিল, কোন দৈব ঘটনা বশতঃই যে ঐ সকলের ধ্বংস

(ন) মগ অর্থাৎ আরাবণ প্রভৃতি প্রদেশীর লোক পোর্টগিজদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া বোম্বাটবার বা বলদমুয়ার কার্য্য করিত। তাহাদিগের দ্বারা বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরস্থ স্থানসমূহ লোকের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইরাছিল।

(খ) পোর্টগীজ ভাষাতত্ত্ব প্রথম বৎ ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

(প) পোর্টগীজ ভাষাতত্ত্ব প্রথম বৎ ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

হইয়াছে, তাহার বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ সকল নগরাদি ভগ্নাবশেষে লোক-পবিশূন্য হইবা ক্রমশঃ অরণ্যোপরিগত হয়, এমন কি কাল সহকারে ঐ বনেব সীমা কলিকাতাপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্তমান কালীর মন্দিরের প্রাচীণত্ব বিষয়ে বিশেষ মতভেদ আছে। আলিপুবে ১৮৮৫। ২৩সে ভূম মঙ্গলবার এক মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মকদ্দমাব বাদী বড়িয়ার সাবর্ণ চৌধুরীগণ বলিয়া ছিলেন, যে, বর্তমান মন্দির ইং ১৮০৯। ১০ সালে (বাঙ্গালা ১২১৬ সালে) নির্মিত। বড়িয়ানিবাসী জটনৈক বিজ্ঞ প্রাচীন ব্যক্তির নিকট আমরা শুনিয়াছি যে পূর্বে অবগ্যাস্তগত একটি কাষ্ঠ-নির্মিত সামান্ত মন্দিবেব মধ্যেকালী স্থাপিত ছিলেন। অনেকেই কালীপ্রসাদী হাজারামব (ফ) বিষয় অবগত থাকিবেন। সেই ক্ষেত্রে উক্ত বিষয় এস্থলে বিবৃত করিবার আবশ্যক হইতেছে না। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এ সময়ে স্বাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়েবা যে মূর্ত্তা গ্রহণ কবেন(ব) সেই মূর্ত্তা ভাবায় প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বর্তমান কালীর মন্দির নির্মিত হয়। অন্যত্র হণ্টাব সাহেব বলেন যে উক্ত মন্দির প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে নির্মিত হইয়াছে (ভ)

(ক) উক্ত বিষয় বঙ্গাপি কাহার বিশেষরূপ অন্তত হইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি অতীতপূর্বক হুজুর শেখার নক্সা পাঠে এবং প্রাচীন লোক নিগের নিকটে অবগত হইতে পারেন।

(খ) ঐ মূর্ত্তার সংখ্যা আররা বিশেষ অবগত নহি। সম্ভবতঃ দশ সহস্র হইবে।

(ঙ) Vide W. W. Hunter's Statistical Report. Vol. P.

কোন লেখক বলেন যে সম্ভবতঃ ঐ মন্দির অনেক শতাব্দী হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ সময়ে গঙ্গা (ভাগীরথী) অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল এবং উহা উক্ত মন্দিরনিঃসৃত নবশোণিত, মন্দির-প্রাচীর বিধৌত করিয়া কল কলস্বরে প্রবাহিত হইত। দম্মাগণ তাহাদিগেব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবাব পূর্বে দেবীর সম্মুখে পূজা অর্পণ কবিত। “হলওয়েল সাহেব ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, কালী ঘাটে কালীর প্রাচীন মন্দির দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং উহাব নিয়ে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। উক্ত স্রোতকে ব্রাহ্মণগণ গঙ্গার আদিস্রোত বলিয়া থাকেন” (ব)।

উপবে কালীঘাট-সঙ্গদে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে এই স্থানটী প্রাচীন এবং সুপ্রসিদ্ধ, বহুপূর্বে ইহাব উন্নত অবস্থা ছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে প্রাচীন মন্দির ছিল এবং উহাব নিয়ে টালির খালের Tally nulluh অধিকৃত স্থানে প্রশস্ত পূণ্য-স্থলী ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। তৎপবে পূর্বোক্ত দুর্দ্দৈববশতঃ যে সময়ে ঐ সকল প্রদেশেব অনিষ্টপাত হয়, সেই সময়ে উক্ত মন্দিরও বিনষ্ট হইয়া থাকিবে এবং ক্রমশঃ ঐ সকল স্থান অরণ্যোপরিগত হইলে, সম্ভবতঃ কাষ্ঠেব সামান্য মন্দিরে কালী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়া ছিল। পশ্চাতে উপরোক্ত ঘটনাতে আধুনিক মন্দির নির্মিত হইয়া থাকিবে এবং এতদ্বশে ইংরেজগমনেব পব হইতে কলিকাতা নগরের ক্রমিক উন্নতিসহকারে কালীঘাট প্রভৃতি অঞ্চলেরও উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়।

(ব) Vide Holwell's Indian Tracts.

যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে কালী-ঘাট বহু পূর্বে হইতে একটি সমৃদ্ধিশালী স্থান এবং এই স্থানব্যতীত কলিকাতার সন্নিকটে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন সুপ্রসিদ্ধ স্থান পবিত্রীকৃত হয় না, তখন আমাদের পক্ষে স্বীকার করিতে হইবে, যে “কালীঘাট” অথবা “কালী” মূলব্যতীত অন্য কোন মূল হইতে কলিকাতা নামোৎপত্তি সম্ভব নহে ।

অনেক সময়ে স্থানের নাম প্রথমে যাহা থাকে তাহা হইতে ক্রমশঃ অপভ্রষ্ট হইয়া পড়ে । ইহা ইতিহাস পাঠকের অবদিত নাই । সেইরূপ কলিকাতা-শব্দ “কালী” বা “কালীঘাট” হইতে বর্ণ-বিশেষ্য (বর্ণবোধ্য বিযোগ বা পরিবর্তন) ঘটয়া কিরূপে যে অপভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির করা অতীব দুষ্কর । কোন কোন লেখক বলেন যে “কালীকুট” (কালী-কালী, এতঃ কুট, = ভূগ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (৩) । কেহ বলেন যে কলিকাতা নাম কালীঘাটের অপভ্রংশ মাত্র (৪) এবং কেহ বা কলিকাতাকে “কালী” কোটা নামে অভিহিত করিয়াছেন

(৩) “Calcutta, Kal-kut-ta, a city of Bengal and the capital of British India standing on the East Bank of the Hugli River, at the distance of 100 miles from the Bay of Bengal. It takes its name from Kali or Kallee the Hindu goddess of Times and Casta “a house or temple,” which stood in the village of Calcutta”—*Vide Beeton's Dictionary of Geography a universal Gazetteer*—P 186

(৪) “Calcutta, Sans. is from Kalika (Kalee) and “kut” to move It was when

(৩) । জনৈক প্রত্নতত্ত্বসন্ধানী কলিকাতাকে কালীক্ষেত্রের অপভ্রংশ করিয়াছেন (৫) ।

পরিশেষে আমরা আর দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের শেষ করিব । “কালী” বা “কালীঘাট” হইতে কলিকাতার নাম কে দিল ? মুসলমান, ইস্তবেজ (যুবোপীয়) কিম্বা হিন্দু প্রথমতঃ সত্ৰাট আকবর সাহেব সময়ে যে যে স্থানে হিন্দুদিগের স্মৃতিখাত দেবাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল, ঐ সকল দেবতা ও স্থানের নাম আইন-ই-আকবরীতে সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু উক্ত পুস্তকে কালীঘাটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । আইন-ই-আকবরীর পূর্বে এবং পশ্চাতে ভাবতে যুবোপী ঐতিহাসিক কালের প্রাবল্যপাশ্চাত্ত কোন মুসলমানীয় ইতিহাসে ও উক্ত স্থানের নামোল্লেখ নাই । ইহাতে বোধ হইতেছে, যে সময়ে আইন-ই-আকবরী রচিত হয়, সে সময়ে কালীঘাটের অস্তিত্ব হীন অবস্থা । তাহা না হইলে উক্ত পুস্তকে কলিকাতার নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অথচ কালীঘাটের উল্লেখ মাত্র নাই । ইহা দ্বাৰা অস্বাভাবিক হইতেছে যে কলিকাতার পূর্বে অবস্থা মন্দ হইয়াছিল । ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে আইন-

they (British) obtained it, only a miserable village known as Kalighat, of which some believe its present name is a corruption”—*Vide Balfour's Cyclopaedia of India*

(৫) *Vide Stewarts, History of Bengal* P 340 and 346

(৬) Calcutta. (Kalikata) is a corruption of Kalikshetra—*Vide note (৩)*

ই-আকবরীর বহুপূর্বে অথচ কালীঘাটের উন্নত অবস্থায় কলিকাতা নাম প্রদত্ত হইয়াছিল । তাহা হইলে প্রমাণ হইতেছে, মুসলমানদিগের দ্বারা কলিকাতার নামকরণ হয় নাই ।

দ্বিতীয়তঃ লংসাহেব বলেন (৪) "ভগলী-নগরে ইঙ্গবেজ বণিকগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে যখন জব্ চার্ণক সাহেব ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ আগষ্ট তারিখে স্মৃতানটী গ্রামে পদার্পণ করেন এবং বৈটকখানা স্থিত বিখ্যাত পুৰাতন বৃক্ষের মূলে বসিয়া তাম্রকূট (পাইপ) সেবন করেন, যে সময়ে

চৌবন্দী ব্যাজভল্লুকের আবাসভূমি অরণ্যে পরিবৃত্ত; সম্ভবতঃ সেই সময়ে তিনি কলিকাতার নিকটে কালীঘাটবাসীত অনা গণনীয় স্থান দেখিতে না পাওয়াতে, উক্ত স্থান হইতে কলিকাতার নাম প্রদান করেন । লং সাহেবের এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রম-মূলক । যে হেতু ভাবতবর্ষের সঙ্গে যুরোপীয়দিগের সংশ্রব হইবার পূর্বে যখন আমবা কলিকাতার নাম আইন-ই-আকবরীতে প্রাপ্ত হইতেছি তখন ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ফলতঃ এই নাম যুরোপীয়দিগের দ্বারা প্রদত্ত হয় নাই ।

তৃতীয়তঃ যখন দেখিতে পাওয়া যায়-তেছে, যে মুসলমান এবং যুরোপীয় উভয়ের কাহারও দ্বারা কালীঘাট হইতে কলিকাতা নাম দেওয়া হয় নাই, এবং যখন কলিকাতার নাম আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ-বহিষ্যছে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে উক্ত স্থান কিছু মহসাই উৎপন্ন হয় নাই অথবা উহা পূর্ব হইতেই বর্জমান ছিল । অতএব প্রতিবাদ-ভীতিশূন্য হইয়া বলা যায় যে এই নাম মোগল-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার বহুপূর্বে সম্ভবতঃ বঙ্গে মুসলমান সমাগমেব অথবা কালীঘাটের উন্নত অবস্থায় হিন্দুদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল ।

(৪) "When Gob charnock landed on the 24th of August—1690, fifty years after the first settlement of the English at Hugli, and smoked his pipe probably under the Shade of the famous old tree that stood at Baitakhana, chowrunghie plain was a dense forest, the abode of bears and tigers. a few weavers shade stood where Chandpal ghat is now there was consequently no object of interest nearer than Kalighat It is not likely then, that the old patriarch called the locality after the most conspicuous object *Vide Selections from the Calcutta Review Vol. V. Page 168 and 169.*

শ্রীঅমোরনাথ দত্ত ।

বাল্য-বিবাহ ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

হিন্দুপত্নী ।

নবজীবনের “হিন্দুবিবাহ” প্রস্তাবলেখক, হিন্দুবিবাহকে আধ্যাত্মিক বলিয়াই ক্রান্ত হইবেন নাই। তিনি হিন্দুবিবাহেব গোঁবব বাড়াইবার অন্য আবও যে কত বলিয়াছেন তাহাব ক্রমে ক্রমে পরিচয় দিতেছি। হিন্দু-বিবাহ আধ্যাত্মিক, হিন্দুবিবাহেব উদ্দেশ্য পাবলৌকিক। একথা বলিয়াও আশা মিটে নাই। শেষ বলিলেন—হিন্দুবিবাহ এমন একটা জিনিষ যাহা হয় শি হইবে না, হিন্দুবিবাহ এক অদ্ভুত পদার্থ। আমবা লেখকের কথাতেই হিন্দুবিবাহেব সেই অদ্ভুত রহস্য ব্যক্ত করিতেছি। লেখক বলিতেছেন—“বঙ্গের স্মার্তশিরোমণি বণু-নন্দনের ব্যাখ্যামুসাৰে আমাদেব বিবাহ-প্রক্রিয়াৰ অর্থ এই যে সপ্তপদী-গমন বৈবাহিক হোম প্রভৃতি অলৌকিক ক্রিয়াৰ গুণে হিন্দু স্ত্রী আহবনীয ও যজ্ঞেব কাঠেব ন্যায় “অলৌকিক” পদার্থ হইয়া থাকেন। অলৌকিক শব্দেব অর্থ মানবধৰ্ম্মাক্রান্ত নয, মানব ধৰ্ম্মেব অতীত যে দেবধৰ্ম্ম সেই দেবধৰ্ম্মাক্রান্ত। অতএব হিন্দুপত্নী অলৌকিক সংস্কাব-সম্পন্ন অতি পবিত্র ও পূজনীয় অলৌকিক পদার্থ বলিলে সাদা কথাৰ এই বুঝায যে হিন্দুপত্নী দেবতা।” হিন্দুবিবাহ শুধু আধ্যাত্মিক নহে, হিন্দু-বিবাহ মানুষকে

দেবতা গড়িতে পারে। হিন্দু-বিবাহ “মহুব মিথ্যাপদার্থ” হিন্দু নারীকে একবার স্পর্শ কবিলেই তিনি অলৌকিক দেবতা চইয়া বসেন। অতএব হিন্দুবিবাহ “ঐজ্জ-জালিক”। বিয়ঃ—ঐজ্জজালিক বলিব না; কাবণ ইজ্জজাল যে কু অৰ্থেও ব্যবহৃত হয়। হিন্দুবিবাহ—অদ্ভুত, অলৌকিক। তাহা বলিয়াওতো তৃপ্তি হইল না। অভিযানে কি আবও উক্ত কথা কিছু নাই? আছে বই কি, সল হিন্দু-বিবাহ অপৌরুষেব। হিন্দুবিবাহ মানুষকে শুদ্ধ মূক্তি আনিয়া দেয় এমত নহে, তাহা হাতে হাতে মানুষকে দেবত্ব প্রদান কবে, মানুষ অমানুষ হইয়া যায়। মানুষ দেবতা হইয়া পড়ে।

লেখক বলেন, হিন্দুনারীৰ পানিগ্রহণ হইবা মাত্র, তিনি দেবতা হইবা যান। বিবাহ করিয়া হিন্দু এক দেবতাকে ঘরে আনেন। যে হিন্দুপতি স্বীয় পত্নীকে দেবতারূপে দেখেন, তাঁহার যেন একটু জৈণতা ঘটে বোধ হয়। একে শয্যাগুরু জালায় এখন কার বাপ মা জালাতন, তাহাতে আবার বউ যদি দেবতা হইবা বসেন, তবে ত তাহা-দেব একেবারে মাথার হাত। একেই এখন কার ছেলেপুলে সাছেবদেব দেখাদেখি স্ত্রীকে লইয়া একঘরে হইতেছেন, বাপ যার

কাছ থেকে সরিয়া গিয়া জীপজা আবস্ত করিয়াছেন, তাঁহাতে আবাব তাঁহারা লেখকের এই উপদেশের হাওয়া পাইলে যে জীব চরণায়ুত পান করিতে আরম্ভ কবিবেন তাহা বড় বিচিত্র নহে। তাই বলি এত বাড়া বাড়ি ভাল নয়, একটু স্যাম্লে শাজ্জের দাব গ্রহণ করা ভাল। সে বাহা হউক, এখন দেখা যাউক, শাজ্জে জীকে কিরূপ দেবতা গড়িয়াছে।

প্রথমতঃ। লেখক বলেন সপ্তপদী গমন করিয়া হিন্দু পত্নী দেবতা হইয়া পড়েন। “সপ্তপদী গমন” কুশণ্ডিকার অঙ্গ মাত্র। কুশণ্ডিকা ব্রাহ্মণ জাতির বিবাহেরই অঙ্গ। ব্রাহ্মণের জাতিতে বিবাহকালীন সপ্তপদী গমন নাই, সুতরাং লেখকের মতেই ব্রাহ্মণের জাতিব হিন্দুপত্নী দেবতা হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ। আপাততঃ লেখকের কথানুসারে স্বীকার কবিয়া লও যে, ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহকালীন দেবতা হইয়া পড়েন। বেশ কথা। কিন্তু যে বিবাহদ্বারা হিন্দুপত্নী দেবতা, সেই বিবাহদ্বারা কি আবাব হিন্দু পত্নী দেবতা নয়? শাজ্জে যখন বলিতেছে, পতিই পত্নীর দেবতা, পতি-শুক্রবা, পত্নীর এক মাত্র ধর্ম এবং এই ধর্মদ্বারা পত্নীর স্বর্গলাভ হয়, তখন কি আর বলিতে পার, যে হিন্দুবিবাহ শুদ্ধ হিন্দুপত্নীকে দেবতা গড়িয়া তুলে হইয়াছে? হিন্দু বিবাহ লেখকের মতে যেমন জীকে দেবতা গড়িয়াছে, তেমনি পতিকেও আবাব সেই দেবতার দেবতা গড়িয়াছে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা হিন্দুপত্নী দেবতা হয়েন, সেই প্রক্রিয়াদ্বারা

হিন্দু পতিও দেবতা হয়েন। সুতরাং শাজ্জার্থে পতিপত্নীর মধ্যে কাহারই পদবুদ্ধি হয় না। লেখকের মতানুসারেই বলিতে হয় আমাদের সমাজে যত জী পুরুষ বেড়াইতেছে, সকলেই মুর্তিমান দেবতা। কিন্তু শাজ্জ ঠিক আছে। শাজ্জ বলে হিন্দু পতিই হিন্দু নারীর দেব স্থানীয়, শুদ্ধ দেবস্থানীয় নহেন, স্থল-বিশেষে তিনি দেবতা অপেক্ষাও গবীধান। হিন্দু ভাষ্যাব যে ব্রতে স্বামীর পাদপূজা নির্দিষ্ট আছে, তাহাই তাহার সর্বপ্রধান ব্রত। মধ্যদিশাজ্জে এই রূপ পতি-পূজাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূবাণ-শ্রেষ্ঠ মহাভারতেও সেই কথা। মহাভারত বলিতেছেন।

“পতিভক্তিই জীলোকের প্রধান ধর্ম তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ। পতিই জীলোকের পবন দেবতা, পবন বহু ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্ৰেমসমতা স্বর্গাশ্রয় শ্রেষ্ঠ”।

অনুশাসন পূর্ব। ১৪৬ অধ্যায়।

তৃতীয়তঃ। পুরুষ দেবতার সেবা করেন, পত্নী আবাব সেই পতিকে দেবতার মত সেবা করেন, সুতরাং শাজ্জনিন্দিষ্ট দাম্পত্য-সম্বন্ধ লেখকের সিদ্ধান্তের বিরোধী। আমরা যে দেবতার সেবা করি, তাঁহার প্রতি আমাদের যে রূপ সমাদর, আর বাহারা আমাদের সেবা করে তাহাদের ও প্রতি কি আমাদের সেইরূপ সমাদর সম্ভবিত পারে? অতএব পত্নীর প্রতি দেবসম্মান মানব-সভাব-বিরুদ্ধ। লেখকের কথা নিরর্থক ও অসম্ভব।

চতুর্থতঃ। বিবাহ দ্বারা যদি হিন্দুপতি পত্নী দেবতা হইয়া যান, তবে তাঁহাদের

আচার ব্যবহার ও চরিত্র অবস্থা দেবতুল্য হইবে। কিন্তু বাস্তবিক কি হিন্দুপতি পত্নী চরিত্র দেবতুল্য? যদি দেবতুল্য হইবে, তবে শাস্ত্র কাহাদিগকে নিন্দা কবিয়াছে, এবং লেখক প্রস্তাবের শেষাংশে ত্রুট্যচর্চায় যে লম্বাচোড়া বক্তৃতা দিয়া Sermonize কবিয়াছেন, তাহা কাহাদিগের জন্ত? লেখক কি দেবতাদের আশ্রয় মাছুষ রূপে ভাবেন না কি? লেখক যে মুখে বলিয়াছেন, হিন্দুপতি পত্নী দেবতা, সেই মুখেই কি বলিতে চান, তাহাবা দেবতা নন? কি ভ্রান্তি। হা হিন্দুশাস্ত্র। কলিকালে অত্যাশ্রয়ে তোমার যে কত স্মৃতি ও গুঢ় তাৎপর্য্য বাহ্যিক কবিবে, তাহা কে বলিতে পারে।

হিন্দু শাস্ত্র সর্বদেশীয় ধর্মশাস্ত্রের মত সৎসঙ্গী জীব গোবর বাড়াইয়াছে বাট, কিন্তু সমগ্র জীজাতিব স্বভাব ও ধর্ম-কথনছলে তাহাদিগের অত্যন্ত নিন্দা ও অবজ্ঞা কবিয়াছে। এই নিন্দাবাদ ও অবজ্ঞা সম্বন্ধে লেখক বলেন, তাহা এই কতিপয় কাবণবশতঃ ঘটিয়াছে।

১। তিনি অল্প একজনকে কথা গ্রহণ কবিয়া বলেন “এসকল সংসার-বিবাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি। জীলোকের রূপ মোহে ও মাধুর্য্যকুহকে অনেক সংযমী বসন্ত নষ্ট হইয়া যায়”।

২। পুরুষের মধ্যে যাহাবা স্বভাবতঃ দোষাধারী নিন্দা-প্রিয় ও তিক্তস্বভাব, তাহাবা কোন জিনিষের ভাল ভাগটা দেখে না মন্দ ভাগটা দেখিয়া জিনিষটাকে একে-ভাবেই মন্দ বলিয়া বর্ণনা করে। এবং

সে বকম লোকে হুই পাঁচ জন হুই জী দেখিবা সমস্ত জীজাতিব যৎপবোনাস্তি নিন্দা করেন। প্রাচীন ভারতে ও সে প্রকৃতিব লোক ছিল। এবং তাহাবাই জীলোকের নিন্দা কবিয়া গিয়াছে। তাহাদের জীনিন্দার উল্লেখ কবিয়া হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও হিন্দু সমাজ জীজাতিব পদ গোবরের পদ নয় একপ প্রমাণ কবিবার চেষ্টা করা বড় একটা ন্যায্য কাজ নয়।

৩। “পুরুষ স্বভাবতঃ জীজাতিব কিছু বশ হইয়া থাকে। অতএব পুরুষকে মতর্ক কবিবার জন্তও সংস্কৃত সাহিত্যে কোন কোন স্থানে জীনিন্দা লিখিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে”।

৪। অত্যাশ্রয় সকল সভ্যজাতি জী জাতিব সম্মান করে, তাহাদেরও সাহিত্যে জীনিন্দা আছে। পুৰাতন ইংরাজী সাহিত্যে বিস্তর জীনিন্দা দেখা যায়। চূড়ান্ত উদাহরণ সেক্সপীয়ারের “Frailty thy name is woman”

অত্যাশ্রয় সভ্য জাতিব সাহিত্যে জী নিন্দা থাকিতে পারে, যে হেতু তাহারী লেখকের মত বলে না যে আমাদের শাস্ত্রে জীজাতিব পদ গোবরের পদ। সে যাহা হউক, প্রথম কাবণ দেখাইয়া লেখক বলিতে চান, যে জীলোকের কুহকে যোগী দিগের যোগ ভঙ্গ হইত, বলিয়া তাহাবা মহা চট্টিয়া গিয়া জীনিন্দা কবিয়া গিয়াছেন। যাহারা যোগী ছিলেন, বনে বাস করিতেন, সংসার ধর্মের ধার ধারিতেন না, তাহাবা কি কি শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন এবং সেই শাস্ত্রের কোন অংশে জীনিন্দা আছে, তাহা না

দেখাইয়া দিলে লেখকের কথা প্রামাণ্য নহে । আর যদি তাঁহা লিখিয়া গিয়াই থাকেন, সে সকল কথা কি মিথ্যা ? তাঁহা মিথ্যাপবাদ দিয়া গিয়াছেন, লেখক কি এই কথা বলিতে চান ? যদি মিথ্যাপবাদ না হয়, তবে লেখক প্রতিপক্ষে কথায় সপ্রমাণ করিতেছেন, আর যদি মিথ্যাপবাদ হয়, তবে অন্ত্যশাস্ত্রকাবেবাও কি মিথ্যাপবাদ দিয়া গিয়াছেন ? সমগ্র শাস্ত্রের নিন্দাবাদই কি মিথ্যা কথা ? ব্যাস, মনু প্রভৃতি সকল শাস্ত্রকাবেবাই কি মিথ্যা নিন্দা কবিয়াছেন ? একথা কখনই সম্ভবিত্তে পাবে না । সুতরাং লেখক প্রথম কাবণ দর্শাইয়া বিপক্ষপক্ষই সমর্থন কবিয়াছেন ।

লেখকের দ্বিতীয় কাবণ, তৃতীয় কাবণের বিবোধী । লেখক তৃতীয় কাবণে বেশ বিজ্ঞের মত অনুমান কবিলেন যে, শাস্ত্রে যে নিন্দাবাদ আছে, তাহা শাস্ত্রীয় প্রণয়নাবাদেরই কুফল নিবারণ কবিবার জন্ত লিখিত হইয়াছে । তাহা হইলেই তিনি স্বীকার কবিতেছেন যে, যে শাস্ত্রে জীলোকের আদব বাড়ান হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই জীজাতির নিন্দাবাদ আছে । তবে তিনি কেন বলেন “পুরুষের মধ্যে ঘাহারা স্বভাবতঃ দোষাশেষী, নিন্দাপ্রিয় ও তিক্তস্বভাব” তাহাবাষ্ট্র জীনিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে ? লেখক যে মনু হইতে পত্নীর গোবর দেখাইয়াছেন, সেই মনুই জীজাতির নিন্দা রটনা কবিয়া গিয়াছেন । তিনি আবার নিজ কথা সমর্থনার্থ বলিয়া গিয়াছেন, ঋতি ও নিগম তাহাব সাক্ষ্য দিতেছে । মনু নবম অধ্যায়ে কহেন—
“জীরা সৌন্দর্য্য অধেষণ করে না, সুদা বা

বুদ্ধ ও দেখে না, সুরূপ বা কুরূপ হউক, পুরুষ পাইলেই উহাব সহিত সম্ভোগ কবে । পুরুষ দর্শনমাত্রে জীদিগের উহার সহিত ক্রীড়া কবিত্তে ইচ্ছা অস্মে এজন্ত, এবং চিত্তের স্থিরতা নাই বলিয়া স্বভাবতঃ স্নেহ-শূন্যতা-প্রযুক্ত ভর্তৃকর্তৃক বন্ধিতা হইলেও ভর্তৃ-বিরুদ্ধে ব্যভিচারপ্রভৃতি কুক্রিয়া জীলোকে কবিয়া থাকে । জীদিগের বিধাতাকর্তৃক সৃষ্ট এই রূপ স্বভাব পুরুষ বিলক্ষণ অবগত হইয়া, তাহাদিগের প্রতি অতিশয় যত্নবান থাকিবে । শয্যা, আসন, ভূষণ, কাম, কোথ কোটীলা, পবহিংসা, যুগিত ব্যবহার এই সকল জীলোক হইতে হয়, ইহা সৃষ্টিসময়ে মনু স্বয়ং কল্পিত কবিয়াছেন । যে হেতু জীলোকদিগের মস্তদ্বারা জাত কন্দাদি সংস্কার হয় না এজন্য উহাদিগের নির্মল অঙ্গঃকরণ হয় না এবং বেদ স্মৃতিতে অধিকার না থাকাত্তে উহাবা ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পাবে না এবং উহাদের মজ্ঞে অধিকার নাই এবং পাপহইলে তাহা ক্ষালন কবিত্তে পাবে না, এজন্য উহাবা কেবল মিথ্যা পদার্থ । জীদিগের এই রূপ স্বভাব ঋতিতে কথিত হইয়াছে । উহাদিগের ব্যভিচার-শীলতা ঋতি নিগমে কহিয়াছে । এবং উহাদিগের ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত ঋতিতে কথিত হইয়াছে ।”*

* নৈতা রূপং পরীক্ষতে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ ।

কুরূপশা বিরূপশা পুমানিতোষ ভুঞ্জতে ॥

পৌংল্লাসলচিত্তাক নৈস্নেহাক স্বভাবিতঃ ।

রক্ষিতা বভ্রোতোঃ পীহ ভক্তৃ বৈতা বিরুদ্ধতে ॥

এবং স্বভাবঃ জাতিসাং প্রজাপতিমিসর্গজঃ ।

পরমং বহুমতিভেৎ পুরুষোন্নয়নং ঋতি ।

মহুতে এই রূপ ঐ নিন্দা দেখা যায়। লেখক কি বলিতে চান “যাহাবা স্বভাবঃ দোষাশেষী, নিন্দাপ্রিয় ও তিক্ত-সভাব” তাহাদের মধ্যে মহু ধর্তব্য? তবে তিনি কাহার কথা বলিতেছেন, শাস্ত্রে ঐজাতিব অনেক সম্মানের কথা আছে? যে মহু ঐজাতিকে সম্মান কবিত্তে বলিয়াছেন (এবং সেরূপ বলিবার বিশেষ কাবণ আছে) সেই মহুই ঐজাতিব নিন্দাপ্রচাবও কবিয়াছেন। এই ত গেল লেখকের মতে প্রধান দ্ব্যুতিকাৰ মন্তর কথা। আবাব পূৰ্ণ-শ্রেষ্ঠ মহাভাবতের নিন্দাবাদ মন্তর সুরেই বচিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির বলিতেছেন:—

“পিতামহ! ইহলোকে পুরুষেবা মোহাবিষ্ট হইয়া সতত কামিনীদিগেব প্রতি এবং কামিনীগণ পুরুষদিগেব প্রতি একান্ত আসক্ত হইতেছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ কবিয়া আমার অন্তঃকবণে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, যখন কামিনীগণ অশেষ দোষের আকব, তখন পুরুষেবা কি নিমিত্ত উহাদিগেব সহিত সংসর্গ কবে? উহাবা যে কোন্ পুরুষেব প্রতি অরুচক ও কোন্ পুরুষেব প্রতি বিবক্ত হইয়া থাকে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। উহাবা ক্রীড়াকৌতুকদ্বাবা পুরুষদিগকে বিমোহিত

কবে। উহাদিগেব হস্তগত হইলে প্রায় কোন্ পুরুষই পরিজ্ঞান লাভ কবিত্তে পারে না। গাত্ৰী যেমন নুতন নুতন তৃণ ভক্ষণ কবিত্তে অভিলাষ কবে, তক্ষণ উহারা নিত্য নিত্য নুতন পুরুষেব সহিত সংসর্গ কবিত্তে বাসনা কবিয়া থাকে। শম্বব, নমুচি, বলি ও কুস্তীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তাব কবিয়া গিয়াছেন, কামিমৌগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। পুরুষে বোদন কবিলে উহাবা কপটে বোদন এবং হাস্ত কবিলে উহাবা কপটে হাস্য কবিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে উহাবা অপ্ৰিয় ব্যক্তিকেও প্রিয় সম্ভাষণদ্বারা গ্রহণ কবে। নীতি-শাস্ত্র-কর্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও ঐবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীবা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাবে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন কবিত্তে পাবে। আমার বোধ হয় বৃহস্পতিপ্রভৃতি মহাত্মাবা কামিনীগণেব বুদ্ধিব কাৰ্যা সমুদায় অবলোকন কবিয়াই অর্থ শাস্ত্র প্রণয়ন কবিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহাদিগেব পূজা কবে, আব যে উহাদিগেব প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কবে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষেব প্রতি সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। পিতামহ! কামিনীগণ নিতান্ত লঘুচিত্ত ও সমুদায় দোষের আকব বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত, তাহাদের কিকূপ স্বভাব আপনি অমুগ্রহ পূৰ্ব্বক কীর্তন ককুন।” এই গেল যুধিষ্ঠিরেব নিন্দাবাদ। ভীষ্ম আবাব নিন্দাবাদ কবিত্তে—

“ইহলোকে ঐলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজলিত অগ্নি,

সখাসনমলস্তাং কামং ক্রোধসনার্কবং ।

ভোহভাষঃ কুবাক্যং ত্রীভ্যো মনুবকল্পবৎ ॥

নাস্তি ত্রীণাং ক্রিযা যাত্রেবিত্তি শর্যোব্যবহিতঃ ।

নিবিক্ৰিযা হামজ্ঞানং ত্রিবোহ নৃতমিত্তি ত্বিত্তিঃ ॥

তথাত ক্রতরোবছেঃ । নিগীভা নিগমেষ্ঠপি ।

বানক্ষণ্য পরীক্ষার্থং ভাসাং শৃণুত নিত্বতীঃ ॥

১৯, ১৯ হইতে ১৯ ।

ময়দানবের মাথা, ক্ষুব্ধাব, বিধ, সর্প ও মৃত্যু এই সমুদয়ের সহিত উহাদিগের তুলনা কবা যায়। * * * জীর্ণগণের প্রতি কোন কার্য বা ধর্ম নির্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্ণ্য বিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি উহাদিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্য্যতা কটুবাক্যপ্রয়োগ ও রতি, এই সমুদয়ে আসক্ত কবিয়া দিয়াছেন। কটুবাক্যপ্রয়োগ, প্রহাষ, বন্ধন, অথবা বিবিধ প্রকাব ক্রেশ প্রদান কবিলেও উহাদিগকে পরপুরুষ-সংসর্গে নিবৃত্ত কবা যায় না। মহুষ্যের কথা দূবে থাকুক, ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্মে বন্ধা কবিতে সমর্থ হয়েন না।” ইত্যাদি।

অল্পশাসন পর্ব। ৩৯।৪০ অধ্যায় দেখ।

ভীষ্মোক্ত পঞ্চচূড়া কথিত নিন্দাবাদ পড়িলেও দেহ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এ সমস্ত কি যোগিদগিগেব বাক্য, না স্বভাবতঃ তিক্ত-স্বভাব নিন্দকের কথা? লেখক কি অন্ধ হইয়া শাস্ত্রাশেষণ কবিয়া ছিলেন? তদপেক্ষা সেক্সপিয়ারের নিন্দাবাদ কি অধিকতর তিক্ত বোধ হইবে? সেক্সপিয়ারের যাহা “চূড়ান্ত” নিন্দাবাদ বলিয়া লেখক অভিহিত করিয়াছেন, তাহা কি এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত নিন্দাবাদের কাছে পবাস্তিত হয় না? এতদপেক্ষা অধিকতর নিন্দাবাদ আব কি হইতে পারে আমরা জানি না। তবে লেখক যে অনুমান করেন, এই সকল নিন্দাবাদদ্বারা শাস্ত্র জীর্বেপূজাকারিগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া থাকিবে, একথা সত্য। শাস্ত্র ঠিক আছে। যাহারা বাস্তবিক অতি নীচ ও হেয় পদার্থ, যখন তাহাদিগের না নইয়া স.সার ধর্ম চলে না, তখন তাহাদিগের সহিত সহ-

বাস সময়ে অতি সাবধানে চলা উচিত। পাছে সেই নীচ ও দুর্বল জাতির প্রতি পুরুষ অনায নিপীড়ন ও অত্যাচার করে, এজন্য শাস্ত্রে কতিপয় প্রবৃত্তি-দায়ক ও জীর্ণজাতির আদব-সম্বন্ধক বচন দিয়া গিয়াছে। তবে কেন লেখক শাস্ত্রোক্ত দুচাটি উক্ত রূপ প্রবৃত্তি-দায়ক শ্লোক দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত কবিয়া বসিলেন যে হিন্দুর কাছে জীর্ণজাতির পদ অতি গৌরবের পদ? বিচিন্তিত এই, লেখক আবার বলিতেছেন “জীর্ণজাতির দুই চাটি নিন্দাবাদ দেখিয়া হিন্দুর মধ্যে জীর্ণজাতির পদ গৌরবের পদ নয় একরূপ সিদ্ধান্ত কবা কোন নীতি অনুসারে যে ন্যায় সম্ভব হয়, তাহা একেবারেই বুঝিতে পারি না।” এতদুত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, যে নীতি অনুসারে লেখক দুইচারিটা জীর্ণজাতির সমাদবসূচক বাক্য দেখিয়া বলেন, জীর্ণজাতির পদ হিন্দুর মধ্যে গৌরবের পদ, সেই নীতি অনুসারেই দাঁগবিশিষ্টা নিন্দাবাদ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, হিন্দু শাস্ত্রে জীর্ণজাতির পদ গৌরবের পদ নয়। লেখক যে এ নীতি বুঝিতে পারেন নাই কেন, তাহাই আশ্চর্য্য।

মহু জীর্ণজাতির পক্ষে যে সমস্ত সমাদবসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, ব্যাস মহাভারতে তাহাবই এইরূপ বিন্যাস কবিয়া দেখাইয়াছেন :—

“জীকে সর্বতোভাবে আত্মাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। যদি জী পুরুষের প্রতি অহরহ ও তাহার সমাগমে ঈর্ষিত না হয়, তাহা হইলে সেই অজীর্ণনিবন্ধন সে কখনই মৃত্যু লাভে সমর্থ হয় না। অতএব

নিস্ত মন্ত্রাগণের প্রীতি-সম্পাদন ও তাহা দিগের প্রতিপালন কবা অবশ্য কর্তব্য। তাহার কামিনীগণের যথার্থ সৎকাব কবে, দেবতা তাহাদেব প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আব যাচা কামিনীগণের অনাদর কবে, তাহাদেব কোন কার্যই ফলোৎপাদক হয় না। কুলকামিনীগণ অনু-তাপ কবিলে কুল একেবাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান কবে, তৎসমুদায় নিশ্চয়ই প্রীত ও উৎসন্ন হয়। মহাঋষি মন্ত্র দেবলোকে গমন কবিবাব সময় পুরুষদিগেব হস্তে জ্বীলোকদিগকে সমর্পণ কবিয়া কথিয়াছিলেন, মানবগণ। জীজাতি নিতান্ত দুর্বল, ও প্রিয়কারী; উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষা-পরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ড হতভাব, অবি-বেচক ও অপ্রিয় কার্যে নিবন্ত। অন্নমাত্র চেষ্টা করিলেই উহাদিগেব ধ্বংস হইয়া যায়, অতএব তোমরা প্রযত্নপূর্বকভাবে উহা-দিগকে বক্ষা কর। উহা বা সততই সম্মান লাভের ইচ্ছা কবে। অতএব উহাদিগকে সম্মান কবা অতিশয় কর্তব্য। জীজাতিই ধর্ম লাভেব কারণ, উহাবাই উপভোগাদি সমুদায়ের মূল; অতএব উহাদিগেব পরিচর্যা ও সম্মান বক্ষা কবা শ্রেয়ঃ। অপ-তোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহাব প্রতিপালন, লোকযাত্রাবিধান, জ্বীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সম্মান কবিলে সমুদায় কার্য সুসিদ্ধ হয়। একদা বিদেহবাজহুহিতা কথিয়াছিলেন, জীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদিগেব স্বামী

ওক্ষয়ই পবন ধর্ম। উহা বা সেই ধর্ম প্রভাবেই স্বর্গলাভ কবিতে পারে। জ্বীলো-ককে কুমারিকাবস্তায় পিতা, যৌবনাবস্তায় ভর্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র বক্ষা কবিবে, উহা-দিগকে স্নাতন্য প্রদান কদাচ বিধেয় নহে। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, তিনি জ্বীলোকদিগকে সৎকাব কবিবেন। উহা বা লক্ষ্মীস্বরূপ, অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীয়ে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীয়ে নিগ্রহ কবা হয়।”

অনুশাসন ৪৬ অ।

মন্ত্রতে জ্বীসমাদব-সূচক যত কথা আছে, তাহাব স্তম্ভ বিন্যাস ও ব্যাখ্যা ব্যাস দিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত শাস্ত্র স্তম্ভবাদ দেখা যায়। কিন্তু এ স্তম্ভবাদ কি প্রকাশ কবিতোছে? উহা হইতে এই পর্য্যন্ত প্রকাশ কবে যে পুরুষজাতি জীজাতিকে সমাদব কবিবে, সমাদব কবিবে কি উচ্চ, তাহাও স্পষ্ট প্রকাশ কবা হইয়াছে। জীজাতিকে সমাদব না কবিলে সংসার ধর্ম ও সমাজেব উন্নতি সাধন হয় না, কাবণ, উহা বা সমাজেব অঙ্গ অঙ্গ।

যে যে স্বার্থসিদ্ধি বজ্জ জীজাতিব প্রতি-পালন ও সমাদব কবা উচিত, ব্যাস তাহা পদে পদে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যেন মন্ত্র মনেব কথা স্থলিয়া দিয়া গিয়া-ছেন। এই পর্য্যন্ত স্তম্ভবাদ দেখিয়া লেখক যদি বলিতে চান যে, হিন্দু শাস্ত্রে জীজাতির পদ বড় গৌরবেব পদ, তবে উহাকে নিতান্ত ব্রাস্ত বলিব। হিন্দু গোজাতিকেও পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে এবং অতি যত্নে প্রতিপালন করে। কিন্তু যে এঁড়টা লাদল টানিতে ভাল না পারে, তাহাকেই ঘাঁর

নাম গোবেড়ন পিটুনি হয়, আর যে গাভী ভাল দুধ দিতে না পারে, তাহাব সামান্য প্রাসের বন্দোবস্ত মাত্র।

কিন্তু লেখককে কান্দেকাজেই বলিতে হইয়াছে যে হিন্দু শাস্ত্রে জীজ্ঞাতির বড় গোববেব পদ। কাবণ, তাঁহার প্রধান মতই জ্ঞাত, সেই জ্ঞাতিকে বজায় রাখিবাব জন্য তাঁহাকে নানা ভ্রাতৃমতের সৃষ্টি কবিতে হইয়াছে। তাঁহাব প্রধান মত—হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক। এই মত ক্রমে বজায় থাকে, তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক ওকলাতি কবিতে হইয়াছে। এই দেখুন, তিনি এক জ্ঞাত্তি হইতে অন্য জ্ঞাত্তিতে কিকপে অসিয়া পড়িয়াছেন।

“মোক্ষসাধনরূপ জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যসাধন সম্বন্ধে জীপুরুষেব যেকপ সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে, তদ্বাবাই বুঝা যায় যে হিন্দু শাস্ত্রানুসাবে জী বড়ই আদবেব, বড়ই গৌরবেব ‘সামগ্রী’।” লেখক বলিতে চান যিনি মোক্ষ সাধনেব সহকাবিলী সেই জী হিন্দুর নিকট অতি আদবেব ও গৌববেব সামগ্রী। ষোক্ষ কোথায় ও সংসারধর্ম কোথায় এবং যে জীব কোন বৈদিক মত্রে অধিকার নাই, তদ্বাবা পতিব ধর্মকার্যে কি রূপ সহায়তা হইত, তাহা আমরা পূর্বে প্রদর্শন কবিয়াছি। হিন্দু বিবাহ যদি আধ্যাত্মিক না হয় এবং হিন্দু জী যদি পতির ধর্মকার্যের আযোজনাদিব্যতীত আব কিছুতেই যোগ দিতে না পারাতেন, এইরূপ প্রতীত হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, হিন্দু জীর পদ অন্য জাতীয় জীর পদ অপেক্ষা অধিক গৌরবেব নামগ্রী নহে। লেখক বোধহয় বলিতে চান হিন্দু জী পুত্রোৎপাদন

কবিয়া পতিকে কায়মনোচিত্তে শুশ্রূষা কবিয়া এবং নিত্য নৈমিত্তিক সংসার-কার্যে পূজাব আযোজন ও অতিথিসংকার-জন্ত বন্ধনাদি সম্পন্ন কবিয়া পতিব মোক্ষ-পথেব সহায়তা করিতেন। স্বামী রুঠে হইলেও হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট কবিতে হইত, গৃহকর্মে দক্ষতা দেখাইতে হইত এবং গৃহ সামগ্রী সকল পবিকৃত ও পরিচ্ছন্ন কবিয়া রাখিতে হইত।* এইরূপে পতির গৃহ-স্থলী কার্যে হিন্দু পত্নীকে গৃহ কার্যে সহায়তা কবিয়া পতিব মোক্ষ পথের সুবিধা করিয়া দিতে হইত। হিন্দু পত্নী এইরূপ কার্য কবিয়া যদি হিন্দু পতির মুক্তিব সহকাবিলী হইয়া থাকেন, তবে ত সেরূপ কার্য, সকল জাতিব ধাত্মিক পতিব পত্নীই কবিয়া থাকেন। বরং অন্তর্জাতিতে পত্নীর পদ আবও উচ্চ। অন্তর্জাতিতে পত্নী শুদ্ধ ধর্মকার্যের সুবিধা ও আযোজন কবিয়া দেন না, পতির সহিত ধর্মকার্যে সম্মুখরূপে যোগ দিতে পারেন। অন্তর্জাতিতে পত্নী ধর্মাহুতানে ও ধর্মমত্রে অনধিকারিলী নহেন, তিনি পতির সঙ্গে একাসনে বসিয়া এক মত্রে পাঠ করিয়া প্রকৃত পক্ষে পতির ধর্মের সঙ্গিনী হয়েন। পতি শুশ্রূষাই হিন্দু পত্নীর প্রধান ধর্ম, তিনি সেই শুশ্রূষাযারা পতির ধর্মকার্যে সহায়তা করেন মাত্র। তদপেক্ষা বেশী করা তাহার পক্ষে সম্ভবনীয় নহে। পত্নী কেবল সংসার ধর্মেই আছেন, লেখকের মতেই সংসার-ধর্মে মোক্ষ নাই, সংসার ধর্মে স্বর্গমাত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে।

“সঙ্গীক না হইয়া ধর্মচর্চা হয় না, হিন্দু

* মনু স্মৃতি, — ১০০ শ্লোক।

শাস্ত্রের এই বিধানের মর্ম্ম এখন বোধ হইয়া কতক কতক বুঝা গেল।” কতক কতক কেন, বেশ বুঝা গেল। “সঙ্গীক না হইয়া ধর্ম্মচর্যা হয় না” একথাও অর্থ আমবা আরও বিশদ কবিয়া দিতেছি।

আমবা দেখিতে পাই, হিন্দু শাস্ত্রে জীজ্ঞাতিকে অত্যন্ত অবজ্ঞাভাজন কবিয়াছে। কেন কবিয়াছে, সে কথাও আলোচনা আমবা করিতে চাছি না। আমরা দেখিতে পাই হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ভাষ্যাও শূদ্রবৎ। তাহাব উপনয়ন নাই, ধর্ম্মকর্ম্ম নাই, মন্ত্রে অধিকার নাই। তাহার আচার ব্যবহার সমুদয় শূদ্রবৎ। আমরা হিন্দু শাস্ত্রে ধর্ম্মাধিকার-কথাস্থলে জী ও শূদ্রের উল্লেখ একত্রে দেখিতে পাই; যেন জী জ্ঞাতি ও শূদ্রের অধিকার একই প্রকার; এই ক্ষেত্রে ভগবন্ অত্রি বলিতেছেন :—

অভঃপুং প্রবক্ষ্যামি জীশূদ্র পতনানি চ ॥

১৩৪।

অপস্তম্বস্তার্থ মাত্রা প্রচটো মন্ত্রসাধনম্।

দেবতাবাদনকৈব জীশূদ্র পতনানি ষট্ ॥

১৩৫।

কেবল ব্রাহ্মণ পতিব পূজাব আয়োজন ও ভোগরন্ধনাদিমাত্র তাহাব অধিকার ভুক্ত। যেহেতু, সেইরূপেই পুরোহিত জাতিব ভাৰ্য্যা পুরোহিতের শুশ্রূষা কবিত্তে পারেন।

হিন্দুশাস্ত্র নাবীজাতিকে এইরূপ হীন-পদ দিয়া তাহাদিগকে কেবল পুরুষেব ধর্ম্ম কার্য্যে শুশ্রূষার্থ অধিকারিণী কবিয়া গেল। তাহাবা পুরুষের যেমন সর্ব্বকার্য্যে সহায়তা করিবে, তদ্রূপ মন্ত্রাদিতে অনুধিকারিণী হইলেও ধর্ম্মাহুষ্ঠানের আয়োজনে

সহায়তা কবিয়া ধর্ম্মচর্যা কবিবে। তাহা-দেব ধর্ম্মচর্য্যার অর্থ এই মাত্র পাড়াই। স্ত্রতবাং ধর্ম্মসম্বন্ধে হিন্দুজাতিব পুরুষ ও নাবী সমান নহে। তাহাদেব অনেক পার্থক্য। অপবাপব জাতিব ধর্ম্মশাস্ত্রে এ পার্থক্য নাই। অপরাপর ধর্ম্মে কি পুরুষ কি নাবী উভয়েই সমান ধর্ম্মাধিকারী। ধর্ম্মের চক্ষে জী পুরুষ উভয়েই সমান। স্ত্রতবাং অস্তান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে জী পুরুষ-সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধির প্রয়োজন হয় নাই। হিন্দু শাস্ত্রে জীপুরুষের বিশেষ ধর্ম্ম হওয়াতে বিশেষ বিধানের প্রয়োজন হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে জীজ্ঞাতি যখন পুরুষের স্ত্রাব ধর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইল ন, তখন সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদিগের অধিকার-সীমা নির্দেশ করা কাজেই আবশ্যক হইল। এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রে জীজ্ঞাতি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক কথা। আমাদের ধর্ম্মবিধান-শাস্ত্র সম্পূর্ণ কবিবাব জন্য এক দিকে যেমন পুরুষেব বিধান দেওয়া হইল, সঙ্গীক হইয়া ধর্ম্মচর্যা কবা উচিত, অন্য দিকেও বলা হইল। “স্বামিধ্যতিবিজ্ঞ জীলোকেব ঘজ্ঞ নাই, স্বামীব অহুমতি ভিন্ন ব্রত নাই, উপবাস নাই, কেবল স্বামীর সেবাচারাই জী স্বর্গ লোকে গমন কবে।”

“নাতি জীণাং পৃথকযজ্ঞোন ব্রতঃ নাপ্যু-
পোষিতঃ।

পতিঃ শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে
মহীরতে।

মহু ৫৯—১৫৫।

লেখক সর্ব্বশেষে একটি কথা সত্য বলি-

বাঁছেন। তিনি বলিষাছেন—“সংস্কৃত সাহিত্যেব ন্যায়, অকপট সাহিত্যে সকল বিষয়ের সকল দিকট আলোচিত হইবা থাকে।” আমবা আশ্চর্য্য হইয়াছি তিনি এই সৰ্ব্বদিকের আলোচনা দেখিয়া কিরূপে এই পক্ষপাতী মতের স্রষ্টি করিলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে

হিন্দুনীর পদ অতি গৌরবের পদ ? হিন্দু শাস্ত্র আলোচনা করিলে বরং উহাব বিপরীত সিদ্ধান্তে আসিবাবই সম্ভাবনা। কিন্তু কোন রূপ সিদ্ধান্ত না কবাই ভাল। যুক্তির বিবাদ-ভূমিতে শাস্ত্রকে আনা কিছু নয়।

শ্রীঅমৃতলাল বসু ।

বিদায় ।

চলিলাম প্রাণময়ি । চলিলাম আজি,
পরাণে পাষণ চেপে ছাড়িয়া তোমায !
এই ভাসাইলু তবী, জানিনা বাঁচি কি মরি,
জানিনা দৈবেব বশে যাইব কোথায !
অনন্ত সলিলবাশি, গর্জিতেছে অট্টহাসি,
প্রলম্ব-পয়োধি যেন উছলিয়া যায় ।
এই ব্রহ্মপুত্র জলে, এই শূন্য বক্ষঃস্থল
এই যে অনন্ত শূন্য ধূ ধূ দেখা যায়,
চলিলাম প্রাণময়ি । একা অসহাব !—

হাই যে, নাই সে খেদ, নাহি দুঃখ তায়,
ভুলিয়াও সে ভাবনা নাহি করি মনে,
কেবল রহিল হৃথ, অই পূর্ণচন্দ্র মুখ,
পূবেনি আকাক্ষা যারে নিরখি নয়নে !
এত কষ্টে এত ক্লেশে, এত যারে ভাল বেসে,
ছাড়িয়া যাহারে যাই বিধি-বিড়ম্বনে !
একটী মুহূর্ত্ত হায়, দেখিতে নারিলু তায়,
এই বিদায়েব কালে, চারু চন্দ্রাননে
ভরিল না চিত্ত, তার একটী চুখনে !

এই দুঃখ প্রাণময়ি । রহিল অজ্ঞবে,
অই মণিময়ী মূর্ত্তি যুকে বসাইয়া,
অন্তিম বিদায়ে হায়, ও কম-কমল পার,
নয়নেব শেষ অশ্রু উপহার দিয়া,
এই চিব, শূন্য প্রাণ, কবিব যে বলিদান
প্রেমযজ্ঞ ‘স্বাহা’ ‘স্বাহা’ মন্ত্র উচ্চারিয়া,
সে আকাঙ্ক্ষা সে রাসনা, পবিপূর্ণ হইল না,
প্রাণেব আঙুর আজি প্রাণে লুকাইয়া,
হাই প্রাণময়ি । প্রাণ পাষণে বাঁধিয়া ।

কোথা যাই প্রাণময়ি । ছাড়িয়া তোমায ?
তোমাবে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই,
অথচ তববী খানি দ্রুত ভেসে যাব !
দুর্গিবাব স্রোতবলে, এই ব্রহ্মপুত্র চলে,
দেখিতে দেখিতে এই আসিলু কোথায ।
হাই তবে চন্দ্রাননে, রাখিও রাখিও মনে,
কেমনে ভুলিব তোরে হাব হাব হাব !
হাই প্রিয়ে প্রাণময়ি ।—বিদায় ! বিদায় !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ।

মুচ্ছকটিক ।

মুচ্ছকটিক জিনিষটা কি ?

মুচ্ছকটিক জিনিষটা কি ? ইহা বুঝাইতে হইলে প্রথমে কতকগুলি বস্তু বুঝান আবশ্যক । সেগুলি এই—

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্য সকলকে প্রথমে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, শ্রব্য এবং দৃশ্য । শ্রব্য বলিতে শ্রবণ মাত্রতই যাহা সম্যক্ পৰিজ্ঞাত হওয়া যায়, নিজে পাঠ করিয়াই হোক, বা অপরের পাঠ শুনিয়াই হোক যাহাব বস, ভাব, অর্থ, তাৎপর্য্য কিছুই গ্রহণ করিতে বাধী থাকেনা, বর্ণিত বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্র হৃদয় প্রাতিফলিত হয়, তাহাব নাম শ্রব্য, যমন বামা-যণ, বসুবংশ ইত্যাদি । কেবল পাঠ করিয়া বা পাঠ শুনিয়া যাহাব মর্ম্ম সম্পূর্ণ বুঝিতে পায়া যায় না, যাহাতে বর্ণিত বিষয়ের চিত্র জন্মযে অঙ্কিত কবিবাব নিমিত্ত দৃষ্টির সাহায্য আবশ্যক কবে তাহাব নাম দৃশ্য । দৃশ্যের আর একটি নাম অতিনেয় অভিনয় ব্যতীত যাহাব সম্যক্ মনোদৃষ্টি হব না তাহাকে অতিনেয় বলে । অভিনয় শব্দে অবস্থাব অঙ্গকরণ ।

এক্ষণে অভিনয় শব্দটিকে ভাল করে বুঝাইবার জন্য আর একটু অগ্রসব হইতে হইল । পণ্ডিতেরা বলেন শুকুমার মতি বালক দিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ লাভের উপায় বিষয়ে অভিজ্ঞ কবাই কাব্যের উদ্দেশ্য । কাব্য অতি সুললিত ও সরস বাক্যে আমাদের জন্ম আশ্রয় করত জগতের ভাল মন্দ এই উভয় দিকই চক্ষুর উপর চিত্রিত করিয়া সুপথ আশ্রয় করিতে এবং কুপথ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় । কাজেই কেবল শ্রব্য কাব্যের দ্বারা সকল সময় ফল সিদ্ধি সম্ভাবনা না হওয়ায় দৃশ্য কাব্যের আবিশ্যক হইয়াছে । জগতের সকল দিক্ স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করানই ইহার প্রধান কার্য্য । জগত বিচিত্র, ভেদ সঙ্কুল । অবস্থাভেদ, চরিত্রভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ, জ্ঞানভেদ, কার্য্যভেদ, ক্রটিভেদ, শিক্ষাভেদ, অধিকারভেদ, আকারভেদ, প্রকারভেদ, কত বলি, অনন্তভেদে পরিপূর্ণ । রাজা, প্রজা, প্রভু, ভৃত্য, ধনী, দরিদ্র, বলবান, দুর্বল, চোব, সাধু; পুণ্যবান, পাপী ;

* দিগত এই মাঘ বৃধবার ত্রীতীর্থে পঞ্চমীর দিবস সারস্বত মহোৎসব উপলক্ষে ভট্টপন্নীহ সংস্কৃত বাবসারী ছাত্রগণ মুচ্ছকটিক নাম গ্রন্থিদ্ধ সংস্কৃত প্রকরণের অভিনয় করিয়া রঙ্গস্থল দর্শক বৃন্দের পরম ভূক্তি উৎপাদন করে । প্রস্তাব লেখকও সেই সময় সেইক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হবেন । সেই উৎসাহের বিকাশমাত্র কতকগুলি প্রবন্ধাকারে বিতায় প্রকাশিত করিবার সমর্থ ।

সবল, খল, উদার, বঞ্চক ; দাতা, কুপণ ; উপকারী, অপকারী ; বিষয়ী, বিবাহী ; সংসারী, সন্ন্যাসী ; ভাগ্যবান্ অভাগা , সুখী, দুঃখী , দয়ালু, নিষ্ঠুর, বদ্ধ, বৈবী , অর্থী, প্রত্যর্থী, বিদ্রাবক, অভিযুক্ত , প্রেমী , অপ্রেমী , পিতা, পুত্র , স্বামী, স্ত্রী ; সতী, অসতী , কুলবধু, বেগমী , সুচরিত্র, লম্পট , শণ্ডিত, মূৰ্খ , জ্ঞানী , অজ্ঞানী , আশ্রিত , নাশ্রিত , প্রিয়ভাষী, হৃদয়, কেশ, বিক্রেতা, জেতা, পরাজিত ; উদ্বুদ্ধ, বদ্ধ , সুখী, উদ্বৃত্ত , স্থির, চঞ্চল , দুঃখ, দীর্ঘস্থায়ী এই রূপ অনন্ত প্রকার লোক লইয়াই জগত । এই অনন্ত লোকের অনন্ত কার্য, সেই অনন্ত কার্যের আবাব ফলও অনন্ত । এই জগ-
তেব সকল দিক স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ কবা-
ইতে হইলে এই অনন্ত প্রকার লোকের
স্বরূপ কার্য ও কার্যামুসাবে ফললাভ এই
কবটি জীবন্ত রূপে প্রত্যক্ষ করাইতে হয় ।
রাজার প্রত্যক্ষ করাইতে হইলে রাজভো-
গামুগত—শারীরিক—স্বত্বীকতা, পরিচ্ছদ,
পরিবার, অঙ্গস্থান, বাক্যস্থান, প্রভাব, গাভীর্য
ইত্যাদি যাহা রাজার থাকে আবশ্যিক তা
সকলেই ঠিক ঠিক দেখাইতে হইবে, এইরূপ
ধনী, দরিদ্র, প্রভু, ভূত্য যখন যাহাকে দেখা-
ইবে তখন তাহাকে সেই রূপে অবিকলই
দেখাইতে হইবে, এই অবিকল দেখানব নামই
অভিনয় । পণ্ডিতের মোটামুটি অভিনয়কে
চার প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেন, শারীরিক,
মানসিক, বাচিক এবং আহার্য অর্থাৎ বৈশিক ।
যে কাব্য এই চার প্রকার অভিনয় দ্বারা জগ-
তেব স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইবা সৎ ও অসৎ
বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে তাহার নামই

দৃশ্যকাব্য ।
দৃশ্য কাব্যের আব একটি নাম রূপক,
রূপক শব্দের অর্থ বাহ্য এক ব্যক্তিকে
অন্যরূপে দেখা, নটকে রাজা, প্রজা, প্রভু,
ভূত্য ইত্যাদি রূপে দেখায় । নাটক বিশেষে
এস বিশেষে, বিষয়বিশেষে, রচনার রীতি-
বিশেষে আবাব দৃশ্য কাব্যের বিশেষ বিশেষ
সংজ্ঞা লক্ষিত হয় । যথা নাটক, প্রেরণ
ভাণ, ব্যাঘোণ, সমবকার ডিম, ইহামুগ,
অঙ্ক, বীথি, প্রহসন, নাটিকা, ত্রোটক'
গোষ্ঠী, সটক, নাটারাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য,
কাব্য, প্রেক্ষণ, বাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত,
শিল্পক, বিলাসিকা, হৃদয়লিকা, প্রেরণী,
হল্লীশ, এবং ভাণিকা । এই আটাইশটির
মধ্যে প্রথম দশটি রূপক এবং অবশিষ্ট
আঠাবটি উপরূপক নামে প্রসিদ্ধ । এই
রূপক ও উপরূপক ভেদের প্রতি কোন
বিশেষ কষ্ট নির্দেশ কবা হয় নাই । তবে
বোধ হয় যে অগ্রে প্রথমে দশটি মাত্র আবি-
ষ্কৃত হওয়ায় উহাবাই রূপক নামে প্রচলিত
হয় । তাহার পর পরবর্তী আচার্যগণ যাহা
আবিষ্কৃত করেন তাহাদিগকে উপরূপক
নামে অভিহিত করা হয় ।

এখন বলি মুচ্ছকটিক জিনিষটা কি ?
মুচ্ছকটিক একখানি দৃশ্য কাব্য প্রেরণ,
নাটক নয় । নাটক নয় প্রেরণ বাঙ্গালী
পাঠক দিগের পক্ষে অথবা কেবল বাঙ্গালী
পাঠক কেন ইংবাজী নবিশ দিগের পক্ষেও
একটা গোলার কথা বটে ; কারণ বাঙ্গালার
কুলীন কুলসর্বস্বও নাটক, নীলদর্পণও নাটক
নীলাবতীও নাটক বিশ্বমঙ্গলও নাটক, ইংরা-
জীতেও এরূপ টেম্পেইও নাটক, হামলেটও

নাটক, ম্যাকবেথও নাটক, কেটোও নাটক, মারকেন্ট অব বিনিসও নাটক। কলকথা ইংরাজ প্রেসাদাৎ বঙ্গে বর্তমান রঙ্গ ভূমির আবির্ভাব। ইংরাজীতে যেমন নাটক ও প্রহসন ভিন্ন আর কথা নাই বাঙ্গালাতে ও তাই ঘটনাছে প্রহসন ছাড়া যা কিছু সবই নাটক। কিন্তু সংস্কৃতের নাটক একটি ভিন্ন পদার্থ, কেবল পদার্থ ভিন্ন নয়, ইহাতে একটু বিশেষ মহৎ ও গৌরবও আছে। রামা, শ্যামা, যার ইচ্ছা তাব কথা লইয়া নাটক হয় না। নাটকের বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, সে নিয়মগুলি এই—

১। যাব খুশি তাব গল্প লইয়া নাটক রচনা হইবে না। কোন পুরাণ বা ইতিহাস মূলক ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিতে হইবে।

২। নাটকের নাযক বাম্য। শ্যামা যে ইচ্ছা সে হইতে পারিবে না। প্রখ্যাত বংশীয় ধীবোদাস্ত লক্ষণাঙ্কিত ওণীবান্ রাক্ষসি, কোন স্বর্গীয় পুরুষ বা তাঁহার অবতার এতস্তিন্ন আব কাহাকে নাটকেব নাযক করা যাইতে পারিবে না।

৩। নাটকে শৃঙ্গার বা বীর এই দুই এর মধ্যে একটি মাত্র বস প্রধান থাকিবে। অন্য রস অপ্রধান থাকিবে কিন্তু নানাবিধ রস থাকা আবশ্যিক।

৪। নাটকে পাঁচের কম এবং দশের অধিক অঙ্ক করিতে পারা যাইবে না। ইহাতে স্তম্ভ স্তম্ভেব উদ্দীপক ঘটনা সকল বর্ণিত হইবে।

এই কয়টি নিয়মই নাটকের নাটক্য কটিক প্রকরণ।

সম্পাদক এইগুলি সর্বত্রোভাবে প্রতিপালন করিয়া নাটক রচনা করিতে হইবে। এবং কোন দৃশ্য কাব্য নাটক কি না? ইংরাজীতে বিচার করিতে হইলে এইগুলি ধরিয়া বিচার করিতে হইবে।

মৃচ্ছকটিক নাটক নয়, কাবণ ইহার নাযক চারুদত্ত বাণিজ্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বংশীয়। ইহার ইতিবৃত্তও কোন পুরাণ বা ইতিহাস মূলক নহে। কায়েই ইহাতে নাটকের লক্ষণ যাইতেছে না ইহা নাটক নয়, তবে কি? প্রকরণ, কেন না প্রকরণ কবিকল্পিতলৌকিক বৃত্তকে আশ্রয় করিয়া রচিত হয়। ইহাতে এক মাত্র শৃঙ্গার রসেরই প্রধান্য থাকে, ধীর প্রশান্ত লক্ষণাঙ্কিত ব্রাহ্মণ অমাত্য অথবা বণিক এইতিনের অন্যতম ইহাব নাযক হওয়া চাই। নাযকের ধর্ম ও অর্পেব অবনতিও ইচ্ছার ব্যাঘাত ঘটনা থাকে। নাযিকা কুলজাই হোক বেশ্যাই হোক অথবা উভয়ই হইতে পারে। ইহাতে ধূর্তর, জুয়াচোব বিট ও চেটেব চরিত্র বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখ মৃচ্ছকটিকেব গল্প, কবিকল্পিত লোক রহস্য মাত্র, নাযক বাণিজ্য ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ, ধীর প্রশান্তলক্ষণাঙ্কিত চারুদত্ত। ইহাতে শৃঙ্গার বসেবই প্রধান্য। নারিকা চারুদত্তেব পূর্বে বিবাহিত স্ত্রী কুলজা হুতা দেবী এবং নবান্নবস্ত্র গণিকা বসন্তসেনা। আর ইহাতে ধূর্ত শকার, দাতকর মাথুর প্রভৃতি, বিট ও চেট প্রভৃতির চরিত্র ও বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অন্যই বলিতেছি মৃচ্ছকটিক প্রকরণ।

শ্রীহরীকেশ শাস্ত্রী।

লক্ষ্মী ও ইহার ভগ্নাবশেষ।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর ।)

আসাকুদৌলা মৃত্যুশয্যায স্বপুত্র উজীর আলিকে উত্তরাধিকারী নির্দেশ কবিয়া যান। উজীর আলি তাঁহার প্রধান বেগমের পুত্র ছিলেন না। একত্র তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যে মহাগোলযোগ উঠিল। তথাপি উজীর আলিই সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। ইংরাজ কোম্পানিও প্রথমতঃ ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু পরে তাঁহাদের রাজ্যালিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিল। অর্থ-লোভে ন্যায্যপরিমাণের মূল্যে কুঠারঘাত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। গভর্ণর জেনারেল সাব জন শোর স্বয়ং লক্ষ্মীয়ে উপস্থিত হইয়া উজীর আলিকে পদচ্যুত করিলেন ও সাদত আলির সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

সাদত আলি আসাকুদৌলার বৈমত্রেয় ভ্রাতা। ইনিই উজীর আলির সিংহাসন-রোহণের পথে প্রধান কণ্টক স্বরূপ ছিলেন। বারানসি ইহার আদিম বাসস্থান। সাদত আলি সার জন শোরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে 'বুঝাইবা' দেন যে যদি কোম্পানির সাহায্যে তিনি অযোধ্যার নবাব উজীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন তাহাহইলে ইংরাজের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবেন। লাভের সাধার মুগ্ধ হইয়া গভর্ণর জেনারেল অবশেষে ইহারই সহিত সন্ধি বন্ধ হইতে প্রতিজ্ঞত

হইলেন। সাদত আলির মন্ত্রণাবলে আসাকুদৌলার উজীর আলির সহিত ঘনিষ্ট বন্ধুস্বন্ধ সম্প্রহজনক প্রমাণ হইল। এবং উজীর আলি চিরদিনের জন্য অযোধ্যার রাজত্ব হারাইলেন।

নবাবদিগের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্রমান্বয়ে যে সকল সন্ধি স্থাপিত হয় তাহাতে চুণার বারানসী, গাজীপুর ও কানপুর অযোধ্যা রাজ্যচ্যুত হয়। এতদ্বিন্ন ঐ রাজ্য যে ব্রিটিশ সৈন্য রক্ষিত হইতে থাকে তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ নবাবসবকার হইতে প্রতি বৎসর ৫৫ লক্ষ টাকা নির্ধারিত ছিল। এক্ষণে সন্ন্যাস আলির সহিত নূতন সন্ধিতে ঐ টাকা ৭৬ লক্ষে পরিণত হইল ও এলাহাবাদ নগর কোম্পানির স্বাধীনে আসিল।

সাদত আলি ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে নবাব উজীর পদে অভিষিক্ত হন। ইনি অযোধ্যার সর্বাধিপতি বিজ্ঞ, ধার্মিক ও সুবিচারক নরপতি বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে ইনি যৌবনের প্রারম্ভে অতিশয় লম্পট ও অসদাচারি ছিলেন। একদা কোন ধরগার পশমন করিয়া ইহার আচার ব্যবহার হটাই পরিবর্তিত হয়। পরে সাদত আলি এরূপ মিথব্য্য হইয়াছিলেন যে অনেক আসাকুদৌলার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে ক্রপণ বলিয়া স্থগা করিত। তাঁহার পূর্বাধি-

কারী যেকপ লক্ষ্যের পশ্চিম দিক নির্মাণ করিয়া যান ইনি উহার পূর্বাদিক সেইরূপ নির্মাণ করেন। দেশরবাগ ও দিলখুসার মধ্যবর্তী অট্টালিকা গুলি প্রায় সমস্তই ইহার নির্মিত। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হইল।

দিলখুসা উপবনবাটী লামাটিনিষবেব প্রায় অর্ধ মাইল পূর্বে উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত। সাদত আলি সময়ে সময়ে এই স্থানে শীকারার্থ আসিতেন; ও তন্নিকটস্থ তাঁহার আদেশে সন্নিহিত জঙ্গলে বহুসংখ্যক হুগ আবদ্ধ থাকিত। বেগমগণ ও কখন কখন আগ্রহ পূর্বক দিলখুসায় আসিয়া বাস করিতেন। সিপাহি যুদ্ধের সময় প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন ক্যাশেল লক্ষ্যে উদ্ধারার্থ আসিয়া সর্ব প্রথমে এই অট্টালিকা অধিকার করেন; ও কিছুদিনের জন্য এই স্থানেই তাঁহার সেনা সন্নিবেশিত।

দিলখুসা অতিক্রম করিয়া, পশ্চিমমুখে গমন করিলে এই নবাবের নির্মিত হিয়াথু মজ কুঠী কক্ষবোয়ালি কুঠী ছববজ কুঠী, আদসামঞ্জিল, চিনিবাজাব, ও টেড়িকুঠী ক্রমান্বয়ে দৃষ্ট হয়। ইহাদের একপ বিশেষ শিল্প প্যাবিপাট্য নাই যে এখনও দর্শনীয় বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু তথাপি ঘটন্য ক্রমে ইহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসে ইহাদের প্রত্যেকের নাম রক্তাক্তরে লিখিত হইয়াছে।

হিয়াপূবজ কুঠী নবাব দিগের শালন স্থানে চিকিৎসালয় ছিল। পরে ইহা চিকিৎসালয়ের আবাসস্থান হয়। এই

স্থলেই ইংরাজ কুল কলঙ্ক নরহত্যা মেজর হডসন বিদ্রোহি দিগের হস্তে পঞ্চদ প্রাপ্ত হন। দিল্লী অধিকার কালে এই মহান্যায়ী দিল্লীস্থবেব নিবস্ত্র পুত্রদিগকে স্বহস্তে গুলি করিয়া পৌরুষ দেখাটয়া ছিলেন। পার্শ্ববিচারে দোষ মুক্ত হইয়াও নৃশংস ইংরাজ তদপেক্ষা মহত্তর বিচারে অবশেষে অব্যাহতি পাইল না। বেগম কুঠীতে অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া অনেক বিদ্রোহী সিপাহী প্রাণ ত্যাগ করে। টেড়ি কুঠীতে সাদত আলির রাজকার্য সম্পন্ন হইত। অবশিষ্ট কুঠীগুলি প্রায় উৎখাত পুত্রদের বাস বাটী ছিল।

গোমতীর তীরে মতিমহল নামে তিনটি স্বতন্ত্র অট্টালিকা এখনও দেখা যায়। পশ্চিমস্থ যেটি লোহিত বর্ণে বঞ্জিত সেইটিই প্রকৃত মতিমহল। পূর্বে ইহার শিখরদেশে মুক্তার আকাব সদৃশ একটি গহ্বজ ছিল ও তদনুসারে অট্টালিকার নামকরণ হয়। বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পর্যটক দেখিতে পাইবেন ভিতবেব ছাদে কাঠের সুন্দর কারুকার্য এখনও অটুট অবস্থায় রহিয়াছে। মতিমহলের অবশিষ্ট অংশ সাদত আলিব পুত্রের নির্মিত।

মতিমহলের কিয়দূর পশ্চিমে নদীতটে ফব্হদ বজ (অর্থাৎ আনন্দ দায়ক) প্রাসাদ সাদত আলিব রাজত্ব কাল হইতে কেন্দ্র বাগ নির্মাণ পর্যন্ত ইহাই লক্ষ্যের রাজ প্রাসাদ ছিল। জেনারেল মার্টিন ইহার নদীতীরস্থ অংশ প্রকৃত করিয়া নবাবের নিকট বিক্রয় করেন। উহার অবশিষ্ট ভাগ ও প্রসিদ্ধ সিংহাসন কক্ষ (খসকল্ স্থলতান) সাদত আলিব নির্মিত। সিংহাসনপুত্রের

অপব নাম 'লাল বার দোরারি।' নবাব-দিগেব শাসন সময়ে এইস্থলে দরবার বসিত । প্রত্যেক রাজাব রাজ্যাভিষেকের সময় বৃটিশ রেসিডেন্ট তাঁহাকে লইয়া প্রথমে এই কক্ষে উপবেশন করাইতেন ও উপচৌকন প্রদান করিতেন ।

সিপাহিযুদ্ধের পব ভাবতবর্ষের যে সকল স্থান ইংবাজের ইতিহাসে চিবন্যবলীয হইয়াছে তন্মধ্যে লক্ষ্মীয়েব 'রেসিডেন্সি' একটি প্রধান । যখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে খেত : 'আবাল বুদ্ধবনিতার শোণিতে বিদ্রোহেব প্রচণ্ড স্রোত বহিতেছিল, যখন আকবরের বংশধব আবার 'জগদীশ্ববো বা' নামে দিল্লীব সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, যখন দুর্দান্ত নানাব বিশ্বাসঘাতকতায জেনাবেল হুযিলবেব সৈন্ত দল একে একে জাহ্নুবীর অতলতলে শায়িত হইল তৎকালে কেবল এই রেসিডেন্সিতে অজুত বীর্য বলে ও অপরিসীম সাহসিকতা প্রভাবে ইংরাজ স্বকীয় গোঁবব কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন ।

আসাকুর্দৌলার রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদ দৌলত খানার এক ভাগেই বৃটিশ বেলিডেন্টের বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল । পুরে সাদত আলি ফরহুদ বক্স প্রাসাদে গমন করিয়া নিকটেই রেসিডেন্সি স্থাপনের নিমিত্ত উক্ত অট্টালিকা নির্মাণ করেন । পূর্বে সৈন্যাদি এখানে কিছুই থাকিত না । কর্ণেল বেলিডেন্সিডেন্ট পদ প্রাপ্ত হইলে সাদত আলি তাঁহার সন্মানার্থে এক দল সৈন্য এই স্থানে সন্নিবেশিত করেন ; ও তাহাদের অন্য রেসিডেন্সির দ্বারদেশে একটি বাসস্থান নির্মিত হয় । এই কারণ বশত রেসিডেন্সির দ্বার

ও তদন্তর্গত ভূমি এবং বাটী সমূহ 'বেলিগার্ড' নামে খ্যাত ছিল । এই নামেই সিপাহিযুদ্ধের পর অগদিখ্যাত হইয়াছে ।

যেস্থান অদ্যাপি বেলিগার্ড নামে পরিচিত তথায় এক্ষণে পূর্নস্থিত অট্টালিকাগুলিব চিত্রমাত্র ও নাই বলিলে অত্যাক্তি হয় না । কোথাও বা একখণ্ড ভগ্ন দেয়াল এক সুপ্রশস্ত দ্বিতল অট্টালিকার পরিবর্তে দণ্ডায়মান আছে । কোথাও বা কয়েকখানি শৈবালাচ্ছন্ন পুঁবাতন ইষ্টক কোন মনোরম বাঙ্গালার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে । কোথাও বা তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপব একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্মিত নূতন স্তম্ভ ভূতপূর্বে ডাকঘরের স্থান নির্দেশের জন্য স্থাপিত হইয়াছে । যে কয়েকটি অদ্যাপিও গৃহেব আকার ধারণ করিয়া আছে তাহা দেব ও অবস্থা অতীব শোচনীয় । তন্মধ্যে রেসিডেন্সিও বেগমকুঠি, নাচঘর, ডাক্তার ফেরারের বাটী, প্রকৃত বেলিগার্ড কুঠী, ইত্যাদি কয়েকটি প্রধান । দেয়ালগুলি জর্জরিত অবস্থায বিদ্রোহীদিগের অসংখ্য গোলাগুলির চিত্র এখনও ধারণ করিতেছে । এক্রপ স্মৃচাক্র রূপে ভগ্নাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে যে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন দুই চারি দিন পূর্বে এই অট্টালিকাগুলির উপর গোলাগুলির স্রোত বহিয়া গিয়াছে । যেখানে কামানের অগ্নিময় গোলা প্রাচীর ভেদ করিয়াছিল সেখানে এক একটি প্রশস্ত গম্বব হইয়াছে ; ও অগণ্য বন্দুকের গুলির আঘাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র সমূহে পরিণত হইয়াছে । জনৈক বঙ্গীয় কবি বেলিগার্ড দর্শন করিয়া গাহিয়াছিলেনঃ—

“ভগ্ন অট্টালিকা গুলি, শোচনীয় ধ্বংস তুলি’
দাঁড়াইবে শ্রীহীন দশায়,
কা’রো গেছে ছাদপড়ি, খসিয়াছে কা’বো কাড়ি
হেলিয়ে র’য়েছে চির, কা’বো কাষ।
প্রাচীর হ’য়েছে চির, কাহাবো ভেঙেছে শির,
আঁখি নীর ঝবে হেবি’ তা’য়;
কারুণ্য-কৃত কারু দেখিলাম নাহি কারু,
সবি কাল আসিয়াছে, হায়।”

গৃহগুলির অভ্যন্তরে দশা অধিকতর
শোচনীয়। সর্বধ্বংসী সময় এখনও কোন
কোন স্থানের শোণিত চিহ্ন নষ্ট কবিত্তে
সমর্থ হয় নাই। অববোধকালে যাহাব
স্থানে বাসস্থান ছিল, প্রধান প্রধান
সেনাপতি যথায় হত হইয়াছেন সে সমস্তই
কুজ কুজ খেতমর্ধবে স্থানে স্থানে লিখিত
রহিয়াছে। বেসিডেন্সি যে কক্ষে কর্নেল
পামরের রূপগুণযুতা উনবিংশবর্ষীয়া কন্যা
গুলির আঘাতে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন,
পর্যটক সেট স্থানে তাঁহার নাম প্রস্তবে
খোদিত দেখিতে পাইবেন। যিনি সিপাহি-
সমবে ব্রিটিশ বীরগণের অগ্রগণ্য ছিলেন,
বাঁহা দয়া ও মহামুত্তবতা সেই ভীষণ
তুর্কিনেও প্রকাশিত হইয়াছিল, যিনি বিদ্রোহী
নরহত্যা বন্দীগণের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপত্র
স্বাক্ষর করিতেও বীর্যবাস ত্যাগ করিতেন
সেই মহামাজ সেনাপতি সার’হেনরী লরে-
ন্সের বৃত্তান্তান ভাস্কর ফেরাবের গৃহে
এখনও নির্দিষ্ট রহিয়াছে। বাঁহায়া খেত-
কার দিগের রক্ষার্থে বেলিগার্ডের দ্বারদেশে
অবাধে স্ব স্ব প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন
সেই সকল হিন্দু সেনাপতিগণের নামও
বৃহৎ একটি খেত প্রস্তরে খোদিত আছে।

তাঁহাদের স্মরণার্থ বহির্ভাগে একটি স্তম্ভও
লড’ মর্ফ্রকের শাসন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হই-
য়াছে। রেসিডেন্সি কুটার উচ্চ স্তম্ভের
ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।
উপরে যেস্থান হইতে মচ্ছিবন ও আলম
বাগে সঙ্কেত গমনাগমন কবিত্ত সেখানে
একখণ্ড কাঠ প্রোথিত হইয়াছে। নীচে
সুবিখ্যাত, ‘তথ খান’ অর্থাৎ মৃত্তিকার অভ্য-
ন্তরে ঘব। ইহারা প্রায় পূর্ব অবস্থাতেই
বর্তমান বৈ। ক্ষুণ্ণ অতি সুশ্রবস্ত ও উচ্চ।
উর্দ্ধে অলৌকিক প্রবেশের অনেকগুলি কাচে
বক্ষিত সুন্দর পথও পূর্বে ছিল। এই সকল
গৃহে প্রায়ের প্রচণ্ড উত্তাপে পীড়িত
হইয়া শীত প্রধান দেশীয় ইউরোপীয়
গণ সচবাচর আশ্রয় লইতেন। বিবয় বিগ্ন-
বের সময় দগ্ন ইংবাজ রমণী, ও শিশু সন্তান
ইহাদের অভ্যন্তরেই বক্ষা পাইয়াছিলেন।

বেসিডেন্সি বাটীর সংলগ্ন পুষ্প বৃক্ষাদি
শোভিত মৃগয স্তূপের উপর সব হেনরী
লাবল্লেব কবব। দুই চারিপদ অতিক্রম
কবিলেই ভূতপূর্ব নাচঘব এখানে খেতমর্ধ-
বেব একটি ভগ্ন কৃত্রিম প্রস্তবণ এখনও দৃষ্ট
হব। সিপাহি যুদ্ধের সময় নাচঘর চিকিৎ-
সালঘে পরিণত হইয়াছিল।

সিপাহি যুদ্ধের এই সুপ্রসিদ্ধ রত্নভূমি
বর্ণন করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ
লিখিতে হয়। আমাদের স্থান সংকীর্ণ।
যুদ্ধের পূর্বে যে কয়েকটি প্রধান অট্টালিকা
বেলিগার্ডের অস্তবস্তী ছিল, নিম্নে কেবল
তাঁহাদের নাম নির্দেশ করিয়াই আমরা কাক্স
থাকিব;—

রেসিডেন্সি, নাচঘর, বেলিগার্ড কটক,

শওসকুঠী, সেগোরবাটি, অর্ধনগ, * এগোরনন, ভুপ্রাট, মাটিনিব, † ডাকঘর, চিকিৎসালয়, ভাস্তাব কেরাবের বাটী, বেগমকুঠী, শিখ-কোয়ার, গ্রাণ্ট, গবিন্স, ওমানি, ইনেস, রিডান, পণ্ড বাখিবার গৃহ, জবাই গৃহ, গির্জা ও খুগেডম্‌স্‌।

* বাটিগুলি যে যে সেনাপতি কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল ও উহাদিগের কোন স্বতন্ত্র নাম না থাকায় তাহাদের পরিবর্তে সৈন্যাব্যক্তিগের নামই নির্দেশ করা গেল।

† এই স্থানে মাটি'নির বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ আশ্রয় লইয়াছিল।

‡ নিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসে অনেকেরই স্বপ্ন থাকিতে পারে যে লক্ষ্মী উদ্ধাবকালে এই বাটীতে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। যে রাত্রে সাবকলিন ক্যাম্পেল অবকল্প ইংরাজদিগকে বেসিডেন্সি তাগ কবিনা দিলখুসাব আশ্রয় লইতে আদেশ দিলেন সেই রজনীতে বাপ্তেন ও বাটারমান নানক জনৈক সেনাপতি এই অট্টালিকার কোন নিভৃত কক্ষে নিদ্রাভঙ্গ অভিজ্ঞ ছিলেন। যখন সকলে গমনার্থ প্রস্তুত হইল তখন ভুল ক্রমে তাঁহার নাম মাত্রও উল্লিখিত হইল না। রাত্রি দুই ঘটাবার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার হৃদযন্ত্র ৯ইল যে তিনি একাকী পঞ্চাশ সহস্র শত্রে বেষ্টিত আছেন। অতঃপর বিস্ময় না করিয়া তিনি উরুধামে দৌড়িলেন; ও লামাটিনিবরের নিকট স্বজাতৃগণ সহ মিলিত হইলেন।

এইরূপ আর একটি ঘটনা মজ্জিভবন হুর্গ অবরোধের সময় ঘটয়াছিল। লক্ষ্মীয়ে বিদ্রোহি প্রস্থলিত হইবার পূর্বে সার হেনরি লরেন্স এই হুর্গ ও বেসিডেন্সি উভয় স্থানেই রক্ষা করিতে বন্দহ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যুদ্ধ আরম্ভ হও-রায় এই স্থানে বিশেষ আশঙ্কা করিয়া মজ্জিভবন পরিত্যাগ করিয়া ও বেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। আশিয়ার সময় উক্ত হুর্গ

বেলিগার্ডের পার্শ্বেই কবর স্থান। এস্থানটি সুবন্দ্য উদ্যানে পরিবৃত্ত। কবরসমূহের উপর খোদিত লেখাগুলি পাঠ করিলে পাবাণ হৃদয়ও দ্রব হয়। এই স্থানেই জেনারেল নীল, মেজর ব্যাংকস ও আর আর অনেক উক্ত সাময়িক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা চিব নিদ্রায় শায়িত আছেন।

১৮১৭ খৃ অক্টোবর মাসে আলি খাঁর মৃত্যু হয়। পূর্বে লিখিত হইয়াছে তাঁহার বুটিশ কোম্পানির সহিত সন্ধিতে অশোধ্য রাজ্য ক্রয় করিয়া গ্রহণ হইয়াছিল। তথাপি ইহাতে ও সাগত আলি নিস্তার পান নাই। মার-কুইস্ অব ওয়েলস্‌লির শাসন সময়ে আরও দুইদল বুটিশ সৈন্য লক্ষ্মীয়ে প্রেরিত হয়, ও তাহাদের ব্যয় নির্বাহার্থে সাদত আলি স্ববাজ্যের অর্ধাংশের ও অধিক কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তিনি

ভূমিস্বা করিয়া দিতে বলেন। তদনুসারে বুটিশ সৈন্য নিরুপিত সৈন্যের রজনীতে মজ্জিভবন হইতে নির্গত হইবা বাকদ ও অগ্নি সহকারে হুর্গ ভস্ম করিয়া দেব। তৎকালে কেবল মাত্র একজন ইং-রাজ সৈনিক মদ্যপান করিয়া অজ্ঞানবস্থায় হুর্গের কোন কক্ষে পতিত ছিল। বাকদের তেজে গৃহ-গুলি ঘেরাপ চূর্ণবিচূর্ণ হইবা আকাশে উটল, সেও তদ্রূপ উর্ধ্বে উঠিয়া ক্ষণকালে ভূয়ে প্রক্ষিপ্ত হইল। তথাপি তাহার যৌরভব নিদ্রার কিঞ্চিৎমাত্র ব্যা-ধি ক্রম ঘটিল না। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সৈন্যসমূহের দেখিল উর্ধ্বে গৃহের কড়িকাঠের পক্ষি-বর্গে আকাশ এবং নীচে শরীর পরিবর্তে ইষ্টক-রাশি। পরে সমস্ত ব্যাপার বোধগম্য হইলে সে গাত্রোধান করিয়া অক্ষত শরীরে বেসিডেন্সিতে পৌঁছাইল, ও তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার হৃদয়বর্গ যথোচিত ক্রম পড়িয়া গেল।

পর লোক গত হইলে রাজ্য শাসন তাঁর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গাজিউদ্দিন হায়দরের উপর ন্যস্ত হইল। ইনিও কয়েকবার কোম্পানিকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন। নেপাল যুদ্ধের সময় লক্ষ্যেয়ের কোষাগার হইতে প্রায় দুই কোটি টাকা প্রদত্ত হয়। ১৮২২খৃ অব্দে গাজিউদ্দিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে পুরুষানুক্রমে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই অবধি নবাব উজীব নাম লুপ্ত হয়।

গাজিউদ্দিন 'নজফ আশাবাক' নামে স্বকীয় কবর প্রস্তুত করেন। ইহাকে সচবাচর 'শা নজফ' বলে। 'নজফ নামক' পর্কতে মুসলমান ধর্ম প্রচাবক মহম্মদেব জামাতা আলির কবর আছে। উহাব অনুকরণে গাজিউদ্দিনের কবর নির্মিত হয়, এবং সেই জন্যই ইহাব ঐক্যপ নাম হইয়াছে। শা নজফের গঠন সাধারণ মসজিদের ন্যায় নহে। উচ্চ সিংহাসন পথে প্রবেশ করিয়া পর্য্যটক দেখিতে পাইবেন যে মসজিদেব সম্মুখে বা পার্শ্বে ছাব নাই। প্রবেশ পথ পশ্চাতে উর্কে গোলখিলানের উপর এক অত্যুচ্চ গম্বুজ ছাদ স্বরূপ রহিয়াছে। ভূমিতল খেত ও কৃষ্ণ মর্যেরে আচ্ছাদিত। মধ্যস্থলে নবাবের কবর। গাজিউদ্দিন বংশ পরম্পরায় এইস্থানের গৌরব রাখিবাব জন্য অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তজ্জন্য এখনও এখানে অনেক গৃহ সজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। দেয়ালে লক্ষ্যেয়ের বিখ্যাত শিল্পকবিদিগের অঙ্কিত নবাবগণের অনেক ভুলি স্মরণ চিত্র আছে। লক্ষ্যে উদ্ধার কালে এইস্থানে বিজ্রোহিদিগের

সহিত সার কোলিন ক্যাম্বেলের ঘোরতর যুদ্ধ হয়।

শা নজফের নিকটেই গাজিউদ্দিনের নির্মিত 'কদম রসুল' মসজিদ। কোমফকীব আবব দেশ হইতে মহম্মদের পদচিহ্ন অঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর আনয়ন করেন। তাহা অতি যত্ন সহকায়ে এই স্থলে বস্কিত হয়। বিজ্রোহকালে এই প্রস্তর এস্থান হইতে অপসৃত হইয়াছিল। কে লইয়া যার তাহাব কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মতিমহলেব অন্তর্বর্তী 'মোবারক মজিল' ও শা মজিল গাজিউদ্দিনের আজ্ঞাব প্রস্তুত হয়। শেখোক্তা বন্য হিংস্র জন্তুদিগের যুদ্ধ ভূমি ছিল। কিন্তু নবাবেরা বিপদ আশঙ্কা করিয়া হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ স্থাপদেব যুদ্ধ এস্থানে হইতে দিতেন না। গোমতীর পরপারে উহার বঙ্গভূমি নির্দিষ্ট ছিল। নবাব অমাত্যবর্গে বেষ্টিত হইয়া শা মজিলেব বারেণ্ডা হইতে ঐ যুদ্ধ অবলোকন করিতেন।

কেসববাগ ও চিনিবাজারের মধ্যবর্তী প্রদেশে ও আধুনিক ক্যাম্বিং কলেজের সমীপে দুইটা মসজিদাকার বৃহৎ অট্টালিকা এখনও বর্তমান আছে। গাজিউদ্দীন এত ভূত্ব কবর নির্মাণ করাইয়া স্বজাতি মধ্যে অসাধারণ পিতৃ মাতৃ ভক্তিব পরিচয় দিয়া ছিলেন। প্রথমটা তাঁহার পিতা সাদত আলির ও দ্বিতীয়টা তাঁহার মাতা মুরশিদ জাদিব কবর। যে স্থানে এক্ষণে সাদত আলি শায়িত আছেন তাঁহার জীবদ্দশায় সেস্থানে তাঁহার পুত্র গাজিউদ্দিনের আবাস বাটী ছিল। কথিত আছে, গাজিউদ্দীন

পিতৃ সিংহাসনে আবেহণ করিয়া মনস্থ কবেন যে তিনি সেকপ তাঁহার পিতাব বাসস্থান অধিকার কবিলেন সেকপ তাঁহার পিতারও তাঁহার ভূত পূৰ্ব স্থান অধিকার কবা কর্তব্য। এবং তদনুসারে স্বকীয় পুৰাতন আলয়ভগ্ন কবিয়া তৎস্থানে তাঁহার পিতাব কবব নির্মাণ কবিতে আজ্ঞা দেন।

গোমতীর উপর এক্ষণে যে লৌহসেতু দৃষ্ট হয় তাহা গাজিউদ্দীনের আজ্ঞায় ঈলঙ হইতে আনীত কিন্তু উহা স্থাপন করিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। মহম্মদ আলি শার সময় উহাব নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

১৮২৭ খৃ অর্ধে গ. দউদ্দীনের মৃত্যু হইলে নসিরুদ্দীন হায পিতৃসিংহাসনে আবেহণ কবেন। ইতি তিশ্য ব্যসনা-সক্ত ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে ইনি বৎসবে ছয়মাস রাজকাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ কবিতেন ও অপব ছয়মাস কেবল অন্তঃপুৰ মধ্যে বাস কবিতেন। “ছত্রমঞ্জলি” ইহার প্রধান কাণ্ডি। বেগমদিগেব নিমিত্ত এই অপূৰ্ব ভট্টালিকা নিৰ্ম্মিত হয়। লক্ষ্মী-য়ের হৰ্ম্মবাজিব মধ্যে ইহাই সৰ্ব্বোচ্চ। গম্বুজের উপর যে সূর্যহং পিন্ডলেব ছত্র দেখা যায় পূৰ্বে উহা একপ ছিল না। উহাব পরিবর্তে সূর্যহং শোভা পাইত। শুনা যায় বৃটিশ গভৰ্ণমেণ্টেব আজ্ঞানুসাবে একপ পবি-বর্তন হইয়াছে। উক্ত ছত্ৰেব মিমিত্তই প্রাসাদের নাম ছত্রমঞ্জলি দেওয়া হইয়াছিল এক্ষণে এ বাটীতে অনেকগুলি গভৰ্ণমেণ্ট

কাৰ্যালয় আছে ; ও ইহাব নদীতীরস্থ অংশে ইংবাজদিগেব নানাবিধ সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে।

নসিরুদ্দীন হাযদেব ‘আবাওয়ালা কুঠি’ অর্থাৎ জ্যোতিষ আলোচনা স্থান স্থাপন কবেন। কর্ণেল উইলকিন্স নামে জৈনক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বেত্তার উপর ইহার নিৰ্ম্মাণভাব অৰ্পিত হইয়াছিল। ১৮৪৭ খৃঃ অর্ধে ওয়াজিদ আলি শাব রাজত্বকালে উক্ত ইংবাজেব মৃত্যু হইলে ইহার কাৰ্য্য স্থগিত হয়। তথাপি ইহাব বহুমূল্য যন্ত্ৰাদি সমস্তে বক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু সিপাহিযুদ্ধেব পর তাহাদেব আব কোন চিত্র পাওয়া গেল না। (অর্ধাধ্যাব বিদ্রোহে বিখ্যাত নেতা ফয়জাবাদবাসী আমেদ উল্লা শা ও তাহাব অম্ব-চববর্গ এইস্থানে বাস কবিত।)

বিলাতি বাগ নামক উদ্যান নসিরুদ্দীনেব আজ্ঞায় স্থাপিত হয়। ইহাতে নানাবিধ ইউরোপীয় বৃক্ষ বোপিত হইয়াছিল। বেগমগণ এখানে সৰ্পদা ভ্রমণ করিতে আসিতেন। ওয়াজিদ আলিব আজ্ঞায় এই উদ্যান উচ্চ প্রাচীবে বেষ্টিত হয়।

লক্ষ্মীয়ে এখন যে পবিখাব ভগ্নাবশেষ আছে, গম্বুজ হটতে জল আনয়ন উদ্দেশে উহা এত সময়েই খ্যাত হইয়াছিল ; কিন্তু নসিরুদ্দীন ইহাতে কৃতকাৰ্য্য হইতে পাবেন নাই।

কমশঃ

শ্রীবাজেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী ।

মুসলমানী বাঙ্গালা ।

(শুদ্ধ উজাল বিবীর কেচ্ছা)

বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ । মুসল-
মানের সংখ্যা হিন্দুব প্রায় আর্দ্ধেক । বাঙ্গা-
লার লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের শাসনাধীন দেশে
যত মুসলমান আছে সমস্ত তুর্কের সাম্রাজ্যে
তত আছে কিনা সন্দেহ । কিন্তু দুঃখের
মধ্যে হিন্দুবা মুসলমানদিগের বড় একটা
ধরার রাখেন না । এই সকল মুসলমানেরা কিন্তু
বাঙ্গালী । বাঙ্গালার উপর হিন্দুদিগের যত
টান, মুসলমানদিগের তদপেক্ষা কোন ও
মতেই কম নহে । অনেক মুসলমানলেখক
বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক
লিখিয়াছেন । মুসলমানেরা দুইতিনি খানি
বাঙ্গালা সংবাদ পত্র চালাইয়া থাকেন ।
তাহার বাঙ্গালা অন্যান্য বাঙ্গালা সংবাদ
পত্রের বাঙ্গালা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে ।
মীর মশারফ হোসেন “বিষাদ সিন্ধু” নামক
যে পুস্তক খানি রচনা কবিয়াছেন
তাহা বাঙ্গালার একখানি মহাবত্ত । উহার
মোহরম পর্বে ও উদ্ধার পর্বে পাঠ করিলে
মুসলমানের পরবর্তী মুসলমানগণের ইতিহাস
আচাৰ, ব্যবহার, শাসন প্রণালী ইত্যাদি সুন্দর
রূপে জানিতে পাবা যাব ও মুসলমানেরা
সেই সময়ে নব ধর্মের উত্তেজনার পড়িয়া
যে রূপ উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন তাহারও
কিয়দংশ পাঠকগণের মনে সংক্রামিত হয় ।
মীর মশারফ হোসেনের বসন্তকুমারী নাটকও
উৎকৃষ্ট বাঙ্গালার লিখিত ।

যে সকল মুসলমান লেখক এই সকল
বাঙ্গালা গ্রন্থ বা বাঙ্গালা সংবাদ পত্র রচনা
করেন তাঁহারা প্রায়ই অশিক্ষিত লোক ।
কিন্তু অশিক্ষিত মুসলমানেরাও বাঙ্গালা
ভাষায় বহুতর পুস্তক লিখিয়া থাকেন তাঁহা-
দের পুস্তক যে ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে
তাঁহাকে মুসলমানী বাঙ্গালা কহে । মুসল-
মানী বাঙ্গালাটী একটা স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে
পাবা যায় না । ঐ বাঙ্গালা ভাষায় একটা
অবাস্তব ভাগহন্তী । মুসলমান লেখক যে
জেলায় বাস করেন সেই জেলার অনেক
প্রচলিত কথা তাঁহার গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয় ।
আব তাহাব সঙ্গে সঙ্গে অনেক উর্দু আরবীও
পারসী মিশ্রিত হইয়া থাকে ।

আমরা পূর্বে বাঙ্গালা হইতে অনেক
গুলি মুসলমানী বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রাপ্ত
হইয়া থাকি । গ্রীহট্টের পুস্তকগুলি ‘কাট
নাগরী’ নামক অক্ষরে লিখিত । শিয়ালদহ
হাজিপাড়ায় কাট নাগরীর একটা প্রেস
আছে । প্রতি বৎসর সেই প্রেস হইতে
অনেকগুলি পুস্তক প্রচারিত হয় । সাধারণতঃ
মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক, বাঙ্গালা পুস্তক
যেখানে শেষ হয়, সেই খান হইতে আরম্ভ
হয় । কিন্তু দুই একখানি পুস্তক বাঙ্গালা
পুস্তকের ন্যায় আরম্ভ হইতেও দেখিয়াছি ।
উর্দু ও পারসী যেরূপ প্রতি ছত্র ডাইনর্দিক
হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে যায় ;

মুসলমানী বাঙ্গলার সেরূপ নহে। মুসলমানী বাঙ্গলার ছত্রগুলি বামদিক হইতে ডাইন দিকে যাব। কেবল কেতাব খানি আমরা বাহাকে শেষ দিক বলি সেই দিক হইতে আবস্ত হয়। মুসলমানী বাঙ্গলা এহু অধিকাংশ কলিকাতা ঢাকা ও কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহ জেলারও কোন কোন স্থানে মুসলমানী বাঙ্গলার ছাপা খানা আছে।

মুসলমানী বাঙ্গলার বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক নাই। মুসলমানদিগের আইন ও ধর্মের পুস্তকের সংখ্যাও অতি অল্প। এই ভাষার বহু পুস্তক বাহির হয তাহাব অধিকাংশই গল্পের বহি এবং পষাবাদি নানা ছন্দোবন্দে লিখিত। এই সকল গল্পের বহি বা কেছার কেতাবে যেমন বাঙ্গলা ও পাবসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ হিন্দুদের দেবীর সঙ্গে মুসলমান পীর ফকীরের কথাও একত্রে লিখিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, হাসেন হোসেন আলি একত্রে জড়িত হইয়া এক অপূর্ণ শোভা ধারণ করে। এই ভাষাব একখানি পুস্তকের নাম **গুজু উজাল** বিবীর কেছা এই পুস্তকের গোড়ার কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিতেছি।

“আল্লা আল্লা বল ভাই যত মমিনগণ
গুজু উজাল বিবির কিছু শুনা দিয়া মন।
গুজু উজাল বিবি যদি মুজু পানে চাব
দেখিয়া আছমানের গুজু সেই লজ্জা পায়
মুজু উজাল বিবিএর হাই অললাল
আছমানের চন্দ্র দেখে হয় মরলাহাল।”

গল্পটী অতি সুন্দর। মহম্মদের আমাত

আলি মহম্মদের কন্যা কতে বা বিবির এন্তে-
কালের পর হনুকা বিবি নামক আর একটী
কন্যা বিবাহ কবেন হনুকা বিবির পুত্রের নাম
হানিকা। হানিকার পাঁচ বিবাহ।

পহেলা কবেছে সাদি মল্লিকা আকাব
তারপরে কবে সাদি জৈগুন সুন্দর
সোম্ব ওভানে কবে সাদি জোরে পাইল
ওবাল

তারপরে করে সাদি বিবি সোণাতান
পবন কুমারী বিয়া করে আপনাব জোবে
এই পঞ্চ বিবি দেবহানিকার ঘরে।

একদিন হানিকা পাঁচ বিবির সঙ্গে বলিয়া
হাস্য পবিহাস করিতেছেন এমন সময়ে
হানুকা বিবি বলিলেন আজি আমার
ঘরে তোমাদেব খানা খাইতে হইবে।
সকলে খানা খাইতে বসিয়াছেন, হানিকা
বিবিদের রূপ দেখিয়া এমন মোহিত
হইয়াছেন যে তাঁহার হাতের প্রাস
পাতে পড়িয়া গেল মুখে আর উঠিল না।
ইহা দেখিয়া সাদোয়ান (খানার অধিকারী
দেবতা) আল্লার নিকটে গিয়া করিয়া
করিল যে—

করিয়া আমার এই শুন পাক সাই
হকুম কর আমি আজ জুনিয়া ছেড়ে বাই
বাইয়া যে নিজপুরি বহি ছাপাইয়া
মরুক হানিকা তবে মোরে না চিনিয়া
আমাকে তুলিয়া দেখে নারির ছরত
আমি বিনে ছরাত রহে কেয়াছা ভাত।
আল্লা বলে সাদোয়ান থাকহ সংসারে
সবার কেছমকে থাক মার হানিকাশরে।
এত যদি কহিলেন আপনি নিরঞ্জন
জৈগুন বিবী আনিল গায়েবে।

জৈগুন বিবী আল্লাদববাবের কথা জানিতে পারিয়া কাণে কাণে সোণাতানকে এই কথা বলিতেছেন এমন সময় হানিফা বলিলেন তোমরা কি বলাবলি করিতেছ, তখন জৈগুন বলিলেন যে তুমি আমাদের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছ কিন্তু আমাদের অপেক্ষাও সুন্দরী এক বিবি আছে—

এমনি ছুবত তাহে দিল বাবিতাল।

চক্ষু কে জিনিয়া তাব ছুবত উজাল।

শুনিয়াই হানিফা সেই বিবির জন্য উন্নত হইয়া উঠিলেন কিছুতেই তাহাব নিষ্পত্তি হইল না। তিনি সেই বমণীর অন্তঃকরণে যাইতে উদ্যত হইলেন। বিবীগণ কান্দিয়া বলিতে লাগিল

কলেমা পড়িছ মোবা জাত মজাটায়

আকবত পাব বলি ভবসা করিয়া

তাহাতে করিলে তুমি মবাবে ইনবাস

আর না যাইব মোবা মা বাণের পাশ

কিন্তু হানিফা কিছুতেই হুগুনাই, হানিফা আহাব ত্যাগ করিল। হাহুর্দী একদিন থানা পাকাইয়া সামনে ধরিলেন কিন্তু সাদোখান ফুল হইয়া উড়িয়া গেল সকলে কান্দিয়া আকুল হইল। হানিফা বলিলেন,

হানিফা বলেন আমি দানা নাহি পাব

আল্লার নামেতে তবে ফকীর হইব

তছবি হাতে নিল মর্দ তাজিছিল ছেবে

ফকির হইল মর্দ আল্লাব বাহা পবে।

তখন হানিফা বাবকোটে গিয়া গুর্জ উজাল বিবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আট দিন অনাহাবে নিবস্তব ক্রমশে একান্ত ক্লান্ত হইয়া হানিফা নদীতীরস্থ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করতঃ আল্লাব

নাম লইতে আবস্ত করিলেন। আশা বৃক্ষ নদী গর্ভে পতিত হইয়া তাহাব জীবলীলা সাক্ষ্য করিবেন। জিবরিল তখন অত্যন্ত কাতর হইয়া আল্লাব নিকট হানিফাব দুর্দশার কথা বর্ণন করিলেন, তখন

আল্লা বলে জিবরিল শুন দিল দিয়া

ঘোড়াখেতুব পাখী আছে আন বোলাইয়া

হানিফ দ দোসব হউক যটয়া নিকটে

পাইবে খটতে থানা গেলে বাবকোটে।

স্বরণমাত্র ঘোড়া খেতুব উপস্থিত হইল।

আতাতালা তাঁহাকে হানিফাব গথ প্রদর্শক হইয়া বাবকোটে লইয়া গাইতে বলিলেন।

আজ্ঞামাত্র ঘোড়াখেতুব হানিফাব নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাবকোটে লইয়া

বাইবাব কথা বলিল। বাবকোটের নাম শুনিয়াই হানিফা জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্

বাবকোট? যেখানে গুর্জ উজাল বিবি আছেন? ঘোড়াখেতুব বলিল হাঁ। তাহা

শুনিয়া হানিফা অষ্টচিত্তে পক্ষীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দূর গিয়া হানিফা

ঘোড়াখেতুবকে বলিলেন ভাই তুমি একটু ডালের উপর বইস। আমি নমাজ পড়িয়া

লই। হানিফাব নমাজের এক অংশ উদ্ধৃত হইল।

এলাহি আলযামীন আল্লা গোম কর মাপ।

আব না সহিতে পারি সাদোখানের তাপ ॥

মাপকব আল্লা তালা আমার তর্কছিব।

থোড়া থানা দিলাও আল্লা আমার খাতির ॥

তখন থোড়া হানিফাব কাতরতার কাতর হইয়া জিবরিলকে স্বরণ করিলেন এবং বলিলেন জিবরিল তুমি হানিফাকে মেবামত পুরে

লইয়া যাও। যেখানে আজি মেহমানি (যজ্ঞ)

হইতেছে। তথায় উহাকে খানা খাওয়াও। জিববিল ফকিবের বেশধারণ করিয়া হানিফার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মেহমানিতে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক ফকীর উপস্থিত ছিলেন জিববিল তাঁহাকে বিছানার উপর বসাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যথা সময়ে আদিমগণ (পরিবেশন কারীগণ) খানা লইয়া আসিল হানিফ বলিলেন তোমাদেব কল্যাণে আজি আমি ছয়মাসের পব খানা খাইলাম বলিয়া আহাব কবিত্তে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু খোদাব নাম লইলেন না অমনি খোদাব আজ্ঞায় সমস্ত অন্ন উড়িয়া গেল। অমনি সমবেত ফকীরগণ বলিয়া উঠিল এই দুই ফকীর জুতের সাহায্যে আমাদের অন্ন উড়াইয়া দিয়াছে। বলিয়া হানিফকে বাঁধিয়া মাঝিতে উদ্ভূত হইল। তখন হানিফ আপন পরিচয় দিলেন যে কপে সাদোওয়ানের ফকীরাদে তাঁহার অন্নবন্ধ হইয়াছে তাহাও বিবৃত করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে দুধ ও অ্যান্য খাবার আনিবার জন্ত চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা হইল না। সমস্ত খাজ্রা উড়িয়া গেল। হানিফ কাদিয়া ঘোড়া খেতুবের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং উভয়ে বারকোটে গেলেন। তথায় শুজ্জ উজ্জাল বিবী 'যে মসজিদে নেমাজ পড়েন সেই মসজিদে গিয়া বসিয়া বহিলেন। বিবি নেমাজ করিয়া হানিফকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? হানিফ আপন পরিচয় দিল। বিবী বলিলেন তুমি যে নবীর খান্দান তাহার পরিচয় কিসে পাইব? আমি তোমায় কতকগুলি সওয়াল করি তুমি তাহার জবাব দাও; বলিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া হানিফ পবদিন প্রত্যয়ে জবাব দিলেন স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মপুরুষ গুরু হইল; তখন ঘোড়াখেতুর আসিয়া বলিল হানিফ তুমি বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াছ। এই সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া তোমার কর্তব্য নয়। তুমি এক কর্তব্য কর এক

গাছা পালক দিয়া যাইতেছি তাই লইয়া থাক শুজ্জ উজ্জাল সকালে আসিয়া তুমি জবাব দিতে না পারিলে, আওয়াজে তোমায় ভয়বানি করিয়া ফেলিবে। তুমি যদি এই পালক সম্মুখে ধর, তোমার কিছুই হইবে না। আমি আল্লাব নিকট তোমার জন্য দরবার কবিত্তে যাই। বলিয়া ঘোড়াখেতুব আল্লাব দরবারে গমন করিল এবং বলিল সাদোয়ান বিহনে হানিফার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে তাহাকে হানিফের নিকট না পাঠাইলে বিপদ উদ্ধাব হয় না। আল্লা তখন সাদোয়ানকে কহিলেন আব অভিমান করিয়া থাকিলে চলিবে না, তুমি যাও হানিফের নিকট আনিয়া হও। সাদোয়ান অগত্যা তাহার মুখে উঠিল। হানিফার ধড়ে বুদ্ধি আসিল।

পবদিন যখন শুজ্জ উজ্জাল উপস্থিত হইলেন এবং মনোমত জবাব না পাইলেন তখন ঘোবতব আওয়াজ করিলেন। পালকেব বলে হানিফার কিছুই হইল না।

এ দিকে জৈশুন সেই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং স্বামীর বিপদ জানিতে পারিয়া খাশুড়ী হানিফা বিবিকে বলিলেন। হানিফা কাদিয়া দিয়া মক্কায ফতেমা বিবি তাহার সপত্নী নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বারকোটে যাইতে বলিলেন।

ফতেমা বাজী হইলেন এবং আলির অনুমতি অনুসারে বারকোট যাত্রা করিলেন।

অতএব ফতেমাজান বারকোটে দেশে।

শুরুজ্জ কবিল বন্ধ আপন বাতাসে।

শুরুজ্জের জেত বন্ধ করিলেন আপনি।

ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়িলেন পবন তাহা জানি মাসেকেব পথ মাতা আইল তিলেকে।

তবে নিজ মূর্ত্তি মাতা হন আপনাকে।

যখন জগন্মাতা ফতেমা বারেকোটে উপস্থিত হইলেন তখন শুজ্জ উজ্জালের আর সন্দেহ রহিল না তিনি হানিফাকে নবীর খানদান জানিয়া, তাহার সঙ্গে বিবাহ

করিলেন হানিকা তাঁহাকে কলমা পড়াইয়া
ধর্মে দীক্ষিত করিলেন এবং শুক্ল উজ্জাল
আপনার সমস্ত ধনসম্পদ পাড়াপড়সীকে
বিলাইয়া দিয়া খণ্ডর বাড়ী গেলেন।

মুসলমানী বাজারের একটি কেছা
পাঠক বর্গকে উপহার দিয়া অদ্যকার মত
বিদায় হইলাম।

ঐহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পুস্তক।

পুস্তক পরম্পরায এক চিবন্তন মনের
বিকাশ হইতেছে। যে কোন পুস্তক
লিখিত হয়, উহা এই বিশ্ব মনের চিন্তা
শৃঙ্খলেব একটি অংশ, বিশ্ব-মনের মহাতীর্থ-
প্রয়াণেব একটি অভিযুখীন পাদ। যে চিন্তা-
বীজ আদৌ উদ্ভূত হইয়াছিল তাহাই নিরব-
চ্ছেদ বিকাশ পাইয়া আসিতেছে। বিপুল-
ছারাসম্বিত বনস্পতি বীজেব রূপান্তর।
নিগূঢ়ত্বাবিকারিণী পরমার্থবিশ্বজ্ঞেব বানী
কৌপীন-মাত্র-পরিধান যুগযাজ্ঞারীব মেঘ
ও তড়িৎমালা দর্শনে অক্ষুণ্ণ ধ্বনিব
রূপান্তর মাত্র। জগতেব শৈশব ও বার্দ্ধক্য
সমন্ত্রুপাতে বর্তমান। স্বজ্ঞাবধি কত
অগণ্য মানব এই সংসারে আসিয়াছে,—
চলিয়া গিয়াছে; শৈশব ও বার্দ্ধক্যেব সহিত
তাঁহাদের মনেবও শৈশব ও বার্দ্ধক্য হই-
য়াছে। এই ব্যক্তিগত বাল্য ও বৃদ্ধ্যেব
ভিতর দিয়া সমগ্রভূত মানব জাতিব সমস্ত
বিধাঙ্গি একটি চিরন্তন মন ও শৈশবাদি
বিবিধ অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়াছে।
এই মনের বিকাশের ক্রমশই অধিকতর
ক্ষুণ্ণত। হইতেছে, কিন্তু ইহার বাল্য ও
বৃদ্ধ্য নিরূপণের উপায় নাই। কারণ এ
স্থলে সমস্তির সহিত এক দেশের তুলনা
হইতে পারে না। সসীম অনন্তের পরি-
মাপক হইতে পারে না।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে আমরা
জন্ম মানবজাতির পাবম্পর্ধ্য রক্ষা করিতে-

ছিলা; পবিত্র মানবমনের চিন্তা শৃঙ্খলেবও
পাবম্পর্ধ্য রক্ষা করিতেছি। মৃতজ্ঞন
জীবিতজ্ঞনে সঞ্জীবিত। এই মহাচিন্তার
ক্রমাত্মদয় পবীক্য করিলে আমরা দেখিতে
পাইব যে ইহাব সম্বন্ধে মৃত্যু নাই; ব্যক্তি-
গত অস্থিতি ইহাব স্থিতির লোপ করিতে
পাবে না। অক্ষত অনারত ভাবে এই
স্রোতঃ বহিয়াছে। দ্রুতম প্রদেশে বন
জঙ্গলেব ভিতর কোন শৈল শৃঙ্গ হইতে
উৎপন্ন হইয়া একটি কুশ সলিল রেখা হইতে
ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইয়া ইহা এখন বিপুল
স্রোতস্বতী হইয়াছে। অক্ষুণ্ণভাবে মহো-
দধিব অভিযুখে চলিয়াছে। ইহাব বেগ
ব্যাহিত হইবাব নয়; গতি সংবোধক মহাম-
হীকহ সকল ছিন্ন, ভগ্ন ও বিপর্যস্ত করিয়া
সাগর সঙ্গমোদ্দেশে চলিয়াছে।

আমাদের তমসাজ্ঞনজীবনে কি অপূর্ণ
আলোক-প্রবাহ; দুর্কহ দুঃখ সন্দেহ ভারে
কি মহতী সাধনা। যখন আমাদের মন
সন্দেহে আকুলিত হয়; যখন বিশ্বংসার
অবজ্ঞীত পিশাচ সন্ধ্যার রক্তভূমিবৎ রোয়
হয়, যখন তরুলতা দুর্কমলতানের
মুক খাতকভূত্যের ন্যায় নির্ধর নির্ধরভাবে
আমাদের দুঃখের সন্ধ্যের লাকী হইয়া
নীরবভাবে দাঁড়াইয়া থাকে তখন আমাদের
এই এক মহতী বিশ্ববার্তা, জীবিতাত্মবন্ধিনী
সাধনা, যে আমরা স্বভাবের প্রথম অধ্বনি
একমাত্র সত্যান নহি। আমাদের